শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

তৃতীয় সংস্করণ।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়,
১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৯২৭

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।
প্রকাশক,—রায় বাহাদুর জগদানন্দ রায়
১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাঠ-পরিচয়।

১ম সংস্করণ,—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক তাঁহার লিখিত পরিশিষ্ট ও ভূমিকাসহ প্রকাশিত।
J. N. Banerjee & Son, Banerjee Press, Calcutta. 1898.

২য় সংস্করণ,—স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিত (আরও কয়েকটি) পরিশিষ্ট ও ভূমিকা সম্বলিত। কলিকাতা, ৫৫নং আপার চিৎপুর রোড, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বঙ্গাব্দ ১৩১৮, (খ্রীষ্টাব্দ ১৯১১)।

৩য় সংস্করণ,—শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, এবং তাঁহার লিখিত পরিশিষ্ট প্রভৃতি সহ বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা আর্ট প্রেসে মুদ্রিত। আগষ্ট, ১৯২৭। . . . . (১০০০ কপি)

মূল্য, কাগজের মলাট, ৩৲। কাপড়ে বাঁধাই, ৩৸০।

আর্ট প্রেস, ৩১নং সেণ্ট্রাল এভেনিউ, কলিকাতা,
শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি-এ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থস্বত্বাধিকার।

এই পুস্তকের স্বত্বাধিকার মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে দান করিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ইহার স্বত্বাধিকার বিশ্ব-ভারতীকে দান করেন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসমিতি, তাঁহাদের ৫ই জুন ১৯২৪ তারিখের অধিবেশনে, ৬ সংখ্যক নির্দ্ধারণের দ্বারা এই দান কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছেন।

বিশ্বভারতীর কর্ত্তৃপক্ষগণ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই সংস্করণ সম্পাদন করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। তিনি এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
৪ঠা আগষ্ট, ১৯২৭।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ,
বিশ্বভারতী-কর্ম্মসচিব।

তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন বর্ত্তমান ভারতের পরম গৌরবের বস্তু। এই ইহ-সর্ব্বস্বতার যুগে তাঁহার নিকটে দৃশ্য জগৎ অপেক্ষা অদৃশ্য জগৎ অধিক সত্য হইয়াছিল। সংসারে যাহা কিছু সুখকর ও প্রিয়, তদপেক্ষা তাঁহার নিকটে ঈশ্বর অধিক সুখকর ও অধিক প্রিয় হইয়াছিলেন। লোকালয়ে বাস করিয়া এবং সংসার-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়াও, তিনি একটি তুষারশুভ্র গিরিশীর্ষের ন্যায়, সংসার হইতে ঊর্দ্ধতর ও পবিত্রতর লোকে জীবিত থাকিতেন। বর্ত্তমান ভারতের ধর্ম্ম-ইতিহাসের অনেকখানি অংশ তাঁহার জীবন-জ্যোতিতে উদ্ভাসিত।

তেমনি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। অতুল ঐশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের দ্বারা বেষ্টিত থাকা সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহার মন বৈরাগ্যের অনলে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, ঈশ্বরের জন্য একটি প্রবল পিপাসা কিরূপে তাঁহাকে অধিকার করিয়া ক্রমে তাঁহার সুখ শান্তি হরণ করিল, এবং কিরূপে পরে সেই পিপাসা তৃপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনে একটি পরম সার্থকতার অনুভূতি আনিয়া দিল, এই গ্রন্থে তিনি স্বীয় অতুলনীয় ভাষায় তাহা বিবৃত করিয়াছেন। অধ্যয়ন, চিন্তা, ধ্যান, ভ্রমণ, ও নির্জ্জন প্রকৃতির সঙ্গ কিরূপে তাঁহার চিত্তে জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, ও ব্রহ্ম-সহবাসের ঘন আনন্দ সঞ্চার করিয়াছে, এই গ্রন্থে অমৃতময় বাক্যে তিনি তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। কিরূপে পরমদেব তাঁহার আত্মাতে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে দিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপাসনা-পদ্ধতি রচনা করাইলেন, কিরূপে প্রাচীন বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রসকল তাঁহার অন্তরের প্রেমভক্তিরসে বিগলিত হইয়া নব নব বন্দনামৃতের ও বচনামৃতের ধারারূপে নিঃসৃত হইয়া আসিল, পাঠক এ গ্রন্থে তাহার অপূর্ব্ব পরিচয় পাইবেন। কিরূপে ধর্ম্মাচরণে ও সংসারকর্ম্মে, সত্যপালনই দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এক মন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল, কিরূপে সাংসারিক বিপদ ও ক্ষতির ঝটিকাবর্ত্ত আসিয়া

তাঁহার চিত্তকে ধর্ম্মে অধিক বদ্ধমূল ও ঈশ্বরে অধিক প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিল, এ গ্রন্থে তাহার অনুপ্রাণনময়ী বর্ণনা পাঠক দেখিতে পাইবেন। রামমোহন রায়ের তিরোধানের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে, স্রোতোহীন প্রাণহীন ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথের আত্মার প্রবল ব্যাকুলতার স্রোত প্রবেশ করিয়া কিরূপে তাহাতে নূতন জীবন-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দিল, কুতূহলী পাঠক তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে লাভ করিবেন। লৌকিক বিচারে তুচ্ছ হইলেও, ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে যাহা অতিশয় মূল্যবান্, স্বীয় জীবনের এমন অনেক ব্যাপার দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সরল ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। এই কারণে, জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ঈশ্বর-পিপাসু ব্যক্তি-মাত্রেরই হৃদয় ইহা পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করে।

এই গ্রন্থের প্রথম দুই সংস্করণে স্বর্গীয় প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আত্ম-জীবনীর পরবর্ত্তী কালের কোন কোন বৃত্তান্ত পরিশিষ্টাকারে লিখিয়া ইহার সহিত যুক্ত করিয়াছিলেন। এখন দেবেন্দ্রনাথের দুইখানি সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে; সুতরাং আত্মজীবনীর পরবর্ত্তী ঘটনা ইহার সহিত যুক্ত করিবার প্রয়োজন আর নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে আমার যোজিত পরিশিষ্ট সকলে আত্মজীবনীর অন্তর্গত কাল সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়া মহর্ষির ঐ সময়ের জীবনের ছবি অধিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, আমার এই পরিশিষ্টগুলি নানা উদ্দেশ্যে লিখিত। কোনটিতে মহর্ষির অভিপ্রায় স্পষ্টতর করিবার, কোনটিতে তথ্য নিরূপণের, কোনটিতে মহর্ষির ধর্ম্মজীবনের একটি ধারার অথবা তাঁহার দীর্ঘকালে সমাপ্ত একটি কার্য্যের ক্রমবিকাশ প্রদর্শনের, কোনটিতে ঘটনা-সকলকে কালক্রমানুসারে সজ্জিত করিয়া দিবার, চেষ্টা করা গিয়াছে। মূল-গ্রন্থের কোন্ স্থানের সহিত কোন্ পরিশিষ্টের যোগ, তাহা পত্রমূলে ফুটনোটের দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পাঠক যদি গ্রন্থপাঠের সময় কষ্ট স্বীকার করিয়া পরিশিষ্টগুলিও পাঠ করেন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়।

কোন কোন পরিশিষ্টের দৈর্ঘ্যের জন্য আমি লজ্জিত। বিশেষতঃ, মহর্ষির উপনিষদ্ চর্চ্চা, উপনিষদে নির্ভর, উপনিষদ্ 'ত্যাগ', উপনিষদ্ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা অনেক স্থান অধিকার

করিয়াছে। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা মহর্ষির জীবন অতিশয় প্রভাবিত হইয়াছিল, এবং উপনিষদ্ সম্পর্কে তিনি নানাশ্রেণীর লোকের সমালোচনা-ভাজন হইয়াছিলেন, এই দুই কারণে এই বিষয়ের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত আলোচনা করা অসঙ্গত মনে হয় নাই। আর একটি কথা এই যে, এই পরিশিষ্টগুলি ধারাবাহিক রচনাসমষ্টি নহে; মূল গ্রন্থের নানা অংশের টীকার আকারে লিখিত। এজন্য, স্থানে স্থানে পুনরুক্তি অনিবার্য্য হইয়াছে। এই অতি-দৈর্ঘ্য ও পুনরুক্তি দোষের জন্য পাঠকগণের নিকটে আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

আমি যখন এই গ্রন্থ সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমার ধারণা ছিল যে মহর্ষির লেখাতে কোথাও ভুল নাই। দুই কারণে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল। প্রথম কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত যে-যে লেখক মহর্ষির বিষয়ে কিছু লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই পুস্তককে সর্ব্ববিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা সকলেই লক্ষ্য করিতাম, মহর্ষির স্মৃতিশক্তি অতিশয় অসাধারণ ছিল। এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিবার সময়েও আমি ঐরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, কোনও বিষয়ে মহর্ষির উক্তির সহিত অন্য কাহারও উক্তির পার্থক্য দেখিলে, মহর্ষির উক্তিকেই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ দেখিতে পাইলাম, মহর্ষিদেব আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কিছু কিছু ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সেজন্য স্থানে স্থানে তাঁহার উক্তিতে ভুল রহিয়াছে। তাঁহার সে বয়সে এরূপ হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে।

এই জন্য কোন কোন বিষয়ে আমাকে বিশেষজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে ও পুরাতন সংবাদপত্রাদি হইতে তথ্য অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই অনুসন্ধান কার্য্যে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার হালদার মহাশয়গণের নিকট হইতে আমি প্রচুর সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি। Imperial Library ও Bengal Secretariat Libraryর কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে বহুপ্রকার সুবিধা দান করিয়াছেন, এবং ক্রমাগত দীর্ঘকাল তাঁহাদিগের ধৈর্য্যের উপরে পীড়ন করা সত্ত্বেও, তাঁহাদিগের নিকট হইতে আমি

অক্ষুণ্ণ সৌজন্য লাভ করিয়াছি। তাঁহাদিগের সকলের নিকটে এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমার অনুসন্ধানের বিষয় ও তাহার ফল পরিশিষ্টে উল্লিখিত আছে। কোন কোন বিষয়ে আমি এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট অপেক্ষা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার স্তম্ভে বিস্তৃততর ভাবে আলোচনা করিয়াছি। সে বিস্তৃততর আলোচনার কথাও পরিশিষ্টে জ্ঞাপন করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে মহর্ষির উক্তির অনুসরণ হেতু আমার ফুটনোটে ভুল হয়; এবং মুদ্রণকার্য্য ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইবার পরে মহর্ষির উক্তির ভ্রম আমি বুঝিতে পারি। ফুটনোটের সে সকল ভুল সংশোধন পত্রে প্রদর্শিত হইল।

মহর্ষির একটি ভ্রমের কথা এখানেই উল্লেখ করা আবশ্যক। তিনি গোরিটির বাগানে প্রায়ই বন্ধুদিগকে লইয়া উৎসব করিতেন। পরস্পর হইতে ৮ বৎসর ব্যবহিত এইরূপ দুইটি উৎসবের ঘটনা আত্মজীবনীর নবম পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে একত্র মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, এবং এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, যাহাতে সকল ঘটনা একই সময়ে সংঘটিত বলিয়া ধারণা হয়। এই সংস্করণে ঐ দ্বিতীয় উৎসবের বৃত্তান্ত সংবলিত কয়েক পংক্তি নবম পরিচ্ছেদের শেষ হইতে ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদের শেষে স্থানান্তরিত করা হইল। (৮৭, ২১৬, ও ৪৫২—৪৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

মহর্ষিদেব যখন মুখে মুখে বলিয়া এই গ্রন্থ লিখাইতেছিলেন, তখন আর তিনি নিজে প্রূফ দেখিতে পারিতেন না; তাই প্রথম দুই সংস্করণে কোন কোন নামে (যথা 'কলবিন্,' 'আর্সন',) ও কোন কোন উদ্ধৃতোক্তিতে ভুল ছিল; একই নাম একাধিক প্রকারে (যথা, দিল্লী দীল্লি, সিমলা শিম্‌লা, ইত্যাদি) মুদ্রিত হইয়াছিল; এবং প্যারাগ্রাফগুলি বিষয়ানুসারে বিভক্ত হয় নাই। এই সংস্করণে এই সকল দোষ পরিহার করিবার জন্য যথাসাধ্য যত্ন করা গিয়াছে। দু এক স্থলে উদ্ধৃতোক্তির বিশুদ্ধ পাঠ নির্ণয় করিতে কৃতকার্য্য হই নাই; পরিশিষ্টে তাহা স্বীকার করা হইয়াছে।

আত্মজীবনীতে মহর্ষিদেব কর্ত্তৃক বেদ, উপনিষদ্, তন্ত্র, মহাভারতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, নানা কাব্য গ্রন্থ, উদ্ভট সাহিত্য, হাফিজ, নানকের পদাবলী, প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত অনেক বচন সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। এই সংস্করণে প্রায় সকল

বচনেরই মূল অনুসন্ধান করিয়া যথাস্থানে ফুটনোটে নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল পুস্তক পত্রিকাদি হইতে আমি কোনও রূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সর্ব্বত্র যথাস্থানে পত্রাঙ্ক প্রভৃতি সহ স্বীকৃত হইয়াছে।

এই সংস্করণে পত্রশীর্ষে পরিচ্ছেদসংখ্যা, ঘটনার বৎসর, মহর্ষির বয়স, ও সেই পত্রের বক্তব্য বিষয়, পরিচ্ছেদারম্ভে সংক্ষেপে বিষয়-পরিচয়, পত্রমূলে নানা বিষয়ের ফুটনোট, গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে আত্মজীবনীর কালের একটি সময়সূচী ও মহর্ষির বংশলতিকা, এবং গ্রন্থশেষে একটি বর্ণানুক্রমিক নামসূচী যোজিত হইল। আশা করি, এ সকলের দ্বারা গ্রন্থপাঠ বিষয়ে পাঠকের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইবে। মহর্ষির রচনা (মূলগ্রন্থ ও তাঁহার লিখিত ফুটনোট, উভয়ই) সর্ব্বত্র পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইল। আমার যোজিত বিষয় সকল মহর্ষির রচনা হইতে পৃথক্ রাখিবার জন্য স্মল পাইকা অথবা বর্জ্জাইস অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

এই পুস্তকের জন্য আমাকে আমার অনেক শ্রদ্ধা ও প্রীতিভাজন বন্ধুর সহিত বার বার সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে বহু সময় ব্যয় করাইতে হইয়াছে। পঞ্জাব হইতে বর্ম্মা পর্য্যন্ত নানা স্থানের বহুসংখ্যক বন্ধুকে বার বার পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে হইয়াছে। আমার পুত্রকন্যাধিক স্নেহভাজন অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, আমার লিখিত ও বার বার সংশোধিত রাশি রাশি পাণ্ডুলিপি পুনঃ পুনঃ লিখিয়া দিয়াছেন; কেহ কেহ Imperial Libraryর প্রাচীন জীর্ণ সংবাদপত্রের ফাইল সকল পরীক্ষা করিবার কঠিন কার্য্যেও আমার সহায়তা করিয়াছেন। এই পবিত্র গ্রন্থের গৌরব অনুভব করিয়া তাঁহারা সকলেই তাঁহাদের নিকটে প্রার্থিত সাহায্য পরম ধৈর্য্য ও আদরের সহিত আমাকে দান করিয়াছেন। সকলের পৃথক্ পৃথক্ নাম উল্লেখ করিয়া আর এই ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করিব না। পুস্তক শেষ হওয়াতে আজ তাঁহাদিগের সকলের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ধাবিত হইয়া যাইতেছে।

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩৩৪।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

এই পুস্তকে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

(১) গ্রন্থনির্দ্দেশের সঙ্কেত।

অজিত — অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী রচিত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", ১৯১৬। সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।

ঈশা. — ঈশোপনিষদ্। সংখ্যা = মন্ত্র।

ঈশান — ঈশানচন্দ্র বসু প্রণীত "শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", মজুমদার লাইব্রেরী, ১৯০২। সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।

ঋ. — ঋগ্বেদসংহিতা। সংখ্যা = মণ্ডল, সূক্ত, ঋক্।

ঐত. — ঐতরেয়োপনিষদ্। সংখ্যা = অধ্যায়, খণ্ড, মন্ত্র।

কঠ. — কঠোপনিষদ্। সংখ্যা = বল্লী, মন্ত্র।

কেন. — কেনোপনিষদ্। সংখ্যা = খণ্ড, মন্ত্র।

গীতা — শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।

ছান্দো. — ছান্দোগ্যোপনিষদ্। সংখ্যা = প্রপাঠক, খণ্ড, মন্ত্র।

তত্ত্ববো. — তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

তৈত্তি. — তৈত্তিরীয়োপনিষদ্। সংখ্যা = বল্লী, অনুবাক, মন্ত্র।

দীবান্ হাফি.জ্. — কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি স্থানের লিথোগ্রাফে ছাপা সংস্করণ। সংখ্যা = গ.জ.লের ও শ্লোকের সংখ্যা।

নগেন্দ্র — নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত", চতুর্থ সংস্করণ। সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।

নৃ. উ. — নৃসিংহ উত্তরতাপনী উপনিষদ্। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।

নৃ. পূ. — নৃসিংহ পূর্ব্বতাপনী উপনিষদ্। সংখ্যা = অধ্যায়, শ্লোক।

পঞ্চবিংশতি — "ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত"; শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক ১৭৮৬ শকের ২৬শে বৈশাখ বিবৃত; Moodeealy Mitter Press। সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।

পত্রাবলী =“মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী”, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, হিতবাদী প্রেস। সংখ্যা=পত্রের সংখ্যা, (পৃষ্ঠার নহে)।

প্রশ্ন. =প্রশ্নোপনিষদ্। সংখ্যা=প্রশ্ন, মন্ত্র।

প্রিয়. পরি. ২ =প্রিয়নাথ শাস্ত্রী লিখিত “শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ব-রচিত জীবনচরিত-পরিশিষ্টের পূর্ব্ব-পরাংশ” ; ১৩১২ বঙ্গাব্দ, পৌষ ও মাঘ মাস। “২”এর পরের সংখ্যা=পত্রাঙ্ক।

বৃহ. =বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। সংখ্যা=অধ্যায়, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র।

ভব. =শ্রীভবসিন্ধু দত্ত প্রণীত “মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচরিত” ; মাঘ, ১৩২১ বঙ্গাব্দ। সংখ্যা=পত্রাঙ্ক।

মনু. =মনুসংহিতা। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

মহানা. =মহানারায়ণোপনিষদ্। সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

মহানি. =মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। সংখ্যা=উল্লাস, শ্লোক।

মহাভা. =মহাভারত, বঙ্গদেশে প্রচলিত পাঠ। পর্ব্বের পরের সংখ্যা=অধ্যায়, শ্লোক।

মাণ্ডূ. =মাণ্ডূক্যোপনিষদ্। সংখ্যা=মন্ত্র।

মুণ্ড. =মুণ্ডকোপনিষদ্। সংখ্যা=মুণ্ডক, খণ্ড, মন্ত্র।

যজু. তৈ. =যজুর্ব্বেদ, তৈত্তিরীয় সংহিতা। সংখ্যা=কাণ্ড, প্রপাঠক, অনুবাক, মন্ত্র।

যজু. বা. মা. =যজুর্ব্বেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মাধ্যন্দিনী শাখা। সংখ্যা=অধ্যায়, মন্ত্র।

রাজ. =“রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত”, দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১৩১৯ বঙ্গাব্দ। সংখ্যা=পত্রাঙ্ক।

রামতনু =শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ”, তৃতীয় সংস্করণ। সংখ্যা=পত্রাঙ্ক।

ব. জা. ই. ব্রা. ৬ =শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রণীত “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ষষ্ঠ অংশ”, (পীরালী ব্রাহ্মণ বিবরণের ১ম খণ্ড)। ১৩১১ বঙ্গাব্দ, চৈত্র। “৬”এর পরের সংখ্যা=পত্রাঙ্ক।

শ্রীমদ্ভা.	= শ্রীমদ্ভাগবত। সংখ্যা = স্কন্ধ, অধ্যায়, শ্লোক।
শ্বেতা.	= শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্। সংখ্যা = অধ্যায়, মন্ত্র।
H. B. S. I.	= History of the Brahmo Samaj *by* Sivanath Sastri, M. A., Vol. I., 2nd Ed., R. Chatterjee, 1919. সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।
Mem.	= Memoir of Dwarkanath Tagore *by* Kissory Chand Mitra. Thacker, Spink & Co., 1870. সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।
M. V. H.	= A Mid-Victorian Hindu, a Sketch of the Life and Times of Rakhal Das Haldar, *by* Sukumar Haldar, B. A., 1921. সংখ্যা = পত্রাঙ্ক।

অন্যান্য পুস্তকের নাম, (এবং কোন কোন স্থলে এই সকল পুস্তকের নামও,) অসংক্ষিপ্তাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। "সাল" = খ্রীষ্টাব্দ। কোথাও অব্দের নাম না থাকিলে তাহা খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

(২) উচ্চারণ-সঙ্কেত।

হিন্দী ও ফারসী কথা বাংলা অক্ষরে লিখিতে গিয়া এই কয়টি সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে। (১) কোনও ব্যঞ্জনহীন স্বরবর্ণের সঙ্গে বিন্দু যুক্ত থাকিলে, তাহা জিহ্বামূল অপেক্ষাও গভীরতর কণ্ঠপ্রদেশ হইতে উচ্চারণ করিতে হইবে, যথা শম্অ., জম্অ., ই.ল্ম্। (২) ক. = জিহ্বামূল অপেক্ষা গভীরতর কণ্ঠপ্রদেশ হইতে উচ্চারিত 'ক'। (৩) খ. = বাংলা খ'য়ের 'ঘষা' উচ্চারণ। (৪) গ. = বাংলা গ'য়ের 'ঘষা' উচ্চারণ। (৫) জ. = ইংরেজী zএর মত'। (৬) ফ. = ইংরেজী fএর মত'। (৭) ব অথবা ব় = ইংরেজী w'র মত'।

হিন্দী ও ফারসীতে অ = হ্রস্ব আ; বাংলা অকারের মত' উচ্চারণ নহে।

ফারসীতে একার এবং ওকার সর্ব্বত্র দীর্ঘ নহে। হ্রস্ব এ'র উচ্চারণ, ই এবং এ'র মাঝামাঝি; কেহ ই'র দিকে, কেহ বা এ'র দিকে টানিয়া উচ্চারণ করেন। এজন্য, একই নামকে কেহ 'হাফি.জ.', ও কেহ 'হাফে.জ.', এই দুই প্রকারে লিখিয়া থাকেন। সেইরূপ, হ্রস্ব ও'র উচ্চারণ উ এবং ও'র মাঝামাঝি বলিয়া, একই নামকে কেহ 'মুহম্মদ্' ও কেহ 'মোহম্মদ্' লিখেন।

সংশোধন পত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৯	২০	বিবাহ (১৮৩১ অথবা ১৮৩২)	বিবাহ (১৮২৯)
৬৬	শেষ	বিয়ের	বিষয়ের
৭১	২৪	(৩) কৃষ্ণপদ ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী	(৩) কৃষ্ণপ্রসাদ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, (৩৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)
৭৮	৩	১৮৪০	১৮৪১
৭৯	পত্রশীর্ষ	১৮৪০	১৮৪১
৭৯	শেষ	১৮৪০	১৮৪১
৮০	২২	কঠ. ১ ২৭	কঠ. ১।২৭
১১১	শেষ	১৪ই সেপ্টেম্বর	২০শে (?) সেপ্টেম্বর
১১৭	৩	যথারীতি দশাহ অশৌচ	যথারীতি অশৌচ
১১৭	শেষ	(৩) ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬।	(৩) ইহা ভুল ; ৪০০—৪০২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১২০	২৩	রামলোচন	রামমণি
১২৩	শেষ	২৯শে সেপ্টেম্বর	১৫ই অক্টোবর
২০১	শেষ	'এ ন্না'	'এদ্যা'
২৭২	শেষ	ঠক.	কঠ.
৩০৩	১৭	দেবেন্দ্রনাথ	"দেবেন্দ্রনাথ
৩২৭	১৯	লক্ষ্মীনারায়ণ	লক্ষ্মীজনার্দ্দন
৩৩৩	২২	অধিকাংশ সম্পত্তি	অধিকাংশ ভূসম্পত্তি
৩৩৯	৮	ঘটে নাই।	ঘটে নাই, (৪০৫, ৪০৬ পৃঃ)।
৩৭৬	৪	সাই	নাই
৩৯৫	৮	করিতেন।	করিতেন, (পত্রাবলী, ৮)।
৪১১	১২	উপদষ্টো	উপদেষ্টা

বিষয়-সূচী।

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়			পৃষ্ঠা
আখ্যাপত্র	...	....	৶০
পাঠ-পরিচয়	...	...	।০
গ্রন্থস্বত্বাধিকার	...	...	।/০
তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদকের নিবেদন		...	।৶০—॥৶০
এই পুস্তকে ব্যবহৃত সাঙ্কেতিক চিহ্ন		...	৸০—৸৵০
সংশোধন পত্র	...	...	৸৶০
[বিষয়-সূচী]	...	...	[১—৯]
সময়-সূচী	....	...	১০—২৭
বংশলতিকা	....	...	২৮—৩১
গ্রন্থারম্ভ	...	...	৩৩
প্রথম সংস্করণের গ্রন্থস্বত্বাধিকার দান পত্র		...	৩৫
"বিজ্ঞাপন" (দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি বাক্যের মূল)			৩৬

প্রথম পরিচ্ছেদ। দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী। পিতামহীর ভালবাসা, ধর্ম্মনিষ্ঠা, অন্তিম কাল। শ্মশানে দেবেন্দ্রনাথের মনে উদাস আনন্দের ভাব। (১৮১৭—১৮৩৫)। ... ... ৩৭—৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পিতামহীর মৃত্যু। শ্মশানের আনন্দ হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের অস্থিরতা। (১৮৩৫)। ... ... ৪১—৪৪

তৃতীয় পরিচ্ছেদ। রিক্ততার দ্বারা শ্মশানের আনন্দ ফিরিয়া পাইবার নিষ্ফল চেষ্টা। ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া গভীর বিষাদ। শাস্ত্রে ঈশ্বরতত্ত্ব অন্বেষণ। কমলাকান্ত চূড়ামণি ও শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য। য়ুরোপীয় দর্শন পাঠে অতৃপ্তি ও বিষাদ বৃদ্ধি। (১৮৩৬,১৮৩৭)। ... ৪৫—৫০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ। অন্ধকারে কয়েকটি কিরণ-রেখা,—(১) বিষয়জ্ঞানের সহিত জ্ঞাতাকে জানা যায়; (২) জগৎ জ্ঞানময় পুরুষের পরিচয় দেয়;

(৩) আকাশ এক অনন্ত নিরবয়ব দেবতার পরিচয় দেয়; (৪) অনন্ত জ্ঞানময়ের ইচ্ছা হইতে বিশ্ব সৃষ্ট। এই সকল চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্তে অন্যের সায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা। (১৮৩৮)। ... ... ৫১—৫৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। প্রতিমাপূজা পরিহার্য্য। রামমোহন রায় সম্বন্ধে বাল্যস্মৃতি। ঈশোপনিষদের ছিন্ন পত্র হইতে হৃদয়ের সায় ও বিমল উপদেশ লাভ। উপনিষদ্ পাঠ। তত্ত্ববোধিনী সভা। (১৮৩৮,১৮৩৯)। ৫৬—৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি; কার্য্যপ্রণালী; সাংবৎসরিক উৎসব। দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন ও তাহার ভার গ্রহণ। (১৮৪০—১৮৪২)। ... ... ৬৫—৭২

সপ্তম পরিচ্ছেদ। উপনিষদে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। সত্যধর্ম্ম প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা। অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতা। উপনিষদ্ প্রকাশ আরম্ভ। (১৮৪৩)। ... ৭৩—৭৭

অষ্টম পরিচ্ছেদ। দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তে অনুরাগ, বিষয়কর্ম্মে অমনোযোগ, ও বেলগাছিয়ার প্রমোদ-সভার কার্য্যে অবহেলা দর্শনে পিতার অসন্তোষ। দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা। বেদপাঠের জন্য ছাত্রবৃত্তি দান ও ছাত্রনির্ব্বাচন। (১৮৪৩)। ৭৮—৮১

নবম পরিচ্ছেদ। বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের আবশ্যকতা। প্রথম প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা। গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার ব্রত। ৭ই পৌষ বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ, (১৮৪৩)। দুই বৎসরের মধ্যে প্রতিজ্ঞাপত্রে ৫০০ জনের স্বাক্ষর। গোরিটির বাগানে মেলা। (১৮৪৫)। ৮২—৮৭

দশম পরিচ্ছেদ। গায়ত্রী সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয়, এ জন্য নূতন ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী রচনা। 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ও 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি', এই দুই মহাবাক্য। ঈশ্বর বিধাতা, স্রষ্টা, ও নিয়ন্তা, এই ভাবের আর তিনটি মন্ত্র। মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র। এই উপাসনাপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তন। (১৮৪৫)। ... ... ৮৮—৯৪

একাদশ পরিচ্ছেদ। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফলে জীবনে বিবিধ কৃতার্থতা। (১) উপনিষদে হৃদয়ের সায় লাভ। (২) ঈশ্বরকে পাইয়া ভক্তিবৃত্তি চরিতার্থ।

(৩) গায়ত্রীতে প্রবেশ করিয়া 'ঈশ্বরই আমার চালক' এই অনুভূতির উদয়। (১৮৪৪, ১৮৪৫)। ... ... ৯৫—১০০

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। অপ্রত্যাশিত কৃতার্থতার ফলে ঈশ্বর-লোলুপতা বৃদ্ধি। ঈশ্বরের প্রেম-রঞ্জিত নিত্য সহবাস। (১৮৪৪, ১৮৪৫)। ১০১, ১০২

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ। উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। খ্রীষ্টিয় প্রচারকগণের বিরুদ্ধে আন্দোলন। হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। (১৮৪৫)। ... ... ১০৩—১০৬

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ। উপনিষদ্ প্রচারের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারের ও ভারতের একতা সম্পাদনের আশা। বেদপাঠের জন্য কাশীতে ছাত্র প্রেরণ। (১৮৪৫, ১৮৪৬)। পিতার ইংলণ্ডে অবস্থিতি হেতু বিষয় দেখিতে বাধ্য হইয়া বিরক্তি বোধ। নির্জ্জনে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণে গমন। নদীতে ঝড়; নৌকাডুবির আশঙ্কা; পিতার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি। (১৮৪৬)। ১০৭—১১৬

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ। দ্বারকানাথের কুশপুত্তল দাহ ও শ্রাদ্ধ। অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধের প্রস্তাবে দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয়গণ বিরোধী। হাজারীলালের সহানুভূতি। মানসিক সংগ্রাম; স্বপ্নে মাতার আশীর্ব্বাদ লাভ। শ্রাদ্ধের দিনের গোলযোগ। দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রসাদ। (১৮৪৬)। ১১৭—১২৬

ষোড়শ পরিচ্ছেদ। বৈষয়িক কথা। দ্বারকানাথের জমিদারী, ব্যবসায়, ট্রষ্টডীড, উইল। গিরীন্দ্রনাথকে ব্যবসায়ের ভার প্রদান, (১৮৪৬)। ১২৭—১৩০

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ। পরা ও অপরা বিদ্যা। কাশীতে গমন করিয়া বেদ শ্রবণ। (১৮৪৭)। ... ... ১৩১—১৩৯

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ। কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া বেদ পরিত্যাগ। (১৮৪৭)। অপরা-বিদ্যা-প্রধান (যাগযজ্ঞ-প্রধান) বেদেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-সূচক বাক্য আছে; কিন্তু উপনিষদেই সে সকলের পূর্ণতা হইয়াছে। ১৪০—১৪৫

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ। কার ঠাকুর কোম্পানীর পতন; দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক উত্তমর্ণদের হস্তে ট্রষ্ট্-সম্পত্তি শুদ্ধ সমুদয় সম্পত্তি সমর্পণ করিবার প্রস্তাব। ইন্‌সল্‌ভেন্সীতে দেবেন্দ্রনাথের ঘৃণা। বিষয়-নাশে দুঃখ না হইয়া

আনন্দ। ব্যয়-সঙ্কোচ। ঋণ শোধের গুরুভার গ্রহণ। সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্ব-চিন্তায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায় গভীর অভিনিবেশ। (১৮৪৮)। ১৪৬—১৫২

বিংশ পরিচ্ছেদ। কাশী হইতে ছাত্রগণের প্রত্যাবর্ত্তন। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ব-চিন্তা ও শাস্ত্রচর্চ্চার একটি গুরুতর ফল,—উপাসনাপদ্ধতিতে তৃতীয় মহাবাক্য 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যোগ। তিনটি মন্ত্রের দ্বারা তিন ভাবে ব্রহ্মের বর্ত্তমানতা উপলব্ধি করিতে হইবে। (১৮৪৮) ১৫৩—১৫৭

একবিংশ পরিচ্ছেদ। দুই জন রাজা। বর্দ্ধমান ভ্রমণ ও বর্দ্ধমানের রাজা মহ্‌তাব চন্দ্‌। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র। (১৮৪৮)। ১৫৮—১৬৪

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। পুনরায় উপনিষৎ প্রসঙ্গ। আধুনিক উপনিষদের কণ্টকারণ্য। প্রাচীন উপনিষদেও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী বাক্যসকল বিদ্যমান। অতএব, বেদে যেমন ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি হইতে পারে না, উপনিষদেও তেমনি হইতে পারে না। জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। আপ্তকাম ও আত্মকাম পুরুষ। (১৮৪৮)। ১৬৫—১৭৪

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ। ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা। দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত সত্য-সকলই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে উপনিষদের ভাষায় প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড নানা শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত। (১৮৪৮, ১৮৪৯)। ১৭৫—১৮৪

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রকাশের পর ব্রাহ্মসমাজে নূতন সজীবতা। ১১ই মাঘে ফেনেলন্-রচিত স্তোত্র পাঠ। (১৮৪৯)। ১৮৫—১৯০

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা রহিত হওয়া। আসাম ভ্রমণ। (১৮৪৯)। ... ... ১৯১—১৯৪

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ। বর্ম্মা ভ্রমণ। (১৮৫০)। ১৯৫—২০২

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ। উড়িষ্যা ভ্রমণ। (১৮৫১)। ২০৩—২০৭

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ। ঋণের জন্য ওয়ারাণ্ট। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাহায্য। তাঁহার সহিত ঈশ্বর বিষয়ে কথোপকথন। (১৮৫৫)। ২০৮—২১৩

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ। বিবিধ বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত হইলেন, (১৮৫৭)। 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' সংশোধন ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মটো রূপে তাহার ব্যবহার, (১৮৪৯, ১৮৫১, ১৮৫৭)। গোরিটির উৎসব, ও তথায় উপবীত ত্যাগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, (১৮৫৪)। ২১৪—২১৭

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। বিবিধ অশান্তি। নগেন্দ্রনাথ কৃত নূতন ঋণ। অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের অভাব; নবপ্রতিষ্ঠিত 'আত্মীয় সভায়' হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ। দেবেন্দ্রনাথের ঔদাস্য, ও 'আত্মার মূল তত্ত্ব' অন্বেষণের সঙ্কল্প। বরাহনগরের বাগানে গমন; দীর্ঘকালের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাসের ইচ্ছার উদয়। (১৮৫৬)। ২১৮—২২৩

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ। গৃহ ত্যাগ। নৌকায় কাশী পর্য্যন্ত, ও গাড়ীর ডাকে অমৃতসর পর্য্যন্ত গমন। (১৮৫৬, ১৮৫৭)। ... ২২৪—২৩১

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ। অমৃতসরে দুই মাস। শিখ মন্দিরে সপ্ত প্রহর ভগবৎকীর্ত্তন। সিমলা যাত্রা। (১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল)। ২৩২—২৩৯

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সিমলা। জলপ্রপাত দর্শন। গুর্খা বিদ্রোহ। (১৮৫৭, এপ্রিল, মে)। ... ... ২৪০—২৪৪

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সিমলা। গুর্খা-ভয়ে ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের পলায়ন। ডগ্‌শাহীতে এগারো দিন। (১৮৫৭, মে)। ২৪৫—২৫২

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ। ব্রহ্মসহবাস আকাঙ্ক্ষায় নির্জ্জন গিরি ভ্রমণ। সুজ্রী। বনফুলে ঈশ্বরের করুণা দর্শন ও হাফিজের সঙ্গীত গান। বোয়ালি, নগরী নদী, ও সিরাহন পর্ব্বত। (১৮৫৭, জুন)। ... ২৫৩—২৬৬

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সিমলা। হিমালয়ে বর্ষা ও শীত। সিমলায় যাপিত দুই বৎসরের দৈনিক জীবন। 'আত্মার মূল তত্ত্ব' নিরূপণ। পুণ্যভূমি হিমালয়ে ব্রহ্মদর্শনলাভ। (১৮৫৭, ১৮৫৮)। ... ২৬৭—২৭৩

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ। ভজ্জী ভ্রমণ। সিমলায় পর্ব্বতোপরি নূতন বাঙ্গালায় বাস। নির্জ্জন ধ্যান ও নির্জ্জন ভ্রমণ। 'অনিমেষ আঁখি'। (১৮৫৮, ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল)। ... ... ২৭৪—২৮০

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ। সিমলা। পুনরায় বর্ষা। আশ্বিনে নিম্নগামিনী নদী দেখিতে দেখিতে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অনুভব। সিমলা ত্যাগ। (১৮৫৮, আগষ্ট—অক্টোবর)। ... ২৮১—২৮৭

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ। এলাহাবাদ হইতে ষ্টীমারে কলিকাতা যাত্রা। পথে নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তি। কলিকাতায় প্রত্যাগমন। (১৮৫৮, নভেম্বর)। ... ... ২৮৮—২৯৩

পরিশিষ্ট **২৯৫**

(১) দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী ২৯৭

(২) দেবেন্দ্রনাথের পিতা মাতা ২৯৮

জননী দিগম্বরী দেবী, ২৯৮; পিতা দ্বারকানাথ, ২৯৯।

(৩) পিতামহীর স্বহস্তে সংসারের কাজ করা ... ৩০৩

(৪) মা-গোসাঁই ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী ... ৩০৪

(৫) মহর্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত বাড়ী ও বাগান ৩০৫

পুরাতন বাড়ী ও 'গোপীনাথ' বিগ্রহ, ৩০৫; ভদ্রাসন বাটী, ৩০৬; বেলগাছিয়ার বাগান-বাড়ী, ৩০৭; বৈঠকখানা বাড়ী, ৩১০।

(৬) প্রথম বয়সে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিশ্বাস ... ৩১২

(৭) দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিন্দুকলেজ ... ৩১৩

রামমোহন রায়ের স্কুল, ৩১৩; হিন্দুকলেজ, ৩১৪: 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা', ৩১৫; হিন্দুকলেজের তৃতীয় ছাত্রদল, ৩১৬; হিন্দু কলেজের পাঠ্যতালিকা, ৩১৬।

(৮) দেবেন্দ্রনাথের জীবন পরিবর্ত্তন ... ৩১৭

(৯) শ্মশানের আনন্দ হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের অশান্তি ৩২১

(১০) দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৩৮ সালের পূর্ব্বে পঠিত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র ৩২২

(১১) বাল্যজীবনে রামমোহন রায়ের সহিত যোগ ৩২৪

(১২) রামমোহন রায়কে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণ করিতে গমন ৩২৬

(১৩) দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধর্ম্মবিশ্বাস ... ৩২৭

(১৪) দ্বারকানাথের বিষয়সম্পত্তি, ও তাঁহার ব্যবসায়ের পতন ৩২৯

দ্বারকানাথের চাকরী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা, ও দেবেন্দ্রনাথকে ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিয়োগ, ৩৩০ ; কার ঠাকুর কোম্পানী, ৩৩১ ; দ্বারকানাথের ট্রষ্টডীড, ৩৩২, মুক্তহস্ততা ও বহুব্যয়শীলতা, ৩৩৫, উইল, ৩৩৬। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ৩৩৬ ; দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাস, ৩৩৭ ; দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পতিত ঋণভার, ৩৪০।

(১৫) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ৩৪০

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ৩৪১ ; বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৩৪৩।

(১৬) দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ চর্চ্চার বিভিন্ন যুগ ... ৩৪৫

(১৭) তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম যুগ ... ৩৪৬

(১৮) রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার বার ৩৫৩

(১৯) ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ .. ৩৫৪

(২০) তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ ... ৩৫৫

(২১) অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৫৮

(২২) দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-বিরাগ ; দ্বারকানাথের অসন্তোষ ৩৫৯

(২৩) 'ব্রাহ্মসমাজ', 'ব্রাহ্ম', ও 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই তিনটি নাম ৩৬০

ব্রাহ্মসমাজ কি-নামে প্রতিষ্ঠিত হয়? ৩৬০। 'ব্রাহ্মসমাজ'ই প্রকৃত নাম, ৩৬৪। 'ব্রাহ্ম' নামটি কবে হইল? ৩৬৫। 'ব্রাহ্মধর্ম্ম', ৩৬৬।

(২৪) ৭ই পৌষের বিশেষত্ব ৩৬৮

(২৫) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পদ্ধতির ও প্রতিজ্ঞার নানা পরিবর্ত্তন ৩৭০

(২৬) দেবেন্দ্রনাথের সহ-দীক্ষিতগণের মধ্যে কয়েক জন ৩৭৪

(২৭) দেবেন্দ্রনাথে বিধির অনুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা ৩৭৫

(২৮) দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর ৩৭৭

(২৯) দেবেন্দ্রনাথকর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি রচনা ও সংস্কার ৩৮৩

(৩০) গায়ত্রী, রামমোহন, ও দেবেন্দ্রনাথ ... ৩৮৬
(৩১) ব্রহ্মোপাসনা ও শব্দের অবলম্বন ... ৩৮৮
(৩২) উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ ... ৩৮৯
(৩৩) হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ... ৩৯০
(৩৪) নন্দকিশোর বসু ৩৯১
(৩৫) রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণ ... ৩৯২
(৩৬) দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতা ৩৯৩
(৩৭) দেবেন্দ্রনাথের বন্ধুগণ সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা ও বন্ধু-প্রীতি ৩৯৪
(৩৮) লালা হাজারীলাল ... ৩৯৭
(৩৯) দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান ... ৩৯৮

আত্মীয়গণের বিরাগ ও ঠাকুর পরিবারে দলাদলি, ৩৯৮ ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আক্রমণ, ৩৯৯ ; শ্রাদ্ধের তারিখ, ৪০০ ; দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্ব-রচিত অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, ৪০২ ।

(৪০) ১৮৪০ সালে দ্বারকানাথের জমিদারী ও কারবার ৪০৩
(৪১) ঋণশোধের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের সাধুতা ... ৪০৪
(৪২) দেবেন্দ্রনাথের ব্যয়-সঙ্কোচ ... ৪০৮
(৪৩) বৰ্দ্ধমান ভ্রমণ ; বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর ব্রাহ্মসমাজ ৪০৯
(৪৪) কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ, ও রাজা শ্রীশচন্দ্র ... ৪১১
(৪৫) দেবেন্দ্রনাথ, বেদান্ত, ও ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ... ৪১২

পত্তনভূমি ও ঐক্যস্থল, ৪১২ ; বেদান্ত কি এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের 'বাইবেল' স্বরূপ ছিল ? ৪১৩ । প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অভ্রান্ত গ্রন্থ, ৪১৪ ; বেদান্ত বিষয়ক বাদানুবাদের ইতিহাস, ৪১৫ ; দেবেন্দ্রনাথের কয়েকজন প্রতিপক্ষ, ৪১৯ ; Revelation শব্দে দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন ? ৪২১ । 'দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বর প্রত্যাদেশে বিশ্বাস' ত্যাগ, ৪২৩ ; দেবেন্দ্রনাথের ১৮৪৭ সালের মত ও বিশ্বাস, ৪২৫ । দেবেন্দ্রনাথের বেদান্ত ত্যাগে বিলম্বের দুই কারণ, ৪২৬ ।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' অভ্রান্ত অথবা একমাত্র অথবা শেষ ধর্ম্মগ্রন্থ নহে; আত্মপ্রত্যয় ইহার সত্য সকলের ভিত্তি, ৪৩১।

(৪৬) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা ৪৩৩

প্রথম খণ্ড,—নূতন ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ৪৩৩; গ্রন্থের অন্যান্য অংশ, ৪৩৬।

(৪৭) ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কোচ ৪৩৭

(৪৮) আসাম যাত্রার প্রথমাংশ, ও রাজনারায়ণ বসু ৪৩৯

(৪৯) ১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ সালের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচী ৪৪০

(৫০) ১৮৫৪ হইতে ১৮৫৮ সালের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচী ৪৪৫

(৫১) আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কয়েক জন ইংরেজ ... ৪৪৮

কিড্, ৪৪৮; কল্‌বিল্, ৪৪৮; আস্পন, ৪৪৯; লর্ড হে, ৪৪৯।

(৫২) ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ ৪৫০

(৫৩) 'পল্‌তা'র বাগানে ব্রাহ্মদের মেলা ও উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব ৪৫২

(৫৪) জগদ্দলের রাখালদাস হালদার ও তাঁহার পিতা ৪৫৫

(৫৫) ১৮৫৩—১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতের ও ভাবের পার্থক্য ... ৪৫৬

(৫৬) কাশীর রাজেন্দ্র মিত্র ও তৎপুত্র গুরুদাস মিত্র ৪৬০

(৫৭) "জো অমৃতরস চাখা নহীঁ, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া" ৪৬০

(৫৮) সুজ্‌ঘ্রী পর্ব্বত ভ্রমণ কোন্ সালে হয়? ... ৪৬১

(৫৯) এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও লালকুঠি ... ৪৬৩

(৬০) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য ৪৬৩

নামসূচী (বর্ণানুক্রমিক) ৪৬৭

সময়-সূচী।

কোনও পুস্তকের নাম না থাকিলে, এইরূপ [ ] বন্ধনীর অন্তর্গত সংখ্যা এই পুস্তকেরই পত্রসংখ্যা, বুঝিতে হইবে।

১৮১৭, ২০ জানুয়ারী, Anglo-Indian College (হিন্দু কলেজ) স্থাপন।

১৮১৭, ১৫ মে, (= ১৭৩৯ শক, ৩ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা তিথি,) দেবেন্দ্রনাথের জন্ম।

১৮২২, হেদুয়ার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে রামমোহন রায়ের স্কুল (Anglo-Hindu School) স্থাপন।

১৮২৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর ২৪ পরগণার কালেক্টর ও নিমক-মহালের অধ্যক্ষ Mr. Plowdenএর দেওয়ান নিযুক্ত হন। [Mem., 9.]

১৮২৩—১৮২৫, দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতেই পড়িতেছিলেন।

১৮২৪, Joseph Barretto & Sons দেউলিয়া হওয়াতে হিন্দু কলেজের মূলধন নষ্ট হয়। [ঈশান, ৩৪, ৩৬]।

১৮২৬ ? দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি হন। [৩১৪, ৩২৪]।

১৮২৭ ? দেবেন্দ্রনাথের উপনয়ন।

১৮২৭, ডিরোজিও হিন্দুকলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন।

১৮২৮, ২০ আগষ্ট, (= ১৭৫০ শক, ৬ই ভাদ্র, বুধবার, শুক্লা পঞ্চমী,) রামমোহন রায় কর্ত্তৃক কমললোচন বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। প্রথমতঃ শনিবার, পরে বুধবার উপাসনার দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। [৩৫৩]।

১৮২৮, অক্টোবর (?) দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়কে পূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলেন। [৩২৬]।

১৮২৮, দ্বারকানাথ ম্যাকিণ্টশ্ কোম্পানীর অংশীদার হন; ইহাতে তিনি Commercial Bankএর একজন ডিরেক্টার হইলেন। [৩৩০]।

১৮২৯, দ্বারকানাথ ঠাকুর Customs Salt & Opium Boardএর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। [৩৩০]।

১৮২৯, দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১২, এবং বধূ সারদা দেবীর বয়স ৬ বৎসর। [তত্ত্ববো., ১৮৩৮ শকের আষাঢ় সংখ্যা, 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ]।

১৮২৯, ১ আগষ্ট, Union Bank প্রতিষ্ঠিত হয়। [৩৩১]।

১৮২৯, ৬ জুন, রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজের জন্য জমি ক্রয়। [৩৬১]।

১৮২৯, ৪ ডিসেম্বর, সতীদাহ নিবারণের রেগুলেশন বিধিবদ্ধ হইল।

১৮৩০, ৮ জানুয়ারী, রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের জন্য ক্রীত জমি ও গৃহের উপরে ট্রষ্টডীড সম্পাদন করেন।

১৮৩০, ১৭ জানুয়ারী, (=১৭৫১ শক, ৫ মাঘ, রবিবার,) 'ধর্ম্মসভা' স্থাপন।

১৮৩০, ২৩ জানুয়ারী, (=১৭৫১ শক, ১১ মাঘ, শনিবার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী,) ব্রাহ্মসমাজের নবগৃহ-প্রবেশ।

১৮৩০, ২৭ মে, খ্রীষ্টিয় মিশনরী আলেগ্‌জাণ্ডার ডফের কলিকাতায় আগমন।

১৮৩০, ১৩ জুলাই, রামমোহন রায়ের সাহায্যে কমললোচন বসুর বাড়ীতে ডফের স্কুল প্রতিষ্ঠা। [৪১৯]।

১৮৩০, ১৯ নভেম্বর, রামমোহন রায় ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। যাত্রার প্রাক্কালে দেবেন্দ্রনাথের করমর্দ্দন করিয়া যান।

১৮৩০, দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি হইলেন। [৩১৪]।

১৮৩১? দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে যাইবার পথে ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীকে প্রণাম করিতেন। এই সময়ে এক দিন নক্ষত্র খচিত অনন্ত আকাশ দর্শনে তাঁহার মনে ঈশ্বরের অনন্ততার ভাব উদিত হয়, [৩১৩]।

১৮৩১, ৮ এপ্রিল, রামমোহন রায় লিভারপুলে পৌঁছিলেন।

১৮৩১, ২৫ এপ্রিল, ডিরোজিও হিন্দুকলেজের কর্ম্ম ত্যাগ করেন।

১৮৩১, ২৪ ডিসেম্বর, ডিরোজিওর মৃত্যু হয়।

১৮৩৩, Mackintosh & Co., এবং তৎসঙ্গে Commercial Bank, ফেল হইল। দ্বারকানাথ ঠাকুরকে Commercial Bankএর সমস্ত দায় পরিশোধ করিতে হইল। [৩৩১]।

১৮৩৩, ২৭ সেপ্টেম্বর, (=১২ আশ্বিন, শুক্রবার, ভাদ্র শুক্লা চতুর্দ্দশী, অর্থাৎ অনন্ত চতুর্দ্দশী তিথি,) ব্রিষ্টল নগরে রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়।

১৮৩৩ ? দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজ ত্যাগ করেন। [৩১৫]।

১৮৩৪, জুলাই, দ্বারকানাথ ঠাকুর বোর্ডের চাকরী ত্যাগ করেন, ও Carr, Tagore & Co. নামে সওদাগরী কুঠী স্থাপন করেন। [৩৩১]।

১৮৩৪, দেবেন্দ্রনাথ ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। [৩১৯]।

১৮৩৫, ১ জুন, কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা। দ্বারকানাথ তাহাতে তিন বৎসরে ৬০০০৲ সাহায্য করেন। [Mem., 26.]

১৮৩৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করেন, [Mem., 35—37]। তাঁহার প্রবাসকালে তাঁহার মাতা অলকাসুন্দরীর মৃত্যু হয়। [৪০]।

১৮৩৫, পিতামহীর মৃত্যুকালে শ্মশানে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে উদাস আনন্দের উদয়। পরে সেই আনন্দ হারাইয়া তাহার উৎস অন্বেষণ। বোটানিকেল গার্ডেনে একাকী বসিয়া থাকা। [৪০—৪৬]।

১৮৩৬, সংস্কৃত শিখিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহ, ও কমলাকান্ত চূড়ামণির নিকটে ব্যাকরণ পাঠ। চূড়ামণির মৃত্যু। [৪৬, ৪৭]।

১৮৩৬, ১৮৩৭ ? দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র পাঠ ও চিন্তা। Locke এবং Humeএর গ্রন্থে, বিশ্বজগতে ও মানবের জ্ঞানক্রিয়াতে জড়প্রকৃতিরই প্রাধান্য, এইরূপ মত দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের বিষাদ ও বিরক্তি। [৪৯, ৫০, ৩২২—৩২৪]।

১৮৩৭, 'ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট' পদ সৃষ্টি করিয়া দেশীয়দিগকে শাসনকার্য্যের অংশ দান করিতে দ্বারকানাথ গভর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দেন। [Mem., 65.]

১৮৩৭ ? ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবার আগ্রহে দেবেন্দ্রনাথ শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশের নিকটে মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করেন। [৪৮]।

১৮৩৮, দেবেন্দ্রনাথের একটি কন্যা জন্মিয়া অল্পদিন মধ্যে মারা যায়। [অজিত, ১১৪]।

১৮৩৮, ৩রা ফেব্রুয়ারী, দ্বারকানাথ ঠাকুর District Charitable Societyকে এক লক্ষ টাকা দান করেন। [৩৩৫]।

১৮৩৮, ১২ই মার্চ্চ, হিন্দুকলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ 'Society for the Acquisition of General Knowledge' অথবা 'সাধারণ

জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সভ্য হন। [৩১৫, ৩১৬]।

১৮৩৮, ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের মনে কয়েকটি সিদ্ধান্তের উদয় হইল, [৫১-৫৩]। এই দৃঢ় প্রতীতি হইল যে, প্রতিমা ঈশ্বর নহেন। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল। ভাইদের লইয়া দল বাঁধিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে প্রতিমাকে প্রণাম করা হইবে না। [৫৬—৫৮]।

১৮৩৮? দেবেন্দ্রনাথ ঈশোপনিষদের ছিন্ন পত্র প্রাপ্ত হন; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া তৃপ্ত ও চমৎকৃত হন; বিদ্যাবাগীশের নিকটে উপনিষদ্ পড়িতে আরম্ভ করেন। [৫৮—৬২]।

১৮৩৮, এপ্রিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক Bengal Landholders' Association স্থাপন। [৪৪২ । Mem., 29.]

১৮৩৮, ১৯ নভেম্বর, (=১৭৬০ শক, ৫ অগ্রহায়ণ, সোমবার, শুক্লা দ্বিতীয়া,) কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম।

১৮৩৯, ডিরোজিও-প্রবর্ত্তিত Academic Association উঠিয়া যায়।

১৮৩৯, জুলাই, লণ্ডনে William Adam সাহেব ভারতবাসীদের হিতকামনায় British India Society নামক সভা স্থাপন করেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত Landholders' Association এই সভার সহিত একযোগে কার্য্য করিতে থাকে। [রামতনু, ১৫৯ ; Mem., App., xx, xxv—xxxvii.]

১৮৩৯, ৬ অক্টোবর, (=১৭৬১ শক, ২১ আশ্বিন, রবিবার, আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী,) দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' স্থাপন করেন। পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার নাম 'তত্ত্ববোধিনী' রাখেন। [৬৪]।

১৮৩৯ সালের শেষ ভাগে অথবা ১৮৪০ সালের প্রথম ভাগে দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের পরিচয় হয়।

১৮৩৯? দেবেন্দ্রনাথের মাতা দিগম্বরী দেবীর মৃত্যু হয়। [১২৩, ২৯৮, ৩৩৪]।

১৮৪০, জুন, দেবেন্দ্রনাথ 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠা করিয়া অক্ষয়কুমার দত্তকে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। [৩৪৯]।

১৮৪০, দেবেন্দ্রনাথ কঠোপনিষদের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৮৪০, ২০ আগষ্ট, (১৭৬২ শকের ৬ ভাদ্র,) দ্বারকানাথ কতকগুলি ভূসম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্ট ডীড সম্পাদন করেন। [১২৮, ৩৩২]।

১৮৪১, ২৫ ফেব্রুয়ারী, দ্বারকানাথ বেলগাছিয়া ভিলায় লাট-ভগিনী মিস্ ইডেনের সম্বর্দ্ধনার জন্য য়ুরোপীয়দিগকে সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দেন, এবং ১৪ মার্চ্চ, রবিবার, দেশীয়দিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। দ্বিতীয় দিন তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উৎসব ছিল বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ত্বরায় চলিয়া আসেন, ও এজন্য পিতার বিরাগ-ভাজন হন। [৭৯, ৩০৯]।

১৮৪১, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য অক্ষয়কুমার দত্ত-রচিত ‘ভূগোল’, ‘পদার্থনীতি’, ইত্যাদি মুদ্রিত হইল। [৩৪৯]।

১৮৪১, ১৪ সেপ্টেম্বর, (= ১৭৬৩ শক, ৩০ ভাদ্র, মঙ্গলবার, আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী,) দেবেন্দ্রনাথ জাঁকজমক করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সাংবৎসরিক উৎসব করিলেন। [৬৭—৭০]।

১৮৪২, ৬ জানুয়ারী, বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে দ্বারকানাথের স্বদেশীয় ও য়ুরোপীয় বন্ধুগণ টাউন হলে সভা করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। [Mem., 75, App., xlv.]

১৮৪২, ৯ জানুয়ারী, (= ১৭৬৩ শক, ২৬ পৌষ,) দ্বারকানাথ ঠাকুর, নিজ ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, এডিকং পরমানন্দ মৈত্র, চিকিৎসক Dr. MacGowan ও চারিজন ভৃত্য সহ বিলাত যাত্রা করেন। [Mem., 78, 79.]

১৮৪২, জানুয়ারী (?) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে যান। বৈশাখ মাসে তাঁহার তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করেন। [৩৫৭]।

১৮৪২, ১ জুন, মহামতি ডেভিড্ হেয়ারের মৃত্যু হয়।

১৮৪৩, জানুয়ারী, দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৪৩, ২০ এপ্রিল, দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত আগত প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও পূর্ব্বোক্ত British Indian Societyর সভ্য George Thompson, কলিকাতায় ভারতবাসীদের জন্য Bengal British Indian

Society নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপন করেন, ও ক্রমে তাহাতে বক্তৃতা দিয়া দিয়া শিক্ষিত যুবকদিগকে মাতাইয়া তোলেন।

১৮৪৩, ৩০ এপ্রিল, (=১৭৬৫ শক, ১৮ বৈশাখ,) তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। [৩৫১]।

১৮৪৩, আগষ্ট, (=১৭৬৫ শক, ভাদ্র,) 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রবর্ত্তিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ইঁহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। [৭৫]।

১৮৪৩, ৫ আগষ্ট, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ সৃষ্টি করিবার আইন পাস হয়।

১৮৪৩, হেদুয়ার নিকটবর্ত্তী রামমোহন রায়ের স্কুলের পরিত্যক্ত বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যন্ত্রালয় স্থাপিত হয়। পিতার বিরাগভয়ে দেবেন্দ্রনাথ বাড়ীতে না বসিয়া, তথায় গিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে বেদান্ত পাঠ করিতে থাকেন। [৭৮, ৩৫৯]।

১৮৪৩, ১৬ আগষ্ট, (১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র,) দ্বারকানাথ ঠাকুর উইল করেন। [১২৮, ৩৩৬, ৪০৭]।

১৮৪৩, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে দেবেন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ সহ উপনিষদ্ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। [৭৭]।

১৮৪৩, ব্রাহ্মসমাজে বেদপাঠ প্রকাশ্যে হইবে, দেবেন্দ্রনাথ এই আদেশ প্রদান করেন। [৮০, ৩৫৫]।

১৮৪৩, (১৭৬৫ শক) আনন্দচন্দ্র ভট্টাচায্য ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক বেদ-শিক্ষার জন্য প্রদত্ত ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। [৮১]।

১৮৪৩, ২১ ডিসেম্বর, (=১৭৬৫ শক, ৭ পৌষ, বৃহস্পতিবার, অমাবস্যা তিথি,) অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা, দেবেন্দ্রনাথ কুড়ি জন বন্ধু সহ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [৮৪]।

১৮৪৪, গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হইবে না, ইহা অনুভব করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি রচনা করিলেন। [৮৯, ৩৮৩, ৩৮৪]।

১৮৪৪, রাজা শ্রীশচন্দ্রের উৎসাহে, ও পরে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রেরিত হাজারীলালের চেষ্টায়, কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি লোক ব্রাহ্ম হন।

রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের পত্রযোগে পরিচয় হয়। [৪১১]।

১৮৪৪, ১৮৪৫, দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ-পাঠের দ্বিতীয় যুগ। ঈশ্বরকে জীবনের বিধাতা ও পরিচালক বলিয়া অনুভব। উপনিষদের প্রচার দ্বারা সত্যধর্ম্মের বিস্তার হইবে, ও ভারতের একতা সম্পাদন হইবে, এই আশার উদয়। [১০৭, ৩৪৫]।

১৮৪৪, সেপ্টেম্বর, (১৭৬৬ শক, আশ্বিন,) ডফ্ সাহেব রচিত India and India's Missions নামক পুস্তকে বেদান্তের উপরে যে আক্রমণ ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাহার প্রথম প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। [৪২০]।

১৮৪৫, জানুয়ারী, (১৭৬৬ শক, মাঘ,) ঐ দ্বিতীয় প্রতিবাদ। [৪২০]।

১৮৪৫ সালের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর Mr. I. Dean Campbellএর সঙ্গে মিলিত হইয়া Bengal Coal Company প্রতিষ্ঠিত করেন। [Mem., 108.]

১৮৪৫, ২ মার্চ্চ, (১৭৬৬ শক, ২০ ফাল্গুন, রবিবার,) রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মৃত্যু হয়। [৩৪৪]।

১৮৪৫, ৮ মার্চ্চ, দ্বারকানাথ ঠাকুর স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ, ভাগিনেয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চিকিৎসক Dr. W. Raleigh, এবং Private Secretary Mr. T. R. Safeকে লইয়া দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করেন। [Mem., 108.]

১৮৪৫, (১৭৬৬ শকের শেষ ভাগে) দেবেন্দ্রনাথ এক জন ছাত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ কাশীতে প্রেরণ করেন। [১০৮]।

১৮৪৫, (১৭৬৭ শক,) দেবেন্দ্রনাথ-রচিত প্রথম ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ব্রাহ্ম-সমাজে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। [৯৪]।

১৮৪৫, এপ্রিল, (১৭৬৭ শক, বৈশাখ,) ডফ্ সাহেবের স্কুলের ছাত্র, ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক উমেশচন্দ্র সরকার, তাহার ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা স্ত্রী সহ ডফের আশ্রয়ে চলিয়া যায়, ও তাঁহা দ্বারা খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। [১০৩, ৩৮৯]।

১৮৪৫, মে, (১৭৬৭ শক, জ্যৈষ্ঠ,) দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টিয় মিশনরীদিগের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ বাহির হয়। [১০৪]।

১৮৪৫, ২৫ মে, (= ১৭৬৭ শক, ১৩ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার,) খ্রীষ্টিয় মিশনরীদিগের বিরুদ্ধে মহাসভা, ও 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' স্থাপন। [১০৫, ৩৯০]।

১৮৪৫, ২ জুন, (= ১৭৬৭ শক, ২১ জ্যৈষ্ঠ, সোমবার,) মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। [অজিত, ১৪১]।

১৮৪৫, জুলাই, (১৭৬৭ শক, শ্রাবণ,) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ডফ্ সাহেবের পুস্তকের তৃতীয় প্রতিবাদ। [৪২০]।

১৮৪৫, সেপ্টেম্বর, (১৭৬৭ শক, আশ্বিন,) ঐ, চতুর্থ প্রতিবাদ। [৪২০]।

১৮৪৫, ঐ চারি প্রতিবাদ হইতে সঙ্কলন করিয়া "Vedantic Doctrines Vindicated" নামে এক পুস্তক প্রকাশিত হয়। [৪২০]।

১৮৪৫, বেদান্তের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয়। [৪২১]

১৮৪৫, ৭ ডিসেম্বর, নন্দকিশোর বসুর মৃত্যু হয়। [৩৯২]।

১৮৪৫, ২০ ডিসেম্বর, (১৭৬৭ শক, ৭ই পৌষ, শনিবার,) দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে গোরিটির (গৌরীহাটির) বাগানে ব্রাহ্মদের একটি মেলা হয়। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম 'উৎসব'। ইহার পূর্ব্বেই হাজারীলালের চেষ্টায় ৫০০ জন লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। [৮৬]।

১৮৪৬, দেবেন্দ্রনাথ আরও তিন জন ছাত্রকে বেদ শিক্ষার্থ কাশীতে প্রেরণ করেন। [১০৯]।

১৮৪৬ সালের প্রথম ভাগে রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [৩৯২]।

১৮৪৬, ২২ মে, ইংলণ্ড হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়কার্য্যে অমনোযোগ হেতু ভর্ৎসনা করিয়া পত্র লিখেন। দেবেন্দ্রনাথ এ পত্র জুলাই মাসে প্রাপ্ত হন। [৩৬০ ; পত্রাবলী, ১৪৫]।

১৮৪৬, জুলাই, কিন্তু তখন বিষয়কার্য্যে যতটুকু মন দিতে হইতেছিল, তাহাও দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি

কিছুকাল নৌকায় নির্জ্জনে ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। [১০৯, ৩৬০]।

১৮৪৬, ১ আগষ্ট, (=১৭৬৮ শক, ১৮ শ্রাবণ, শনিবার, শুক্লা নবমী,) ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়।

১৮৪৬, ৫ আগষ্ট, Kensal Green নামক স্থানে দ্বারকানাথ ঠাকুরের দেহ সমাহিত হয়। [Mem., 118.]

১৮৪৬, সেপ্টেম্বর (?) রাজনারায়ণ বসু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। [৩৯৩]।

১৮৪৬, সেপ্টেম্বর (?) দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পত্নী, তিন পুত্র, ও রাজনারায়ণ বসুকে লইয়া নৌকায় গঙ্গাতে ভ্রমণে বাহির হইলেন। তখনও পিতার মৃত্যুসংবাদ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছে নাই। [১০৯, ৪০১]।

১৮৪৬, ১৮ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, অপরাহ্নে বিলাতী ডাকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছে। [৪০১]।

১৮৪৬, ২০ (?) সেপ্টেম্বর, দেবেন্দ্রনাথের নৌকা পাটুলি ছাড়িয়া আসিয়া তুমুল ঝড়ে পতিত হয়, ও নৌকাডুবির আশঙ্কা হয়। রাত্রিতে কলিকাতা হইতে আগত লোকের হস্তে দেবেন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। [১১১—১১৫, ৪০১]।

১৮৪৬, ১১ অক্টোবর, (=১৭৬৮ শক, ২৬ আশ্বিন, রবিবার, কৃষ্ণা অষ্টমী,) দ্বারকানাথ ঠাকুরের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। [১১৭, ৪০২]।

১৮৪৬, ১৫ অক্টোবর, (=১৭৬৮ শক, ৩০ আশ্বিন, বৃহস্পতিবার,) দ্বারকানাথ ঠাকুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। [১২৩—১২৬, ৪০২]।

১৮৪৬, ২২ অক্টোবর তারিখের *Englishman* পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ কৃত পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে আক্রমণ করিয়া জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের এক পত্র মুদ্রিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের উত্তর ২৮ অক্টোবর তারিখের *Englishman* এবং অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। [৩৯৯, ৪০০]।

১৮৪৬, ২ ডিসেম্বর, বুধবার, টাউন হলে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য বৃহৎ সভা হয়।

১৮৪৭, ১ জানুয়ারী, কার ঠাকুর কোম্পানীতে গিরীন্দ্রনাথকে অংশীদার করিয়া লওয়া হইল, [৩৩৭]। অতঃপর তাঁহার পরামর্শে সাহেব অংশীদারগণকে বেতনভোগী কর্ম্মচারীতে পরিণত করা হইল, এবং গিরীন্দ্রনাথকে হাউসের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হইল। [১২৯]।

১৮৪৭, এপ্রেল (১৭৬৯ শকের বৈশাখ) হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে 'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ' ইত্যাদি বচনটি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। [১৩১]।

১৮৪৭, ২৮ মে, (= ১৭৬৯ শক, ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার,) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের' পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নাম অবলম্বিত হয়। [৩৬৭]।

১৮৪৭, কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার মন্দিরের জন্য দেবেন্দ্রনাথ এক হাজার টাকা দান করেন। [৪১২]।

১৮৪৭, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিষয়ক প্রথম পুস্তক 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রকাশিত হয়।

১৮৪৭, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' উঠিয়া যায়। বাঁশবেড়ে গ্রামে তাহার যে জমি ও আটচালা ঘর ছিল, তাহার বিক্রয়ের জন্য আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। পরে তাহা ডফ্ সাহেব নিজ মিশনের জন্য ক্রয় করেন। [৩৫২]।

১৮৪৭, সেপ্টেম্বরের শেষে, (আশ্বিন মাসে,) কাশীতে বেদ শ্রবণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ হাজারীলালকে লইয়া যাত্রা করেন। [১৩২]।

১৮৪৭, অক্টোবর, (১৭ আশ্বিন, শনিবার,) দেবেন্দ্রনাথ মেমারিতে পৌছেন। [পত্রাবলী, ৩৪]।

১৮৪৭, অক্টোবরের মধ্য ভাগে, দেবেন্দ্রনাথের কাশীতে উপস্থিত হওয়া, চারি বেদ শ্রবণ, ও কাশী-নরেশের নিমন্ত্রণ গ্রহণ। [১৩২—১৩৬, ৪১৮, ৪১৯]।

১৮৪৭, ১৯ অক্টোবর, (৩ কার্ত্তিক, বিজয়া দশমী,) 'রামলীলা' দর্শন। [১৩৭]।

১৮৪৭, অক্টোবরের শেষ ভাগে, বিন্ধ্যাচল ও মির্জ্জাপুর ভ্রমণ, ও তৎপরে কুমারখালি গমন। [১৩৮]।

১৮৪৭, নভেম্বর, আনন্দচন্দ্রকে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। [১৩৯]।

১৮৪৭, ২৭ ডিসেম্বর, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হইল, [৩৩৬]। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে কার ঠাকুর কোম্পানীরও দ্বার বন্ধ হইল, [৩৩৮]।

১৮৪৮, ১২ জানুয়ারী, কার ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া যাইবার বিজ্ঞাপন *Calcutta Gazette* পত্রিকায় দেওয়া হয়। ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যায় উহা মুদ্রিত হয়। [৩৩৮]।

১৮৪৮, দেবেন্দ্রনাথ কঠোর ভাবে ব্যয়সঙ্কোচ করেন; গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করেন; আহারাদির ব্যয় অনেক কমাইয়া দেন। [১৫১, ৪০৮]।

১৮৪৮, মার্চ্চ হইতে দেবেন্দ্রনাথ কঠিন পরিশ্রম সহকারে শাস্ত্রচর্চ্চায় ও ব্রাহ্মসমাজের নানা কার্য্যে নিযুক্ত হন; প্রতিদিন সন্ধ্যার পর হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত ছাতের উপরে কম্বল পাতিয়া বসিয়া বন্ধুগণ সহ ধর্ম্মচর্চ্চা করেন; [১৫১]। ইহা দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ চর্চ্চার তৃতীয় যুগ। [৩৪৬, ৪২৩, ৪২৪]।

১৮৪৮, এই শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিলেন যে উপনিষদে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইবে না। [১৬৬, ৪২৪]।

১৮৪৮, মার্চ্চ (?) (১৭৬৯ শকের ফাল্গুন) হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে ২৪ বৎসর ইহা চলিয়াছিল। [১৫৫]।

১৮৪৮, ৪ এপ্রিল, কার ঠাকুর কোম্পানীর উত্তমর্ণগণের সভা হয়; তাহাতে কোম্পানীর হিসাব প্রদর্শন করা হয়। দ্বারকানাথের বিষয়সম্পত্তির অবস্থা সহৃদয়তার সহিত বিবেচিত হয়। দ্বারকানাথের ট্রষ্ট সম্পত্তি ব্যতীত, কলিকাতার বসতবাটীখানিও তাঁহার সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অন্যান্য সম্পত্তির জন্য ট্রষ্টী নিয়োগ করা হয়। রমানাথ ঠাকুর, Mr. R. C. Jenkins, ও Mr. F. R. Hampton ট্রষ্টী নিযুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ এই ট্রষ্টীগণকে বিষয় পরিচালনে ও ঋণশোধে সাহায্য করিবেন এইরূপ স্থির হয়, এবং সেজন্য এই ট্রষ্টীগণ অতি ন্যূন হারে পারিশ্রমিক লইতে স্বীকৃত হন। [৩৮৮; এবং তত্ত্ববো. ১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ২১০ পৃঃ]।

১৮৪৮, (জ্যৈষ্ঠ মাসের পর) 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজম্' রচিত হয়। [১৭৫]।

১৮৪৮, কাশীতে প্রেরিত আর তিন জন ছাত্রকে ফিরাইয়া আনা হইল। আনন্দচন্দ্রকে 'বেদান্তবাগীশ' উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য নিযুক্ত করা হইল। [১৫৪]।

১৮৪৮, কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহিত দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ। [১৬২]।

১৮৪৮, অক্টোবর, (আশ্বিন,) দামোদর নদে নৌকায় ভ্রমণ। বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলে মহারাজা মহ্‌তাব্ চন্দ্‌ দেবেন্দ্রনাথকে সমাদর করিয়া ডাকিয়া লইয়া যান। [১৫৮, ৪০৯]।

১৮৪৮, দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৪৫ সালে রচিত ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির দ্বিতীয় সংস্কার। প্রথম পদ্ধতির দুই প্রধান মন্ত্রের সহিত 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্র যোগ করা হইল। [১৫৬, ৩৮৪, ৩৮৫]।

১৮৪৮ সালের শেষার্দ্ধে দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করেন। [১৭৬—১৮৪, ৪৩৩—৪৩৭]।

১৮৪৮ সালের শেষভাগে, উত্তমর্ণগণের অনুমতিক্রমে দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথই সমুদয় সম্পত্তি পরিচালন করিয়া ঋণ শোধ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। গিরীন্দ্রনাথ এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। [১৫২]।

১৮৪৯, ২৩ জানুয়ারী, (=১৭৭০ শকের ১১ মাঘ,) সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় ফেনেলন হইতে অনুবাদিত নূতন স্তোত্র পাঠ করা হইল। উপাসনাক্ষেত্রে অপূর্ব্ব ভাবের উদয়। [১৮৬—১৯০]।

১৮৪৯, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ (তাৎপর্য্য ছাড়া) প্রকাশিত হয়।

১৮৪৯, 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের' সংস্কার। [২১৪]।

১৮৪৯, ৭ মে, বীট্‌ন্ স্কুল স্থাপিত হয়। (দেবেন্দ্রনাথ পরে স্বীয় কন্যা সৌদামিনীকে তাহাতে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পত্রাবলী, ৩০)।

১৮৪৯, সেপ্টেম্বর, (আশ্বিন,) আসাম ভ্রমণ। [১৯১, ৪৩৯]।

১৮৫০, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রের বর্ত্তমান আকার স্থির হয়। [৩৭৩]।

১৮৫০, অক্টোবর, (আশ্বিন,) দেবেন্দ্রনাথ বর্ম্মা ভ্রমণে বাহির হন। [১৯৫]।

১৮৫০ অথবা ১৮৫১, দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। [৪৪১]।

১৮৫১, ২৩ জানুয়ারী, (১৭৭২ শক, ১১ মাঘ,) দেবেন্দ্রনাথের সম্মতিক্রমে অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাতে ঘোষণা করেন, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত। [৪২৩, ৪২৬]।

১৮৫১, মার্চ্চ, (ফাল্গুনের শেষ,) কটক যাত্রা। [২০৩]।

১৮৫১, ১৪ মার্চ্চ, (২ চৈত্র,) দেবেন্দ্রনাথ কটকে পৌঁছিলেন। পরে তথা হইতে পাণ্ডুয়া ও তৎপরে পুরী গমন করেন। [পত্রাবলী, ১]।

১৮৫১, মে, (১৭৭৩ শক, জ্যৈষ্ঠ,) কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। [২০৭]।

১৮৫১, মে, (১৭৭৩ শক, জ্যৈষ্ঠ,) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য দুই জন ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া হইবে। [অজিত, ২৩৩, ২৩৪]।

১৮৫১, ১৩ জুলাই, (১৭৭৩ শক, ৩০ আষাঢ়, শনিবার), বর্দ্ধমান রাজবাটীর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। [৪১০]।

১৮৫১, জুলাই, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। [পত্রাবলী, ৩১]।

১৮৫১, "Black Acts" আন্দোলন। [৪৪২]।

১৮৫১, ১২ আগষ্ট, মহামতি বীটনের মৃত্যু। [৪৪২]।

১৮৫১, ৩১ অক্টোবর, British Indian Association স্থাপন। দেবেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদক হইলেন। [৪৪২, ৪৪৩]।

১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় পুস্তকে দেবেন্দ্রনাথের মহাবাক্য 'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ' স্থান প্রাপ্ত হয়। [৬৯, ৪৪৩]।

১৮৫১, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের উপবীত ত্যাগ, [৪৪৫]। উপবীত রাখা উচিত কি না, ইহা ব্রাহ্মসমাজে আলোচনার বিষয় হইয়া পড়ে।

১৮৫২, জানুয়ারী মাসে ১২।১৩ জন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের নিকটে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। [পত্রাবলী, ২]।

১৮৫২, জুন, "ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গালা ভাষ্য" (সম্ভবতঃ 'তাৎপর্য্য') প্রস্তুত হইতেছিল। [৪৪৩]।

১৮৫২, ২১ জুন, ১৭৭৪ শকের ৯ আষাঢ়, (পদ্মপুকুর রোডস্থ 'ভবানীপুর ব্রাহ্ম-সমাজের' জননী) 'জ্ঞানপ্রকাশিকা সভার' জন্ম হয়। [৪৪৩]।

১৮৫২, ২ জুলাই, জগদ্দল গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। [৪৪৪, ৪৫৫]।

১৮৫২, ২৯ সেপ্টেম্বর, রাখালদাস হালদারের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

১৮৫২, ৬ অক্টোবর, রাখালদাস হালদার, অনঙ্গমোহন মিত্র, ও অক্ষয়কুমার দত্তের উদ্যোগে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। [৪৫৮]।

১৮৫৩, ৮ ফেব্রুয়ারী, (২৭ মাঘ,) দেবেন্দ্রনাথ শিলাইদহে। [পত্রাবলী, ৫]।

১৮৫৩, ১৭ ফেব্রুয়ারী, (১৭৭৪ শক, ৭ ফাল্গুন,) রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র কর্ত্তৃক খিদিরপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন। এই সমাজে বাংলায় উপাসনা হইত। [৪৪৪]।

১৮৫৩, মে, ডুমুরদহ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা। [অজিত, ২২৫]।

১৮৫৩, ২৮ মে, (১৭৭৫ শক, ১৬ জ্যৈষ্ঠ,) দেবেন্দ্রনাথের উপরে সংসারের কার্য্যভার পড়িয়া তাঁহার অনবকাশ ঘটাইয়াছিল। ঋণ অনেক শোধ হইয়া গিয়াছিল। [পত্রাবলী, ৩৬]।

১৮৫৩, মে, (জ্যৈষ্ঠ,) দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক হইলেন। এত দিন তিনি এক জন সভ্য মাত্র ছিলেন, ও নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন। [অজিত, ২৩৫]।

১৮৫৩, ২৭ আগষ্ট, (১২ ভাদ্র,) দেবেন্দ্রনাথ 'পল্‌তা'র বাগানে। [পত্রাবলী, ৭]।

১৮৫৩, ১ অক্টোবর, শারদীয় ভ্রমণ যাত্রা। [পত্রাবলী, ৯]।

১৮৫৩, ২৬ ডিসেম্বর, (১২ পৌষ, সোমবার,) হাজারীলালের মৃত্যু। [৩৯৮]।

১৮৫৪, ১ জানুয়ারী, (১৭৭৫ শক, ১৮ পৌষ, রবিবার,) গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদিগের সম্মিলন ও আলোচনা। ইহার ফলে, রাখালদাস হালদারের উপবীত ত্যাগ। [৪৪৫, ৪৫৩]।

১৮৫৪, ৮ মার্চ্চ, (১৭৭৫ শক, ২৬ ফাল্গুন,) তত্ত্ববোধিনী সভার 'গ্রন্থাধ্যক্ষ'দের সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের তীব্র অসন্তোষ। [৪৩৫, ৪৫৭]।

১৮৫৪, মার্চ্চ, (১৭৭৫ শক, চৈত্র,) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। [৪৩৬, ৪৪৫]।

১৮৫৪, ২৬ সেপ্টেম্বর, (১৭৭৬ শক, ১১ আশ্বিন,) দেবেন্দ্রনাথ পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণের পথে চম্পারণ পঁহুছেন। [পত্রাবলী, ১১]।

১৮৫৪, ১১ অক্টোবর, (২৬ আশ্বিন,) দেবেন্দ্রনাথ দিল্লীতে। [পত্রাবলী, ১২]।

১৮৫৪, ২৪ নভেম্বর, (১০ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ দিল্লী ও এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। [পত্রাবলী, ১৩]।

১৮৫৪, ১৯ ডিসেম্বর, (১৭৭৬ শক, ৫ পৌষ,) গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু। [২০৮]।

১৮৫৫, চৌদ্দ হাজার টাকার ওয়ারাণ্টে দেবেন্দ্রনাথ ধৃত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত মত দেবেন্দ্রনাথের ঋণ শোধ করিয়া দিবার ভার লন। প্রসন্নকুমারের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরের সত্যতা বিষয়ে কথোপ-কথন। [২০৮—২১২]।

১৮৫৫, ২০ জুন, (১৭৭৭ শক, ৭ আষাঢ়,) দেবেন্দ্রনাথ চন্দননগরে। [পত্রাবলী, ১৫]।

১৮৫৫, ৩১ জুলাই, (১৬ শ্রাবণ,) দেবেন্দ্রনাথ গোরিটিতে। [পত্রাবলী, ৪২]।

১৮৫৫, ১৬ অক্টোবর, (৩১ আশ্বিন,) দেবেন্দ্রনাথ নৌকায় ঢাকা গমনোন্মুখ। [পত্রাবলী, ৪৩]।

১৮৫৫, ১৮ নভেম্বর, (৩ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা হইতে সুন্দরবনের পথে কলিকাতায় ফিরিলেন। [পত্রাবলী, ৪৫]।

১৮৫৫, ২০ নভেম্বর, (৫ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ বৰ্দ্ধমানে। [পত্রাবলী, ৪৫]।

১৮৫৫, ডিসেম্বর, (১৭৭৭ শক, অগ্রহায়ণ,) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ও সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাখালদাস হালদার প্রভৃতির অসন্তোষ। রাখালদাস কর্ত্তৃক "ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা" শীর্ষক আবেদন পত্র প্রেরণ। [৪৫৭, ৪৫৮]।

১৮৫৬, ২৬ জুলাই, বিধবা বিবাহের আইন পাস হইল।

১৮৫৬, নগেন্দ্রনাথ কৃত নূতন ঋণ, ও তাহা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য। [২১৮—২২০]।

১৮৫৬, জুলাই অথবা আগষ্ট, (১৭৭৮ শক, শ্রাবণ,) দেবেন্দ্রনাথ সংসারে বিরক্ত হইয়া বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে গিয়া

নির্জ্জনবাস করেন, এবং শাস্ত্রপাঠ ও ধর্ম্মালোচনায় নিযুক্ত হন। কিছুদিন মুক্তভাবে বিচরণ করিবার ইচ্ছা হয়। [২২২, ২২৩]।

১৮৫৬, সেপ্টেম্বর, দেবেন্দ্রনাথ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে চারি পুত্রকে লইয়া কিছুকাল পদ্মানদীতে যাপন করেন। [৪৪৬]।

১৮৫৬, ৩ অক্টোবর, (১৭৭৮ শক, ১৯ আশ্বিন, শুক্রবার,) দেবেন্দ্রনাথ কাশী পর্য্যন্ত একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া তাহাতে আরোহণ করেন। [২২৪]।

১৮৫৬, ৩১ অক্টোবর, (১৬ কার্ত্তিক,) দেবেন্দ্রনাথ মুঙ্গেরে। [২২৫]।

১৮৫৬, ৬ নভেম্বর, (২২ কার্ত্তিক,) দেবেন্দ্রনাথ পাটনায়। [পত্রাবলী, ৪৬]।

১৮৫৬, ২০ নভেম্বর, (৬ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ কাশীতে। [২২৬]।

১৮৫৬, ১ ডিসেম্বর, (১৭ অগ্রহায়ণ,) অন্য নৌকায় কাশী ত্যাগ। [২২৭]।

১৮৫৬, ৩ ডিসেম্বর. (১৯ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদে। [২২৭]।

১৮৫৬, ৬ ডিসেম্বর, (২২ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ হইতে ডাকের গাড়ীতে আগ্রা পৌছিলেন। [২২৮]।

১৮৫৬, ৭ ডিসেম্বর, (২৩ অগ্রহায়ণ,) কলিকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহ (শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহ,) ও তুমুল আন্দোলন।

১৮৫৬, ১০ ডিসেম্বর, (২৬ অগ্রহায়ণ,) দেবেন্দ্রনাথ আগ্রা হইতে নৌকায় দিল্লী যাত্রা করেন। [২২৮]।

১৮৫৬, ২১ ডিসেম্বর, (৮ পৌষ,) দেবেন্দ্রনাথ মথুরায়। [২২৯]।

১৮৫৭, ৯ জানুয়ারী, (২৭ পৌষ,) দেবেন্দ্রনাথ দিল্লীতে। তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ দিল্লীতে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই, [২৩০]। ইহলোকে আর উভয়ের সাক্ষাৎ হয় নাই।

১৮৫৭, ১১ জানুয়ারী, (১৭৭৮ শক, ২৯ পৌষ,) কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভায় রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত করা হইল। [২১৪]।

১৮৫৭, জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী, দেবেন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে ডাকের গাড়ীতে অম্বালা যাত্রা করিলেন। [২৩১]।

১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী, অম্বালা হইতে ডুলীতে লাহোর গমন। [২৩১]।

১৮৫৭, ১৪ ফেব্রুয়ারী, (৪ ফাল্গুন,) লাহোর হইতে ফিরিয়া অমৃতসরে আগমন। [২৩১]।

১৮৫৭, ২২ ফেব্রুয়ারী, (১২ ফাল্গুন,) রাজনারায়ণ বসু তাঁহার জেঠতুত ভাই দুর্গানারায়ণের ও সহোদর ভাই মদনমোহনের বিধবা বিবাহ দেন। তাহাতে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়।

১৮৫৭, ৬ মার্চ্চ, (২৪ ফাল্গুন,) দেবেন্দ্রনাথ অমৃতসর হইতে রাজনারায়ণ বসুকে তাঁহার ভাইদের বিধবা বিবাহ দেওয়া বিষয়ে পত্র লিখেন; এ কার্য্যকে "অতীব কঠোর কার্য্য" বলিয়া উল্লেখ করেন। এই পত্রেই দেবেন্দ্রনাথের মহাবাক্য "সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাহার সহায়" প্রথম ব্যবহৃত হয়। [পত্রাবলী, ৪৮]। দেবেন্দ্রনাথের অপর এক পত্র হইতে জানা যায় যে তিনি এ সময়ে Sir William Hamiltonএর গ্রন্থ পড়িতেছিলেন। [পত্রাবলী, ৪৭]।

১৮৫৭, ২০ এপ্রিল, (১৭৭৯ শক, ৯ বৈশাখ,) অমৃতসর ত্যাগ। [২৩৯]।

১৮৫৭, ২৩ এপ্রিল, (১২ বৈশাখ,) কাল্‌কায় আগমন। [২৩৯]।

১৮৫৭, ২৭ এপ্রিল, (১৬ বৈশাখ,) সিমলা শৈল আরোহণ আরম্ভ। [২৪০]।

১৮৫৭, ২৮ এপ্রিল, (১৭ বৈশাখ,) দেবেন্দ্রনাথ সিমলা পৌঁছিলেন। [২৪১]।

১৮৫৭, ১০ মে, রবিবার, সিমলায় জলপ্রপাতে স্নান ও তাহার ধারে বনভোজন। [২৪২]।

১৮৫৭, ১৫ মে, (৩ জ্যৈষ্ঠ,) দেবেন্দ্রনাথের চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়া। চক্ষুরোগ আরাম হওয়াতে মনের প্রসন্নতা। [২৪৩]।

১৮৫৭, ১৬ মে, গুর্খাদের বিদ্রোহের আশঙ্কায় সিমলা হইতে সকলের পলায়ন, ও সিমলায় সশস্ত্র পাহারা। [২৪৪]।

১৮৫৭, ১৭ মে, দেবেন্দ্রনাথ সিমলা ত্যাগ করিয়া ডগ্‌শাহী পাহাড়ে চলিয়া যান। [২৪৯]।

১৮৫৭, ২৯ মে, ডগ্‌শাহী হইতে সিমলা অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন। [২৫২]।

১৮৫৭, ৬ জুন, (২৫ জ্যৈষ্ঠ,) সিমলা হইতে সুজ্মী ভ্রমণের জন্য যাত্রা। [২৫৩, ৪৬২]।

১৮৫৭, ১০ জুন, (২৯ জ্যৈষ্ঠ,) নারকাণ্ডা। [২৫৭]।

১৮৫৭, ১১ জুন, (৩০ জ্যৈষ্ঠ,) সুঙ্গ্রী। [২৬০]।

১৮৫৭, ১২ জুন, (৩১ জ্যৈষ্ঠ,) অবরোহণ আরম্ভ। [২৬০]।

১৮৫৭, ১৩ জুন, (৩২ জ্যৈষ্ঠ,) 'নগরী' নদীতীরে দাবানল দর্শন। [২৬৩]।

১৮৫৭, ২৬ জুন, (১৩ আষাঢ়,) সিমলায় প্রত্যাবর্ত্তন। [২৬৫]।

১৮৫৭, ১৮৫৮, সিম্‌লাতে উপনিষদ্, হাফিজ, Kant, Fichte, Victor Cousin, Scottish Intuitionist দার্শনিকগণ ও Francis Newmanএর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন; আত্মার মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান; ব্রহ্মসহবাস জনিত আনন্দ। [২৬৯—২৭৩, ৪৪৭]।

১৮৫৮, ফেব্রুয়ারী, (মাঘের শেষ,) ভজ্জী ভ্রমণ। [২৭৪]।

১৮৫৮, অক্টোবর, (১৭৮০ শক, আশ্বিন,) নিম্নগামিনী নদীর স্রোত দর্শন করিতে করিতে দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অনুভব করা। [২৮১, ২৮২]।

১৮৫৮, ১৬ অক্টোবর, (১৭৮০ শক, ১লা কার্ত্তিক, শনিবার, বিজয়া দশমী,) সিমলা ত্যাগ। [২৮৪]।

১৮৫৮, ২৪ অক্টোবর, নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু। [২৯১, ৪৪৭]।

১৮৫৮, ১৫ নভেম্বর, (১৭৮০ শক, ১ অগ্রহায়ণ, সোমবার,) দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন। [২৯৩]।

১৮৫৯, দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতির বিবিধ সংস্কার। [৩৮৬]।

১৮৬০, ২৫ জুলাই, (১৭৮২ শক, ১১ই শ্রাবণ, বুধবার), দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান দান করেন। এই দিন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের বেদীতে প্রথম বার বসিলেন। [৪৩৯]।

১৮৬১, মে, (১৭৮৩ শক, জ্যৈষ্ঠ,) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের তাৎপর্য্য ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মাঝে মাঝে কোন কোন শ্লোকের তাৎপর্য্য বাহির হইয়াছিল। [৪৩৭]।

১৮৬৯, ডিসেম্বর, (১৭৯১ শক, অগ্রহায়ণ,) তাৎপর্য্য সহিত সমগ্র 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। [১৭৮]।

বংশ-

আত্মজীবনীতে উল্লিখিত আত্মীয়গণের

(যে কয়টি নাম একান্ত প্রয়োজনীয়, কেবল তাহাই ইহার অন্তর্ভুক্ত
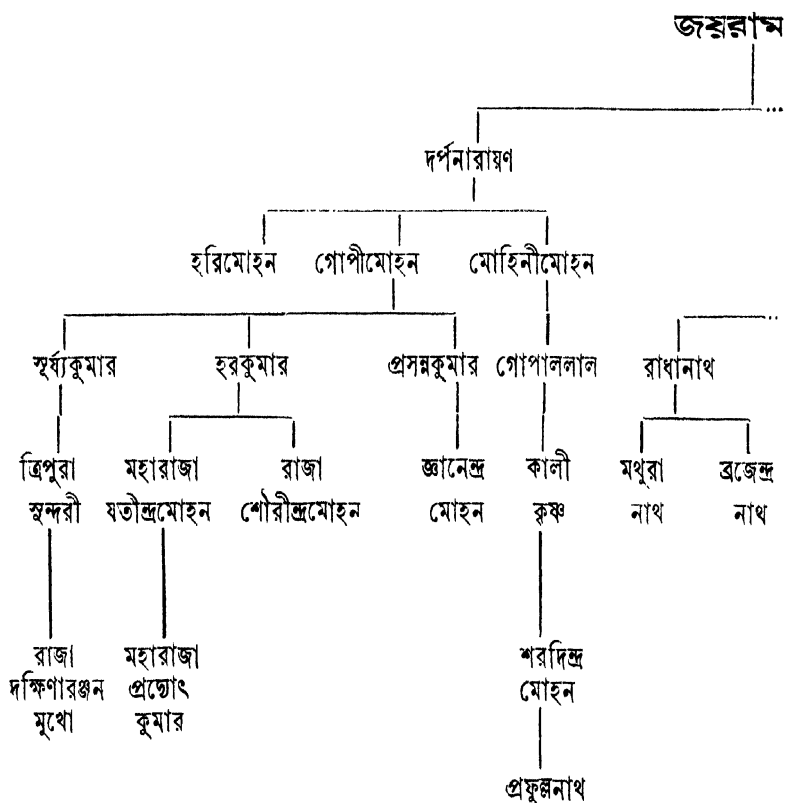
'লতিকা (১)

সহিত দেবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক।

করা হইল। পতি বা পত্নীর নামের পূর্ব্বে = এই চিহ্ন দেওয়া হইল।)
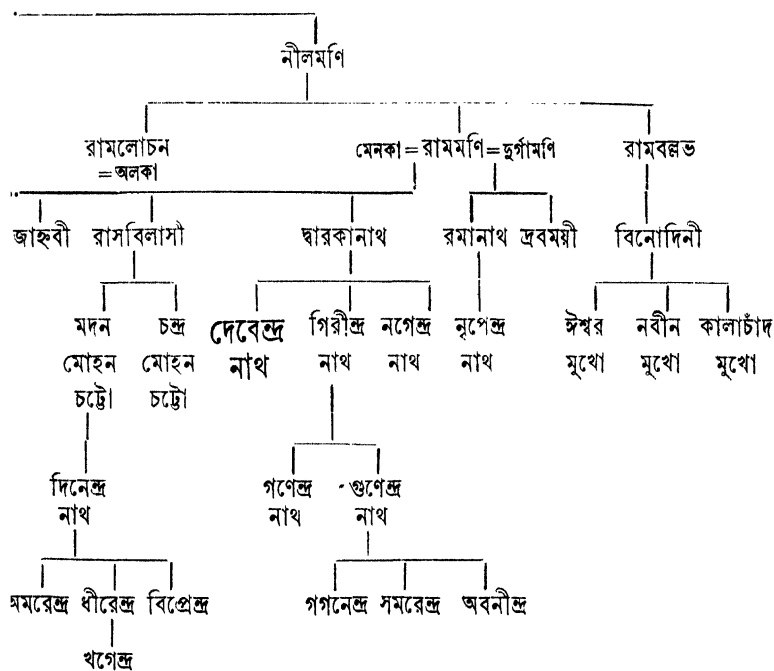
বংশলতিকা (২)

দেবেন্দ্রনাথের অধস্তন দুই পুরুষ।

পুত্র, কন্যা	পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী
১) দ্বিজেন্দ্র	দ্বিপেন্দ্র অরুণেন্দ্র সরোজা =মোহিনীমোহন চট্টো নীতীন্দ্র সুধীন্দ্র ঊষা =রমনীমোহন চট্টো কৃতীন্দ্র
২) সত্যেন্দ্র	সুরেন্দ্র ইন্দিরা =প্রমথনাথ চৌধুরী
(৩) হেমেন্দ্র	প্রতিভা =আশুতোষ চৌধুরী হিতেন্দ্র ক্ষিতীন্দ্র ঋতেন্দ্র প্রজ্ঞা =লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া অভিজ্ঞা =দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মনীষা =দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (অভিজ্ঞার মৃত্যুর পরে) শোভনা =নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুনৃতা =নন্দলাল ঘোষাল সুষমা =যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সুদক্ষিণা =পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ

পুত্র, কন্যা	পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী
(৪) বীরেন্দ্র	বলেন্দ্র
(৫) সৌদামিনী =সারদাপ্রসাদ গঙ্গো	সত্যপ্রসাদ ইরাবতী =নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইন্দুমতী =নিত্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়
(৬) জ্যোতিরিন্দ্র	(নিঃসন্তান)
(৭) সুকুমারী =হেমেন্দ্রনাথ মুখো	অশোকনাথ
(৮) শরৎকুমারী =যদুনাথ মুখো	সুশীলা =শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় সুপ্রভা =সুকুমার হালদার যশঃপ্রকাশ স্বয়ংপ্রভা =অশ্বিনীকুমার বন্দ্যো চিরপ্রভা =নলিনীকান্ত বন্দ্যো জ্ঞানপ্রকাশ

পুত্র, কন্যা	পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী
(৯) স্বর্ণকুমারী =জানকীনাথ ঘোষাল	হিরণ্ময়ী =ফণীন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় জ্যোৎস্নানাথ =(কুচবিহার রাজকুমারী) সুকৃতি দেবী সরলা =পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী ঊর্ম্মিলা (অল্প বয়সে মৃত)
(১০) বর্ণকুমারী =সতীশচন্দ্র মুখো	সরোজনাথ প্রমোদনাথ
(১১) পূর্ণেন্দ্র পুণ্যেন্দ্র	(অল্প বয়সে মৃত)
(১২) সোমেন্দ্র	(বিবাহ করেন নাই)
(১৩) রবীন্দ্র	মাধুরীলতা =শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী রথীন্দ্র রেণুকা =সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মীরা =নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শমীন্দ্র (অল্প বয়সে মৃত)
(১৪) বুধেন্দ্র	(অল্প বয়সে মৃত)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আত্মজীবনী।

(প্রথম সংস্করণের)

গ্রন্থ-স্বত্বাধিকার-দানপত্র

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ প্রিয় নাথ,

১৮ বৎসর হইতে ৪১ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত আমার জীবন-কাহিনী ঊনচল্লিশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত করিয়া তোমাকে দিলাম; ইহা তোমার সম্পত্তি হইল। ইহাতে কোন নূতন শব্দ যোগ করিবে না, ইহার বিন্দু বিসর্গও পরিত্যাগ করিবে না। আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে ইহা মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিবে না। তোমার প্রতি আমার এই আদেশ, ইহা সর্ব্বতোভাবে পালন করিবে। তোমার মঙ্গল হউক। ইতি ১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক।

পুনশ্চ। ইহার ইংরাজী অনুবাদের অধিকার শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ও শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথকে দিলাম। অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের অধিকার তোমারই রহিল। ইতি ১১ই মাঘ, ১৮১৬ শক।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

বিজ্ঞাপন।

স্বরচিত জীবন-চরিতের [দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে[১]] এই যে লিখিত আছে, "উপনিষদে আছে যে, যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়," ইত্যাদি, তাহার শ্রুতিপ্রমাণ এই—

"অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে, তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং, রাত্রেরপরপক্ষম্, অপরপক্ষাদ্যান্ ষড়্ দক্ষিণৈতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি ॥৩॥ মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং, পিতৃলোকাদাকাশম্, আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। এষ সোমো রাজা। তদ্দেবানামন্নং, তং দেবা ভক্ষয়ন্তি ॥৪॥ তস্মিন্ যাবৎসম্পাতমুষিত্বা, হথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে, যথেতমাকাশম্, আকাশাদ্বায়ুং। বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাঽভ্রং ভবতি ॥৫॥ অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি। ত ইহ ব্রীহি-যবা ওষধি-বনস্পতয়স্তিল-মাষা ইতি জায়ন্তে। অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং। যো যো হ্যন্নমত্তি, যো রেতঃ সিঞ্চতি, তদ্ভূয় এব ভবতি ॥৬॥"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৫ প্রপাঠক, [১০ খণ্ড]।

---

(১) প্রথম সংস্করণে এই স্থানে পৃষ্ঠার সংখ্যা দেওয়া ছিল

ওঁ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ পিতামহীর ক্রোড়ে লালিত পালিত। পিতামহীর ধর্ম্মনিষ্ঠা, কার্য্যদক্ষতা এবং তেজস্বিতা। পিতামহীর প্রদত্ত টাকা মোহর; ভোগে নিঃস্পৃহ ১৮ বৎসর বয়স্ক দেবেন্দ্রনাথের সে টাকা-মোহরকে মুড়ি-মুড়কি বলিয়া বোধ। পিতামহীর অন্তিমকালে গঙ্গাযাত্রা। শ্মশানের নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে বসিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে আনন্দপূর্ণ উদাস ভাব। (১৮১৭—১৮৩৫)।

দিদিমা* আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। শৈশবে তাঁহাকে ব্যতীত আমিও আর কাহাকে জানিতাম না[১]। আমার শয়ন, উপবেশন, ভোজন, সকলই তাঁহার নিকট হইত। তিনি কালীঘাটে যাইতেন, আমি তাঁহার সহিত যাইতাম। তিনি যখন আমাকে ফেলে জগন্নাথক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন আমি বড়ই কাঁদিতাম।

ধর্ম্মে তাঁহার অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান করিতেন, এবং প্রতিদিন শালগ্রামের জন্য স্বহস্তে পুষ্পের মালা গাঁথিয়া দিতেন। কখনো কখনো তিনি সংকল্প

---

* আমার পিতামহী। (পিতামহী সম্বন্ধে পরিশিষ্ট ১ দ্রষ্টব্য।)

(১) পরিশিষ্ট ২।

করিয়া উদয়াস্ত সাধন করিতেন; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যের অস্তকাল পর্য্যন্ত সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতেন। আমিও সে সময়ে ছাতের উপরে রৌদ্রেতে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, এবং সেই সূর্য্য অর্ঘ্যের মন্ত্র শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গেল,—

"জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্"।

দিদিমা এক এক দিন হরিবাসর করিতেন; সমস্ত রাত্রি কথা হইত, এবং কীর্ত্তন হইত; তাহার শব্দে আমরা আর রাত্রিতে ঘুমাইতে পারিতাম না।

তিনি সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধারণ করিতেন, এবং স্বহস্তে অনেক কার্য্য করিতেন[১]। তাঁহার কার্য্যদক্ষতার জন্য তাঁহার শাসনে গৃহের সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিত। পরে সকলের আহারান্তে তিনি স্বপাকে আহার করিতেন। আমিও তাঁহার হবিষ্যান্নের ভাগী ছিলাম। তাঁহার সেই প্রসাদ আমার যেমন স্বাদু লাগিত, তেমন আপনার খাওয়া ভাল লাগিত না।

তাঁহার শরীর যেমন সুন্দর ছিল, কার্য্যেতে তেমনি তাঁহার পটুতা ছিল, এবং ধর্ম্মেতেও তাঁহার তেমনি আস্থা ছিল। কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের[২] সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না। তাঁহার ধর্ম্মের অন্ধ বিশ্বাসের সহিত একটু স্বাধীনতাও ছিল।

আমি তাঁহার সহিত আমাদের পুরাতন বাড়ীতে[৩] 'গোপীনাথ' ঠাকুর দর্শনার্থে যাইতাম। কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে ভাল বাসিতাম না; তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া গবাক্ষ দিয়া

---

(১) পরিশিষ্ট ৩। (২) পরিশিষ্ট ৪।
(৩) পরিশিষ্ট ৫।

শান্ত-ভাবে সমস্ত দেখিতাম। এখন আমার দিদিমা আর নাই। কিন্তু, কত দিন পরে, কত অন্বেষণের পরে, আমি এখন আমার দিদিমার দিদিমাকে পাইয়াছি, ও তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া জগতের লীলা দেখিতেছি[১]।

দিদিমা মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে আমাকে বলেন, "আমার যা কিছু আছে আমি তাহা আর কাহাকেও দিব না, তোমাকেই দিব।" পরে তিনি তাঁহার বাক্সের চাবিটা আমাকে দেন। আমি তাঁহার বাক্স খুলিয়া কতকগুলিন টাকা ও মোহর পাইলাম। লোককে বলিলাম যে, "আমি মুড়ি মুড়্কি[২] পাইয়াছি।"

১৭৫৭ শকে দিদিমার যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত, তখন আমার পিতা এলাহাবাদ অঞ্চলে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন[৩]। বৈদ্য আসিয়া কহিল, "রোগীকে আর গৃহে রাখা হইবে না।" অতএব সকলে আমার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বাড়ীর বাহিরে আনিল। কিন্তু দিদিমা আরও বাঁচিতে চান, গঙ্গায় যাইতে তাঁহার মত নাই। তিনি বলিলেন যে, "যদি দ্বারকানাথ বাড়ীতে থাকিত, তবে তোরা কখনই আমাকে লইয়া যাইতে

---

(১) আত্মজীবনীর এই অংশ ও ইহার পরবর্ত্তী অংশের ভিতরে অনেক বৎসরের ব্যবধান রহিয়াছে। এই ব্যবধানের সময়ে দেবেন্দ্রনাথের উপনয়ন (১৮২৭), বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ (১৮২৬—১৮৩৩), রামমোহন রায়ের বিলাত গমন (১৮৩০), দেবেন্দ্রনাথের বিবাহ (১৮৩১ অথবা ১৮৩২), প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। আত্মজীবনী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালের ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিদ্যালয়ে পাঠের বিষয় জানা বিশেষ আবশ্যক; তাহা ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

(২) দেবেন্দ্রনাথ সাদা টাকাকে মুড়ি ও হল্‌দে মোহরকে মুড়্কি বলিয়াছিলেন।

(৩) সময়সূচী দ্রষ্টব্য।

পারতিস্ নে।” কিন্তু লোকে তাহা শুনিল না। তাঁহাকে লইয়া গঙ্গাতীরে চলিল। তখন তিনি কহিলেন, “তোরা যেমন আমার কথা না শুনে আমাকে গঙ্গায় নিয়ে গেলি, তেমনি আমি তোরদের সকলকে খুব কষ্ট দিব; আমি শীঘ্র মরিব না।” গঙ্গাতীরে লইয়া একটি খোলার চালাতে তাঁহাকে রাখা হইল। সেখানে তিনি তিন রাত্রি জীবিত ছিলেন। আমি সেই সময়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার সঙ্গে নিয়ত থাকিতাম।

দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, “এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে”; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাস-ভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশানের উদাস আনন্দই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ। পিতামহীর মৃত্যু। শ্মশানের আনন্দ হারাইয়া ব্যাকুলতা। শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের উপাখ্যান। (১৮৩৫)।

এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম[১]। তত্ত্বজ্ঞানের কিছুমাত্র আলোচনা করি নাই। ধর্ম্ম কি, ঈশ্বর কি, কিছুই জানি নাই, কিছুই শিখি নাই। শ্মশানের সেই উদাস আনন্দ, তৎকালের সেই স্বাভাবিক সহজ আনন্দ, মনে আর ধরে না। ভাষা সর্ব্বথা দুর্ব্বল, আমি সেই আনন্দ কিরূপে লোককে বুঝাইব? তাহা স্বাভাবিক আনন্দ; তর্ক করিয়া, যুক্তি করিয়া, সেই আনন্দ কেহ পাইতে পারে না। সেই আনন্দ ঢালিবার জন্য ঈশ্বর অবসর খোঁজেন। সময় বুঝিয়াই তিনি আমাকে এ আনন্দ দিয়াছিলেন। কে বলে ঈশ্বর নাই? এই তো তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি তো প্রস্তুত ছিলাম না, তবে কোথা হইতে এ আনন্দ পাইলাম?

এই ঔদাস্য ও আনন্দ লইয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময় আমি বাড়ীতে আসিলাম। সে রাত্রিতে আমার আর নিদ্রা হইল না। এ অনিদ্রার কারণ, আনন্দ। সারা রাত্রি যেন একটা আনন্দ-জ্যোৎস্না আমার হৃদয়ে জাগিয়া রহিল।

রাত্রি প্রভাত হইলে দিদিমাকে দেখিবার জন্য আবার গঙ্গা-তীরে যাই। তখন তাঁহার শ্বাস হইয়াছে। সকলে ধরাধরি করিয়া

---

(১) পরিশিষ্ট ৮

দিদিমাকে গঙ্গার গর্ভে নামাইয়াছে, এবং উৎসাহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম" নাম ডাকিতেছে। দিদিমার মৃত্যু হইল। আমি নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, তাঁহার হস্ত বক্ষঃস্থলে, এবং অনামিকা অঙ্গুলিটি ঊর্দ্ধমুখে আছে। তিনি "হরিবোল" বলিয়া অঙ্গুলি ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরলোকে চলিয়া গেলেন। তাহা দেখিয়া আমার বোধ হইল, মরিবার সময় ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইয়া গেলেন, "ঐ ঈশ্বর ও পরকাল।" দিদিমা যেমন আমার ইহকালের বন্ধু ছিলেন, তেমনি পরকালেরও বন্ধু।

মহা সমারোহে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইল। আমরা তৈল হরিদ্রা মাখিয়া শ্রাদ্ধের বৃষকার্ষ্ঠ গঙ্গাতীরে পুঁতিয়া আসিলাম। এই কয় দিন খুব গোলযোগে কাটিয়া গেল।

পরে, দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রে যেরূপ আনন্দ পাইয়াছিলাম, তাহা পাইবার জন্য আমার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহা আর পাইলাম না। এই সময়ে আমার মনে কেবলই ঔদাস্য আর বিষাদ। সেই রাত্রিতে ঔদাস্যের সহিত আনন্দ পাইয়াছিলাম, এখন. সেই আনন্দের অভাবে ঘন বিষাদ আসিয়া আমার মনকে আচ্ছন্ন করিল। কিরূপে আবার সেই আনন্দ পাইব, তাহার জন্য মনে বড়ই ব্যাকুলতা জন্মিল[১]। আর কিছুই ভাল লাগে না।

---

(১) দেবেন্দ্রনাথ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে একদিন বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় একটি রহস্য যদি জানিতে চাও, তবে আমি বলি যে, সেই শ্মশানে বসিয়া যে আনন্দকে আমি পাইয়াছিলাম, তাহাকেই চিরকাল আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। যখনি কোন আনন্দের উপলব্ধি হয়, অমনি ভাবি, বুঝি সেই আনন্দকে পাইলাম।"—(অজিত ৫১)।

এস্থলে ভাগবতের একটি উপাখ্যানের[১] সহিত আমার অবস্থার তুলনা হইতে পারে। নারদ বেদব্যাসের নিকটে আপনার কথা বলিতেছেন,—"আমি পূর্ব্বজন্মে কোন এক ঋষির দাসীপুত্র ছিলাম। ঐ ঋষির আশ্রমে বর্ষার কয়েক মাস অনেক সাধুলোক আশ্রয় লইতেন। আমি তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতাম। ক্রমশঃ আমার দিব্য-জ্ঞান জন্মিল, এবং মনে হরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হইল। পরে ঐ সমস্ত সাধু, আশ্রম হইতে বিদায় লইবার কালে, কৃপা করিয়া আমাকে জ্ঞান-রহস্য শিক্ষা দিয়া যান। ইহার দ্বারা আমি হরি-মাহাত্ম্য সুস্পষ্ট জানিতে পারি। জননী ঋষির দাসী, আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র,—'একাত্মজা মে জননী'। আমি কেবল তাঁহারই জন্য ঐ ঋষির আশ্রম ত্যাগ করিতে পারি নাই। একদা তিনি নিশাকালে গো-দোহন করিবার জন্য বাহিরে যান। পথে একটি কৃষ্ণসর্প পাদস্পৃষ্ট হইবা মাত্র তাঁহাকে দংশন করে, এবং তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইটি আমি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির বড় সুযোগ মনে করিলাম, এবং একাকী ঝিল্লিকা-গণ-নাদিত এক ভীষণ মহাবনে প্রবেশ করিলাম। পর্য্যটন-শ্রমে আমার অতিশয় ক্ষুৎপিপাসা হইয়াছিল। আমি এক সরোবরে স্নান ও জলপান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। মন প্রশান্ত হইল। অনন্তর আমি এক অশ্বত্থ বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলাম, এবং সাধু-গণের উপদেশ অনুসারে আত্মস্থ পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলাম। মন ভাবে আপ্লুত, নেত্রযুগল বাষ্পপূর্ণ। সহসা হৃৎপদ্মে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল। সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল। আমি যার পর নাই আনন্দ পাইলাম। কিন্তু পরক্ষণে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সেই

(১) শ্রীমদ্ভা. ১।৬।

শোকাপহ কমনীয় রূপ দেখিতে না পাইয়া সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। মনে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। পরে আমি আবার ধ্যানস্থ হইয়া তাঁহাকে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু আর পাইলাম না। তখন আতুরের ন্যায় অতৃপ্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে সহসা এক দৈববাণী হইল, 'এ জন্মে তুমি আমাকে আর দেখিতে পাইবে না। যাহাদের চিত্তের মল ক্ষালিত হয় নাই, যাহারা যোগে অসিদ্ধ, তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। আমি যে একবার তোমাকে দেখা দিলাম, ইহা কেবল তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্য'।" আমার ঠিক এইরূপই অবস্থা ঘটিয়াছিল। আমি সেই রাত্রিকালের আনন্দ না পাইয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলাম; কিন্তু তাহাই আবার আমার অনুরাগ উৎপাদন করিয়া দিল।

কেবল নারদের এই উপাখ্যানের সঙ্গে আমার একটি বিষয়ে মিল হয় না। তিনি প্রথমে ঋষিদিগের মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাদের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক উপদেশ পাইয়াছিলেন। আমি কিন্তু প্রথমে কাহারও মুখে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিবার কোন সুযোগই প্রাপ্ত হই নাই, এবং কৃপা করিয়া কেহই আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন নাই। আমার চারিদিকে কেবল বিলাস ও আমোদের-অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন, ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময়, স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন প্রদান করিলেন। তাঁহার এ কৃপার কোথাও তুলনা হয় না! তিনিই আমার গুরু, তিনিই আমার পিতা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্মশানের সেই আনন্দকে ফিরিয়া পাইবার জন্য গভীর ব্যাকুলতা। বৈরাগ্যের পথ আশ্রয় করিয়া তাহা পাইবার চেষ্টা (বৈঠকখানার আসবাব বিলাইয়া দেওয়া) নিষ্ফল হইল। ঈশ্বরবিষয়ক বিমল জ্ঞান বিনা এ অন্ধকার যাইবে না। বোটানিকেল বাগানে গিয়া সূর্য্যকিরণ কৃষ্ণবর্ণ বোধ। গ্রন্থ পাঠ ঃ—(১) সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত ও তৎপুত্র শ্যামাচরণ; তাঁহাদের নিকটে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও মহাভারত পাঠ। (২) য়ুরোপীয় দর্শন পাঠ; তাহাতে জড়বাদ ও প্রকৃতির প্রাধান্য দেখিয়া অতৃপ্তি ও বিষাদ ঘনীভূত। বুঝি 'আর বাঁচিব না!'—(১৮৩৬, ১৮৩৭)।

দিদিমার মৃত্যুর পর এক দিন আমার বৈঠকখানায় বসিয়া আমি সকলকে বলিলাম যে, "আজ আমি কল্পতরু হইলাম; আমার নিকটে আমার দিবার উপযুক্ত যে যাহা কিছু চাহিবে, তাহাকে আমি তাহাই দিব।" আমার নিকট আর কেহ কিছু চাহিলেন না, কেবল আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজ বাবু[১] বলিলেন যে, "আমাকে ঐ বড় দুইটা আয়না দি'ন্, ঐ ছবিগুলান্ দি'ন্, ঐ জরির পোষাক দি'ন্।" আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সকলই দিলাম। তিনি পর দিন মুটে আনিয়া বৈঠকখানার সমস্ত জিনিস লইয়া গেলেন। ভাল ভাল ছবি ছিল, আর আর বহুমূল্য গৃহ-সজ্জা ছিল, সমস্তই তিনি লইয়া গেলেন।

এইরূপে আমার সকল আস্‌বাব বিলাইলাম। কিন্তু আমার মনের যে বিষাদ, সেই বিষাদ! তাহা আর ঘুচে না। কিসে

---

(১) দ্বারকানাথের অগ্রজ রাধানাথের পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথ। বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।

শান্তি পাইব, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না[১]। এক এক দিন কৌচে পড়িয়া ঈশ্বরবিষয়ক সমস্যা ভাবিতে ভাবিতে মনকে এমনি হারাইতাম যে, কৌচ হইতে উঠিয়া, ভোজন করিয়া, আবার কৌচে কখন পড়িলাম, তাহার আমি কিছুই জানি না; আমার বোধ হইতেছিল, যেন আমি বরাবর কৌচেই পড়িয়া আছি।

আমি সুবিধা পাইলেই দিবা দুই প্রহরে একাকী বোটানিকেল উদ্যানে যাইতাম। এই স্থানটি খুব নির্জ্জন। ঐ বাগানের মধ্যস্থলে যে একটা সমাধিস্তম্ভ[২] আছে, আমি গিয়া তাহাতে বসিয়া থাকিতাম। মনে বড় বিষাদ। চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। বিষয়ের প্রলোভন আর নাই, কিন্তু ঈশ্বরের ভাবও কিছুই পাইতেছি না; পার্থিব ও স্বর্গীয়, সকল প্রকার সুখেরই অভাব। জীবন নীরস, পৃথিবী শ্মশানতুল্য। কিছুতেই সুখ নাই, কিছুতেই শান্তি নাই। দুই প্রহরের সূর্য্যের কিরণ-রেখা-সকল যেন কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইত। সেই সময় আমার মুখ দিয়া সহসা এই গানটি বাহির হইল,—"হবে, কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার[৩]।" এই আমার প্রথম গান। আমি সেই সমাধি-স্তম্ভে বসিয়া একাকী এই গানটি মুক্তকণ্ঠে গাইতাম।

তখন সংস্কৃত শিখিতে আমার বড় ইচ্ছা হইল। সংস্কৃত ভাষার উপর আমার বালক-কালাবধিই অনুরাগ ছিল; চাণক্যের শ্লোক যত্নপূর্ব্বক তখন মুখস্থ করিতাম; কোন একটি ভাল শ্লোক

---

(১) এই অশান্তির অবস্থাকে দেবেন্দ্রনাথ অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশিষ্ট ৯ দ্রষ্টব্য।

(২) সমাধি-স্তম্ভ নয়, স্মৃতিস্তম্ভ। পরিশিষ্ট ৫১ দ্রষ্টব্য।

(৩) এই গানের অপরার্দ্ধ এই—"গত হ'ল আয়ু, নাহি গেল জানা, কেমনে তাঁরে জানিবে বল না!" রাগিণী বেহাগ।

শুনিলে অমনি তাহা শিখিয়া লইতাম। তখন আমাদের বাটীতে একজন সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম কমলাকান্ত চূড়ামণি; নিবাস বাঁশবেড়ে। তিনি অগ্রে গোপীমোহন ঠাকুরের[১] আশ্রয়ে ছিলেন; পরে আমাদের হন। তিনি সুপণ্ডিত ও তেজস্বী। আমার বয়স তখন অল্প; তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, আমি তাঁহাকে ভক্তি করিতাম। একদিন বলিলাম, "আমি আপনার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িব।" তিনি কহিলেন, "ভালই তো, আমি তোমাকে পড়াইব।" তখন চূড়ামণির নিকট মুগ্ধবোধ আরম্ভ করিলাম, এবং "ঝ ঢ় ধ ঘ ভ, জ ড় দ গ ব," কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম। সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশ হইবার জন্য, চূড়ামণির নিকট আমার মুগ্ধবোধ পড়িবার প্রথম উৎসাহ।

এক দিন চূড়ামণি তাঁহার হাতের লেখা একখানি কাগজ আস্তে আস্তে বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন; কহিলেন, "এই লেখাতে সহি করিয়া দেও।" আমি বলিলাম, "কি লেখা?" পড়িয়া দেখি, তাহাতে লেখা আছে যে, তাঁহার পুত্র শ্যামাচরণকে চিরকাল আমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি তাহাতে তখনি সহি করিয়া দিলাম। চূড়ামণির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তিনি বলিলেন, আর আমি অমনি তাহাতে সহি করিয়া দিলাম; তাহার বিষয় আমি তখন কিছুই প্রণিধান করিলাম না।

কিছু দিন পরে আমাদের সভাপণ্ডিত চূড়ামণির মৃত্যু হইল। তখন শ্যামাচরণ আমার সেই স্বাক্ষরটুকু লইয়া আমার নিকট আসিলেন। কহিলেন যে, "আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি নিরাশ্রয়; এখন আপনার আমাকে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(১) প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পিতা। বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।

এই দেখুন, আপনি পূর্ব্বেই ইহা লিখিয়া দিয়াছেন।” আমি তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইলাম, এবং তদবধি শ্যামাচরণ আমার নিকটে থাকিতেন।

সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার কিছু অধিকার ছিল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ঈশ্বরের তত্ত্বকথা কিসে পাওয়া যায়?” তিনি কহিলেন, “মহাভারতে।” তখন আমি তাঁহার নিকট মহাভারত পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এই গ্রন্থ খুলিবামাত্র একটি শ্লোক আমার চক্ষে ঠেকিল। তাহা এই—

“ধর্ম্মে মতি র্ভবতু বঃ সততোত্থিতানাং,
স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
অর্থাঃ স্ত্রিয়শ্চ নিপুণৈরপি সেব্যমানা
নৈবাপ্তভাব মুপয়ন্তি ন চ স্থিরত্বম্[১]।”

তোমাদের ধর্ম্মে মতি হউক, তোমরা সতত ধর্ম্মে অনুরক্ত হও, সেই এক ধর্ম্মই পরলোকগত ব্যক্তির বন্ধু; অর্থ ও স্ত্রীদিগকে নিপুণরূপে সেবা করিলেও তাহাদিগকে আয়ত্ত করা যায় না, এবং তাহাদের স্থিরতাও নাই।—মহাভারতের এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া আমার বড়ই উৎসাহ জন্মিল।

আমার সংস্কার ছিল যে, সকল ভাষাতেই বাঙ্গালা ও ইংরাজি ভাষার ন্যায় বিশেষ্যের অগ্রে বিশেষণগুলি থাকে। কিন্তু সংস্কৃতে দেখিলাম যে, বিশেষ্য এখানে, বিশেষণ সেই-সেখানে। এইটি আয়ত্ত করিতে আমার কিছু দিন লাগিয়াছিল।

আমি এই মহাভারতের অনেক অংশ পাঠ করি। ধৌম্য ঋষির উপাখ্যানে[২] উপমন্যুর গুরুভক্তির কথা আমার বেশ মনে

(১) মহাভা. আদি. ২।৩৯১।

(২) মহাভা. আদি. ৩।৩৩—৩৭।

পড়ে। এখন তো ঐ বৃহৎ গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া অনেকের পাঠ্য হইয়াছে, কিন্তু তখনকার কালে ঐ মূল গ্রন্থ অল্প লোকেই পাঠ করিত। আমি ধর্ম্মপিপাসায় উহার অনেকাংশ পাঠ করি।

এক দিকে যেমন তত্ত্বান্বেষণের জন্য সংস্কৃত, তেমনি অপর দিকে ইংরাজী। আমি য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র[১] বিস্তর পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও মনের যে অভাব, সেই অভাব! তাহা কিছুতেই ঘুচাইতে পারিলাম না। সেই বিষাদের অন্ধকার, সেই অশান্তি, হৃদয়কে অতিমাত্র ব্যথিত করিতেছিল। ভাবিলাম, "প্রকৃতির অধীনতাই কি মনুষ্যের সর্ব্বস্ব? তবে তো গিয়াছি! এই পিশাচীর পরাক্রম দুর্নিবার। অগ্নি, স্পর্শমাত্র সমস্ত ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে; যানযোগে সমুদ্রে যাও, ঘূর্ণাবর্ত্ত তোমাকে রসাতলে দিবে, বায়ু বিষম বিপাকে ফেলিবে। এই পিশাচী প্রকৃতির হস্তে কাহারও নিস্তার নাই। ইহার নিকট নতশিরে থাকাই যদি চরম কথা হয়, তবে তো গিয়াছি! আমাদের আশা কৈ, ভরসা কৈ?"

আবার ভাবিলাম, "যেমন ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে সূর্য্য-কিরণের দ্বারা বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা মনের মধ্যে বাহ্য বস্তুর একটা অবভাস হয়। ইহাই তো জ্ঞান। এই পথ ছাড়া জ্ঞানলাভের আর কি উপায় আছে?" য়ুরোপের দর্শনশাস্ত্র আমার মনে এইরূপ আভাস আনিয়াছিল। এক জন নাস্তিকের নিকট এইটুকুই যথেষ্ট; সে প্রকৃতি ছাড়া আর কিছু চায় না। কিন্তু আমি ইহাতে কিরূপে তৃপ্ত হইব? আমার চেষ্টা

(১) এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্রের কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন, ও কেন তাহাতে তাঁহার মনের অশান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে পরিশিষ্ট ১০ দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরকে পাইবার জন্য; অন্ধবিশ্বাসে নয়, জ্ঞানের আলোকে। তাহা না পাইয়া আমার ব্যাকুলতা দিন দিন আরো বাড়িতে লাগিল। এক এক বার ভাবিতাম, আমি আর বাঁচিব না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একাগ্র চিন্তার ফলে ক্রমশঃ দেবেন্দ্রনাথের মনে, অন্ধকারের মধ্যে কিরণ-রেখার মত, কয়েকটি সিদ্ধান্তের উদয় হইল। (১) মানুষ বিষয়-জ্ঞানের সহিত আপনাকেও জ্ঞাতা বলিয়া জানে। (২) এক **জ্ঞানময়** পুরুষের অভিপ্রায়ের চিহ্নে জগৎ পূর্ণ, এবং (৩) আকাশ এক **অনন্ত** নিরবয়ব দেবতার পরিচয় দেয়। (৪) অতএব, সেই অনন্ত জ্ঞানময়ের অমোঘ ইচ্ছা হইতেই জগৎ ও জগতের উপকরণ উভয়ের সৃষ্টি হইয়াছে।—একাকী এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া, তাহাতে অন্যের সায় পাইবার আকাঙ্ক্ষা। (১৮৩৮)।

এই বিষাদ অন্ধকারের মধ্যে ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যুতের ন্যায় একটা আলোক চমকিত হইল। দেখিলাম, বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা রূপ রস :গন্ধ শব্দ স্পর্শের যোগে বিষয়-জ্ঞান জন্মে। কিন্তু এই জ্ঞানের সহিত, আমি যে জ্ঞাতা, তাহাও তো জানিতে পারি। দর্শন স্পর্শন আঘ্রাণ ও মননের সহিত, আমি যে দ্রষ্টা স্প্রষ্টা ঘ্রাতা ও মন্তা, এ জ্ঞানও তো পাই। বিষয়-জ্ঞানের সহিত বিষয়ীর বোধ হয়; শরীরের সহিত শরীরীকে জানিতে পারি।

আমি অনেক অনুসন্ধানে সর্ব্বপ্রথমে এই আলোকটুকু পাই; যেন ঘোর অন্ধকারাবৃত স্থানে সূর্য্যকিরণের একটি রেখা আসিয়া পড়িল! বিষয়-বোধের সহিত আমি আপনাকে আপনি জানিতে পারি, ইহা বুঝিলাম।

পরে যতই আলোচনা করি, জ্ঞানের প্রভাব বিশ্বসংসারে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। আমাদের জন্য চন্দ্র সূর্য্য নিয়মিতরূপে উদয়াস্ত হইতেছে; আমাদের জন্য বায়ু বৃষ্টি উপযুক্তরূপে সঞ্চালিত

হইতেছে; ইহারা সকলে মিলিয়া আমাদের জীবন পোষণের একটি লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। এইটি কাহার লক্ষ্য? জড়ের তো লক্ষ্য হইতে পারে না, চেতনেরই লক্ষ্য। অতএব একটি চেতনা-বান্ পুরুষের শাসনে এই বিশ্বসংসার চলিতেছে। দেখিলাম, শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মাতার স্তন্যপান করে। ইহা কে তাহাকে শিখাইয়া দিল? তিনিই, যিনি ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন। আবার মাতার মনে কে স্নেহ প্রেরণ করিল? যিনি তাঁহার স্তনে দুগ্ধ দিলেন, তিনি। তিনিই সেই প্রয়োজন-বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বর, যাঁহার শাসনে জগৎসংসার চলিতেছে। যখন এতটুকু জ্ঞাননেত্র আমার ফুটিল, তখন একটু আরাম পাইলাম। বিষাদ-ঘন অনেক কাটিয়া গেল। তখন কিছু আশ্বস্ত হইলাম।

বহু পূর্ব্বে প্রথম বয়সে আমি যে অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইয়াছিলাম[১], একদিন ভাবিতে ভাবিতে তাহা হঠাৎ আমার মনে পড়িয়া গেল। আবার আমি একাগ্র মনে অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র খচিত এই অনন্ত আকাশের উপরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম, এবং অনন্তদেবকে দেখিলাম। বুঝিলাম যে অনন্ত-দেবেরই এই মহিমা; তিনি অনন্ত-জ্ঞানস্বরূপ। যাঁহা হইতে আমরা পরিমিত জ্ঞান ও তাহার আধার এই অবয়ব পাইয়াছি, তাঁহার কোন অবয়ব নাই; তিনি শরীর ও ইন্দ্রিয় রহিত। তিনি হাত দিয়া এ বিশ্ব গড়ান নাই; কেবল আপনার ইচ্ছার দ্বারা এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি কালীঘাটের কালীও

---

(১) এই ঘটনার উল্লেখ আত্মজীবনীতে নাই। কিন্তু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে মহর্ষি এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন; তাহা মনে করিয়াই এখানে "আমি যে" এইরূপ পুনরুক্তিসূচক ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন। পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য।

নহেন, তিনি আমাদের বাড়ীর শালগ্রামও নহেন। এইখানেই পৌত্তলিকতার মূলে কুঠারাঘাত পড়িল।

সৃষ্টির কৌশল-চিন্তায় স্রষ্টার জ্ঞানের পরিচয় পাই, এবং নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখিয়া বুঝি তিনি অনন্ত,—এই সূত্রটুকু ধরিয়া তাঁহার স্বরূপ মনের মধ্যে আরও খুলিয়া গেল। দেখিলাম, যিনি অনন্ত জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছাকে কেহ বাধা দিতে পারে না; তিনি যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। আমরা, সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া রচনা করি; তিনি, তাঁহার ইচ্ছায় সকল উপকরণ সৃষ্টি করিয়া, রচনা করেন। তিনি জগতের কেবল রচনা-কর্ত্তা নহেন, তাহা হইতে উচ্চ; তিনি ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই সৃষ্ট বস্তুসকল অনিত্য, বিকারী, পরিবর্ত্তনশীল ও পরতন্ত্র; ইহাদিগকে যে পূর্ণ জ্ঞান সৃষ্টি করিয়াছেন ও চালাইতেছেন, তিনিই নিত্য, অবিকৃত, অপরিবর্ত্তনীয় ও স্বতন্ত্র। সেই নিত্য সত্য পূর্ণ পুরুষ সকল মঙ্গলের হেতু এবং সকলের সম্ভজনীয়।

কত দিন ধরিয়া এইটি আমার বুদ্ধির আলোচনায় স্থির করিলাম; কত সাধনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। তথাপি আমার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। জ্ঞান-পথ অতি দুর্গম পথ; এ পথে সাহস দেয় কে? আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম, তাহাতে সায় দেয় কে? কিরূপ সায়? যেমন পদ্মার মাঝীর নিকট হইতে আমি একটা সায় পাইয়াছিলাম, সেইরূপ সায়।

আমি একবার জমিদারী কালীগ্রামে যাই। অনেক দিনের পর বাড়ীতে ফিরি। আমি পদ্মার উপর বোটে। তখন বর্ষাকাল, আকাশে ঘোর ঘনঘটা, বেগে বায়ু উঠিয়াছে, পদ্মা তোলপাড় হইতেছে। মাঝীরা ভারি তুফান দেখিয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, কিনারায় বোট বাঁধিয়া ফেলিল। সেই কিনারাতেও

তরঙ্গে বোট স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কিন্তু বহু দিন বিদেশে, শীঘ্র বাড়ীতে আসিতে বড় ইচ্ছা। বেলা ৪ চারিটার সময়ে একটু বাতাস কমিলে আমি মাঝীকে বলিলাম যে, "এখন নৌকা ছাড়িতে পারিবি?" সে বলিল, "হুজুরের হুকুম হয় তো পারি।" আমি মাঝীকে বলিলাম, "তবে ছাড়্।" তার পর দেখি, সময় চলিয়া যায়, তবু নৌকা ছাড়ে না। আধ ঘণ্টা হইয়া গেল, তবু ছাড়ে না। মাঝীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই যে বল্লি, 'হুজুরের হুকুম হইলে নৌকা ছাড়িয়া দিতে পারি,' আমি তো হুকুম দিয়াছি, তবে এখনও ছাড়িলি না কেন? এখন একটু ঝড় থেমেছে, আবার কখন্ ঝড় উঠিবে, তাহার ঠিক নাই। যদি ছাড়িতে হয় তো এখনি ছাড়্।" সে বলিল যে, "বৃদ্ধ দেয়ানজী বলিলেন, 'ওরে মাঝি, এমন কর্ম্ম কি করিতে হয়? একে এই সর্‌দার[১] মোহানা, কূলকিনারা কিছুই দেখা যায় না; তাহাতে শ্রাবণের সংক্রান্তি। ঢেউয়ের তোড়ে নৌকা কিনারাতেই থাকিতে পারিতেছে না। তুই কি না এই অবেলায় এ হেন পদ্মায় পাড়ি দিতে চাস্?' দেয়ানজীর এই কথায় ভয় পেয়ে আমি নৌকা ছাড়িতে পারি নাই।" আমি বলিলাম, "ছাড়্।" সে অমনি নৌকা খুলে পাইল তুলে দিলে। অমনি বাতাসের এক ধাক্কায় নৌকা পদ্মার মধ্যে চলিয়া গেল। হাজার নৌকা কিনারায় বাঁধা ছিল, তাহারা সকলে একস্বরে বলিয়া উঠিল, "এখন যাবেন না, যাবেন না!" তখন আমার হৃদয় ডুবিয়া গেল। কি করি, আর ফিরিবার উপায় নাই, নৌকা পাইল পাইয়া শাঁ শাঁ করিয়া চলিতে লাগিল। খানিক গিয়া দেখি যে, তরঙ্গে তরঙ্গে

---

(১) সর্‌দা নদী পদ্মার সহিত মিলিত হইতেছে। আজকাল লালগোলা-ঘাট হইতে রাজসাহী পর্য্যন্ত যে ষ্টীমার যায়, সর্‌দা তাহার একটি ষ্টেশন।

জল ফাঁপিয়া সম্মুখে যেন একটা দেওয়াল উঠিয়াছে। নৌকা তাহাকে ভেদ করিতে ছুটিল, আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। এমন সময়ে অদূরে দেখি, এক খানা ডিঙ্গি হাবু ডুবু খাইতে খাইতে মোচার খোলার মত ওপার হইতে আসিতেছে। তাহার মাঝী আমাদের সাহস দেখিয়া সাহস দিয়া চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ভয় নাই, চলে যান্!" আমার উৎসাহে উৎসাহের স্বর মিশাইয়া এমন ভরসা দেয় কে? আমি এইরূপ সায় চাই। কিন্তু হা! তা আর কে দিবে[১]?

---

(১) চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে উল্লিখিত "সায়" সম্বন্ধে ৭ম পরিশিষ্টের "সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা" ও ৪৫তম পরিশিষ্টের "দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে বিলম্বের দুই কারণ" শীর্ষক অংশদ্বয় দ্রষ্টব্য।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর অনন্ত, নিরবয়ব; অতএব প্রতিমাপূজা পরিহার্য্য। বাল্যকালের গুরু রামমোহন রায়কে স্মরণ করিয়া প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে ভাইদের লইয়া দল বাঁধা। ঈশোপনিষদের ছিন্নপত্র হইতে নিজ চিন্তালব্ধ সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ সায় ও বিমল উপদেশ লাভ করিয়া গভীর তৃপ্তি ও কৃতার্থতা। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে উপনিষদ পাঠ আরম্ভ (১৮৩৮)। সত্য ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা, ও তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের প্রথম ব্যাখ্যান (১৮৩৯)।

যখনই আমি বুঝিলাম যে ঈশ্বরের শরীর নাই, তাঁহার প্রতিমা নাই, তখন হইতে আমার পৌত্তলিকতার উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মিল। রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল, আমার চেতন হইল। আমি তাঁহার অনুগামী হইবার জন্য প্রাণ ও মন সমর্পণ করিলাম।

শৈশব কাল অবধি আমার রামমোহন রায়ের সহিত সংশ্রব। আমি তাঁহার স্কুলে পড়িতাম[১]। তখন আরও ভাল স্কুল ছিল, হিন্দু-কালেজ ছিল। কিন্তু আমার পিতা রামমোহন রায়ের অনুরোধে আমাকে ঐ স্কুলে দেন। স্কুলটি হেদুয়ার পুষ্করিণীর ধারে[২] প্রতিষ্ঠিত। আমি প্রায় প্রতি শনিবার দুইটার সময় ছুটি হইলে রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের মাণিক-তলার বাগানে[৩] যাইতাম। অন্য দিনও দেখা করিয়া আসিতাম।

---

(১) ১৮২৬—১৮৩০, (বয়স ৯—১৩ বৎসর)। দেবেন্দ্রনাথের শৈশবে রামমোহন রায়ের সহিত যোগ বিষয়ে পরিশিষ্ট ১১ দ্রষ্টব্য।

(২) হেদুয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে। স্কুলটির নাম ছিল Anglo-Hindu School; ইহাতে ছাত্রবেতন লওয়া হইত না। পরে এই স্কুল পূর্ণ মিত্রের স্কুল নামে পরিচিত হইয়াছিল।

(৩) বর্ত্তমান ১১৩নং আপার সার্কুলার রোড।

কোন কোন দিন আমি তথায় গিয়া বড়ই উপদ্রব করিতাম। বাগানের গাছের নিচু ছিঁড়িয়া, কখনো কড়াইশুঁটি ভাঙ্গিয়া মনের সুখে খাইতাম। রামমোহন রায় একদিন কহিলেন, "বেরাদর[১]! রৌদ্রে হুটা-পাটি করিয়া কেন বেড়াও, এইখানে বোসো। যত নিচু খেতে পার এখানে বসিয়া খাও।" মালীকে বলিলেন, "যা, গাছথেকে নিচু পেড়ে নিয়ে আয়।" সে তৎক্ষণাৎ এক থালা ভরিয়া নিচু আনিয়া দিল। তখন রামমোহন রায় বলিলেন, "যত ইচ্ছা নিচু খাও।"

তাঁহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর। আমি বড় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাঁহাকে দেখিতাম। বাগানে একটা কাঠের দোলা ছিল। রামমোহন রায় অঙ্গ চালনার জন্য তাহাতে দোল খাইতেন। আমি বৈকালে বাগানে গেলে তিনি আমাকে সেই দোলায় বসাইয়া আপনি টানিতেন; ক্ষণেক পরে আপনি তাহাতে বসিয়া বলিতেন, "বেরাদর! এখন তুমি টান।"

আমি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকেই বাড়ী বাড়ী যাইতে হইত। আশ্বিন মাসের দুর্গোৎসব। আমি এই উপলক্ষে রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ করিতে যাই[২]। গিয়া বলিলাম, "রামমণি ঠাকুরের নিবেদন, তিন দিন আপনার প্রতিমা দর্শনের নিমন্ত্রণ।" শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "বেরাদর! আমাকে কেন? রাধাপ্রসাদকে বল।"

(১) এটি ইংরাজী Brother শব্দ নহে। ফারসী বেরাদর শব্দ। বে-র একার হ্রস্ব স্বর; দ-য়ের অকার হ্রস্ব আ-র মত' উচ্চারণ করিতে হইবে।

(২) এই ঘটনা ১৮২৮ কি ১৮২৯ সালে, দেবেন্দ্রনাথের এগারো বারো বৎসর বয়সের সময়ে ঘটিয়া থাকিবে। ১২ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

এত দিন পরে সেই কথার অর্থ ও ভাব বুঝিতে পারিলাম। এই অবধি আমি মনে মনে সংকল্প করিলাম যে, রামমোহন রায় যেমন কোন প্রতিমা পূজায় ও পৌত্তলিকতায় যোগ দিতেন না, তেমনি আমিও আর তাহাতে যোগ দিব না। কোন প্রতিমাকে পূজা করিব না, কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিব না, কোন পৌত্তলিক পূজায় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিব না। সেই অবধি আমার এই সংকল্প দৃঢ় হইল। তখন জানিতে পারিলাম না যে, কি আগুনে প্রবেশ করিলাম।

আমার ভাইদের লইয়া একটা দল বাঁধিলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সংকল্প করিলাম যে, পূজার সময়ে আমরা পূজার দালানে কেহই যাইব না; যদি কেহ যাই, তবে প্রতিমাকে প্রণাম করিব না। তখন সন্ধ্যাকালে আরতির সময় আমার পিতা দালানে যাইতেন। সুতরাং তাঁহার ভয়ে আমাদেরও তখন সেখানে যাইতে হইত[১]। কিন্তু প্রণামের সময় যখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত, আমরা তখন দাঁড়াইয়া থাকিতাম। আমরা প্রণাম করিলাম কি না, কেহই দেখিতে পাইত না।

যে শাস্ত্রে দেখিতাম পৌত্তলিকতার উপদেশ, সে শাস্ত্রে আমার আর শ্রদ্ধা থাকিত না। আমার তখন এই ভ্রম হইল যে, আমাদের সমুদায় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব।

আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশ ভাব, তখন হঠাৎ এক দিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্য বশতঃ তাহা ধরিলাম। কিন্তু

---

(১) দ্বারকানাথের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ৫ পরিশিষ্টের "বৈঠকখানা বাড়ী" শীর্ষক অংশ, এবং ১৩ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

তাহাতে যাহা লেখা আছে, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কের[১] কর্ম্ম সারিয়া শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেছি। তুমি ইহার মধ্যে এই পাতার শ্লোক গুলানের অর্থ করিয়া রাখ। কুঠী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে।" এই বলিয়া আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলাম।

ঐ সময়ে আমি ইউনিয়ান ব্যাঙ্কে কর্ম্ম করিতাম। আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর তাহার ধনরক্ষক; আমি তাঁহার সহকারী। ১০টা হইতে, যতক্ষণ না কাজ নিকাশ হয়, ততক্ষণ তথায় আমার থাকিতে হইত। ক্যাশ বুঝাইয়া দিতে রাত্রি দশটা বাজিয়া যাইত। কিন্তু সে দিন শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে পুঁথির পাতা বুঝিয়া লইতে হইবে, অতএব ক্যাশ বুঝাইয়া দিবার গৌণ আর সহ্য হইল না। আমি ছোট কাকাকে বলিয়া-কহিয়া দিন থাকিতে থাকিতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

আমি আমার বৈঠকখানার তেতালায়[২] তাড়াতাড়ি যাইয়াই শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "সেই ছাপার পাতাতে কি লেখা আছে, আমাকে বুঝাইয়া দাও।" তিনি বলিলেন, "আমি এত ক্ষণ এত চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ইংরাজ পণ্ডিতেরা তো ইংরাজি সকল গ্রন্থই বুঝিতে পারে। তবে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতেরা সকল সংস্কৃত গ্রন্থ বুঝিতে পারেন না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কে বুঝিতে পারে?" তিনি

(১) পরিশিষ্ট ১৪

(২) পরিশিষ্ট ৫।

বলিলেন, "এ তো সব ব্রহ্ম-সভার[১] কথা। ব্রহ্ম-সভার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ[২] বুঝিতে পারেন।" আমি বলিলাম, "তবে তাঁহাকে ডাক।" বিদ্যাবাগীশ খানিক পরেই আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন, "এ যে ঈশোপনিষৎ[৩],—

'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং।'

যখন বিদ্যাবাগীশের মুখ হইতে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং' ইহার অর্থ বুঝিলাম, তখন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া আমাকে অভিষিক্ত করিল। আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল,[৪] আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল। আমি ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিতে চাই; উপনিষদে কি পাইলাম? পাইলাম যে, "ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন কর।" ঈশ্বর দ্বারা সমুদায় জগৎকে আচ্ছাদন করিতে পারিলে আর অপবিত্রতা কোথায়? তাহা হইলে সকলই পবিত্র হয়, জগৎ মধুময় হয়। আমি যাহা চাই, তাহাই পাইলাম।

এমন আমার মনের কথা আর কোথাও হইতে শুনিতে পাই নাই। মানুষে কি এমন সায় দিতে পারে? সেই ঈশ্বরেরই

---

(১) ২৩ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) পরিশিষ্ট ১৫।

(৩) পাতাখানি রামমোহন রায় সম্পাদিত ঈশোপনিষদের ছিন্ন পত্র ছিল। রামমোহন রায়ের গ্রন্থসকল দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে সাদরে রক্ষিত হইত। এ শ্লোকটি ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্র।

(৪) ৪৫ পরিশিষ্টের "দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে বিলম্বের দুই কারণ" শীর্ষক অংশ দ্রষ্টব্য।

করুণা আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, তাই 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং' এই গূঢ় বাক্যের অর্থ বুঝিলাম। আহা! কি কথাই শুনিলাম, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', তিনি যাহা দান করিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর। তিনি কি দান করিয়াছেন? তিনি আপনাকেই দান করিয়াছেন। সেই পরম ধনকে উপভোগ কর। আর সকল ত্যাগ করিয়া সেই পরম ধনকে উপভোগ কর; আর সকল ত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাকে লইয়াই থাক। কেবল তাঁহাকে লইয়া থাকা মানুষের ভাগ্যে কি মহৎ কল্যাণ! আমি চিরদিন যাহা চাহিতেছি, ইহা তাহাই বলে।

আমার বিষাদের যে তীব্রতা, তাহা এই জন্য ছিল যে, পার্থিব ও স্বর্গীয় সকল প্রকার সুখ হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছিলাম। সংসারেও আমার কোন প্রকার সুখ ছিল না, এবং ঈশ্বরের আনন্দও ভোগ করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু যখন এই দৈববাণী আমাকে বলিল যে, সকল প্রকার সাংসারিক সুখ ভোগের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরকেই ভোগ কর, তখন, আমি যাহা চাহিতেছিলাম তাহা পাইয়া আনন্দে একেবারে নিমগ্ন হইলাম। এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ! সে ঋষি কি ধন্য, যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল! ঈশ্বরের উপরে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, আমি সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইলাম।* আহা, সে দিন আমার পক্ষে কি শুভ দিন, কি পবিত্র আনন্দের দিন!

উপনিষদের প্রতি কথা আমার জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিতে লাগিল। উপনিষদকে অবলম্বন করিয়া আমি দিন দিন আমার গম্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার নিকট সকল গূঢ় অর্থ ব্যক্ত হইতে লাগিল।

আমি বিদ্যাবাগীশের নিকট ক্রমে ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য উপনিষৎ পাঠ করি, এবং অন্যান্য পণ্ডিতের সাহায্যে অবশিষ্ট আর ছয় উপনিষৎ[১] পাঠ করি। প্রতিদিন যাহা পড়ি, তাহা অমনি কণ্ঠস্থ করিয়া তাহার পর দিন বিদ্যাবাগীশকে শুনাইয়া দেই। তিনি আমার বেদের উচ্চারণ শুনিয়া বলিতেন যে, "তুমি এ উচ্চারণ কার কাছে শিখিলে? আমরা তো এ প্রকার উচ্চারণ করিতে পারি না।" আমি বেদের উচ্চারণ একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট শিখি[২]।

যখন উপনিষদে আমার বিশেষ প্রবেশ হইল, এবং সত্যের আলোক পাইয়া যখন আমার জ্ঞান ক্রমে উজ্জ্বল হইতে লাগিল, তখন এই সত্যধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। প্রথমে[৩] আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতাদিগকে লইয়া একটি সভা সংস্থাপন করিবার ইচ্ছা করিলাম। আমাদের

---

(১) প্রশ্ন, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। সম্ভবতঃ ১৮৩৮ হইতে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ভিতরে একাদশ উপনিষদের প্রথম বার পাঠ শেষ হয়। দেবেন্দ্রনাথের উপনিষৎ-চর্চ্চার বিভিন্ন যুগ বিষয়ে পরিশিষ্ট ১৬ দ্রষ্টব্য।

(২) পরিশিষ্ট ২৭।

(৩) "প্রথমে" বলিবার অভিপ্রায় এই যে, এই সত্যধর্ম্ম প্রচার দেবেন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হইল, এবং তাঁহার আত্মজীবনীর অনেক অংশ এই লক্ষ্য সাধনের নানা প্রয়াসের বর্ণনাতেই পূর্ণ। যথা,—(১) "প্রথম", এই তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন; (২) ব্রাহ্মসমাজ পরিদর্শন ও তাহার ভার গ্রহণ (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ); (৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ও তাহাতে উপনিষৎ প্রকাশ (৭ম পরিচ্ছেদ); (৪) ব্রাহ্মদিগকে ধর্ম্মে দৃঢ় ও একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে (ক) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র, (খ) ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি, (গ) ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ও (ঘ) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা (৯ম, ১০ম, ২৩শ পরিচ্ছেদ)।

বাড়ীর পুষ্করিণীর[১] ধারে একটা ছোট কুঠরী চূণকাম করাইয়া পরিষ্কার করিয়া লইলাম। এদিকে দুর্গা পূজার কল্প আরম্ভ হইল; আমাদের বাটীর আর সকলে এই উৎসবে মাতিলেন। আমরা কি শূন্য-হৃদয় হইয়া থাকিব? আমরা সেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে আমাদের হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ করিয়া একটি সভা স্থাপন করিলাম।

আমরা সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পুষ্করিণীর ধারে সেই পরিষ্কৃত কুঠরীতে আসিয়া বসিলাম। আমি যেই সকলকে লইয়া সেখানে বসিলাম, অমনি যেন শ্রদ্ধা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল[২]। সকলের মুখের পানে তাকাইয়া দেখি, সকলের মুখেই শ্রদ্ধার রেখা। ঘরের মধ্যে পবিত্রতার ভাবে পূর্ণ। আমি ভক্তিভরে ঈশ্বরকে আহ্বান করিয়া কঠোপনিষদের এই শ্লোক[৩] ব্যাখ্যা করিলাম,—

"ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং,
প্রমাদ্যন্তং, বিত্তমোহেন মূঢ়ং।
অয়ং লোকো নাস্তি পর, ইতি মানী
পুনঃ পুন র্বশমাপদ্যতে মে।"

প্রমাদী ও ধনমদে মূঢ় নির্ব্বোধের নিকটে পরলোক সাধনের উপায় প্রকাশ পায় না; 'এই লোকই আছে, পরলোক নাই,' যাহারা এ প্রকার মনে করে, তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে (অর্থাৎ মৃত্যুর বশে) আইসে। আমার ব্যাখ্যান সকলেই পবিত্র ভাবে স্তব্ধভাবে শ্রবণ করিলেন। এই আমার প্রথম ব্যাখ্যান।

---

(১) পরিশিষ্ট ৫।
(২) ইহা কঠোপনিষদের ভাষা (কঠ. ১।২)।
(৩) কঠ. ২।৬।

ব্যাখ্যান শেষ হইয়া গেলে আমি প্রস্তাব করিলাম যে এই সভার নাম 'তত্ত্বরঞ্জিনী' হউক, এবং ইহা চিরস্থায়িনী হউক। ইহাতে সকলেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ এই সভার উদ্দেশ্য হইল। প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে সায়ংকালে এই সভার অধিবেশনের সময় স্থির হইল। দ্বিতীয় অধিবেশনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আহূত হইলেন, এবং তাঁহাকে এই সভার আচার্য্য-পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি এই সভার 'তত্ত্বরঞ্জিনী' নামের পরিবর্ত্তে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম রাখেন। এইরূপে ১৭৬১ শকে ২১শে আশ্বিন[১] রবিবার কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই 'তত্ত্ব-বোধিনী' সভা সংস্থাপিত হইল।

---

(১) ৬ই অক্টোবর, ১৮৩৯।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি; অক্ষয়কুমার দত্ত। সভার কার্য্যপ্রণালী (১৮৪০)। সভার দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে (১৮৪১) জাঁকজমক। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজ দেখিতে গমন (১৮৪২); ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ। মাসিক ব্রাহ্মসমাজ এবং ১১ই মাঘের সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তন। ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি।

১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; "বেদান্ত দর্শনের" সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না[১]।

প্রথম দিনে ইহার সভ্য দশ জন মাত্র ছিল। ক্রমশঃ ইহার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল[২]। অগ্রে ইহার অধিবেশন আমার বাড়ীর নীচেকার একতালার একটি প্রশস্ত ঘরে হইত; কিন্তু পরে ইহার জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীটেতে একটি বাড়ী ভাড়া করি; সেই বাড়ী বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অধিকারে আছে[৩]।

---

(১) দেবেন্দ্রনাথ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকেই বেদান্তদর্শনের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে আবার এই কথা আছে।

(২) পরিশিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য।

(৩) ৫৬নং সুকিয়া ষ্ট্রীট্ (লাহা বাবুদের বাড়ী)। এক সময়ে এই বাড়ীতে আত্মীয়-সভার অধিবেশন হইত। দেবেন্দ্রনাথ যখন লিখিতেছেন, তখন কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন।

এই সময়[১] অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয় বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।

সভার অধিবেশন মাসের প্রথম রবিবারে রাত্রিকালে হইত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ এই সভায় আচার্য্যের আসন গ্রহণ করিয়া উপদেশ দিতেন। তিনি এই শ্লোকটি প্রতিবারই পাঠ করিতেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং,
স্তুত্যা নির্ব্বচনীয়তা খিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া,
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং, জগদীশ, তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং[২] ॥"

হে অখিলগুরো! তুমি রূপবিবর্জ্জিত, অথচ ধ্যানের দ্বারা আমি তোমার রূপ যে বর্ণন করিয়াছি, এবং স্তুতির দ্বারা তোমার যে অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, ও তীর্থযাত্রাদির দ্বারা তোমার ব্যাপিত্বকে যে বিনাশ করিয়াছি,—হে জগদীশ! চিত্তবিকলতা হেতু আমি যে এই তিন দোষ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর।

এই সভাতে সকল সভ্যেরই বক্তৃতা করিবার অধিকার ছিল[৩]। তবে এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম এই ছিল, যিনি সকলের অগ্রে বক্তৃতা লিখিয়া সম্পাদকের হস্তে দিতেন, তিনিই বক্তৃতা পাঠ করিতে পাইতেন। এই নিয়ম থাকাতে কেহ কেহ সম্পাদকের শয্যার বালিশের নীচে বক্তৃতা রাখিয়া আসিতেন। অভিপ্রায়

---

(১) ১৮৩৯ সালের শেষভাগে অথবা ১৮৪০ সালের প্রথম ভাগে।

(২) ব্যাসকৃত প্রণব-প্রকল্পের শ্লোক। রামমোহন রায়ের 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' নামক গ্রন্থে ইহা উদ্ধৃত আছে।

(৩) "এক এক ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট মত বক্তৃতা পাঠ করিলে তাহার এবং অন্যান্য বিয়ের আলোচনা হইত" (ঈশান, ১৮)।

এই যে, সম্পাদক প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়াই তাঁহার বক্তৃতা পাইবেন।

তৃতীয় বৎসরে এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব অতি সমারোহপূর্ব্বক হইয়াছিল। এই তত্ত্ববোধিনী সভার দুই বৎসর চলিয়া গেল[১]; লোকের সংখ্যা আমার মনের মত হয় না; আর, একটা সভা যে হইয়াছে, তাহা ভাল প্রকাশও হয় না; ইহা ভাবিতে ভাবিতে, ক্রমে ক্রমে, ১৭৬৩ শকের ভাদ্র[২] কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী আসিল। এই সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এইবার একটা খুব জাঁকের সহিত সভা করিয়া সকলকে তাহা জানাইয়া দিতে আমার ইচ্ছা হইল। তখন সংবাদ-পত্রে বিজ্ঞাপন দিলে সংবাদ বড় প্রচার হইত না। অতএব আমি করিলাম কি, না, কলিকাতায় যত আফিস ও কার্য্যালয় আছে, সকল আফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারীর নামে নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়া পাঠাইয়া দিলাম। কর্ম্মচারীরা আফিসে আসিয়া দেখিল যে, তাহাদের প্রত্যেকের ডেক্‌সের উপর আপন আপন নামের এক এক খানা পত্র রহিয়াছে। খুলিয়া দেখে, তাহাতে 'তত্ত্ববোধিনী সভার' নিমন্ত্রণ। তাহারা কখনও তত্ত্ববোধিনী সভার নামও শুনে নাই!

আমরা এ দিকে সারাদিন ব্যস্ত। কেমন করিয়া সভার ঘর ভাল সাজান হইবে, কি করিয়া পাঠ ও বক্তৃতা হইবে, কে কি কাজ

(১) পরিশিষ্ট ১৭ দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮৪১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, বাংলা ৩০শে ভাদ্র, মঙ্গলবার। এই সাংবৎসরিক সভা তিথি (আশ্বিন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী) অনুসারেই করা হইয়াছিল; কিন্তু এ বৎসর ঐ তিথি বাংলা সৌর ভাদ্র মাসে পড়ে; তাই দেবেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ "ভাদ্র কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশী" বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

করিবেন, তাহারই উদ্যোগ। সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই আমরা আলো জ্বালিয়া, সভা সাজাইয়া, সব ঠিকঠাক করিয়া ফেলিলাম। আমার মনে ভয় হইতেছিল, এ নিমন্ত্রণে কি কেহ আসিবেন? দেখি যে, সন্ধ্যার পরেই লণ্ঠন আগে করিয়া এক একটি লোক আসিতেছেন। আমরা সকলে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া সভার সম্মুখের বাগানে, বেঞ্চের উপর বসাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে লোক আসিয়া বাগান ভরিয়া গেল। লোক দেখিয়া আমাদেরও উৎসাহ বাড়িতে লাগিল।

কেহ কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাঁহারা কি জন্যই বা আসিয়াছেন, এবং এখানে কি-ই বা হইবে। আমি ব্যগ্র হইয়া ঘড়ী খুলিয়া বারে বারে দেখিতেছি, আটটা বাজে কখন্। যেই আটটা বাজিল, অমনি ছাদের উপর হইতে শঙ্খ ঘণ্টা ও শিঙ্গা বাজিয়া উঠিল; আর অমনি, ঘরের যত গুলি দরজা ছিল, সকলই এক বারে এক সময়ে খুলিয়া গেল। লোকেরা সকলেই অবাক্ হইয়া উঠিল।

আমরা সকলকে আহ্বান করিয়া ঘরের মধ্যে বসাইলাম। সম্মুখেই বেদী। তাহার দুই পার্শ্বে দশ দশ জন করিয়া দুই শ্রেণীতে বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের গাত্রে লাল রঙের বনাত। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদীতে বসিলেন, দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণেরা একস্বরে বেদ পড়িতে লাগিলেন[১]। বেদ পাঠ শেষ হইতেই রাত্রি দশটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আমি উঠিয়া বক্তৃতা করিলাম। সেই বক্তৃতার মধ্যে এই কথা ছিল যে, "এইক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার আলোচনায় বিদ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার

(১) পরিশিষ্ট ২৭।

সন্দেহ নাই, এবং এতদ্দেশস্থ লোকের মনের অন্ধকারও অনেক দূরীকৃত হইয়াছে। এইক্ষণে মূর্খ লোকদিগের ন্যায় কাষ্ঠ লোষ্ট্রেতে ঈশ্বর-বুদ্ধি করিয়া তাহাতে পূজা করিতে তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। বেদান্তের প্রচার অভাবে, ঈশ্বর নিরাকার, চৈতন্য-স্বরূপ,[১] সর্ব্বগত, বাক্য মনের অতীত, ইহা যে আমাদের শাস্ত্রের মর্ম্ম, তাহা তাহারা জানিতে পারে না। সুতরাং আপনার ধর্ম্মে এ প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান না পাইয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের শাস্ত্রে তাহা অনুসন্ধান করিতে যায়। তাহাদিগের মনে এই দৃঢ় আছে যে, আমাদিগের শাস্ত্রে কেবল সাকার উপাসনা; অতএব এ প্রকার শাস্ত্র হইতে তাহাদিগের যে শাস্ত্র উত্তম বোধ হয়, সেই শাস্ত্র মান্য করে। কিন্তু যদি এই বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার থাকে, তবে আমাদিগের অন্য ধর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না। আমরা এই প্রকারে আমাদিগের হিন্দুধর্ম্ম রক্ষায় যত্ন পাইতেছি।” আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন; তাহার পর চন্দ্রনাথ রায়, তাহার পর উমেশচন্দ্র রায়, তৎপরে প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, তদনন্তর অক্ষয়কুমার দত্ত, পরিশেষে রমাপ্রসাদ রায়[২]। ইহাতেই রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এই সব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল। লোকগুলান্ হয়রান্! সকলেই আফিসের

(১) এই বক্তৃতা ১৮৪১ সালে হয়। ‘ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ’ এই মহাবাক্য কয়েক বৎসর পরে (১৮৫১ সালে) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক তাঁহার ‘বোধোদয়’ পুস্তকে গৃহীত হয়; তদবধি ইহা লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বালকবালিকার অন্তরে ঈশ্বর সম্বন্ধে বিমল ধারণার উদয় করিয়া আসিতেছে।

(২) সব বক্তৃতাগুলি প্রিয়. পরি. ২।৮৯—৯৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত আছে।

ফেরতা। হয়তো কেহ মুখ ধোয় নাই, জল খায় নাই, তথাপি আমার ভয়ে কেহ সভা ভঙ্গের আগে যাইতে পারিতেছে না। কে-ই বা কি বুঝিল, কে-ই বা কি শুনিল, কিছুই না! কিন্তু সভাটা ভারি জাঁকের সহিত শেষ হইল।

এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম সাম্বৎসরিক সভা, এবং এই আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার শেষ সাম্বৎসরিক সভা।

এই সাম্বৎসরিক সভা হইয়া যাইবার পরে ১৭৬৪ শকে[১] আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক মহাত্মা রামমোহন রায় ইহার ১১ বৎসর[২] পূর্ব্বে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল নগরে দেহ ত্যাগ করেন। আমি মনে করিলাম, যখন ব্রাহ্মসমাজ ব্রহ্মোপাসনার জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন ইহার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার যোগ দিলে আমাদের সংকল্প তো আরও অনায়াসে সিদ্ধ হইবে। এই মনে করিয়া আমি এক বুধবারে[৩] সেই সমাজ দেখিতে যাই। আমি গিয়া দেখি যে, সূর্য্য অস্ত হইবার পূর্ব্বে সমাজের পার্শ্বগৃহে একজন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ উপনিষৎ পাঠ করিতেছেন; সেখানে কেবল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, এবং আর দুই তিন জন ব্রাহ্মণ উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন; শূদ্র-

(১) ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে বহুদিন এই ভুল ধারণা ছিল যে, রাজা রাম-মোহন রায় ইংলণ্ডে যাইবার পর এক বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। 'পঞ্চ-বিংশতি' পুস্তকেও দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "১৭৫২ শকে তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করেন, এবং ১৭৫৩ শকে সেখানে ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার মৃত্যু হইয়া সমাধি হয়।" বস্তুতঃ রামমোহন রায়ের মৃত্যু ১৭৫৫ শকে ঘটে। সুতরাং এখানে "১১ বৎসর" ভুল; ৯ বৎসর হইবে।

(৩) পরিশিষ্ট ১৮।

দিগের সেখানে যাইবার অধিকার নাই[১]। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন সমাজের ঘরে প্রকাশ্যে বেদীতে বসিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিরই সমান অধিকার ছিল। দেখিলাম, লোকের সমাগম অতি অল্প। বেদীর পূর্ব্বদিকে ফরাস চাদর পাতা, তাহাতে পাঁচ ছয় জন উপাসক বসিয়া রহিয়াছে। আর বেদীর পশ্চিম দিকে কয়েকখানা চৌকী পাতা রহিয়াছে, তাহাতে দুই চারি জন আগন্তুক লোক। ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন উপনিষৎ ব্যাখ্যা করিলেন, এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয় বেদান্ত দর্শনের মীমাংসা[২] বুঝাইতে লাগিলেন। বেদীর সম্মুখে কৃষ্ণ ও বিষ্ণু[৩] এই দুই ভাই মিলিয়া একস্বরে ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হইল।

আমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ভার গ্রহণ করিলাম, এবং তত্ত্ববোধিনী সভাকে তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলাম[৪]। নির্দ্ধারিত হইল, তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধান করিবে। সেই অবধি তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক উপাসনা রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রাতঃকালে ব্রাহ্মসমাজের মাসিক উপাসনা ধার্য্য হইল, এবং ২১শে আশ্বিনের তত্ত্ববোধিনীর সাম্বৎ-সরিক সভা পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের গৃহ প্রতিষ্ঠার দিবস, ১১ মাঘে, সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ প্রবর্ত্তিত হইল। ১৭৫০ শকের

---

(১) পরিশিষ্ট ১৯।

(২) বেদান্ত-দর্শনকে উত্তর-মীমাংসাও বলা হয়, কারণ তাহার বিষয়, বৈদিক জ্ঞানকাণ্ড। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় জৈমিনি-রচিত মীমাংসাকে পূর্ব্ব-মীমাংসা বলা হয়।

(৩) কৃষ্ণপদ ও বিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী।

(৪) পরিশিষ্ট ২০।

ভাদ্র মাসে[১] যোড়াসাঁকোস্থ কমল বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়; এবং এই ভাদ্র মাসে তাহার যে সাম্বৎসরিক সমাজ হইত, তাহা আমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই, ১৭৫৫ শকে[২] উঠিয়া গিয়াছিল।

যখন আমরা ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করিলাম, তখন ইহার উন্নতির জন্য এই চিন্তা হইল, সমাজে অধিক লোক কি প্রকারে হইবে। ক্রমে আমাদের যত্নে ঈশ্বরের প্রসাদে লোক বাড়িতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঘরও বাড়িতে লাগিল। ইহাতেই আমাদের কত উৎসাহ! প্রথমে ইহা দুই তিন কুঠরীতে বিভক্ত ছিল; ক্রমে সেই সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই একটি প্রশস্ত ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। যতই ঘর প্রশস্ত হইতে লাগিল, ততই লোকের সমাগম দেখিয়া মনে করিলাম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি হইতেছে। ইহাতে মনে কত আনন্দ!

---

(১) ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র, বুধবার।

(২) ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে। যত দিন তিনি (এ দেশে কিংবা বিলাতে) জীবিত ছিলেন, ভাদ্র মাসেই ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক হইত। ১১ই মাঘকে রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক মনে করিতেন না; এখনও মনে করা ঠিক নহে। মাঘোৎসব ও ভাদ্রোৎসব এই দুইয়ের মধ্যে ভাদ্রোৎসবই প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক: তাহাই রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, ও প্রাচীনতর। মাঘ মাসে 'সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ' করা দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সাল হইতে আরম্ভ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

উপনিষদে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। ঈশ্বর পিতা পাতা বন্ধু; তিনিই পরম লভনীয়; তিনি আত্মারও জন্মদাতা। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা প্রকাশ (ভাদ্র, ১৮৪৩); উদ্দেশ্য,—সত্য ধর্ম্ম প্রচার, ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশ-প্রদত্ত ব্যাখ্যানসকল ও রামমোহন রায়ের গ্রন্থসকল মুদ্রিত করা, লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশ, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সকল সভ্যকে সভার সংবাদ প্রদান। অক্ষয়কুমার দত্তকে সম্পাদক নিযুক্ত করা; তাঁহার রচনাসৌষ্ঠব; তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতপার্থক্য। তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা দ্বারা বঙ্গদেশের একটি অভাব পূরণ। তত্ত্ববোধিনীতে দেবেন্দ্রনাথ-রচিত বৃত্তি ও অনুবাদ সমেত উপনিষৎ প্রকাশ (১৮৪৩)।

এত সাধ্য সাধনার পর আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব যাহা কিছু আবির্ভূত হইল, উপনিষদে দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি; এবং উপনিষদের অর্থ আলোচনা করিয়া যাহা কিছু বুঝিতে পারি, দেখি তাহারই প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ে। অতএব উপনিষদের উপরে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।

আমার হৃদয় বলিতেছে যে, তিনি আমার পিতা, পাতা, বন্ধু। উপনিষদে দেখি যে তাহারই অনুবাদ, "স নো বন্ধুর্জ্জনিতা স বিধাতা"[১]।

যদি তাঁহাকে না পাই, তবে পুত্র, বিত্ত, মান-মর্য্যাদা আমার নিকটে কিছুই নহে; পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, আর-আর সকল

(১) মহানা. ২।৫; যজু. বা. মা. ৩২।১০ হইতে তথায় গৃহীত।

হইতে, তিনি প্রিয়। ইহার অনুবাদ উপনিষদে দেখি, "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ"[১]।

আমি ধনবান্ হইতে চাই না, মানবান্ হইতে চাই না। তবে আমি কি চাই? উপনিষদ্ বলিয়া দিলেন যে, "ব্রহ্মেত্যুপাসীত, ব্রহ্মবান্ ভবতি",[২] যে ব্রহ্মকে উপাসনা করে সে ব্রহ্মবান্ হয়। আমি বলিলাম, "ঠিক্, ঠিক! ধনকে যে উপাসনা করে সে 'ধনবান্' হয়, মানকে যে উপাসনা করে সে 'মানবান্' হয়, ব্রহ্মকে যে উপাসনা করে সে 'ব্রহ্মবান্' হয়"।

উপনিষদে যখন দেখিলাম, "য আত্মদা বলদা"[৩], তখন আমার প্রাণের কথা পাইলাম; তিনি কেবল আমাদের প্রাণ দিয়াছেন তাহা নহে, তিনি আমাদের আত্মাও দিয়াছেন; তিনি কেবল আমাদের প্রাণের প্রাণ নহেন, তিনি আমাদের আত্মারও আত্মা। তিনি আপনার আত্মা হইতে আমাদিগের আত্মাকে প্রসব করিয়াছেন। সেই এক ধ্রুব নির্ব্বিকার অনন্ত জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা, স্ব-স্বরূপে নিত্য অবস্থিতি করিয়া, অসংখ্য পরিমিত আত্মা-সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই কথা আমি উপনিষদে স্পষ্টই পাইলাম, "একং রূপং বহুধা যঃ করোতি"[৪], যিনি এক রূপকে বহু প্রকার করেন[৫]।

---

(১) বৃহ. ১।৪।৮। (২) তৈত্তি. ৩।১০। (৩) নৃ. পূ. ২।৪; ঋ. ১০।১২১।২ হইতে তথায় গৃহীত।

(৪) কঠ. ৫।১২। (৫) এখানে 'প্রসব করিয়াছেন,' 'স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া' এবং 'সৃষ্টি করিয়াছেন', এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। 'ব্রহ্ম আপনাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন', 'জগৎ ব্রহ্মের বিকার', প্রভৃতি মত যে দেবেন্দ্রনাথ মানেন না, এবং 'ব্রহ্ম আপন ইচ্ছাতে জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন' এই মতই যে তিনি মানেন, ইহা স্পষ্ট করিবার জন্য এই ভাষা

তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, তাহার ফল,—আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র;—এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।

এই লক্ষ্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য একটি যন্ত্রালয়, একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে[১] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার

ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে 'বহুধা যঃ করোতি' এই বাক্যের 'করোতি' শব্দটি ঝোঁক দিয়া পড়িতে হইবে, এবং 'আপন ইচ্ছায় বহু প্রকার করেন,' এরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

(১) ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে; ভাদ্রমাসে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, তাঁহার রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও মধুর; আর দোষ এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জূট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃ-সন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইহাঁর দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।

ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম[১], এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর, তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ;—আকাশ পাতাল প্রভেদ!

ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্ব্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে[২]। বেদ বেদান্ত ও পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচার

---

(১) "এক এক দিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাবসকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতেন", (রাজ. ৬৩)। (২) পরিশিষ্ট ২১।

করা আমার যে মুখ্য সঙ্কল্প ছিল, তাহা এই পত্রিকা হওয়াতে সুসিদ্ধ হইল।

আমরা ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্‌কেই বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম। বেদান্তদর্শনকে আমরা শ্রদ্ধা করিতাম না; যে-হেতুক, তাহাতে শঙ্করাচার্য্য জীব আর ব্রহ্মকে এক করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন[১]। আমরা চাই ঈশ্বরকে উপাসনা করিতে। যদি উপাস্য উপাসক এক হইয়া যায়, তবে কে কাহাকে উপাসনা করিবে? অতএব বেদান্তদর্শনের মতে আমরা মত দিতে পারিলাম না। আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদেরও বিরোধী। শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে লইতে পারিলাম না; যে-হেতুক, তিনি অদ্বৈত-বাদের পক্ষে টানিয়া তাহার সমুদায় অর্থ করিয়াছেন। এই জন্যই ভাষ্যের পরিবর্ত্তে আমার আবার নূতন করিয়া উপনিষদের বৃত্তি লিখিতে হইয়াছিল। যাহাতে ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ রক্ষিত হয়, আমি ইহার সেইরূপ সংস্কৃত ভাষাতে বৃত্তি করিয়া, ইহার অনুবাদ বাঙ্গালাতে লিখিতে লাগিলাম; এবং তাহা ক্রমে ক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ হইতে লাগিল।

---

(১) ৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার যন্ত্রালয় (১৮৪৩)। বেলগাছিয়ার বাগানের প্রমোদ-সভার কাজে দেবেন্দ্রনাথের অবহেলা (১৮৪০)। বিদ্যাবাগীশের প্রতি দ্বারকানাথের বিরক্তি; কারণ, দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া খারাপ হইতেছেন। "আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে?" দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রাহ্ম-সমাজে প্রকাশ্যে বেদ পাঠের ব্যবস্থা, ও অবতারবাদ বর্ণনা নিবারণ। বেদশিক্ষার জন্য ছাত্র নির্ব্বাচন ও ছাত্রবৃত্তি দান (১৮৪৩)।

প্রথমে কলিকাতাস্থ হেদুয়ার একটি বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভার যন্ত্রালয় হয়। যে হেদুয়াতে রামমোহন রায়ের স্কুলে আমি পড়িতাম, এ, হেদুয়ার সেই বাড়ী। এই যন্ত্রালয়েই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আসিয়া আমাকে উপনিষৎ ও বেদান্তদর্শন পড়াইতেন।

আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না; যে-হেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে তার বিষয়-বুদ্ধি অল্প,—এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে কিছুই মনোযোগ দেয় না[১]।"

---

(১) এই বিরক্তি প্রকাশ ১৮৪৩ সালে ঘটিয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়াই পড়াইতেন। ২২ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আমার পিতার বিরক্ত হইবারও একটা হেতু ছিল। যখন এখানে গবর্ণর জেনারল্ লর্ড অক্‌লণ্ড ছিলেন[১], তখন আমাদের বেলগাছিয়ার বাগানে[২] অসামান্য সমারোহে গবর্ণর জেনারলের ভগিনী মিস্ ইডেন প্রভৃতি অতি প্রধান প্রধান বিবি ও সাহেব-দিগের এক ভোজ হয়। রূপে, গুণে, পদে, সৌন্দর্য্যে, নৃত্যে, মদ্যে, আলোকে আলোকে, বাগান একেবারে ইন্দ্রপুরী হইয়া গিয়াছিল। এই ইংরাজদের মহা ভোজ দেখিয়া কোন কোন বিখ্যাত বাঙ্গালীরা বলিয়াছিলেন যে, "ইনি কেবল সাহেবদের লইয়া আমোদ করেন, বাঙ্গালীদের ডাকেন না।" এই কথা আমার পিতার কর্ণগোচর হইল। অতএব ইহার পরে তিনি এক দিন ঐ বাগানে সমস্ত প্রধান প্রধান বাঙ্গালীদের লইয়া বাইনাচ ও গান বাজনা দিয়া একটা জমকাল মজলিস্ করিলেন। সেদিন তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করা ও পরিতোষণ করা আমার একটি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে সে দিন আমাদের তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনের দিন পড়িয়া গিয়াছিল ; আমি সেই সভা লইয়া ব্যস্ত ও উৎসাহী,—আমরা সেই দিন ঈশ্বরের উপাসনা করিব। অতএব, এই গুরুতর কর্ত্তব্য ছাড়িয়া আমি আর বাগানের মজলিসে যাইতে পারিলাম না ; পিতার শাসনে ও ভয়ে এক বার তাড়াতাড়ি করিয়া সেই বিলাসভূমি ঘুরিয়া, চলিয়া আসিলাম। এই ঘটনাতে আমার মনের ঔদাস্য তাঁহার নিকটে বিশেষ প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই অবধি তিনি সতর্ক হইলেন যে, আমি বেদান্ত পড়িয়া, ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া, না খারাপ হই। তাঁহার মনের নিতান্ত অভিলাষ যে, আমি

(১) ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। (২) পরিশিষ্ট ৫।

তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া পদ ও মান মর্য্যাদাতে সকলের শ্রেষ্ঠ ও যশস্বী হই। কিন্তু তিনি আমার মনে তাহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইয়া নিতান্ত দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।

তবুও তো তিনি আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারেন নাই! তখন আমার হৃদয় যে বলিতেছে 'তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ', তখন যে আমি উপনিষদে এই কথা পড়িয়াছি যে 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ[১]',—আর কি কেহ বিষয়েতে আমাকে ডুবাইতে পারে? আর কি কেহ আমাকে ঈশ্বরের নিকট হইতে দূরে লইয়া যাইতে পারে? বিদ্যাবাগীশ ভয় পাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "কর্ত্তার মত নাই, অতএব আমি আর তোমাকে পড়াইতে পারিব না"। এই জন্যই আমি বাড়ীতে তাঁহাকে আসিতে বারণ করিয়া হেদুয়াতে যন্ত্রালয়ে যাইয়া আমাকে পড়াইতে বলিয়াছিলাম। তিনিও তাই করিতেন[২]।

ব্রাহ্মসমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই[৩], তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত[৪]। যখন ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা,—যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আবার এক দিন দেখি যে, সেই ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যা-

(১) কঠ. ১২৭।

(২) পরিশিষ্ট ২২।

(৩) ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

(৪) ৭১ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট ১৯ দ্রষ্টব্য।

বাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।

তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে, এমন সকল সুবিজ্ঞ লোকের নিতান্ত অভাব ছিল। অতএব, শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন বিদ্যা-বাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র এবং তারকনাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই দুই জনকেই খুব ভাল বাসিতাম। আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাঁহাকে আদরের সহিত ‘সুকেশা” বলিয়া ডাকিতাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

এখনও ব্রাহ্মসমাজের কেহ কোন একটা ধর্ম্মভাবে আবদ্ধ নাই। পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া ও একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া 'ব্রাহ্ম' হইবার আবশ্যকতা। বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা; তাহাতে রামমোহন রায়ের অনুসরণে গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার প্রতিজ্ঞা। ৭ই পৌষ (১৮৪৩), ২০ জন সঙ্গী সহ দেবেন্দ্রনাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন; বিদ্যাবাগীশের ভাবাবেগ। দুই বৎসর মধ্যে ৫০০ ব্রাহ্ম হওয়া। ১৮৪৫ সালের ডিসেম্বরে গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদের মেলা ও উৎসব।

এক দিন[1] যন্ত্রালয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের কেহ কোন একটা ধর্ম্মভাবে বদ্ধ নাই। সমাজে জোয়ার ভাঁটার ন্যায় কত লোক আসিতেছে, চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কেহই এক ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত নাই। অতএব যখন সমাজে লোকের সমাগম বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন মনে হইল যে, লোক বাছা আবশ্যক। কেহ বা যথার্থ উপাসনার জন্য আগমন করে, কেহ বা লক্ষ্যশূন্য হইয়া আইসে; কাহাকে আমরা ব্রহ্মোপাসক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি? এই ভাবিয়া স্থির করিলাম, যাঁহারা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনায় ব্রতী হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্ম হইবেন। যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে, ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে,

---

(১) ১৮৪৩ সালের শেষ ভাগে।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়[১]।

কোন কার্য্যই বিধিপূর্ব্বক না করিলে তাহার কোন ফল হয় না[২]। এই জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে বিধিপূর্ব্বক গৃহীত হয়, যাহাতে পৌত্তলিকতার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহার উদ্দেশে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রহণের একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলাম। তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার কথা ছিল। রামমোহন রায়ের গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা-বিধান[৩] দেখিয়াই আমার মনে এইটি উদ্দীপিত হয়। সেই ব্রহ্মোপাসনা-বিধানে আমি এই আশা পাইয়াছিলাম,—

"ওঙ্কারপূর্ব্বিকা স্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়ো ঽব্যয়াঃ,
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী, বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং।
যোঽধীতে ঽহন্যহন্যেতান্ ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ,
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি[৪]—

প্রণবপূর্ব্বক তিন মহাব্যাহৃতি, অর্থাৎ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ, আর ত্রিপাদ গায়ত্রী[৫], এই তিন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বার হইয়াছেন। যে, তিন বৎসর প্রতিদিন নিরালস্য হইয়া প্রণব ব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রীমন্ত্র

---

(১) পরিশিষ্ট ২৩। (২) পরিশিষ্ট ২৭।

(৩) রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ১৮২৭ সালে রচিত 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনা-বিধানম্' নামক ক্ষুদ্র পুস্তক। ইহাতে নানা শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, বেদপাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রীজপের দ্বারাই ব্রহ্মোপাসনা হয়। ৩১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(৪) মনু. ২।৮১, ৮২ হইতে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকের শেষ চরণটি দেবেন্দ্রনাথ পরিত্যাগ করিয়াছেন ; তাহা এই—"বায়ুভূতঃ খ-মূর্ত্তিমান্", অর্থাৎ (ঐরূপে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিতে করিতে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া সে) বায়ুবৎ কামচারী এবং আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপী হইয়া যায়।

(৫) পরিশিষ্ট ৩০।

জপ করে, সে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।"—ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার আর একটি কথা ছিল।

১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে[১] আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদ পাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল; অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব। "নিশ্চয় অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে[২]"। এই আশা উৎসাহে পূর্ণ হইয়া বিদ্যাবাগীশের সম্মুখে আমি বিনীত ভাবে দাঁড়াইয়া একটি বক্তৃতা[৩] করিলাম। "অদ্য এই শুভক্ষণে এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আমরা সকলে আপনার নিকট উপনীত

---

(১) ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার; অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় অনুষ্ঠানটি হয়।

(২) কালীনাথ রায় রচিত "চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিয়া ওরে মন" শীর্ষক সঙ্গীতের এক পংক্তি। এটি রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের ১১৫ সংখ্যক সঙ্গীত। মূলে আছে "নিশ্চিত অমৃতলাভ সে ফল ফলিলে।"

(৩) প্রকাশ্য স্থানে যাহা কিছু বলা হইত,—তাহা নিবেদন, উপদেশ, ব্যাখ্যান, কি বিচার-বিতর্ক; যাহাই হউক,—সে সকলকেই সে-যুগে "বক্তৃতা" বলা হইত।

হইয়াছি। যাহাতে পরিমিত দেবতার উপাসনা হইতে বিরত হইয়া এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারি, যাহাতে সৎকর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি হয়, এবং পাপমোহে মুগ্ধ না হই, এইরূপ উপদেশ দিয়া আমাদের সকলকে মুক্তির পথে উন্মুখ করুন”। আমার এই বক্তৃতা শুনিয়া ও আমার হৃদয়ের একাগ্রতা দেখিয়া তিনি অশ্রুপাত করিলেন, এবং বলিলেন যে, “রামমোহন রায়ের এইরূপ উদ্দেশ্য ছিল[১]; কিন্তু তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। এত দিন পরে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল।”

প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য; পরে, আমি। তাহার পরে পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায়, প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন[২]।

তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই এক দিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের এই আর এক দিন! ১৭৬১ শক[৩] হইতে ক্রমে ক্রমে আমরা এত দূর অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?

---

(১) পরিশিষ্ট ২৩।
(২) পরিশিষ্ট ২৬। (৩) ১৮৩৯

ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার[১]। পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ[২]। সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।

১৭৬৭ শকের পৌষ মাসের মধ্যে ৫০০ জন প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন[৩]। তখন ব্রাহ্মের সহিত ব্রাহ্মের আশ্চর্য্য হৃদয়ের মিল ছিল। সহোদর ভাইয়ে ভাইয়েও এমন মিল দেখা যায় না। যখন ব্রাহ্মদের মধ্যে পরস্পর এমন সৌহৃদ্য দেখিলাম, তখন আমার মনে বড়ই আহ্লাদ হইল। আমি মনে করিলাম যে, নগরের বাহিরে প্রশস্ত ক্ষেত্রে ইহাঁদের প্রতি পৌষ মাসে একটা মেলা হইলে ভাল হয়। সেখানে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, সদ্ভাব বৃদ্ধি, ও ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হইয়া সকলের উন্নতি হইতে থাকিবে। আমি এই উদ্দেশে ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ[৪] পলতার পরপারে আমার গোরিটির বাগানে সকলকে নিমন্ত্রণ করি। ৮।৯টা বোট করিয়া সকল ব্রাহ্মকে কলিকাতা হইতে আমি ঐ বাগানে লইয়া যাই। ইহাতে তাঁহাদের সদ্ভাব, ও মনের প্রীতি, ও উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত হইয়া বাগানে ব্রাহ্মদের একটি মহোৎসব হইয়াছিল। প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই

---

(১) পরিশিষ্ট ২৪। (২) পরিশিষ্ট ২৩। (৩) প্রধানতঃ লালা হাজারী লালের (পরিশিষ্ট ৩৮) চেষ্টায়। ১৭৬৭ শকের পৌষ=১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর। এখানে ও পরবর্ত্তী কয়েক পরিচ্ছেদে ঘটনাসকল সময় অনুসারে সজ্জিত হয় নাই। পাঠক সময়-সূচী দেখিয়া লইবেন।

(৪) ১৮৪৫, ২০ ডিসেম্বর, শনিবার।

আমরা ব্রহ্মের জয়ধ্বনি আরম্ভ করিলাম, ফলফুলে শোভিত বৃক্ষচ্ছায়াতে বসিয়া মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত ও পবিত্র হইলাম[১]।

---

(১) পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে ইহার পরে আরও কয়েক পংক্তি ছিল,—("উপাসনা ভঙ্গ হইলে……উদ্যত হইয়াছিলেন"); তাহাতে বর্ণিত ঘটনাটি এই উৎসবেই ঘটিয়াছিল বলিয়া ভ্রম করিয়া দেবেন্দ্রনাথ তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ১৮৫৪ সালের ১লা জানুয়ারীর উৎসবের ঘটনা। এই দ্বিতীয় উৎসবের কোনও উল্লেখ আত্মজীবনীতে নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে ঐ কয় পংক্তি এই পরিচ্ছেদের শেষভাগ হইতে উনত্রিংশ পরিচ্ছেদের শেষভাগে স্থানান্তরিত হইল; এবং উহাতে বর্ণিত ঘটনাটি বুঝিবার সহায়তার জন্য, দেবেন্দ্রনাথের একখানি পত্র হইতে উক্ত দ্বিতীয় উৎসবের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ তথায় স্মল পাইকা অক্ষরে উদ্ধৃত হইল। এ বিষয়ে ৫৩ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দশম পরিচ্ছেদ[১]।

গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা সর্ব্বসাধারণের উপযোগী নয়, ইহা অনুভব করিয়া নূতন ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালী রচনা (১৮৪৪)। ব্যক্তিগত উপাসনায়, ব্রহ্মে আত্মা সমাধানের জন্য দুইটি মহাবাক্যের অবলম্বন,— 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' ও 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি'। সামাজিক উপাসনায়, (১) সমাধানের জন্য ঐ দুই মহাবাক্য, ও আর তিনটি মন্ত্র; (২) পরমেশ্বরের স্তোত্র। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের স্তোত্রটি শ্যামাচরণ তর্কবাগীশের সাহায্যে পাওয়া ও সংশোধন করা; (৩) প্রার্থনা।— এই উপাসনাপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হওয়া (১৮৪৫)।

আমি প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়ের উপদেশ-মত কেবল একমাত্র গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারাই ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন[২]; সে কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইল। দেখিলাম যে, সাধারণের পক্ষে এ মন্ত্র বড় কঠিন হইয়া উঠে। ইহাদ্বারা উপাসনা করিতে তাহাদের রুচি হয় না। গায়ত্রী মন্ত্র আয়ত্ত করিয়া, তাহার অর্থ বুঝিয়া, ব্রহ্মের উপাসনা করা অনেক সাধনা সাপেক্ষ; "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে এ মন্ত্রে সিদ্ধ হওয়া যায় না।

কিন্তু এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও তন্নিষ্ঠ ব্যক্তি পাওয়া অতি দুর্লভ; "সহস্রেষু কশ্চিদেব[৩]" ভবতি,—সহস্রের মধ্যে যদি কেহ এক জন হয়। আমি চাই যে, আপামর সাধারণ সকলে ব্রহ্মোপাসনা

---

(১) ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৯ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচী ২৮ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এই পরিচ্ছেদ পড়িবার পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া লইলে ভাল হয়। (২) ৮৩ পৃষ্ঠা। (৩) গীতার (৭।৩) ভাষ্য।

করিবে। অতএব আমি স্থির করিলাম, যাহারা গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারে, তাহারা করুক ; যাহারা তাহা না পারে, তাহারা যে কোন সহজ উপায়ে ঈশ্বরে আত্মা সমাধান করিতে পারে, তাহাই অবলম্বন করুক[১]। অতএব প্রতিজ্ঞাতে,[২] "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব" এই কথার পরিবর্ত্তে এই হইল যে, "প্রতি দিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব"।

কিন্তু পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতে গেলে একটা শব্দের অবলম্বন অতি প্রশস্ত উপায়[৩]। সে শব্দ প্রাচীন ও প্রচলিত, সহজ ও সুবোধ্য, হইলে, তাহা উপাসকের পক্ষে আশু উপকারী হয়। অতএব আমি বহু অনুসন্ধানে উপনিষদে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মোপাসনার উপযোগী এই ছুইটি মহাবাক্য[৪] লাভ করিয়া অতীব হৃষ্ট হইলাম,—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি"। ইহাতে আমার মানস পূর্ণ ও যত্ন সফল হইয়াছে; যে-হেতুক, এখন দেখিতেছি যে, সকল ব্রাহ্মই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন।

---

(১) দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে কয়েক বারে ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীর অনেক সংস্কার সাধন করেন। ২৯ পরিশিষ্টে তাহার সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইল। (২) অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাতে। এই প্রতিজ্ঞা-বাক্যের ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন বিষয়ে ২৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। (৩) পরিশিষ্ট ৩১। (৪) তৈত্তি. ২।১, ও মুণ্ড. ২।২।৭ হইতে। এই দুই বাক্য অবলম্বন করিয়া কি ভাবে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা আত্ম-জীবনীর বিংশ পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

প্রতি ব্রাহ্মের একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিবার পক্ষে এই দুই বাক্যই যথেষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনার জন্যও একটি প্রশস্ত উপাসনাপ্রণালী আবশ্যক। এই উদ্দেশে আমি এই দুই মহাবাক্য প্রথমে সংস্থাপন করিয়া, তাহার সহিত উপনিষৎ হইতে আর তিনটি শ্লোক যোগ করিয়া দিলাম।

প্রথম শ্লোক,—

"স পর্য্যগা চ্ছুক্র মকায় মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধ মপাপবিদ্ধম্,
কবি র্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতো হর্থান্ ব্যদধা চ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ[১]।"

তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়ব, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা; তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ এবং স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগকে যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

এই সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, নিরাকার পরমেশ্বর এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, উপাসনার সময় ইহা মনন ও ধারণ করিবার জন্য, পরে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"এতস্মা জ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ,
খং বায়ু র্জ্যোতি রাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী"[২]।

ইহাঁ হইতে প্রাণ, মন, ও সমুদায় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী, উৎপন্ন হয়।

তিনি সকলের আশ্রয়, এবং অদ্যাপি তাঁহারই শাসনে জগৎ-

(১) ঈশা. ৮। (২) মুণ্ড. ২।১।৩।

সংসার চলিতেছে, ইহা চিন্তা করিবার জন্য, পরে এই তৃতীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইল,—

"ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যু র্ধাবতি পঞ্চমঃ"[১]।

ইহাঁর ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহাঁর ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইহাঁর ভয়ে মেঘ, বায়ু এবং মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

সকলের আশ্রয়, মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের স্তোত্র পাঠ করিবার জন্য সংশোধন করিয়া তন্ত্র হইতে এই শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করিলাম,—

"ওঁ নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাং।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাং॥
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো,
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥"

(১) কঠ. ৬।৩।

তুমি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, এবং জ্ঞান-স্বরূপ ও সকলের আশ্রয়, তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্তিদাতা, অদ্বিতীয়, নিত্য, ও সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্ম, তোমাকে নমস্কার। তুমিই সকলের আশ্রয়স্থান, তুমিই কেবল বরণীয়, তুমিই এক এই জগতের পালক ও স্বপ্রকাশ; তুমিই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ. নিশ্চল, ও দ্বিধাশূন্য। তুমিই সকল ভয়ের ভয় ও ভয়ানকের ভয়ানক; তুমিই প্রাণীগণের গতি ও পাবনের পাবন; তুমিই মহোচ্চ পদ-সকলের নিয়ন্তা, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং রক্ষকদিগের রক্ষক। আমরা তোমাকে স্মরণ করি, আমরা তোমাকে ভজনা করি, তুমি জগতের সাক্ষী, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। সত্যস্বরূপ, আশ্রয়স্বরূপ, অবলম্বরহিত, সংসার-সাগরের তরণী,অদ্বিতীয় ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই।

শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশের তান্ত্রিক কুলে জন্ম। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চূড়ামণি ঘোরতর তান্ত্রিক ছিলেন; সুতরাং তত্ত্ববাগীশের তন্ত্রশাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্রহ্মোপাসনা-প্রণালীতে উপনিষৎ হইতে 'সপর্য্যগাদ্'-আদি তিনটি মন্ত্র যোজনা করিয়া, তাহার পর তাহাতে একটি হৃদয়গ্রাহী ব্রহ্মস্তোত্র সন্নিবেশ করিবার জন্য, আমি বেদের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহার মধ্যে আমার মনের মতন কোন স্তোত্র পাইলাম না। আমি ইহাতে অতিশয় চিন্তিত ও আকুলিত হইলাম। তত্ত্ববাগীশ আমার চিন্তার বিষয় জানিয়া বলিলেন যে, "তন্ত্রের মধ্যে কিন্তু একটি সুন্দর ব্রহ্মস্তোত্র আছে।" আমি বলিলাম, "সেটি কি?" তখন তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্র[১] হইতে সেই স্তোত্র পাঠ করিলেন।

---

(১) তৃতীয় উল্লাসের ৫৯—৬৩ শ্লোক। রামমোহন রায় তাঁহার 'ব্রহ্মোপাসনা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এই স্তোত্রটি উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেই পুস্তিকা তখনও দেখেন নাই বলিয়া বোধ হয়।

তাহা শুনিয়া আমি আহ্লাদিত হইলাম। কিন্তু তাহাতে অদ্বৈত-বাদ আছে বলিয়া তাহা আমি সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। অতএব তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপযোগী করিয়া সংশোধন করিয়া লইলাম।

এই স্তোত্র পঞ্চ রত্নে বিভক্ত। তাহার প্রথম রত্নের প্রথম চরণে আছে, "নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়। নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়"। আমি সংশোধন করিয়া করিলাম, "নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়। নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়"। ইহার তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে আছে, "নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়"। আমি সংশোধন করিলাম, "নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়। নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়"। দ্বিতীয় রত্নের দ্বিতীয় চরণে, "ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপং" আছে। আমি সংশোধন করিলাম, "ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশং"। তৃতীয় রত্নের চতুর্থ চরণে,"রক্ষকং রক্ষকাণাং" শব্দের স্থানে "রক্ষণং রক্ষণানাং" করিলাম। ইহার চতুর্থ রত্ন সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিলাম। পঞ্চম রত্নের প্রথম চরণে "ত্বদেকং স্মরাম-স্ত্বদেকং জপামঃ" আছে। আমি সংশোধন করিলাম, "বয়স্ত্বাং স্মরামো বয়স্ত্বাস্তুজামঃ"। তাহার পরের চরণের "ত্বদেকং" শব্দের স্থানে "বয়স্ত্বাং" শব্দ বসাইয়া দিলাম।

সংশোধনান্তর পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, ইহা বড়ই সুন্দর হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে ঈশ্বর বিশ্বস্রষ্টা, তিনি বিশ্বরূপ নহেন। অতএব, প্রথম চরণে বলিলাম, তিনি সৎস্বরূপ ও জগতের কারণ, ও দ্বিতীয় চরণে বলিলাম, তিনি জ্ঞানস্বরূপ ও সকলের আশ্রয়। তাহার পরে, "নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়, নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায়," যিনি এই জগতের কারণ, যিনি জগতের আশ্রয়,

তিনি আমাদের মুক্তিদাতা, তিনি ব্রহ্ম, সর্ব্বদেশব্যাপী, ও কালের অতীত, নিত্য।

তন্ত্রোক্ত এই স্তোত্র সংশোধন ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদে আমি তত্ত্ববাগীশের বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি, ইহার জন্য আমি এখনো তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।

পরে আমি একটি প্রার্থনা রচনা করিয়া উপাসনাপ্রণালীর সর্ব্বশেষে তাহা সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম।—"হে পরমাত্মন্! মোহ-কৃত পাপ হইতে মুক্ত করিয়া এবং দুর্ম্মতি হইতে বিরত রাখিয়া তোমার নিয়মিত ধর্ম্মপালনে আমাদিগকে যত্নশীল কর, এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক অহরহ তোমার অপার মহিমা এবং পরম মঙ্গলস্বরূপ চিন্তনে উৎসাহযুক্ত কর, যাহাতে ক্রমে তোমার সহিত নিত্য-সহবাস-জনিত ভূমানন্দ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি"।

১৭৬৭ শকে[১] ব্রাহ্মসমাজে এই উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তখন স্তোত্র পাঠের সময় তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ ব্যবহৃত হইত না। ১৭৭০ শকের[২] পরে স্তোত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়।

এই উপাসনাপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে, সেখানে কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বক্তৃতা পাঠ, এবং ব্রহ্মসঙ্গীত হইত।

---

(১) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ। (২) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফলে জীবনে গভীর হইতে গভীরতর কৃতার্থতা লাভের সাক্ষ্যদান। (১) বুদ্ধির সিদ্ধান্তে যে ঈশ্বরকে জানা হইয়াছিল, উপনিষদের সাহায্যে তাঁহাকে উজ্জ্বলতর রূপে অনুভব করিয়া কৃতার্থতা। (২) আমার ভক্তিবৃত্তি ব্যর্থ হইবে না, আমার উপাস্যকে আমি চিনিলাম, জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিয়া আমিও তাঁহার পূজা করিতে পাইলাম, এই কৃতার্থতা। (৩) আরও গভীর ও অপ্রত্যাশিত কৃতার্থতা: ঈশ্বরই আমার বুদ্ধিবৃত্তি সকলের প্রেরণকর্ত্তা, তিনিই আমার চালক, এই অনুভূতি, ও তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ; গায়ত্রীর অর্থে প্রবেশ করিয়া এই অমূল্য উপলব্ধির উদয়। অতঃপর ঈশ্বরের আদেশ বুঝিবার ও পালন করিবার জন্য নিরন্তর যত্ন। তাঁহার রুদ্রমুখ ও প্রসন্ন মুখ, দণ্ড ও পুরস্কার। (১৮৪৪, ১৮৪৫)।

আমি পূর্ব্বে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর-প্রসাদে যে সত্যে উপনীত হইয়াছিলাম[১], সেই সত্যকে জাজ্বল্যতররূপে উপনিষদে পাইয়া আমার হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হইল। উপনিষদে পাইলাম যে, তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম[২]'। আমি এক সময়ে প্রকৃতির নিরঙ্কুশ পরাক্রমে অতিমাত্র ভীত ছিলাম[৩]; এক্ষণে আমি সুস্পষ্ট জানিলাম যে, প্রকৃতির উপরে এক জন নিয়ন্তা আছেন। "স্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ[৪]", সেই এক সত্য পুরুষ স্বভাবের উপর আরূঢ় হইয়া আছেন। তাঁহার এক কশাঘাতে সব চলিতেছে,—

---

(১) ৫৩ পৃষ্ঠা। (২) তৈত্তি. ২।১। (৩) ৪৯ পৃষ্ঠা।
(৪) শ্বেতা. ৫।৪।

"ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ[১]"। তিনি রাজগণ-রাজা, মহারাজা, তিনি আমাদের পিতা, মাতা, বন্ধু, ইহা জানিয়া নির্ভয় হইলাম, তাঁহার উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম।

নির্জ্জনে একাকী তাঁহার মহদ্ভাব জাজ্বল্য প্রভাব অনুভব করিতেছি; ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার গুণগান করিতেছি, সব সুহৃদে মিলে সখাকে ডাকিতেছি; ইহাতে আমার সকল কামনা শেষ হইল।

যত দিন তাঁহাকে না পাইয়াছিলাম, তত দিন মনে করিতাম যে, এই পৃথিবীর সকলেই ভাগ্যবান্, কেবল আমি একাই ভাগ্যহীন,—"ভাগ্যহীন যমপাশ"। কত লোক ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া ছুটিতেছে, কত লোক বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে, কত লোক জগন্নাথ ক্ষেত্রে, কত লোক দ্বারকা হরিদ্বারে, তাহার গণনা নাই। ইতস্ততঃ দেবমন্দির-সকল দেবের আবির্ভাবে পরিপূরিত, ভক্তির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত, মঙ্গলধ্বনিতে নিনাদিত। কিন্তু আমার কাছে তাহা সকলই শূন্য। কখন আমি আমার উপাস্য দেবতাকে দেখিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব, কখন্ আমার হৃদয়ের ভক্তি উপহার দিয়া তাঁহাকে পূজা করিব, কখন্ তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিব,—জলাভাবে পিপাসার ন্যায় আমার এই বলবতী স্পৃহা আমাকে কঠিন দুঃখ দিতেছিল। এখন আমার সেই স্পৃহা পূর্ণ হইল, সব দুঃখ দূর হইল। এত দিন পরে করুণাময়ের এই করুণা আমি বুঝিলাম যে, তিনি তাঁহার ভক্তকে কখনই পরিত্যাগ করেন না। যে তাঁহাকে চায়, সে তাঁহাকে পায়। আমি দীন দরিদ্র ভাগ্যহীনের মত এই সংসারে যে বেড়াই, তাহা তিনি আর দেখিতে পারিলেন না। তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশিত হইলেন।

---

(১) কঠ. ৬।৩।

আমি দেখিলাম, "অয়ম্ অস্মি ন্নাকাশে তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ[১], সর্ব্বানুভূঃ[২]", এই সর্ব্বজ্ঞ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই আকাশে। এই জগন্মন্দিরে জগন্নাথকে দেখিলাম। তাঁহাকে কেহ কোথাও স্থাপিত করিতে পারে না, তাঁহাকে কেহ হস্ত দিয়া নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তিনি আপনাতেই আপনি নিত্য স্থিতি করিতেছেন[৩]। আমি আমার সেই প্রাণদাতা উপাস্য দেবতাকে পাইলাম, এবং নির্জ্জনে সজনে তাঁহার উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। আমি যে-আশা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াছিলাম, সে-আশা আমার পরিপূর্ণ হইল।

আমি তো এতটা পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তিনি তো এতটুকু দিয়া সন্তুষ্ট হইলেন না! তিনি আরও দিতে চাহেন। মাতার ন্যায়, তিনি আরও দিতে চাহেন; যাহা আমি জানি নাই, যাহা আমি চাই নাই, তিনি তাহাও দিতে চাহেন।

যদিও আমি বুঝিলাম যে, ব্রহ্মোপাসনার জন্য গায়ত্রী সাধারণের পক্ষে উপযুক্ত নহে, কিন্তু আমি সেই সাবিত্রী দেবীকে[৪] ধরিয়াই রহিলাম, কখনো পরিত্যাগ করিলাম না। পুরুষানুক্রমে আমরা এই গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া আসিতেছি। এই মন্ত্র আমাদের শিরায় শিরায়। উপনয়নের সময় যদিও আমি এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। যেই আমি রামমোহন রায়ের উদ্ধৃত গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব দেখিলাম, অমনি তাহা আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল। আমি তাহার অর্থ আবৃত্তি করিয়া তাহারই

---

(১) বৃহ. ২।৫।১০। (২) বৃহ. ২।৫।১৯।

(৩) নানকের ভাষা; দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(৪) ৩০ পরিশিষ্ট।

জপেতে সাধ্যমত নিযুক্ত হইলাম। যখন আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিজ্ঞা লিপিবদ্ধ করি, তখন তাহার মধ্যেও গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধান থাকে[১]। গায়ত্রীমন্ত্র প্রচার করিয়া যদিও ইহার দ্বারা অন্যের উপকারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না, কিন্তু ইহাতে আমার সুফল ফলিল। আমি সম্যক্‌রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালনের জন্য প্রতিদিনই অভুক্ত অবস্থায় অতন্দ্রিত ও সংযত হইয়া গায়ত্রীর দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলাম।

গায়ত্রীর গূঢ় ভাবার্থ আমার মনে দিন দিন আরো প্রকাশ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" আমার সমস্ত হৃদয়ে মিশিয়া গেল! ইহাতে আমার দৃঢ় নিশ্চয় হইল যে, ঈশ্বর আমাকে কেবল যে মূক সাক্ষীর ন্যায় দেখিতেছেন, তাহা নহে; তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া অনুক্ষণ আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। ইহাতে তাঁহার সহিত একটি ঘনিষ্ঠ জীবন্ত সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইল। তাঁহাকে দূর হইতে প্রণাম করিয়াই পূর্ব্বে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলাম; এখন সেই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হইলাম যে, তিনি আমা হইতে দূরে নহেন, কেবল মূক সাক্ষী নহেন, কিন্তু তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া আমার বুদ্ধিবৃত্তি-সকল প্রেরণ করিতেছেন। তখন আমি জানিলাম যে, আমি অসহায় নহি, তিনিই আমার চিরকালের সহায়। যখন তাঁহাকে আমি না জানিয়া মুহ্যমান হইয়া ঘুরিতেছিলাম, তখনও তিনি আমার অন্তরে থাকিয়া, ক্রমে ক্রমে আমার ভাল চক্ষু, জ্ঞান-চক্ষু, খুলিয়া দিলেন। এত দিন আমি জানি নাই যে, তিনি আমার হাত ধরিয়া আনিয়াছেন; এক্ষণে আমি জানিয়া, তাঁহার হাত ধরিয়া চলিলাম।

---

(১) ৮৩ পৃষ্ঠা।

এই অবধি আমি তাঁহার আদেশ শুনিবার শিক্ষা করিতে লাগিলাম। মনের প্রবৃত্তিই বা কি, তাঁহার আদেশই বা কি, এই দুয়ের পৃথক্ ভাব আমি বুঝিতে লাগিলাম। যাহা আমার প্রবৃত্তির কুটিল মন্ত্রণা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে সযত্ন হইলাম, এবং তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন আমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, "তুমি আমাকে শুভবুদ্ধি প্রেরণ কর, ধর্ম্মবল প্রেরণ কর; ধৈর্য্য দেও, বীর্য্য দেও, তিতিক্ষা সন্তোষ দেও[১]।"

গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়া কি আশার অতীত ফলই পাইলাম। তাঁহার দর্শন পাইলাম, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিলাম, এবং একেবারে তাঁহার সঙ্গী হইয়া পড়িলাম। তিনি আমার হৃদয়ে আসীন হইয়া আমাকে চালাইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। তিনি যেমন আকাশে থাকিয়া গ্রহ নক্ষত্রগণকে চালাইতেছেন, তেমনি তিনি আমার হৃদয়ে থাকিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধি-সকল প্রেরণ করিয়া আমার আত্মাকে চালাইতেছেন। যখনি নির্জ্জনে অন্ধকারে তাঁহার আদেশের বিপরীত কোন কর্ম্ম করিতাম, তখনই তাঁহার শাসন অনুভব করিতাম; তখনি তাঁহার "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং[২]" রুদ্র মুখ দেখিতাম, সকল শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইত। আবার যখনি কোন সাধু কর্ম্ম গোপনে করিতাম, প্রকাশ্যে তিনি তাহার পুরস্কার দিতেন, তাঁহার প্রসন্ন মুখ দেখিতাম, সমুদায় হৃদয় পুণ্য-

(১) এই প্রার্থনা দেবেন্দ্রনাথ রচিত একটি সঙ্গীতে নিবদ্ধ হইয়াছে; তাহার আদি,—"দেহ জ্ঞান দিব্য জ্ঞান।"

(২) কঠ. ৬।২।

সলিলে পবিত্র হইত। আমি দেখিতাম যে, তিনি গুরুর ন্যায় নিয়ত আমার হৃদয়ে বসিয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন, সৎকর্ম্মে চালাইতেছেন। আমি বলিয়া উঠিতাম, "পিতা, তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা[১]"। দণ্ডেতেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম, পুরস্কারেও তাঁহার স্নেহ দেখিতাম। তাঁহার স্নেহেতেই পালিত হইয়া, উঠিতে পড়িতে, এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। তখন আমার বয়স ২৮ বৎসর।

---

(১) স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় রচিত "নাথ, কি বলিয়ে ডাকিব তোমায়" এই সঙ্গীতের এক পংক্তি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বরকে উপাস্যরূপে ও জীবনের চালকরূপে পাইয়া যে অপ্রত্যাশিত কৃতার্থতা, তাহার ফলে ঈশ্বর-লোলুপতা বৃদ্ধি। ঈশ্বরের প্রেম-রঞ্জিত নিত্য সহবাস লাভের জন্য প্রার্থনার উদয়। সে প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া। তাঁহার প্রেমের আভা হৃদয়ে আসিল, সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল।

(১৮৪৪, ১৮৪৫)।

আমি যখন পূর্ব্বে দেখিতাম যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা কৃত্রিম পরিমিত দেবতার উপাসনা করিতেছে, আমি মনে করিতাম, কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্ত দেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব। এই স্পৃহা তখন আমার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। শয়নে স্বপনে আমার এই কামনা, এই ভাবনা ছিল। এখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিয়া আমার সমুদায় কামনা পরিতৃপ্ত হইল, এবং আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইল।

আমি এতটা পাইয়া তৃপ্ত হইলাম, কিন্তু তিনি এতটুকু দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। এত দিন তিনি বাহিরে ছিলেন, এখন তিনি আমাকে অন্তরে দর্শন দিলেন, তাঁহাকে আমি অন্তরে দেখিলাম। জগন্মন্দিরের দেবতা এখন আমার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা হইলেন, এবং সেখান হইতে নিঃশব্দ গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে লাগিলাম। যাহা কখনো আশা করি নাই, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল! আমি আশার অতীত ফল লাভ করিলাম, পঙ্গু হইয়া গিরি লঙ্ঘন করিলাম। আমি জানিতাম না যে, তাঁর এত করুণা।

তাঁহাকে না পাইয়া আমার যে তৃষ্ণা ছিল, এখন তাঁহাকে পাইয়া তাহা শতগুণ বাড়িল। এখন যতটুকু তাঁহাকে দেখিতে পাই, যতটুকু তাঁহার কথা শুনিতে পাই, তাহাতে আর আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় না। "যে ছেলে যত খায়, সে ছেলে তত লালায়।" "হে নাথ! তোমার দর্শন পাইয়াছি, তুমি আরো জাজ্বল্য হইয়া আমাকে দর্শন দাও। আমি তোমার বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, তোমার আরো মধুর বাণী আমাকে শুনাও। তোমার সৌন্দর্য্য নবতর-রূপে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হউক। তুমি এখন আমার নিকটে বিদ্যুতের ন্যায় আসিয়াই চলিয়া যাও, তোমাকে আমি ধরিয়া রাখিতে পারি না; তুমি আমার হৃদয়ে স্থায়ী হও,"—ইহা বলিতে বলিতে অরুণ-কিরণের ন্যায় তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। তাঁহাকে না পাইয়া মৃত দেহে, শূন্য হৃদয়ে, বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন ছিলাম। এখন প্রেম-রবির অভ্যুদয়ে আমার হৃদয়ে জীবন সঞ্চার হইল, আমার চির নিদ্রা ভঙ্গ হইল, বিষাদ-অন্ধকার চলিয়া গেল। ঈশ্বরকে পাইয়া জীবন-স্রোত বেগে চলিল, প্রাণ বল পাইল। আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম-পথের যাত্রী হইলাম। জানিলাম, তিনি আমার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়-সখা, তিনি ভিন্ন আমার এক নিমেষও চলে না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নাবালক উমেশচন্দ্র সরকার ও তাহার স্ত্রীর খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ। তাহাদের পিতা সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করিয়া ফল পাইলেন না। দেবেন্দ্রনাথ খ্রীষ্টিয় প্রচারকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্থাপিত করিলেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ; সকল দল এক হওয়া; মহাসভা; 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়'। (১৮৪৫)।

১৭৬৭ শকের বৈশাখ[১] মাসের এক দিন প্রাতঃকালে সংবাদ-পত্র দেখিতেছি, এমন সময় আমাদের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথ সরকার আমার নিকট কাঁদিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল যে, "গত রবিবারে আমার স্ত্রী ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশ চন্দ্রের স্ত্রী, দুই জনে একখানা গাড়ীতে চড়িয়া নিমন্ত্রণে যাইতে-ছিলেন; এমন সময় উমেশচন্দ্র আসিয়া তাহার আপনার স্ত্রীকে গাড়ী হইতে জোর করিয়া নামাইয়া লয়, এবং উভয়ে খ্রীষ্টান হইবার জন্য ডফ্ সাহেবের[২] বাড়ীতে চলিয়া যায়। আমার পিতা অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে সেখান হইতে ফিরিয়া আনিতে না পারিয়া, অবশেষে সুপ্রীম কোর্টে নালিশ করেন। নালিশে সে-বার আমাদের হার হয়। কিন্তু আমি ডফ্ সাহেবের নিকট গিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম যে, 'আমরা আবার কোর্টে নালিশ আনিব। দ্বিতীয় বার বিচারের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূকে খ্রীষ্টান করিবেন না'। কিন্তু তিনি তাহা

---

(১) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল অথবা মে।

(২) ৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

না শুনিয়া গত কল্যই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিয়াছেন"। এই বলিয়া রাজেন্দ্রনাথ কাঁদিতে লাগিল।

ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল[১]। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে[২] প্রকাশ হইল। "অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব! ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল। * * * অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতীক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনরিদিগের সংশ্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ। তাহাদিগের পাঠশালাতে পুত্রদিগকে প্রেরণ করিতে নিবৃত্ত হও, এবং যাহাতে স্ফূর্ত্তির সহিত তাহারা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, এমত উদ্যোগ শীঘ্র কর। যদি বল, পাদ্রিদিগের পাঠশালা ব্যতীত দরিদ্র সন্তানদিগের অধ্যয়ন জন্য অন্য স্থান কোথায়? কিন্তু ইহাই বা কি লজ্জার বিষয়! খ্রীষ্টানেরা অতলস্পর্শ সমুদ্র-তরঙ্গকে তুচ্ছ করত আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার জন্য ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পাঠশালা সকল স্থাপন করিতেছে। আর আমাদিগের, দেশের দরিদ্র সন্তানদিগকে অধ্যাপন

(১) পরিশিষ্ট ৩২। (২) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা।

করিবার নিমিত্তে একটিও উত্তম পাঠশালা নাই। সকলে একত্র হইলে তাহাদিগের পাঠশালার তুল্য বা তাহার অপেক্ষা দশগুণ উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় কি স্থাপিত হইতে পারে না? ঐক্য থাকিলে কোন্ কর্ম্ম না সিদ্ধ হয়?”

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দুসন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয়, এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ[১]; আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম। আমার এই উৎসাহে সকলেই উৎসাহিত হইলেন। ইহাতেই ধর্ম্মসভা ও ব্রাহ্মসভার যে দলাদলি[২], এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলেই একদিকে হইলেন, এবং যাহাতে খ্রীষ্টানদিগের বিদ্যালয়ে আর ছেলে পড়িতে না পায়, যাহাতে খ্রীষ্টানেরা আর খ্রীষ্টান করিতে না পারে, তাহার জন্য সম্যক্ চেষ্টা হইতে লাগিল।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ[৩] আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের

---

(১) রাজা রাধাকান্ত দেব ও রাজা সত্যচরণ ঘোষাল হিন্দুসমাজের নেতা, ও হিন্দু আচারে নিষ্ঠাবান্; অপর দিকে রামগোপাল ঘোষ ডিরোজিও-শিষ্যগণের নেতা, ও হিন্দু আচারে শ্রদ্ধাহীন।

(২) ২৩ পরিশিষ্ট। (৩) ২৫শে মে, ১৮৪৫, রবিবার।

বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদার পুস্তক লইয়া, তাহাতে কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

এই সভা হইতে "হিন্দুহিতার্থী" নামে একটা বিদ্যালয়[১] সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।

---

(১) পরিশিষ্ট ৩৩।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উপনিষদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে, ও সমগ্র ভারতের ধর্ম্ম এক হইবে, এই আশা। উপনিষদ্ যে-বেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ, সেই বেদ জানিবার আগ্রহ, ও সেজন্য কাশীতে চারিজন ছাত্রকে প্রেরণ (১৮৪৫, ১৮৪৬)। পিতার ইংলণ্ড গমন হেতু বিষয় দেখিতে বাধ্য হওয়া, ও তাহাতে বিরক্তি বোধ। নির্জ্জনে নৌকাভ্রমণের উদ্যোগ। স্ত্রী-পুত্রগণের ও রাজনারায়ণ বসুর সহিত ঘোর বর্ষাকালে নৌকারোহণ। —রাজনারায়ণ বসুর পিতার ও রাজনারায়ণ বসুর স্বল্প বৃত্তান্ত।— নৌকায় ঝড়, দেবেন্দ্রনাথের আঘাত লাগা, নৌকাডুবির আশঙ্কা। পিতার মৃত্যু-সংবাদ। অতি দ্রুত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন (১৮৪৬)।

যখন উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা আমার সঙ্কল্প হইল। ঐ উপনিষদকে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে,—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।

তন্ত্র-পুরাণেতেই পৌত্তলিকতার আড়ম্বর। বেদান্ত, পৌত্ত-লিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। তন্ত্র-পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যদি

সকলে এই উপনিষদ্ অবলম্বন করে, যদি উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া সকলে ব্রহ্মোপাসনাতে রত হয়, তবে ভারতবর্ষের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। সেই মঙ্গলের পথ মুক্ত করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

কিন্তু যে-বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, যে-বেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য বেদান্ত-দর্শনের এত পরিশ্রম, সে-বেদকে আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। রামমোহন রায়ের যত্নে তখন কয়েকখানা উপনিষদ্ ছাপা হইয়াছিল[১]; এবং যাহা ছাপা হয় নাই এমন কয়েক খানি উপনিষদ্ আমিও সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু বিস্তৃত বেদের বৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারিতেছি না। বঙ্গদেশে বেদের লোপই হইয়া গিয়াছে। টোলে টোলে ন্যায়-শাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র পড়া হয়; অনেক ন্যায়বাগীশ, স্মার্ত্তবাগীশ সেখান হইতে বাহির হন; কিন্তু সেখানে বেদের নাম গন্ধ কিছুই নাই। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম যে বেদ অধ্যয়ন অধ্যাপনা, তাহা এদেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; কেবল বেদ-বিরহিত নামমাত্র উপবীত-ধারী ব্রাহ্মণ-সকল রহিয়া গিয়াছেন। দুই এক জন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ভিন্ন, কেহ তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম সন্ধ্যা-বন্দনার অর্থ পর্য্যন্ত জানেন না।

আমার বিশেষরূপে বেদ জানিবার জন্য বড়ই আগ্রহ জন্মিল। বেদের চর্চ্চা কাশীতে, অতএব সেখানে বেদ শিক্ষা করিবার জন্য ছাত্র পাঠাইতে আমি মানস করিলাম। এক জন ছাত্রকে ১৭৬৬ শকে[২] কাশীধামে প্রেরণ করিলাম; তিনি তথায় মূল বেদ সমুদায়

(১) ঈশা, কেন, কঠ, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, এই পাঁচখানি রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে আছে; কিন্তু আরও কয়েকখানি তিনি প্রকাশিত করিয়াছিলেন, এরূপ শোনা যায়।

(২) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে।

সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর বৎসরে[১] আর তিন জন ছাত্র তথায় প্রেরিত হইলেন। আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর এবং রমানাথ, এই চারি জন ছাত্র।

যখন ইঁহাদিগকে কাশীতে পাঠাই, তখন আমার পিতা ইংলণ্ডে। তাঁহার বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার সকলই আমার উপরে পড়িল[২]। কিন্তু আমি কোন কাজ কর্ম্ম ভাল করিয়া দেখিয়া উঠিতে পারিতাম না। কর্ম্মচারীরাই সকল কাজ চালাইত; আমি কেবল বেদ-বেদান্ত, ধর্ম্ম, ও ঈশ্বর ও চরম-গতিরই অনুসন্ধানে থাকিতাম। বাড়ীতে যে একটু স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, তাহাও পারিয়া উঠিতাম না। এত কর্ম্ম কাজের প্রতিঘাতেতে আমার উদাস ভাব আরো গভীর হইয়া উঠিয়াছিল। এত ঐশ্বর্য্যের প্রভু হইয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা করিত না। সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া একা একা বেড়াইবার ইচ্ছাই আমার হৃদয়ে রাজত্ব করিতে লাগিল। তাঁহার প্রেমে মগ্ন হইয়া একাকী এমন নির্জ্জনে বেড়াইব যে, তাহা কেহ জানিতেও পারিবে না; জলে স্থলে তাঁহার মহিমা প্রত্যক্ষ করিব, দেশভেদে[৩] তাঁহার করুণার পরিচয় লইব; বিদেশে, বিপদে, সঙ্কটে পড়িয়া তাঁহার পালনী-শক্তি অনুভব করিব,—এই উৎসাহে আমি আর বাড়ীতে থাকিতে পারিলাম না।

১৭৬৮ শকের শ্রাবণ মাসের[৪] ঘোর বর্ষাতেই গঙ্গাতে বেড়াইতে

---

(১) ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

(২) ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে লইয়া দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন করেন। তাঁহার 'বিস্তীর্ণ কার্য্যের ভার' ষোড়শ পরিচ্ছেদের আরম্ভে বর্ণিত আছে। পরিশিষ্ট ২২ দ্রষ্টব্য।

(৩) রামমোহন রায়ের 'কি স্বদেশে কি বিদেশে' সঙ্গীতের ভাষার ছায়া।

(৪) ১৮৪৬ সালের আগষ্ট; পরিশিষ্ট ৩৯ দ্রষ্টব্য।

বাহির হইলাম। আমার ধর্ম্মপত্নী সারদা দেবী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবে? যদি যাইতেই হয়, তবে আমাকে সঙ্গে করিয়া লও"। আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইলাম। তাঁহার জন্য একটা পিনিস ভাড়া করিলাম। তিনি, দ্বিজেন্দ্রনাথ সত্যেন্দ্রনাথ এবং হেমেন্দ্রনাথকে লইয়া তাহাতে উঠিলেন। আমি রাজনারায়ণ বসুকে সঙ্গে লইয়া নিজের একটি সুপ্রশস্ত বোটে উঠিলাম। তখন দ্বিজেন্দ্রনাথের বয়স ৭ বৎসর, সত্যেন্দ্রনাথের ৫ বৎসর, এবং হেমেন্দ্রনাথের ৩ বৎসর।

রাজনারায়ণ বসুর পিতার নাম নন্দকিশোর বসু[১]। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপে, ও তাঁহার ধর্ম্মভাব নম্র ভাব দেখিয়া, আমি বড় সুখী হইয়াছিলাম। তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন,—"যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয়, তবে বড় ভাল হয়"। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার সে ইচ্ছার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

তাঁহার মৃত্যু[২] হইলে রাজনারায়ণ বাবু সেই অশৌচ অবস্থায় আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সেই সময়েই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। তখনকার ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি একজন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া, দিন দিন তাঁহার প্রতি আমার অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি ১৭৬৭ শকে[৩] ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ

(১) পরিশিষ্ট ৩৪। (২) ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৪৫।
(৩) ১৮৪৬ সালের প্রথম ভাগে। পরিশিষ্ট ৩৫ দ্রষ্টব্য।

করিলেন। ধর্ম্মভাবে তাঁহার সহিত আমার হৃদয়ের খুব মিল হইয়া গেল। তাঁহাকে আমি উৎসাহী সহযোগী পাইলাম। তখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে কিছু ইংরাজী লেখা পড়ার প্রয়োজন, তাহার বিশেষ ভার তাঁহার উপরে দিলাম। কঠাদি উপনিষদের অর্থ আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতাম, তিনি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেন, এবং সে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইত[১]।

যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাস্যমুখ সর্ব্বদাই দেখিতাম। তখন তিনি আমার সঙ্গের সঙ্গী ছিলেন; তাঁর সঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে আমার বড় ভাল লাগিত[২]। আমি তাঁহাকে পরিবারের মধ্যেই গণ্য করিতাম। যখন আমি পরিবার লইয়া বেড়াইতে চলিলাম, তখন রাজনারায়ণ বাবুকে সঙ্গে লইলাম। তিনি সেই বোটে আমার সঙ্গে রহিলেন; পিনিসে আমার স্ত্রীপুত্র-সকল।

উৎসাহ সহকারে আমরা ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। তখনকার সেই শ্রাবণ মাসের[৩] প্রবল স্রোত আমাদের বিপক্ষে; তাহার প্রতিকূলে, অতি কষ্টে, আস্তে আস্তে, চলিতে লাগিলাম। হুগলী আসিতেই তিন চারি দিন কাটিয়া গেল। আরদু ই দিন পরে কাল্‌নাতে আসিয়া মনে হইল, যেন কতদূরেই আসিয়াছি।

এইরূপে চলিতে চলিতে পাটুলি পশ্চাৎ করিয়া এক দিন[৪] বেলা চারিটার সময় আমি রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, "আজ তোমার দৈনন্দিন লেখা শেষ করিয়া ফেল। আজ প্রকৃতির শোভা বড়ই দীপ্তি পাইতেছে; চল, আমরা বোটের ছাদের উপর

(১) পরিশিষ্ট ৩৬। (২) পরিশিষ্ট ৩৭। (৩) পরিশিষ্ট ৩৯ দ্রষ্টব্য। (৪) ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৬।

গিয়া বসি।" তিনি বলিলেন যে, "এখনও বেলার অনেক বাকী; ইহার মধ্যে আমার দৈনন্দিনের জন্য কত ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা কে জানে?"

এইরূপে তাঁহার সঙ্গে কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় দেখি, পশ্চিমের আকাশে ঘটা করিয়া একটা মেঘ উঠিতেছে। তখন একটা ভারি ঝড়ের আশঙ্কা হইল। রাজনারায়ণ বাবুকে বলিলাম, "চল আমরা পিনিসে যাই; ঝড়ের সময় বোটে থাকা ভাল নয়।"

মাঝি পিনিসের সঙ্গে বোট লাগাইয়া দিল। আমি সিঁড়িতে পা ঝুলাইয়া বোটের ছাদের উপর বসিয়া আছি, এবং দুই জন দাঁড়ী পিনিসের সঙ্গে মিলাইয়া বোট ধরিয়া আছে। অন্য একটা নৌকা গুণ টানিয়া যাইতেছিল, তাহাদের নৌকার গুণ আমাদের বোটের মাস্তুলের আগায় লাগিয়া গেল। সেই গুণ আমাদের এক জন দাঁড়ী লগি দিয়া ছাড়াইতেছিল। আমি সেই গুণ ছাড়ান দেখিতেছি। যে দাঁড়ী গুণ ছাড়াইতেছিল, সে সেই বাঁশের লগির ভার সামলাইতে পারিল না। তাহার হাত হইতে লগি আমার মস্তকের উপর পড় পড় হইল। সামাল-সামাল রব পড়িয়া গেল, মহা গোল উঠিল। আমি তখনও সেই মাস্তুলের দিকে তাকাইয়া আছি। দাঁড়ী সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমার মস্তক বাঁচাইল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সামলাইতে পারিল না। লগির কোণ আসিয়া আমার চক্ষুর কোণে চশ্‌মার তারের উপর পড়িল। চক্ষুটা বাঁচিয়া গেল, কিন্তু চশ্‌মার তার আমার নাসিকা কাটিয়া বসিয়া গেল। আমি টানিয়া চশ্‌মা তুলিয়া ফেলিলাম, আর দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছাদ হইতে নামিয়া তখন আমি নীচে বোটের কিনারায় বসিয়া রক্ত ধুইতে লাগিলাম।

ঝড়ের কথা মনে নাই, সকলেই একটু অসাবধান। দাঁড়ীরা পিনিস ধরিয়া আছে, এবং সেই অবস্থায় বোট লইয়া পিনিস চলিতেছে। এমন সময় একটা দমকা ঝড় আসিয়া পিনিসের মাস্তুলের একটি শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। সেই ভগ্ন মাস্তুলটি তাহার পাল দড়াদড়ি লইয়া বোটের মাস্তুলকে জড়াইয়া তাহার ছাদের উপর পড়িল; সেই খানে আমি পূর্ব্বে বসিয়াছিলাম। এখন তাহা আমার মস্তকের উপর ঝুলিতে লাগিল। পিনিস অবশিষ্ট পাল-ভরে ঝড়ে ছুটিতে লাগিল, এবং বোটকে আকৃষ্ট করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিল। যে দুই জন দাঁড়ী পিনিস ধরিয়া আছে, তাহারা আর ঠিক রাখিতে পারে না। বোট পিনিসের টানে এক-কেতে হইয়া চলিল; সে দিকটা জলের সঙ্গে প্রায় মিশিয়াই পড়িল, কেবল এক আঙ্গুল মাত্র জল হইতে ছাড়া। মাস্তুলে জড়ান দড়ি কাটিয়া দিবার জন্য একটা গোল পড়িয়া গেল, "আন্ দা, আন্ দা ;" কিন্তু দা কেহ খুঁজিয়া পায় না। একখানা ভোঁতা দা লইয়া একজন মাস্তুলের উপর উঠিল। আঘাতের পর আঘাত, তার পরে আঘাত, কিন্তু এ ভোঁতা দা-য়ে দড়ি কাটে না। অনেক কষ্টে একটা দড়ি কাটিল, দুইটা কাটিল। তৃতীয়টা কাটিতেছে, আমি আর রাজনারায়ণ বাবু স্তব্ধ হইয়া জলের দিকে তাকাইয়া আছি। এ নিমিষে আছি, পর নিমিষে আর নাই, জীবন ও মৃত্যু পাশাপাশি। রাজনারায়ণ বাবুর চক্ষু স্থির, বাক্য স্তব্ধ, শরীর অসাড়। এদিকে দাঁড়ীরা দড়িই কাটিতেছে। আবার একটা ভারি দম্‌কা আইল। দাঁড়ীরা বলিয়া উঠিল, "আবার তাই রে, তাই !" বলিতে বলিতে শেষ দড়িটা কাটিয়া ফেলিল। বোট নিষ্কৃতি পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া একেবারে ওপারে চলিয়া গেল

এবং পাড়ের সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইল। আমি অমনি বোট হইতে ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলাম; রাজনারায়ণ বাবুকেও ধরাধরি করিয়া তুলিলাম।

এখন ডাঙ্গা পাইয়া আমাদের প্রাণ বাঁচিল, কিন্তু পিনিস তখনও দৌড়িতেছে। দাঁড়ীরা চেঁচাইতে লাগিল, "থামা, থামা"। তখন সূর্য্য অস্ত গেল; মেঘের ছায়ার সঙ্গে সন্ধ্যার ছায়া মিশিয়া একটু ঘোর হইল; পিনিস থামিল কি না, অন্ধকারে ভাল দেখিতে পাইতেছি না। ওদিকে দেখি, একটা ছোট নৌকা বেগে আমাদের বোটের দিকে আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই নৌকা আমাদের বোটকে ধরিল। আমি বলিলাম, "এ আবার কি? ডাকাতের নৌকা নাকি?" আমার ভয় হইল। সেই নৌকা হইতে লাফাইয়া একজন পাড়ের উপর উঠিল। দেখি যে, আমার বাড়ীর সেই স্বরূপ খানসামা। তাহার মুখ শুষ্ক। সে আমাকে একখানা চিঠি দিল। সেই অন্ধকারে অনেক চেষ্টা করিয়া যাহা পড়িলাম, তাহাতে বোধ হইল, ইহাতে আমার পিতার মৃত্যু সংবাদ আছে[১]। সে বলিল, "কলিকাতা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। আপনার খোঁজে নৌকা করিয়া কত লোক বাহির হইয়াছে, কেহ আপনাকে ধরিতে পারে নাই। আমার এত কষ্ট সার্থক যে আমি আপনাকে ধরিলাম।"

এ সংবাদ হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় আমার মস্তকে পড়িল।

---

(১) "দেবেন্দ্র বাবু ঝিকিমিকি আলোকে চিঠি পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা রহিয়াছে, Melancholy news from England. তাহাতেই তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের তথায় মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতায় চব্বিশ ঘণ্টায় যাইতে হইবে, তাহা না হইলে বিষয়ের মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে।" (রাজ. ৫৭)।

আমি স্তব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়া বোট লইয়া পিনিস ধরিতে গেলাম, এবং সেই পিনিস ধরিয়া তাহাতে উঠিলাম। সেখানে আলোতে পত্রখানা স্পষ্ট করিয়া পড়িলাম। এখন আর কি হইবে? তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ এখন আর কাহাকেও শুনাইলাম না।

পরদিন প্রাতঃকালেই কলিকাতা অভিমুখে ফিরিলাম। আমি যে বোটে ছিলাম, তাহা ১৪টা দাঁড়ের বোট। ইহার ভিতরকার দুই পার্শ্বে বেঞ্চের উপরে আঁটা তক্তা, তাহাতে দীর্ঘ ফরাস পাতা। আমি স্ত্রীপুত্রদিগকে তাহাতে লইলাম। রাজনারায়ণ বাবুকে সমস্ত পিনিসের অধিকার দিয়া পশ্চাতে ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিতে বলিলাম। ভাদ্র মাসের গঙ্গার স্রোতে, দাঁড়ে পালে নক্ষত্র বেগে বোট ছুটিল; কিন্তু মন তাহার আগে ছুটিতেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অনবরত বৃষ্টির ও বাতাসের কোলাহল। মধ্য পথে, কালনাতে পঁহুছিবার কিছু পূর্ব্বে, এক মাঠের ধারে এমন তুফান উঠিল যে, নৌকা ডুব ডুব হইয়া পড়িল। নৌকা কিনারা দিয়াই যাইতেছিল; মাঝিরা তৎক্ষণাৎ ডাঙ্গায় লাফাইয়া পড়িয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের একটা মুড়া গাছে তাহা বাঁধিয়া ফেলিল; বোট রক্ষিত হইল। তখন সেই মুড় গাছটিকে নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এবং পরম বন্ধু বলিয়া আমার মনে হইল। পাঁচ মিনিট পরেই আবার আমার মনের আবেগে বোট খুলিয়া দিলাম। যখন বেলা প্রায় অবসান, তখন আমি মেঘের মধ্য দিয়া ক্ষীণপ্রভ সূর্য্যকে একবার দেখিতে পাইলাম। তখন আমি সুখসাগরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। সূর্য্য যখন অস্ত হইল, তখন আমি ফরাসডাঙ্গায়। সেখানে দাঁড়ীদের হাত অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর আর তাহারা খাটিতে পারে না। আবার, জোয়ার আসিয়া পঁহুছিল এ বিষম ব্যাঘাত! এখান

হইতে পল্‌তায় আসিতে রাত্রি ৮টা হইল; এখানে আসিয়া বোট কাত হইয়া পড়িল। দিন দশটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িয়াছে। এক একবার দমকা বাতাসে দুই এক জায়গায় ভয়ে বোট থামাইতেও হইয়াছিল। দাঁড়ীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছে। পল্‌তায় পঁহুছিতেই কিনারা হইতে লোক আসিয়া সংবাদ দিল, এখানে গাড়ী প্রস্তুত আছে। এই কথা শুনিয়া আমার শরীরে প্রাণ আসিল।

আমি সেই যে বোটে বসিয়াছিলাম, একবারও তাহা হইতে উঠি নাই। এখন গাড়ীর কথা শুনিয়া সেখান হইতে উঠিয়া বোটের দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখি যে, সেখানে আমার এক হাঁটু জল; সমস্ত নৌকার খোল জলে পূরিয়া গিয়া তাহার উপরে এক হাত পর্য্যন্ত জল দাঁড়াইয়াছে; সকলই বৃষ্টির জল; আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতেও পারি নাই[১]। যদি পল্‌তায় গাড়ী না থাকিত, যদি আমরা নৌকায় বরাবর কলিকাতার দিকে চলিতাম, তবে পথে জলভারে বোট নিশ্চয়ই ডুবিত; এ কথা আর কাহাকে বলিতেও পারিতাম না।

বোট হইতে নামিয়া গাড়ীতে চড়িলাম। রাস্তা জলময়; সেই জলের ভিতরে গাড়ীর চাকা অর্দ্ধেক মগ্ন। অতি কষ্টে বাড়ী পঁহুছিলাম। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর; সকলেই নিদ্রিত, কাহারও সাড়া শব্দ নাই। বাড়ীর ভিতরে স্ত্রীপুত্রদিগকে প্রেরণ করিয়া আমি বৈঠকখানার তেতালায় উঠিলাম। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র ব্রজ বাবু আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাকে সেখানে একাকী অত রাত্রি পর্য্যন্ত আমার জন্য অপেক্ষা করিতে দেখিয়া আমার মনে কেমন একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইল! কেন তাহা জানি না।

---

(১) নৌকার মধ্যভাগ বেঞ্চি-সংলগ্ন তক্তায় ও ফরাসে ঢাকা ছিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পিতার কুশ-পুত্তলিকা দাহ ও যথারীতি দশাহ অশৌচ ধারণ। অপৌত্তলিক শ্রাদ্ধের প্রস্তাবে রমানাথ ঠাকুর, রাজা রাধাকান্ত দেব, গিরীন্দ্রনাথ, সকলেই দেবেন্দ্রনাথের বিরোধী। কেবল হাজারীলাল সায় ও উৎসাহ দিলেন; হাজারীলালের কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত। মানসিক সংগ্রামের ফলে দেবেন্দ্রনাথের অদ্ভুত স্বপ্ন; স্বপ্নে জননীর আশীর্ব্বাদ লাভ। শ্রাদ্ধের দিনে দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক মন্ত্রের দ্বারা দানোৎসর্গ করাতে তুমুল গোলমাল; আর কিছু না করিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধপ্রাঙ্গণ ত্যাগ। গিরীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক শাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ সম্পাদন; তৎসত্ত্বেও জ্ঞাতিগণের বিমুখতা। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উপদেশ, 'আর এরূপ করিবে না, বল'; তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের অসম্মতি। "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন" (১৮৪৬)।

১৭৬৮ শকে শ্রাবণ মাসে[১] লণ্ডন নগরে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার ৫১ বৎসর বয়ঃক্রম। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ এবং আমার পিস্তুত ভাই নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়[২] তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভাদ্র মাসে আমি সেই সংবাদ প্রাপ্ত হই। মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্তির পর কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে[৩] তাঁহার কুশ-পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিয়া আমার মধ্যম ভ্রাতার সহিত গঙ্গার পর পারে যাইয়া তাঁহার দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করি।

---

(১) ১৮৪৬, ১লা আগষ্ট।　　(২) বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।

(৩) ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৪৬।

এই দিবস হইতে আমরা যথারীতি দশ দিবস অশৌচ ধারণ পূর্ব্বক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই অশৌচকালে শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত প্রতি দিবস প্রাতে উঠিয়া মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত খালি পায় কলিকাতার তাবৎ মান্য লোকদিগের সহিত আমি সাক্ষাৎ করিতাম, এবং মধ্যাহ্নের পর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই সকল আগন্তুক ভদ্রলোকদিগকে আপনার বাটীতে অভ্যর্থনা করিতাম। পিতৃবিয়োগে পুত্রের যেরূপ কঠোর তপস্যা পালন করিতে হয়, তাহা আমি সমুদায় করিয়াছিলাম।

আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর আমাকে সতর্ক করিয়া দিলেন, "দে'খো, ব্রহ্ম ব্রহ্ম ক'রে এ সময় কোন গোলমাল তুলিও না। দাদার বড় নাম।" আমি যখন রাজা রাধাকান্ত দেবের কাছে সাক্ষাৎ করিতে গেলেম, তিনি আমাকে কাছে বসাইয়া আমার পিতার অনেক সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। আমাকে বন্ধুভাবে পরামর্শ দিলেন, "শাস্ত্রে যেমন যেমন বিধান আছে, সেই অনুসারে এই শ্রাদ্ধটি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করিও।" তাঁহাকে আমি বিনয়ের সহিত বলিলাম, "আমি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত লইয়াছি; সে ব্রতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে পারিব না। তাহা করিলে ধর্ম্মে পতিত হইব। আমি কিন্তু শ্রাদ্ধ যে করিব, তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপনিষদের মতে করিব।" তিনি বলিলেন, "সে হবে না; সে হবে না। তাহা হইলে শ্রাদ্ধ বিধিপূর্ব্বক হবে না। শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কার্য্য হইবে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা শুনো; তাহা হইলে সব ভাল হইবে।" আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম, "আমরা যখন ব্রাহ্ম

হইয়াছি, তখন তো আর শালগ্রাম আনিয়া শ্রাদ্ধ করিতে পারিব না। যদি তাহাই করিব, তবে ব্রাহ্মই বা কেন হইলাম, প্রতিজ্ঞাই বা কেন করিলাম?” তিনি নতশিরে মৃদুস্বরে বলিলেন, “তাহা হইলে সকলে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবে, সকলে আমাদিগের বিপক্ষ হইবে। সংসার আর তবে কি করিয়া চলিবে? মহা বিপদেই পড়িব।” আমি বলিলাম, “তাই বলিয়া পৌত্তলিকতাতে যোগ দিতে পারা যায় না।”

কাহারো নিকট হইতে আর আমি এ বিষয়ে উৎসাহ পাই না। আমার প্রিয় ভ্রাতাও আমার উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিলেন। সকলেই আমার মতের বিরোধী। এমনি বিরুদ্ধ ভাব দাঁড়াইল, যেন আমি সকলকে রসাতলে ডুবাইতে যাইতেছি। সকলের মনে হইল, যেন আমার একটি কাজে সকল থাকে বা সকল যায়! আমি একা এক দিকে, আর সকলেই আমার আর এক দিকে। কাহারো কাছে একটি আশ্বাস বাক্য পাই না, সাহসের কথা পাই না।

যখন আমার চারিদিকে কেবল এই প্রকার বাধা, সেই অসহায় বন্ধুহীন অবস্থায় কেবল এক জন ব্রহ্মনিষ্ঠ আমার সহায় হইলেন, এবং আমার প্রাণের কথা বলিয়া উঠিলেন, “লোক-ভয় আবার ভয়! ‘ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়’,[১] তাঁহাকে ভয় কর। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া যায়; তাহার কাছে লোকনিন্দা কি? প্রাণ গেলেও আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম ছাড়িব না।” ইনি কে? ইনি লালা হাজারীলাল। ধর্ম্মনিষ্ঠা

---

(১) রামমোহন রায় রচিত, ও তাঁহার গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতের ১৩ সংখ্যক গানের প্রথম পংক্তি

ও সাহসে বাঙ্গালী হইতে পশ্চিম দেশবাসী হিন্দুস্থানীরা যে বড়, এই সঙ্কট সময়ে আমি তাহার পরিচয় পাইলাম। আমার সঙ্গে একমনা ও এক-হৃদয় হইয়া আমার স্বপক্ষে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন।

যখন আমার পিতামহ[১] বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হাজারীলালকে পিতৃ-মাতৃহীন অনাথ বালক দেখিয়া তাহাকে তিনি সঙ্গে করিয়া আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছিলেন। তিনি তাহার জীবনের কল্যাণ কামনা করিয়া তাহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পক্ষে বিপরীত ঘটিল; সে কলিকাতায় আসিয়া নগরের পাপস্রোতে ভাসিয়া গেল। তাহাকে কে বা দেখে, কে বা তার সংবাদ লয়,—অসৎ সঙ্গে পড়িয়া তাহার জীবন পাপময়, কলঙ্কময় হইল। এই দুরবস্থায় ঈশ্বর-প্রসাদে সে ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের বল তাহার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইল, এবং সে সেই বলে পাপস্রোত অতিক্রম করিয়া আবার পুণ্য-পদবীতে আরোহণ করিল।

সেই হাজারীলাল আবার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হন। আপনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কুটিল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, তখন তিনি আবার পুণ্য-পথে অন্যকে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতার ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মানী সকলের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃষ্ট মঙ্গল পথ দেখাইতে লাগিলেন। অল্পকালের মধ্যে তখন যে অত লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহারই যত্নে[২]।

---

(১) রামলোচন ঠাকুর; ১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) ৮৬ পৃষ্ঠা ও পরিশিষ্ট ৩৮ দ্রষ্টব্য।

তিনিই আমাকে এই সঙ্কট সময়ে বলিলেন, "লোক ভয় আবার কি ভয়? ঈশ্বর বড় না লোক বড়?" আমি তাঁহার বাক্যে সাহস ও উৎসাহ পাইলাম। আমার হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি আরো জ্বলিয়া উঠিল।

এই আলোচনা ও শোচনাতে রাত্রিতে আমার ভাল নিদ্রা হয় না। একে পিতৃবিয়োগ, তাহাতে এই লৌকিকতাতে সারাদিন পরিশ্রম ও কষ্ট, তাহার উপরে আমার এই আন্তরিক ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ধর্ম্মের জয়, কি সংসারের জয়, কি হয় বলা যায় না, এই ভাবনা। ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, "আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে বল দাও, আমাকে আশ্রয় দাও।"

এই সকল চিন্তাতে শোচনাতে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না। বালিসের উপরে মাথা ঘুরিতে থাকে। রাত্রিতে এক বার তন্দ্রা আসিতেছে, আবার জাগিয়া উঠিতেছি। নিদ্রা জাগরণের যেন সন্ধিস্থলে রহিয়াছি। এই সময়ে সেই অন্ধকারে এক জন আসিয়া বলিল, "উঠ"; আমি অমনি উঠিয়া বসিলাম। সে বলিল, "বিছানা হইতে নাম"; আমি বিছানা হইতে নামিলাম। সে বলিল, "আমার পশ্চাতে পশ্চাতে এসো"; আমি তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিলাম। বাড়ীর ভিতরের যে সিঁড়ি তাহা দিয়া সে নামিল, আমিও সেই পথে নামিলাম। নামিয়া তাহার সঙ্গে উঠানে আসিলাম, সদর দেউড়ীর দরজায় দাঁড়াইলাম। দরওয়ানেরা নিদ্রিত। সে সেই দরজা ছুঁইল, অমনি তাহার দুই কপাট খুলিয়া গেল। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আইলাম। ছায়া-পুরুষের ন্যায় তাহাকে বোধ হইল। আমি তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি না, কিন্তু সে আমাকে যাহা বলিতেছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে তাহা বাধিত

হইয়া করিতে হইতেছে। এখান হইতে সে উৰ্দ্ধে আকাশে উঠিল, আমিও তাহার পশ্চাতে আকাশে উঠিলাম। পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রহ নক্ষত্র তারকা-সকল দক্ষিণে বামে সম্মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া আলোক দিতেছে, আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিতেছি। যাইতে যাইতে একটা বাষ্প-সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আর তারা নক্ষত্র কিছুই দেখিতে পাই না। বাষ্পের মধ্যে খানিক দূর যাইয়া দেখি যে, সেই বাষ্প-সমুদ্রের উপদ্বীপের ন্যায় একটি পূর্ণচন্দ্র স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার যত নিকটে যাইতে লাগিলাম সেই চন্দ্র তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আর তাহাকে গোলাকার বলিয়া বোধ হইল না; দেখিলাম, তাহা আমাদের পৃথিবীর ন্যায় চেটাল। সেই ছায়া-পুরুষ গিয়া সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইল, আমিও সেই পৃথিবীতে দাঁড়াইলাম। সে সমুদায় ভূমি শ্বেত প্রস্তরের; একটি তৃণ নাই; না ফুল আছে, না ফল আছে, কেবল শ্বেত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। তাহার যে জ্যোৎস্না তাহা সে সূর্য্য হইতে পায় নাই; সে আপনার জ্যোতিতে আপনি আলোকিত; তাহার চারিদিকে যে বাষ্প তাহা ভেদ করিয়া সূর্য্যরশ্মি আসিতে পারে না। তাহার নিজের সে রশ্মি অতি স্নিগ্ধ; এখানকার দিনের ছায়ার ন্যায় সেখানকার সে আলোক। সেখানকার বায়ু সুখস্পর্শ। মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে সেখানকার একটা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সকল বাড়ী সকল পথ শ্বেত প্রস্তরের,—স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। রাস্তায় একটি লোকও দেখিলাম না। কোন কোলাহল নাই, সকলই প্রশান্ত। রাস্তার পার্শ্বে একটা বাড়ীতে আমার নেতা প্রবেশ করিয়া তাহার দোতালায় সে উঠিল, আমিও তাহার সঙ্গে উঠিলাম। দেখি যে, একটা প্রশস্ত ঘর; ঘরে শ্বেত পাথরের টেবিল ও

শ্বেত পাথরের কতকগুলা চৌকি রহিয়াছে[১]। সে আমাকে বলিল, "বসো"। আমি একটা চৌকিতে বসিলাম। সে ছায়া বিলীন হইয়া গেল। আর সেখানে কেহই নাই। আমি সেই নিস্তব্ধ গৃহে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি; খানিক পরে দেখি যে, সেই ঘরের সম্মুখের একটা দরজার পর্দ্দা খুলিয়া উপস্থিত হইলেন আমার মা। মৃত্যুর দিবস তাঁহার যেমন চুল এলোনো দেখিয়াছিলাম, সেইরূপ তাঁহার চুল এলোনোই রহিয়াছে। আমি তো তাঁহার মৃত্যুর সময়ে মনে করিতে পারি নাই যে, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে[২]। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর যখন শ্মশান হইতে ফিরিয়া আইলাম, তখনো মনে করিতে পারি নাই যে তিনি মরিয়াছেন; আমার নিশ্চয় যে তিনি বাঁচিয়াই আছেন। এখন দেখিলাম, আমার সেই জীবন্ত মা আমার সম্মুখে। তিনি বলিলেন, "তোকে দেখ্‌বার ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তোকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা'[৩]!" তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার এই মিষ্ট কথা শুনিয়া, আনন্দ-প্রবাহে আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দেখি যে, আমি সেই বিছানাতেই ছট্ ফট্ করিতেছি।

শ্রাদ্ধের দিন[৪] উপস্থিত হইল। বাড়ীর সম্মুখে পশ্চিম প্রাঙ্গণে দীর্ঘ চালা প্রস্তুত হইল। দান-সাগরের সোণা রূপার

---

(১) দেবেন্দ্রনাথ নিজের ঘরে এই প্রকার আসবাব রাখিতে ভাল বাসিতেন। (২) পরিশিষ্ট ২।

(৩) ইহা এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের এক চরণ,—

'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন,
অপারসম্বিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লগ্নং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ।'

(৪) ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৬; ৩৯ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ষোড়শে সেই চালা সজ্জিত হইল। ক্রমে ক্রমে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধুবান্ধবে প্রাঙ্গণ পূরিয়া গেল। আমি পৌত্তলিকতার সংশ্রব-বর্জ্জিত দানোৎসর্গের একটি মন্ত্র স্থির করিয়া দিয়া, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে বলিয়া রাখিলাম যে, "দানোৎসর্গের সময় তুমি আমাকে এই মন্ত্র পড়াইও।" এদিকে পুরোহিত আত্মীয় স্বজনেরা চালার মধ্যস্থলে শালগ্রামাদি স্থাপন করিয়া আমার উপবেশন অপেক্ষা করিতেছেন। চারিদিকে গোলমাল, চারিদিকে লোক জনের ভিড়। আমি এই অবসরে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে লইয়া শ্রাদ্ধস্থানের এক সীমান্তে যাইয়া আমার সেই নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র দ্বারা দানসামগ্রী উৎসর্গ করিতে লাগিলাম। দুই তিনটা দান শেষ হইয়া গেল; তখন আমার পিসতুত ভাই মদন বাবু[১] ইহা দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তোমরা এখানে কি করিতেছ? ওদিকে যে দান উৎসর্গ হইতেছে। সেখানে শালগ্রাম নাই, পুরোহিত নাই, কিছুই নাই।" আবার অন্য দিকে আর এক গোল, সকলে বলিতেছে, "ঐ কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে দিল না।" নীলরতন হালদার[২] বলিলেন, "আহা! কর্ত্তা কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন।" আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কীর্ত্তনীয়াদের আসিতে বারণ করিলে কেন?"

---

(১) দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহোদরা রাসবিলাসীর পুত্র; (বংশলতিকা দ্রষ্টব্য)। ইহাঁকে দ্বারকানাথ চেষ্টা করিয়া নিমক বিভাগের দেওয়ান করিয়া দিয়াছিলেন।

(২) রামমোহন রায়ের ও দ্বারকানাথের বন্ধু; ইনি এই উভয়ের সহিত মিলিত হইয়া Bengal Herald নামক স্বল্পকালজীবী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি 'জ্ঞানরত্নাকর' নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনিও নিমক বিভাগের দেওয়ান ছিলেন।

আমি বলিলাম, "আমি তো তার কিছুই জানি না; আমি তো বারণ করি নাই।" তিনি বলিলেন, "ঐ যে হাজারী লাল কীর্ত্তনীয়াদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দিতেছে না।" আমি তাড়াতাড়ি ষোড়শ ও দানসামগ্রী-সকল উৎসর্গ করিয়াই আমার তেতালায় চলিয়া গেলাম। কাহারও সঙ্গে তাহার পর আর আমার সাক্ষাৎ হইল না। শুনিলাম, গিরীন্দ্রনাথ শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

এই সকল গোল মিটিয়া গেলে মধ্যাহ্নের পর আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ও কয়েক জন ব্রাহ্মকে লইয়া নীচের তালায় আমার পাথরের ঘরে কঠোপনিষৎ পাঠ করিলাম; যেহেতুক, কঠোপনিষদে আছে যে, শ্রাদ্ধকালে যে এই উপনিষদ্ পাঠ করে, তার সেই শ্রাদ্ধের ফল অনন্ত হয়[১]।

সে দিন আর কোন কথার উত্থাপন হইল না। জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব, যেখান হইতে যিনি আসিয়াছিলেন, সকলেই আহার করিয়া চলিয়া গেলেন। পর দিবস ভোজের নিমন্ত্রণে জ্ঞাতি কুটুম্ব আর কেহই আইলেন না। তাঁহারা সকলে আমাকে ত্যাগ করিলেন। আমার খুড়ো, খুড়তুতো ভাই, জেঠতুতো ভাই ও আমার চারি পিসী আমার সঙ্গে যোগ দিয়া রহিলেন[২]। ইহাঁদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ী; ইহাতেই আমাকে কেহ এক-ঘরে করিতে পারিল না।

আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম, "তুমি যে শ্রাদ্ধ করিলে,

---

(১) কঠ. ৩।১৭।

(২) খুড়ো রমানাথ ঠাকুর; খুড়তুতো ভাই নৃপেন্দ্রনাথ; জেঠতুতো ভাই ব্রজেন্দ্রনাথ। চারি পিসী,—জাহ্নবী, রাসবিলাসী, দ্রবময়ী ও বিনোদিনী। বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।

তাহাতে কি ফল হইল? তোমার কৃত শ্রাদ্ধ কেহ তো স্বীকার করিল না; অথচ তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। যাহাদের সন্তোষের জন্য তুমি তোমার ধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে, তাহারা তো ভোজে যোগ দিল না।"

প্রসন্নকুমার ঠাকুর আমাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব।" আমি উত্তর দিলাম, "যদি তাই হবে, তবে এতটা কাণ্ড কেন করিলাম? আমি আর পৌত্তলিকতার সঙ্গে মিলিতে পারিব না।"

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই প্রথম দৃষ্টান্ত[১]। জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলাম। এছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।

---

(১) পরিশিষ্ট ৩৯ দ্রষ্টব্য

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বৈষয়িক কথা। দ্বারকানাথের জমিদারী ও ব্যবসায়। ব্যবসায় নষ্ট হইলে জমিদারী নষ্ট না হয়, এজন্য ট্রষ্ট ডীড্ করা (১৮৪০)। দ্বারকানাথের উইল; তাহাতে কলিকাতার বাড়ী ও জমির বিভাগ; ব্যবসায়ে নিজের সমগ্র (আট আনা) অংশ দেবেন্দ্রনাথকে দান (১৮৪৩)।—পিতার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ সে আট আনা অংশ তিন ভাইর মধ্যে বাঁটিয়া দিলেন। গিরীন্দ্রনাথের পরামর্শে সাহেব অংশীদারদিগকে বেতনভোগী কর্ম্মচারীতে পরিণত করা হইল। গিরীন্দ্রনাথ ব্যবসায় পর্য্যবেক্ষণের ভার লওয়াতে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজের কাজ করিতে অধিক অবসর লাভ করিলেন (১৮৪৬)।

আমার পিতা ১৭৬৩ শকের পৌষ মাসে[১] য়ুরোপে প্রথম বার যান। তখন তাঁহার হাতে হুগলী, পাবনা, রাজসাহী, কটক, মেদিনীপুর, রঙ্গপুর, ত্রিপুরা, প্রভৃতি জেলার বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী, এবং নীলের কুঠী, সোরা, চিনি, চা প্রভৃতি বাণিজ্যের বিস্তৃত ব্যাপার। ইহার সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে কয়লার খনির কাজও চলিতেছে[২]। তখন আমাদের সম্পদের মধ্যাহ্ন সময়। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না। আমাদের হাতে পড়িয়া যদি বাণিজ্য-ব্যবসায় কার্য্যের পতন হয়, তবে, স্বোপার্জ্জিত যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জমিদারী আছে তাহাও তাহার সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে, এবং পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীও

(১) ১৮৪২, ৯ জানুয়ারী। (২) ৪০ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

থাকিবে না। তাঁহার বাণিজ্য ব্যাপারের ক্ষতিতে আমরা যে পূর্ব্বপুরুষদিগের বিষয় হইতেও বঞ্চিত হইব, এইটি তাঁহার মনে অতিশয় চিন্তার বিষয় ছিল। অতএব য়ুরোপে যাইবার পূর্ব্বে, ১৭৬২ শকে[১], আমাদের পৈতৃক বিষয় বিরাহিমপুর ও কটকের জমিদারীর সঙ্গে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত ডিহি সাহাজাদপুর ও পরগণা কালীগ্রাম একত্র করিয়া, এই চারিটি সম্পত্তির উপরে একটি ট্রষ্ট ডীড্ লিখিয়া, তিন জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সমস্তের অধিকারী তাঁহারাই হইলেন; আমরা কেবল তাহার উপস্বত্ব-ভোগী রহিলাম। তাঁহার এই কার্য্যে আমাদের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও সূক্ষ্ম ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, উভয়ই প্রকাশ পাইয়াছে।

তিনি প্রথম বার য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার ছয় মাস পরে, ১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে,[২] একটা উইল করিলেন। তাহাতে তাঁহার সমুদায় বিষয় আমাদের তিন ভাইকে সমান ভাগে বিভাগ করিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন; ভদ্রাসন বাড়ী আমাকে, তেতালার বৈঠকখানা বাড়ী আমার মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথকে, এবং বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য ২০,০০০৲ বিশ হাজার টাকার সহিত ভদ্রাসন বাড়ীর পশ্চিম প্রাঙ্গণের ভূমি সমুদায়টা আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথকে দিয়া গিয়াছিলেন[৩]। আমাদের কার-ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্য ব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ

---

(১) ১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট; ট্রষ্ট্ ডীড্ সম্বন্ধে ১৪ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮৪৩, ১৬ই আগষ্ট। এই উইলে দরিদ্রদের জন্য এক লক্ষ টাকা দানের আদেশ ছিল; দেবেন্দ্রনাথ (ঋণ শোধ শেষ হইলে) সুদ সমেত ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটিকে এই টাকা দেন। পরিশিষ্ট ২২ ও ৪১ দ্রষ্টব্য।

(৩) পরিশিষ্ট ৫।

আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন ; ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না, আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।

গিরীন্দ্রনাথের খুব বিষয়-বুদ্ধি ছিল। যখন হাউসের উপরে তাঁহার অধিকার জন্মিল, তখন এক দিন আমার নিকটে প্রস্তাব করিলেন যে, "যখন হাউসের মূলধন সকলি আমাদের, তখন সাহেবদিগকে হাউসের অংশ দেওয়া কেন হয়? সমুদয় বিষয় আমাদের অধিকারে আসুক না কেন?" এ কথা আমার মনে ধরিল না। বলিলাম, "এ প্রস্তাব বড় ভাল নয়। আপনাদিগকে অংশী মনে করিয়া সাহেবেরা এখন যেমন উৎসাহে, যে মনের বলে, কার্য্য করিতেছে, তাহাদিগকে সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিলে আমাদের কাজে তাহাদের তেমন দৃষ্টি ও উদ্যম থাকিবে না। আমরা একা একা কিছু এই বৃহৎ কার্য্য চালাইতে পারিব না, কাজের জন্য তাহাদের চাই-ই চাই। অংশী বলিয়া তাহারা যেমন লাভের অংশ পায়, তেমনি ক্ষতির সময়ে তাহাদেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। আর, অংশ না দিয়া তাহাদিগকে বেতনভোগী চাকর করিয়া রাখিলে, তাহাদের মোটা মোটা মাহিয়ানা আমাদের যোগাইতেই হইবে ; অথচ এখন হাউসের লাভের প্রতি তাহাদের যে যত্ন আছে, তখন আর তাহা থাকিবে না। অতএব তোমার এ প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে না।" তিনি আমাকে বুঝাইলেন যে, "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক্ সম্পত্তি নাই। যদি কখনো বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা

আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথা-সর্ব্বস্ব দিতে থাকিব। এখনো দেখুন কি হইতেছে, —আমাদের জমিদারীর সকল টাকাই এই হাউসে ঢালা হইতেছে। যতই টাকা দেওয়া যাইতেছে, ততই ইহার ক্ষুধার বৃদ্ধি হইতেছে; তাহার এ রাক্ষসী ক্ষুধা আর মিটে না। কিন্তু সাহেব অংশীরা ইহাতে এক পয়সাও দেন না।” এই কথায় আমি তাঁহার বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে হাউসের উপর কর্ত্তৃত্ব ভার দিলাম, এবং আমি ব্রাহ্মসমাজের কাজের জন্য প্রচুর অবসর পাইলাম।

এখন আমরা তিন ভাই অবিভাগে সমস্ত হাউসের অধিকারী হইলাম। পূর্ব্বকার অংশী সাহেবদিগকে, যাহার যেমন অংশ ছিল সেই অনুসারে, কাহাকেও বা এক হাজার টাকা, কাহাকেও বা দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে হাউসের কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। তাহারা অগত্যা তাহা স্বীকার করিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে কার-ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্যের এই নূতন প্রণালী নিবদ্ধ হইল। তাহাতে আমি সম্মত হওয়ায় তিনি উৎসাহ পাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক যথাসাধ্য হাউসের বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উপনিষদে পরা ও অপরা বিদ্যার ভেদ। বেদ ভাল করিয়া জানিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের কাশী যাত্রা। তথায় পূর্ব্বে প্রেরিত ছাত্রগণের সাহায্যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিমন্ত্রণ ও সংবর্দ্ধনা; চারি বেদ শ্রবণ; যজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে বিচার। কাশী-নরেশের নিমন্ত্রণ; দশমীর রামলীলা। বিন্ধ্যাচল ও মির্জাপুর ভ্রমণ; বিন্ধ্যাচলে গিরিদর্শনে আনন্দ। কুমারখালী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন। কাশী হইতে হাজারীলালের প্রচার যাত্রা (১৮৪৭)।

আমরা উপনিষদের উপদেশে জানিলাম, "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, এই সকলি অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা; আর, যাহার দ্বারা পরব্রহ্মকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।" এই কথা আমরা অতি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। আমাদের লক্ষ্যের সঙ্গে এ কথার খুব মিল হইয়া গেল। আমাদের সেই লক্ষ্য সাধারণের নিকটে ঘোষণা করিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ হইতে[১] তাহার শিরোভাগে এই বেদবাক্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম,—"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষর মধিগম্যতে[২]।"

---

(১) চারি বৎসরে এক কল্প। দ্বিতীয় কল্পের প্রথম ভাগ=৫ম বর্ষ। ১৮৪৭ সালের বৈশাখ।

(২) মুণ্ড. ১।১।৫। ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটির নাম বেদ; শিক্ষা প্রভৃতি ছয়টির নাম বেদাঙ্গ; এবং উপনিষদের নাম বেদান্ত। শিক্ষা=বৈদিক উচ্চারণের শাস্ত্র। কল্প=বৈদিক যজ্ঞাদির শাস্ত্র। নিরুক্ত=প্রাচীন দুরূহ বৈদিক শব্দের অর্থ।

যখন আমরা ইহাদ্বারা বুঝিলাম যে, বেদের মধ্যে দুই বিদ্যা আছে, পরা বিদ্যা এবং অপরা বিদ্যা, তখন অপরা বিদ্যার বিষয় কি, এবং পরা বিদ্যারই বা বিষয় কি, তাহা বিস্তাররূপে জানিবার জন্য বেদের অনুসন্ধানে উৎসুক হইলাম। আমি স্বয়ং কাশী যাইতে প্রস্তুত হইলাম। লালা হাজারীলালকে সঙ্গে লইয়া ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে[১] পাল্কীর ডাকে কাশী যাত্রা করিলাম। ১৪ দিনে অতি কষ্টে আমরা সেখানে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গাতীরে মানমন্দিরে আমার বাসস্থান হইল।

আমার প্রেরিত ছাত্রেরা সেখানে আমাকে পাইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় পাঠের অবস্থা এবং কাশীর সংবাদ আমাকে জানাইলেন। আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম যে, কাশীর প্রধান প্রধান বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার এখানে একটা সভা করিতে হইবে। আমি সব বেদ শুনিতে চাই এবং বেদের অর্থ বুঝিতে চাই। রমানাথ! তুমি তোমার ঋগ্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। বাণেশ্বর! তুমি তোমার যজুর্ব্বেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তারকনাথ! তুমি তোমার সামবেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর সামবেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। আনন্দচন্দ্র! তুমি তোমার অথর্ব্ববেদের গুরুকে বল যে, তিনি কাশীর অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করেন।" এই প্রকারে

---

(১) ১৮৪৭, সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগ। ২রা অক্টোবর (১৭ই আশ্বিন) মেমারি হইতে দেবেন্দ্রনাথ পথের কিঞ্চিৎ কৌতুকপূর্ণ বর্ণনা করিয়া রাজনারায়ণ বসুকে পত্র লিখিয়াছিলেন। (পত্রাবলী, ৩৪ দ্রষ্টব্য)।

কাশীর সকল ব্রাহ্মণদিগের[১] নিমন্ত্রণ হইয়া গেল। কাশীতে একটা রব উঠিল যে, বাঙ্গালা হইতে কে এক জন শ্রদ্ধাবান্ যজমান আসিয়াছেন, তিনি সমস্ত বেদ শুনিতে চান। বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডা আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন, ও আমাকে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। অমি বলিলাম, "আমি এই তো এই বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেই আছি, আর কোথায় যাইব ?"

আমার কাশী পহুঁছিবার তৃতীয় দিবসে প্রাতঃকালে মান-মন্দিরের প্রশস্ত গৃহ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাদের সকলকে চারি পংক্তিতে বসাইলাম; ঋগ্বেদের এক পংক্তি, যজুর্ব্বেদের দুই পংক্তি, এবং অথর্ব্ববেদের এক পংক্তি। সামবেদী দুইটি মাত্র বালক; তাহাদিগকে আমার পার্শ্বে বসাইলাম। তাহারা নূতন ব্রহ্মচারী, এখনো তাহাদের কর্ণে কুণ্ডল আছে, তাহাতে তাহাদের মুখের বড় শোভা হইয়াছে। বাণেশ্বর চন্দনের বাটি লইলেন, তারকনাথ ফুলের মালা লইলেন, রমানাথ কাপড়ের থান লইলেন, এবং আনন্দচন্দ্র ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা লইলেন। ব্রাহ্মণের ললাটে বাণেশ্বর যেমন চন্দনের ফোঁটা দিলেন, অমনি তারকনাথ তাঁহার গলায় ফুলের মালা দিলেন; রমানাথ তৎপরে তাঁহাকে এক খানা থান কাপড় দিলেন; অবশেষে আনন্দচন্দ্র তাঁহার হস্তে দুইটি টাকা দিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে ফোঁটা, মালা, কাপড় ও মুদ্রা বিতরিত হইল। ব্রাহ্মণেরা এই পূজা গ্রহণ করিয়া প্রহৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "যজমান বড়া শ্রদ্ধাবান্ হ্যায়্। কাশীমেঁ এয়্সা কোই কিয়া নহীঁ।"

(১) অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের। 'ঋগ্বেদী,' 'যজুর্ব্বেদী,' প্রভৃতি শব্দে এখানে ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি যাঁহাদের কণ্ঠস্থ এমন ব্রাহ্মণ বুঝিতে হইবে।

আমি যোড় হস্তে বলিলাম, "এখন আপনারা বেদ পাঠ করিয়া আমাকে পবিত্র করুন।" ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরা সকলে মিলিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে উৎসাহ সহকারে "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" পাঠ করিলেন। তাহার পরে যজুর্ব্বেদীরা যজুর্ব্বেদ আরম্ভ করিলেন। যেই তাঁহারা "ঈষে ত্বা, উর্জ্জে ত্বা" পাঠ ধরিলেন, অমনি এক জন ব্রাহ্মণ বলিলেন, "যজমান হম্‌কো অপমান কিয়া"। আমি বলিলাম, "কিসের অপমান?" তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ যজু প্রাচীন যজু হ্যায়্‌, উস্‌কা সম্মান আগে নহীঁ হুয়া, উস্‌কা পাঠ আগে নহীঁ হুয়া, হম্ লোগোঁকা অপমান হুয়া।" আমি বলিলাম, "তোমরা আপসে এ বিষয় মিট মাট করিয়া লও।" এখন এই দুই দলে বিবাদ বাধিয়া গেল,—কে আগে পড়িবে। আমি যখন দেখিলাম তাঁহাদের বিবাদ আর কোন মতে মিটে না, তখন আমি তাঁহাদের দুই দলকেই একত্র পড়িতে বলিলাম। এই কথায় তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া দুই দলেই উচ্চৈঃস্বরে গোলমালে পড়িতে লাগিলেন; কিছুই বুঝা যায় না। তখন আমি বলিলাম, "তোমাদের দুই দলেরই তো মান রক্ষা হইল, এখন এক দল নিরস্ত হও, এক দল পাঠ কর।" তখন প্রথম শুক্ল যজুর পাঠ হইয়া পরে কৃষ্ণ যজুর পাঠ হইল। যজুর্ব্বেদ পাঠ করিতে অনেক সময় লাগিল। সামবেদী বালকদের সাম গান শুনাইবার বড় উৎসাহ। যজুর্ব্বেদ পাঠের বিলম্বে তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। যজুর্ব্বেদ পাঠ শেষ হইলেই তাহারা আমার মুখের দিকে তাকাইল; আমি বলিলাম, "পড়।" অমনি তাহারা দুই জনে সুমধুর স্বরে "ইন্দ্র আয়াহি" সাম গান ধরিল। এমন সুমিষ্ট সাম গান আমি আর কখনো শুনি নাই। সর্ব্বশেষে অথর্ব্ববেদীরা পড়িলেন, এবং সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

সভা ভঙ্গের পরে ব্রাহ্মণেরা আমার প্রতি সদয় হইয়া বলিলেন, "যজমান, একঠো ব্রাহ্মণ ভোজন দীজে। একঠো উদ্যানমেঁ হমলোগ্ সব মিলকে ভোজন করেঙ্গে।" আমি তাঁহাদের কথায় উত্তর দিতে না দিতে তারকনাথ আমাকে কাণে কাণে বলিলেন, "ইহাঁদের আবার ব্রাহ্মণ ভোজন! আমাদের সকলি যোগাইতে হইবে, আর ইহাঁরা এক ময়দানে এক একটা চৌকা কাটিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র খাইবেন। ইহাতে আমাদের কি হইবে? এ তো আমাদের মত ব্রাহ্মণ ভোজন নয় যে, আমরা রাঁধিয়া দিব, তাঁহারা খাইবেন।"

আর এক জন ব্রাহ্মণ আমাকে বলিলেন, "আমাদের এখানে শীঘ্র একটা যজ্ঞ হইবে, আপনি যদি তাহা দেখিতে যান তো দেখিতে পাইবেন।" আমি বলিলাম, "আমি তো ইহারই জন্য এখানে আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন, "হম্‌লোগোঁকে যজ্ঞমেঁ পশু-বধ নহীঁ হোতা হ্যায়্। পিঠালী-মেঁ পশু নির্ম্মাণ কর্‌কে হম্‌লোগ্ যজ্ঞ কর্‌তে হ্যাঁয়্।" আর দিক হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন, "জিস্ যজ্ঞমেঁ পশু-বধ নহীঁ, ওহ্ যজ্ঞ ক্যা যজ্ঞ হ্যায়্? বেদমেঁ হ্যায়্, 'শ্বেতমালভেত'[১], শ্বেত ছাগলকো বধ করেগা।" আমি দেখিলাম, যজ্ঞেতেও দলাদলি আছে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

সেখানকার একজন শুদ্ধ-সত্ত্ব ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। আবার অপরাহ্ণ ৩টার সময়ে কাশীর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা শাস্ত্রালোচনার জন্য মানমন্দিরে আসিলেন। তাঁহাদের সভায় বেদের জ্ঞানকাণ্ড, কর্ম্মকাণ্ড, এবং অন্যান্য শাস্ত্রের তর্ক বিতর্ক হইল। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "যজ্ঞে পশুবধ বেদবিহিত কি না?"

(১) যজু. বা. মা. ২৪।১, ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।১ দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা বলিলেন, "পশুবধ না করিলে কখনো যজ্ঞ হয় না।" এই প্রকারে পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা হইতেছে, এমন সময়ে কাশীর রাজবাড়ীর একজন বাবু (বাবু বলিলে রাজার ভ্রাতাদিগকে বুঝিতে হইবে) আসিয়া আমাকে বলিলেন, "মহারাজের ইচ্ছা যে, আপনার সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়।" আমি তাঁহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। পরে সভা ভঙ্গ হইল, এবং শাস্ত্রীরা টাকা বিদায় লইয়া বাড়ী গেলেন। এক জন শাস্ত্রী বলিলেন, "আপকা দান গ্রহণ কর্‌কে হম্‌লোগ্ তৃপ্ত হুয়ে। কাশীমেঁ শূদ্রকা দান লেনেসে শরীর রোমাঞ্চিত হোতা হ্যায়্।"

পর দিনে সেই বাবু আসিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া কাশীর পরপারে রামনগরে লইয়া গেলেন। রাজা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। বাবু আমাকে রাজার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে লাগিলেন। ঘরগুলান ছবিতে, আয়নাতে, ঝাড় লণ্ঠনে, গালিচা দুলিচায়, মেজ কেদারায়, দোকানের ন্যায় ভরা রহিয়াছে। আমি এদিক ওদিক দেখিয়া বেড়াইতেছি, দেখি যে, আমার সম্মুখেই দুই জন বন্দী, রাজার যশোগান ধরিয়াছে। সে স্বর অতি মনোহর। ইহাতে রাজার আগমন সংবাদ বুঝিলাম। তিনি উপস্থিত হইয়াই আমাকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সভাতে লইয়া গেলেন। অমনি সেখানে নৃত্য গীত আরম্ভ হইল। তিনি আমাকে একটি হীরার অঙ্গুরী উপহার দিলেন। আমি অতি বিনয়ের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তিনি বলিলেন, "আপকে সাথ মিল্‌নেসে হম্‌কো বড়া আনন্দ হুয়া। দশমীকী রামলীলামেঁ আপ জরূর আনা।" আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে কাশী ফিরিয়া আসিলাম।

আবার রামলীলার দিন[১] রামনগরে উপস্থিত হইলাম। দেখি, রাজা মস্ত একটা হাতীতে বসিয়া আলবোলা টানিতে- তেছেন। তাঁহার পিছনে ছোট একটা হাতীতে তাঁহার হুঁকা- বরদার একটা হীরার আলবোলা ধরিয়া রহিয়াছে। আর একটা হাতীতে রাজগুরু গেরুয়া কাপড় পরা, মৌনী। পাছে কথা কহিয়া ফেলেন এজন্য তাঁহার জিহ্বাতে একটা কাঠের খাপ দেওয়া রহিয়াছে; ইহাতেও তাঁহার আপনার উপরে নির্ভর নাই। চতুর্দ্দিকে কর্ণেল, জর্ণেল[২], সৈন্যাধ্যক্ষেরা এক এক হাতীতে চড়িয়া রাজাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। আমিও চড়িবার জন্য একটা হাতী পাইলাম। আমরা সকলে মিলিয়া সেই রাম- লীলার রঙ্গভূমিতে যাত্রা করিলাম। মেলায় গিয়া দেখি যে, সেখানে লোকে লোকারণ্য। যেন সেখানে আর একটা কাশী বসিয়াছে। সেই মেলার এক স্থানে একটা সিংহাসনের মত, তাহা ফুলে ফুলে সাজান। উপরে চন্দ্রাতপ। সেই সিংহাসনে একটি বালক ধনুর্ব্বাণ লইয়া বসিয়া রহিয়াছে। লোকে যাইয়া তাহাকে ঢুস্ ঢুস্ করিয়া প্রণাম করিতেছে। এ ক্ষেত্রে তিনিই অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। খানিক পরে যুদ্ধক্ষেত্র। এক দিকে কতকগুলা সং-রাক্ষস, তাহাদের কাহারো কাহারো মুখ উটের মত, কাহারো ঘোড়ার মত, কাহারো বা ছাগলের মত। কাতারে কাতারে তাহারা সকলে দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতেছে। ঘোড়ার মুখ উটের কাণের কাছে, উটের মুখ ছাগলের কাণের কাছে যাইতেছে, এইরূপে পরস্পর কাণাকাণি করিতেছে। ভারি

(১) ১৮৪৭, ১৯ অক্টোবর। বিজয়া দশমী। বাংলা দেশের যাত্রার মত অভিনয়কে পশ্চিমে রামলীলা বলে। কিন্তু তাহা কেবল রামচন্দ্রের জীবন লইয়াই হয়। (২) অর্থাৎ General.

একটা যুদ্ধের পরামর্শ হইতেছে। খানিক পরে তাহাদের মধ্যে একটা বোম পড়িল, আর চারিদিকে আতস-বাজি হইতে লাগিল। আমি কাহাকে কিছু না বলিয়া ওখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

পরে কাশী হইতে নৌকাপথে বিন্ধ্যাচল দেখিয়া মির্জাপুর পর্য্যন্ত গেলাম। তখন বিন্ধ্যাচলের সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিয়াও যে কত আনন্দ, কত উৎসাহ হইল, তাহা বলিতে পারি না[১]। সকাল অবধি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রৌদ্রে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া নৌকায় ফিরিয়া আসিলাম, এবং একটু দুগ্ধ পাইলাম, তাহা খাইয়া বাঁচিলাম। সেই বিন্ধ্যাচলে যোগমায়া দেখিলাম, এবং ভোগমায়াও দেখিলাম। পাথরে খোদা দশভুজা যোগমায়া; একটি যাত্রী বা একটি লোকও সেখানে দেখিলাম না। ভোগমায়ার মন্দিরে গিয়া দেখি, কালী-ঘাটের ন্যায় সেখানে ভিড়। লাল পাগড়ী পরা খোট্টারা রক্ত-চন্দনের ফোঁটা এবং জবাফুলের মালা পরিয়া পাঁটা কাটিয়া রক্তের ছড়াছড়ি করিতেছে। এ একটা আমার অদ্ভুত বোধ হইল। আমি তাহাদের ভিড় ঠেলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। ঝাঁকি দর্শন[২] করিয়া আসিলাম।

তাহার পর মির্জাপুর হইতে এক ষ্টীমার করিয়া বাড়ীতে ফিরিলাম। কাশী হইতে সেই যাত্রায় আনন্দচন্দ্রকে লইয়া কুমারখালী পর্য্যন্ত আসিলাম। কুমারখালীতে আমার জমিদারী

---

(১) বোধ হয় দেবেন্দ্রনাথের এই প্রথম পর্ব্বত দর্শন।

(২) ভিতরে প্রবেশ না করিয়া দরোজার বাহির হইতে গলা বাড়াইয়া দর্শন।

পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আর আর ছাত্রেরা পরে কলিকাতায় আসিয়া সমাজের কার্য্যে ব্রতী হইলেন।

লালা হাজারীলাল কাশী হইতে রিক্ত হস্তে প্রচারের জন্য দূর দূরান্তে বহির্গত হইলেন। একটি অঙ্গুরী মাত্র সম্বল ছিল, তাহাতে খোদিত ছিল, "য়হ্ ভী নহীঁ রহেগা।" সেই যে তিনি গেলেন, আর ফিরিলেন না ; তাহার পর আর তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল না[১]।

---

(১) পরিশিষ্ট ৩৮।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া (১৮৪৭) বেদ পরিত্যাগ। বেদে পরা ও অপরা বিদ্যার মধ্যে, যাগযজ্ঞই অপরা বিদ্যা। গৃহ্য কর্ম্মে অগ্নির প্রাধান্য। বৈদিক দেবগণের মূর্ত্তি পূজা হয় না; কিন্তু তাঁহারা সাকার। ব্রাহ্মগণ বেদত্যাগী গৃহী; উপনিষদের ঋষিগণ বেদ ও গৃহ উভয়ই ত্যাগ করিতেন।—কিন্তু যাগযজ্ঞপ্রধান বেদের ভিতরেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-মূলক বাক্যসকল আছে; তাহা ক্রমে উপনিষদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহাই বেদের পরা বিদ্যা।

এইক্ষণে এই নিশ্চয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, বেদে অপরা বিদ্যার বিষয়[১] কেবল দেবতাদিগের যাগযজ্ঞ। ঋগ্বেদের হোতা, তিনি যজ্ঞে দেবতার স্তুতি করেন। যজুর্ব্বেদের অধ্বর্য্যু, তিনি যজ্ঞে দেবতাকে হবি দান করেন। সামবেদের উদ্গাতা, তিনি যজ্ঞে দেবতার মহিমা গান করেন।

এই বেদের দেবতা মোটে তেত্রিশটি। তাঁহাদের মধ্যে অগ্নি, ইন্দ্র, মরুৎ, সূর্য্য, ঊষা, এই কয়েকটি প্রধান। বেদের সকল ক্রিয়াতেই অগ্নি আছেন। অগ্নিকে ছাড়িয়া বেদের যজ্ঞই হয় না। অগ্নি-দেবতা যজ্ঞে কেবল স্তবনীয় নহেন, তিনি আবার যজ্ঞের পুরোহিত; রাজার পুরোহিত যেমন রাজার অভীষ্ট সম্পাদন করেন, অগ্নি স্বয়ং যজ্ঞের পুরোহিত হইয়া হোম সম্পাদন করেন। অগ্নিতে যে যে দেবতার উদ্দেশে হবি প্রদত্ত হয়, অগ্নি সেই সেই দেবতাকে সেই হবি বণ্টন করিয়া দেন; অতএব তিনি কেবল পুরোহিত নহেন, তিনি আবার দেবতাদের দূত। আর, হবি দান করিয়া যজমানেরা

---

(১) ১৩২ পৃষ্ঠা।

যে যে দেবতার নিকট হইতে যে যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা অগ্নি ভাণ্ডারীর ন্যায় তাঁহাদিগকে বণ্টন করিয়া দেন। অগ্নি-দেবতার অনেক কার্য্য। বেদে অগ্নি-দেবতার একাধিপত্য।

আবার দেখ, এই অগ্নি ব্যতীত আমাদের কোন গৃহ্যকর্ম্ম সমাধা হইতে পারে না। জাত-কর্ম্ম অবধি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল কার্য্যেই অগ্নি। অগ্নি বিবাহের সাক্ষী। শূদ্রের বেদে কোন অধিকার নাই, তথাপি বিবাহের সাক্ষীর জন্য তাহার অগ্নি চাই। তাহাতে তাহার অমন্ত্রক হবি দান করিতে হয়। আমাদের মধ্যে অগ্নি দেবতার যে এত আধিপত্য, আমি পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। বালককাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে, শালগ্রাম শিলা না হইলে আমাদের কোন কাজ হয় না। বিবাহাদি অনুষ্ঠানে শালগ্রাম, পূজা পার্ব্বণে শালগ্রাম, শালগ্রাম আমাদের গৃহদেবতা ; সর্ব্বত্র শালগ্রাম দেখিয়া তাহারই একাধিপত্য মনে করিতাম।

শালগ্রাম ও কালী দুর্গা পূজা পরিত্যাগ করিয়াই মনে করিয়াছিলাম যে, আমরা পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছি। কিন্তু এখন দেখি,—অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি এমন অনেক পুতুল আছেন, ইহাঁদের হাত পা শরীর নাই, তথাপি ইহাঁরা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ। ইহাঁদের শক্তি সকলেই অনুভব করিতেছে। বৈদিকদিগের এই বিশ্বাস যে, ইহাঁদিগকে তুষ্ট করিতে না পারিলে, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টিতে, সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে, বায়ুর প্রবল ঘূর্ণায়মান ঝড়ে, সৃষ্টি উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাঁদের তুষ্টিতেই জগতের তুষ্টি ; ইহাঁদের কোপেতে জগতের বিনাশ। অতএব বেদেতে অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য আরাধ্য দেবতা হইয়াছেন।

কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ, ইহাঁরা সব তন্ত্র পুরাণের আধুনিক

দেবতা ; অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্র, সূর্য্য, ইহাঁরা বেদের পুরাতন দেবতা, এবং ইহাঁদের লইয়াই যাগ যজ্ঞের মহা আড়ম্বর। অতএব কর্ম্মকাণ্ডের পোষক যে বেদ, তাহা দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আমরা বেদ পরিত্যাগ করিয়া বেদসন্ন্যাসী গৃহস্থ[১] হইলাম ; আমাদের গৃহ-কর্ম্মেতেও বেদবিহিত অগ্নির আর আধিপত্য রহিল না। কিন্তু পূর্ব্বকার ব্রহ্মবাদী ঋষিরা সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতেন। তাঁহারা যাগ যজ্ঞ ত্যাগ করিয়া আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। জ্ঞানের বিরোধী এই যাগ যজ্ঞের আড়ম্বরে বিরক্ত এবং মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া একেবারে বনে চলিয়া গেলেন। অরণ্যের মধ্যে যাইয়া পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়[২] যে ব্রহ্ম, তাঁহাতেই যুক্ত হইলেন ; ইন্দ্রিয়গোচর যে দেবতা, তাহার উপাসনা হইতে বিরত হইলেন। উপনিষদ্ সেই অরণ্যের উপনিষদ্। অরণ্যেতেই তাহার প্রণয়ন, অরণ্যেতেই তাহার উপদেশ, অরণ্যেতেই তাহার শিক্ষা। গৃহেতে ইহার পাঠ পর্য্যন্ত নিষেধ। আমরা প্রথমেই এই উপনিষদ্ পাইয়াছিলাম।

কিন্তু প্রাচীন ঋষিদেরও আত্মা যে, কেবল এই অগ্নি বায়ু প্রভৃতি পরিমিত দেবতার যাগ যজ্ঞ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, তাহাও নয়। তাঁহাদের মধ্যেও জিজ্ঞাসা হইল যে, এই দেবতারা কোথা হইতে আইলেন? তাঁহাদের মধ্যে সৃষ্টির প্রহেলিকা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। তাঁহারা বলিলেন, "কে ঠিক্ জানে, কোথা হইতে এই বিচিত্র সৃষ্টি? কে বা এখানে বলিয়াছে

---

(১) অর্থাৎ: কেবল বেদত্যাগী কিন্তু গার্হস্থ্যাশ্রমত্যাগী নহে। মনু. ৬।৮৬—৯৭, এবং রামমোহন রায় রচিত "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ" পুস্তিকা দ্রষ্টব্য।

(২) বৃহ. ১।৪।৮।

যে, কোথা হইতে এই সকল জন্মিয়াছে ? দেবতারা এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন ; তবে কে জানে যাঁহা হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ?—

কো অদ্ধা বেদ, ক ইহ প্রবোচৎ,
কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ ?
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন,
অথা কো বেদ যত আবভূব[১] ?"

ঋষিরা যখন এই সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারিলেন না, যখন তাঁহারা শান্তিহীন হইয়া বিষাদ-অন্ধকারে মুহ্যমান হইলেন, তখন তাঁহারা স্তব্ধ হইয়া একাগ্রমনে জ্ঞানময় তপঃ-সাধনে রত হইলেন। তখন দেব-দেব পরম দেবতা সেই একাগ্র-মনা স্থিরবুদ্ধি ঋষিদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া মন ও বুদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন। ইহাতে ঋষিরা জ্ঞানতৃপ্ত ও প্রহৃষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, কোথা হইতে এই সৃষ্টি, এবং কে এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন। তখন তাঁহারা উৎসাহ সহকারে ঋগ্বেদের এই মন্ত্র ব্যক্ত করিলেন,— সৃষ্টির পূর্ব্বে, "মৃত্যু অমৃত তখন কিছুই ছিল না। রাত্রির সহিত দিনও ছিল না, প্রজ্ঞানও ছিল না। তখন স্বীয় শক্তির সহিত অবাত-প্রাণিত সেই এক জাগ্রৎ ছিলেন। তাঁহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, এই বর্ত্তমান জগৎ ছিল না,—

ন মৃত্যুরাসী দমৃতং ন তর্হি,
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং,
তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস[২] ॥"

---

(১) ঋ. ১০।১২৯।৬। (২) ঋ. ১০।১২৯।২।

যে যে ঋষিরা তপঃপ্রভাবে দেব-প্রসাদে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন, তাঁহারাই এই প্রকারে তাঁহার সত্য বলিয়া গিয়াছেন, "যিনি আত্মদাতা, বলদাতা, যাঁহার বিধানকে বিশ্বসংসার উপাসনা করে, দেবতারাও যাঁহার বিধানকে উপাসনা করেন, অমৃত যাঁহার ছায়া, মৃত্যু যাঁহার ছায়া, তাঁহাকে ভিন্ন আর কোন্ দেবতাকে আমরা হবি দান করিব ?—

য আত্মদা বলদা, যস্য বিশ্ব
উপাসতে প্রশিষং, যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়াঽমৃতং, যস্য মৃত্যুঃ,
কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম[১] ?"

"তাঁহাকে তোমরা জানিলে না, যিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই অন্যকে জানিলে না, যিনি তোমাদের অন্তরে রহিয়াছেন। কেমন করিয়াই বা ইহাঁরা জানিবেন, যখন অজ্ঞাননীহারের দ্বারা ও বৃথা জল্পনা দ্বারা প্রাবৃত হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখে তৃপ্ত হইয়া, এবং যজ্ঞের মন্ত্রে অনুশাসিত হইয়া, ইহাঁরা সকলে বিচরণ করিতেছেন ?—

ন তং বিদাথ য ইমা জজান,
অন্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চ,
অসুতৃপ উক্থশাস শ্চরন্তি[২] "

দেখ, প্রাচীন ঋক্ ও যজুর্ব্বেদেতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মের তত্ত্ব, কেমন উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পাইতেছে। আশ্চর্য্য যে,

---

(১) ঋ. ১০।১২১।২।

(২) ঋ. ১০।৮২।৭ ; যজু. বা. মা. ১৭।৩১ ; যজু. তৈ. ৪।৬।২।২।

উপনিষদের যে সকল মহাবাক্য, তাহা সেই প্রাচীন বেদেরই মহাবাক্য ; সেই সকল বাক্যেতেই উপনিষদের মহত্ত্ব হইয়াছে। উপনিষদে যে আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম[১]", উপনিষদে যে আছে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া[২]",—এ সকলি ঋগ্বেদের বাক্য ; ঋগ্বেদ হইতে উপনিষদে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। বেদের যদি আর সকলি লোপ হয়, তবু এই সকল সত্য বাক্যের কখনো লোপ হইবে না। এই সত্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়া উপনিষদের ঋষিদের জীবনকে প্লাবিত, পবিত্র, ও উন্নত করিল। তাঁহাদের জীবন এই সকল সত্যে সংগঠিত হইল। তাঁহারা ইহা হইতে অমৃতের আস্বাদ পাইলেন, এবং মুক্তির পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা এই সকল সত্যের প্রভাবে মুক্ত হৃদয়ে বলিলেন,—

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়[৩]।

আমি এই তিমিরাতীত জ্যোতির্ম্ময় মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি ; সাধক কেবল তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।" আমি জানিলাম যে ইহাই পরা বিদ্যা, এবং এই পরা বিদ্যার বিষয়, "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম"।

(১) তৈত্তি. ২।১। ভাষ্যে আছে, "এষা ঋক্ অভ্যুক্তা", অর্থাৎ এটি ঋক্‌মন্ত্র ; কিন্তু এটি ঋগ্বেদ-সংহিতায় নাই।

(২) মুণ্ড. ৩।১।১ ; শ্বেতা. ৪।৬। এটি ঋগ্বেদে আছে (ঋ. ১।১৬৪।২০)।

(৩) যজু. বা. মা. ৩১।১৮ ; শ্বেতা. ৩।৮।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যবসায় পতন। উত্তমর্ণদিগের সভায় দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ট্রষ্ট সম্পত্তি তাঁহাদিগের হস্তে সমর্পণের প্রস্তাব। ঋণশোধের জন্য কমিটি নিয়োগ। দেবেন্দ্রনাথের ইন্‌সল্‌বেন্সীতে ঘৃণা ও বিষয়নাশে আনন্দ। ঋণ শোধের ভার স্বয়ং গ্রহণ, এবং সঙ্গে সঙ্গে তত্ত্বচিন্তায় ও শাস্ত্রচর্চ্চায় গভীর অভিনিবেশ। (১৮৪৮)।

আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে, আমাদের হাউস কার-ঠাকুর কোম্পানি টল্‌মল্‌ করিতেছে। হুণ্ডী আসিতেছে, তাহা পরিশোধ করিবার টাকা সহজে জুটিতেছে না। অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, প্রতিদিন টাকা যোগাইতে হইত। এমন করিয়া আর কত দিন চলে? এই সময়ে এক দিন একটা ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী আসিল; সে টাকা আর দিতে পারা যাইতেছে না। সে দিন সন্ধ্যা হইল, টাকা জুটিল না। হুণ্ডীওয়ালা টাকা না পাইয়া হুণ্ডী লইয়া ফিরিয়া গেল। কার-ঠাকুর কোম্পানির হাউসের সম্ভ্রম চলিয়া গেল, আফিসের দরজা সকল বন্ধ হইল।

১৭৬৯ শকের ফাল্গুন মাসে[১] কার-ঠাকুর কোম্পানির বাণিজ্য ব্যবসায় পতন হইল। তখন আমার বয়স ৩০ বৎসর। প্রধান কর্ম্মচারী ডি এম্ গর্ডন্ সাহেবের পরামর্শে সমস্ত পাওনাদারদিগকে ডাকিয়া একটা সভা করা গেল। ব্যবসায় পতনের তিন দিবস পরে হাউসের তৃতীয় তল গৃহে উঁহারা সকলে সমবেত হইলেন।

---

(১) ১৪ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ডি এম্ গর্ডন্ আমাদের দেনা পাওনার একটা হিসাব প্রস্তুত করিয়া এই সভাতে উপস্থিত করিলেন। সেই হিসাবে দেখান হইল যে, আমাদের হাউসের মোট দেনা এক কোটি টাকা, পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা; ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। তিনি সভার সম্মুখে বলিলেন যে, "হাউসের অধিকারীরা আপনার আপনার নিজের যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাও ইহাতে দিয়া ইহার অসংস্থান পূর্ণ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই হাউসের পাওনা ও সম্পত্তি, এবং ইঁহাদের জমিদারীর স্বত্ব, সকলি আপনারদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন। কিন্তু একটি ট্রষ্ট-সম্পত্তি আছে, তাহাতে তাঁহারা অধিকারী নহেন, কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।" গর্ডন্ এইরূপ বক্তৃতা করিতেছেন, আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম,—"গর্ডন্ সাহেব পাওনাদারদিগকে ভয় দেখাইতেছেন যে, আমাদের ট্রষ্ট-সম্পত্তিতে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। এ সময় আমাদের নিজে অগ্রসর হইয়া বলা উচিত, 'যদিও আমাদের দেনার দায়ে ট্রষ্ট-সম্পত্তি কেহ হস্তান্তর করিতে পারেন না, তথাপি আমরা এই ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া ঋণ পরিশোধের জন্য ইহাও ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছি।' যাহাতে আমরা পিতৃ-ঋণ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, সেই পথই অবলম্বন করা শ্রেয়। যদি অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ না হয়, তবে ট্রষ্ট-সম্পত্তিও বিক্রয় করিতে হইবে[১]।"

এদিকে, পাওনাদারেরা, কতকগুলা সম্পত্তির উপরে তাঁহাদের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইতেছেন না;

---

(১) পরিশিষ্ট ৪১।

কিন্তু যখন তাঁহারা অনতিবিলম্বেই শুনিলেন যে, কোন আইন আদালতের মুখাপেক্ষা না করিয়া আমরা স্বেচ্ছাক্রমে অকাতরে ট্রষ্ট-সম্পত্তির সহিত আমাদের সকল সম্পত্তিই তাঁহাদের হস্তে দিতে প্রস্তুত আছি, তখন তাঁহারা স্তম্ভিত হইলেন। দেখিলাম, আমাদের এই প্রস্তাব শুনিয়া অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল। আমাদের এই আসন্ন বিপদ দেখিয়া তাঁহারাও বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, এই হাউসের উত্থান ও পতনে আমাদের কোন হস্ত নাই; আমরা নির্দ্দোষ ও নিরীহ; আমাদের মস্তকে এই অল্প বয়সে এই দারুণ বিপদ পড়িল। আজ আমাদের এই ঐশ্বর্য্য বিভব, কাল আর ইহার কিছুই আমাদের থাকিবে না, ইহাই ভাবিয়া তাঁহারা দয়ার্দ্র হইলেন। কোথায় তাঁহাদের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ক্রুদ্ধ হইবেন, না, তাঁহারা দয়ার্দ্র-হৃদয় হইলেন। এই সময়ে তাঁহাদের হৃদয়ে কোথা হইতে দয়া আইল? তিনিই ইঁহাদের মনে দয়া প্রেরণ করিলেন, যিনি আমার চিরজীবন-সখা।

তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, যখন ইঁহারা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইঁহাদের সম্পত্তি হইতে ভরণ পোষণের জন্য ইঁহারা প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। দেনাদার পাওনাদারদিগের মধ্যে এইরূপে একটা সদ্ভাব রহিয়া গেল। কেহ আর তখন আপনার পাওনার জন্য আদালতে নালিশ আনিলেন না[১]। আমাদের সকল সম্পত্তি তাঁহারা আপন হাতে গ্রহণ করিলেন, এবং সেই বিষয় চালাইবার জন্য তাঁহাদের মধ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত করিলেন। সেই কমিটির একজন সম্পাদক হইলেন, তাঁহার

(১) পরে আনিয়াছিলেন (অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)।

বেতন এক হাজার টাকা হইল; তাঁহার অধীনে আরও কর্ম্মচারী থাকিল। এখন হইতে "কার-ঠাকুর কোম্পানি ইন্ লিকুইডেশন্" নামে তাঁহাদের কার্য্য চলিতে লাগিল[১]।

আমাদের সকল সম্পত্তির উপরে পাওনাদারেরা আপন কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিয়া সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা দুই ভাই বাড়ী চলিলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে আমি গিরীন্দ্রনাথকে বলিলাম, "আমরা তো বিশ্বজিৎ যজ্ঞ[২] করিয়া সকলি দিলাম।" তিনি বলিলেন, "হাঁ, এখন লোকে জানুক, আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই; তাহারা বলুক যে, 'ইঁহারা সকল ধন দিলেন, সর্ব্ববেদসং দদৌ'[৩]।" আমি বলিলাম যে, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত তো শুনিবে না। আদালতে যে কেহ এক জন নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে, 'আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই'; নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু, যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে, 'সব দিলাম'। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন,—যেন ইন্‌সল্‌বেণ্ট্ আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়[৪]।" এই সকল কথাবার্ত্তায় আমরা বাড়ী পঁহুছিলাম।

আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত

---

(১) ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত এরূপ চলিয়াছিল।

(২) এই যজ্ঞের দক্ষিণা, যজমানের সর্ব্বস্ব।

(৩) কঠোপনিষদের আরম্ভের ভাষা।

(৪) পরিশিষ্ট ৪১।

হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই[১], তেমনি বিষয়ও নাই; বেশ মিলে গেল!

در ان هوا که جز برق اندر طلب نباشد
گر خرمنی بسوزد چندی عجب نباشد

[দর্ আঁ হবা কে জুজ়্ বরক়্ অন্দর্ তলব্ ন বাশদ্
গর্ খি.র্মনে বেসোজ.দ্ চন্দে অ.জব্ ন বাশদ্।
দীবান্ হাফি.জ়্, ১৮১।১]

"সেই অভিলাষে,—বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক,—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায়, তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে[২]।" 'বিদ্যুৎ পড়ুক, বিদ্যুৎ পড়ুক', বলিতে বলিতে যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া সব জ্বলিয়া যায়, তবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমি বলি যে, "হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না". তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন, গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন, এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন। "দমড়ীকী ঠুড্ডিয়াঁ মুয়েস্সর নহীঁ, কে চিবাকে পানী পিয়ূঁ[৩]।" যাহা প্রার্থনাতে ছিল, তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল।

---

(১) ১০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) এই দুই পংক্তির অর্থ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিলে এইরূপ দাঁড়ায়ঃ—"আমার প্রার্থনাতে তো [তোমার দৃষ্টির] বিদ্যুৎ বই আর কিছুর জন্য কামনা ছিল না; সেই প্রার্থনার ফলে যদি [সেই বিদ্যুৎ পড়িয়া] আমার শস্যাগার (অর্থাৎ ধন-সম্পত্তি) ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।" প্রথম পংক্তির অন্তিম শব্দের অর্থ 'না থাকুক' বলার চেয়ে 'ছিল না' বলাই অধিক ঠিক।

(৩) হিন্দী প্রবচন। 'এক দামড়ীর চাউল-ভাজাও আমার হাতে নাই, যে চিবাইয়া একটু জল খাইব'। আট দামড়ীতে এক পয়সা হয়।

সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন! আমি আর এক সোপানে উঠিলাম। চাকরের ভিড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম[১]; ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব, কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি, এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম[২]; এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর, অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল; এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

এই সময়ে আমি সকালে দুই প্রহর পর্য্যন্ত গভীর দর্শন-শাস্ত্রের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। দুই প্রহরের পর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেদ বেদান্ত মহাভারত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনায়, ও বাঙ্গালা ভাষায় ঋগ্বেদের অনুবাদে, নিযুক্ত থাকিতাম। সন্ধ্যার সময় ছাদের উপর প্রশস্ত কম্বল পাতিয়া বসিতাম। সেখানে আমার কাছে বসিয়া ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মেরা, ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু সাধুরা, নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। এই আলোচনাতে কখন কখন রাত্রি দুই প্রহরও অতিবাহিত হইয়া যাইত। সেই সময় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধ সকলও পরিদর্শন করিতাম[৩]।

---

(১) পরিশিষ্ট ৪২।

(২) তৈত্তি. ২।৮ ; বৃহ. ৪।৩।৩৩, ৪।৪।৭।

(৩) এক দিকে সম্পত্তি-নাশ, অপর দিকে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মে এই

হাউস পতনের তিন চারি মাস পরে গিরীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলিলেন যে, "এত দিন চলিয়া গেল, কিন্তু ঋণের তো কিছুই পরিশোধ হয় না। কেবল সাহেবেরা বসিয়া মাহিয়ানা খাইতেছে। এ প্রকার ব্যবস্থাতে ঋণ যে পরিশোধ হইবে, তাহা তো আশা করা যায় না। এরূপ করিয়া চলিলে আমাদের ঘর বাড়ী বিক্রয় করিয়াও ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব না। অতএব আমি পাওনাদারদের কমিটিতে এই প্রস্তাব করিতে চাই যে, যদি তাঁহারা সমুদায় কার্য্যের ভার আমাদের হাতে দেন, তবে আমরা আপনারা চেষ্টা করিয়া অল্প ব্যয়ে অনতি-দীর্ঘকালে ঋণ পরিশোধের একটা উপায় করিতে পারি।" আমি বলিলাম যে, "এ তো বড় উৎকৃষ্ট প্রস্তাব।" পরে আমরা পাওনাদারদিগের সভাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলাম। তাঁহারা আহ্লাদ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত চিত্তে ইহাতে সম্মত হইলেন। তাহার পরে কাজ কর্ম্ম চালাইবার ভার আমরা নিজে গ্রহণ করিয়া আমাদের বাড়ীতেই আফিস উঠাইয়া আনিলাম, এবং সেই আফিসে এক জন সাহেব ও এক জন কেরাণী নিযুক্ত করিলাম। এখন আমাদের বাড়ীতে বসিয়াই কার-ঠাকুর কোম্পানির ঘুড়ীর লক্ গুটাইতে লাগিলাম। মধ্য পথে এখন তাহা না ছিঁড়িলে হয়!

অভিনিবেশ ও ধর্ম্মের জন্য এই পরিশ্রম! ১৮৪৮ সাল দেবেন্দ্রনাথের জীবনে এক আশ্চর্য্য বৎসর। ২৮ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যবসায় পতনের পরে বৈদিক ছাত্রগণকে কাশী হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইল। গভীর তত্ত্বচিন্তা ও শাস্ত্রচর্চ্চার ফলঃ—ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ; ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালীর দৃঢ়তর ভিত্তি; আত্মাতে, জগতে, ও আপনাতে-আপনি-স্থিত অবস্থায়, এই তিন ভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য তিনটি মন্ত্র; (১৮৪৮)।

চারি জন ছাত্রকে যে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার জন্য কাশীতে পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উপনিষদের মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বতর, বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাঙ্গের মধ্যে নিরুক্ত ও ছন্দ, বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটীক সূত্রভাষ্য, বেদান্তপরিভাষা, বেদান্তসার, অধিকরণমালা, সিদ্ধান্তলেশ, পঞ্চদশী ও সটীক গীতাভাষ্য, কর্ম্মমীমাংসার মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী, অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় ফিরিয়া আইলেন[১]। অপর তিন জনের মধ্যে ঋগ্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্যের ঋগ্বেদসংহিতার সপ্তমাষ্টকের তৃতীয় অধ্যায় ও তাহার ভাষ্যের প্রথমাষ্টকের ষষ্ঠাধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্যের মাধ্যন্দিন সংহিতার একত্রিংশৎ অধ্যায়, তৈত্তিরীয় সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়, কাণ্বভাষ্যের পূর্ব্বার্দ্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায় এবং তাহার উত্তরার্দ্ধের

---

(১) আনন্দচন্দ্রকে দেবেন্দ্রনাথ কাশী হইতে ফিরিবার সময়ে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন (১৩৮ পৃষ্ঠা)। আর তিন জন ছাত্রকে ১৮৪৮ সালে ব্যবসায় পতনের পর ফিরাইয়া আনিতে হইল।

পঞ্চবিংশতি অধ্যায় শিক্ষা হইয়াছে। সামবেদীয় ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ ভট্টাচার্য্যের সামবেদ বিষয়ে বেয়গানের ষট্ত্রিংশৎ সাম, আরণ্যগানের চতুর্থ প্রপাঠক, উহগানের সপ্তমার্দ্ধ, ও উত্তর ভাষ্যের ষষ্ঠ খণ্ডের তৃতীয় সূক্ত-ভাষ্য এবং কর্ম্মমীমাংসা, ও দর্শন বিষয়ে শাস্ত্রদীপিকার জাতিখণ্ডন পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইয়াছে। ইঁহাদিগের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম[১]।

এখন বেদ আলোচনা করিয়া আমার আরও বোধ হইল, ঋষিরা যে কেবল প্রকৃত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নিকে উপাসনা করিতেন, তাহাও নহে। তাঁহারা সেই এক পরমেশ্বরকেই অগ্নি বায়ু রূপে বহুপ্রকারে উপাসনা করিতেন। তাই ঋগ্বেদে[২] দেখা যায়,—

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি
অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ",

ঋষিরা সেই এক পরমেশ্বরকে অগ্নি, যম, বায়ু রূপে বহুপ্রকারে বলেন। যজুর্ব্বেদেও আছে[৩], "এষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ", ইনিই সকল দেবতা। এই বেদবাক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঋগ্বেদ-অনুবাদের ভূমিকাতে[৪] বলিয়াছিলাম যে, "সূর্য্যের অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি সূর্য্যদেবতা। বায়ুর অন্তর্যামী যে

---

(১) ইনি আজীবন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ছিলেন। বেদান্ত ও গীতা, এবং এসিয়াটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (Bibliotheca Indicaর অন্তর্গত) শ্রৌত ও গৃহ্য সূত্র সম্পাদন করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন।

(২) ঋ. ১।১৬৪।৪৬।

(৩) ঠিক যজুর্ব্বেদে নয়, কিন্তু যজুর্ব্বেদের ব্রাহ্মণ 'শতপথ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৪।৬ মন্ত্রে।

(৪) ১৮৪৮ সালের ফাল্গুনের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়।

কোন পুরুষ, তিনি বায়ুদেবতা। অগ্নির অন্তর্যামী যে কোন পুরুষ, তিনি অগ্নিদেবতা। ইহাতে বৈদিকেরা বাহ্য জড় সূর্য্য প্রভৃতিকে উপাসনা করেন না, কিন্তু তাহার অন্তর্যামী যে চৈতন্য পুরুষ, তাঁহারই উপাসনা করেন।”

তন্ত্র-পুরাণের দেবতা, আর বেদের দেবতা, ইঁহাদের অনেক প্রভেদ। কিন্তু এদেশের সাধারণ লোকদের মধ্যে এ ভেদ জ্ঞান নাই। ইহাদের বিশ্বাস যে, বেদের মধ্যেই কালী দুর্গা পূজার বিধি আছে। এই সকল ভ্রম দূরীকরণের জন্য, এবং আমাদের পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মের ক্রম-অভিব্যক্তি জানিবার জন্য, কাশীর এক জন পণ্ডিতের সাহায্যে আমি ঋগ্বেদ-অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ঋগ্বেদের পূর্ব্বার্দ্ধ-মূল সভায়[১] সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ভাষ্য যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আপাততঃ বেদ-অনুবাদ নির্ব্বাহ হইতে থাকিবে। কিন্তু এ প্রকাণ্ড কাণ্ড। ইহার সংহিতাতেই দশ সহস্রেরও অধিক শ্লোক। আমি যে ইহা সমাপ্ত করিতে পারিব, তাহার কোন আশা নাই। তথাপি সাধ্যমত যাহা পারি, তাহাই অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মুদ্রিত করিতে লাগিলাম[২]।

এত দিন ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মোপাসনাতে “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম”, “আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি”, এই দুই মহাবাক্য ছিল[৩]; ইহা অপূর্ণ ছিল। এখন তাহাতে “শান্তং শিবমদ্বৈতং[৪]” যোগ

---

(১) তত্ত্ববোধিনী সভায়।

(২) ১৮৪৮ হইতে ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত ২৪ বৎসরে প্রথম মণ্ডলের ১০৮ সূক্ত পর্য্যন্ত ১২৪৮টি ঋকের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত হয়।

(৩) ৮৯ পৃষ্ঠা। (৪) মাণ্ডু. ৭।

হওয়ায় তাহা পূর্ণ হইল। সমাজের উপাসনা প্রণালী প্রথম প্রবর্ত্তিত হইবার তিন বৎসর পরে ১৭৭০ শকে[১] আমি তাহাতে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" যোগ করিয়া দিই।

যিনি আত্মার অন্তর্যামী ব্রহ্ম, এবং তাহাতে নিয়ত জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন, তিনি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"; তাঁহাকে অন্তরে উপলব্ধি করি। যখন সেই "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে" এই অসীম আকাশস্থিত জগতের শোভা সৌন্দর্য্যের মধ্যে দেখি, তখন দেখি যে "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি," তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। "স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ[২]", সেই জন্ম-বিহীন পরমাত্মা বাহিরেও আছেন, অন্তরেও আছেন।

আবার, তিনি "অনন্তর মবাহ্যং[৩]", "নিত্য মেবাত্মসংস্থং[৪]"; তিনি অন্তরে বাহিরে থাকিয়াও, আপনাতে আপনি আছেন, এবং আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন যে জ্ঞান ধর্ম্মে, প্রেম মঙ্গলে, সকলে উন্নত হউক। তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং"।

সাধকদিগের এই তিন স্থানে ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে,—অন্তরে তাঁহাকে দেখিবেন, বাহিরে তাঁহাকে দেখিবেন, এবং আপনাতে আপনি যে আছেন, সেই ব্রহ্মপুরে তাঁহাকে দেখিবেন। যখন তাঁহাকে অন্তরে আমার আত্মাতে দেখি, তখন বলি, "তুমি অন্তরতর অন্তরতম, তুমি আমার পিতা, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সখা"। যখন তাঁহাকে বাহিরে দেখি, তখন বলি, "তব রাজ সিংহাসন অসীম আকাশে"। যখন তাঁহাকে তাঁহার আপনাতে দেখি, তাঁহার স্বীয় ধামে

(১) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। (২) মুণ্ড. ২।১।২।
(৩) বৃহ. ৩।৮।৮। (৪) শ্বেতা. ১।১২।

সেই পরম সত্যকে দেখি, তখন বলি, “তুমি শান্তং শিবমদ্বৈতং, তুমি শান্তভাবে আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছ”।

আমরা একই সময়ে সব ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের অন্তরে ভাবি; কখনো তাঁহাকে আমরা আমাদের বাহিরে ভাবি; কখনো ভাবি যে তিনি আপনাতে আপনি রহিয়াছেন। কিন্তু, একই সময়ে, সেই অবাতপ্রাণিত[১] নিত্য জাগ্রত পুরুষ, আপনাতে আপনি শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া, আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন, আমাদের অন্তরে জ্ঞানধর্ম্ম প্রেরণ করিতেছেন, এবং বহির্জ্জগতে জীবের কাম্যবস্তু সকল বিধান করিতেছেন। তাঁর “যুগ যুগ একো বেশ[২]।”

“কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন,
করিতে যাঁহার স্তুতি, অবসন্ন হয় শ্রুতি, স্মৃতি, দরশন![৩]”

তাঁহার প্রসাদে আমার এখন এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে-যোগী সেই একই সময়ে তাঁহার এই ত্রিত্ব দেখিতে পান,—দেখিতে পান যে, তিনি আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের অন্তরে আছেন, আপনাতে আপনি থাকিয়া সকলের বাহিরে আছেন, এবং আপনাতে আপনি থাকিয়া আপনার মঙ্গল ইচ্ছা নিত্যই জানিতেছেন,—তিনি পরম যোগী। তিনি তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া আপনার প্রাণ, মন, প্রীতি, ভক্তি, সকলি তাঁহাতে অর্পণ করেন, এবং অপরাজিত চিত্তে তাঁহার শাসন বহন করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করেন। তিনিই ব্রহ্মোপাসকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

(১) ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) নানকের উক্তি; (জপজী, পোড়ী ২৮, ২৯)।

(৩) কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত সঙ্গীতের প্রথম ও দ্বিতীয় পংক্তি। (রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের ৩৫ সংখ্যক সঙ্গীত)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বর্দ্ধমান ভ্রমণ। বর্দ্ধমান-রাজ মহ্‌তাব্‌-চন্দ্‌ ও কৃষ্ণনগর-রাজ শ্রীশচন্দ্র।

(১৮৪৮)।

এই সময়ে, ১৭৭০ শকের আশ্বিন মাসে[১], কতকগুলি বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া আমি দামোদর নদীতে বেড়াইতে যাই। সাত দিন সেই দামোদরের বাঁক ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক দিন বেলা চারিটার সময় তাহার তীরের একটা চড়ায় নৌকা লাগাইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে, বর্দ্ধমান ইহার খুব নিকটে, দুই ক্রোশ দূরে। অমনি আমার বর্দ্ধমান দেখিতে কৌতূহল হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ চড়া ভাঙ্গিয়া বর্দ্ধমান চলিলাম। রাজনারায়ণ বসু আর দুই এক জন আমার সঙ্গে। সহরে পঁহুছিলাম। তখন সন্ধ্যার দীপ ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে, জ্বলিতেছে। আমরা ইতস্ততঃ বেড়াইয়া বেড়াইয়া সহর দেখিলাম, বাজার দেখিলাম, রাজবাড়ী দেখিলাম। রাজবাড়ীর মধ্যে বাতির আলোকে আলোকিত একটা ঘরে রাজা যেন বসিয়া আছেন, শাশীর বাহির হইতে আমাদের এমনি বোধ হইল। আমাদের কৌতূহল পূর্ণ করিয়া আবার দামোদরের সেই চড়া ভূমি দিয়া নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। রাজনারায়ণ বাবু এত পর্য্যটন বোধ হয় কখনো করেন নাই। আমাদের সঙ্গে তিনি আর চলিয়া উঠিতে পারেন না। অনেক কষ্টে নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি শুইয়া পড়িলেন; দেখি, তাঁহার জ্বর হইয়াছে।

---

(১) ১৮৪৮ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। পরিশিষ্ট ৪৩ দ্রষ্টব্য।

পর দিন বেলা প্রথম প্রহরে তরুণ সূর্য্য-রশ্মি-বিধৌত সেই দামোদরের পুণ্য-স্রোতে স্নান করিয়া নীল পট্ট-বস্ত্র পরিধান করিলাম, এবং নিয়মিত উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। এমন সময়ে দেখি, সেই চড়া ভাঙ্গিয়া এক খানা সুন্দর ফিটন গাড়ী চারিদিকে বালুর মেঘ তুলিয়া আসিতেছে। যেখানে উষ্ট্রের পথ, সেখানে কি ভাল গাড়ী চলিতে পারে, না ঘোড়া দৌড়িতে পারে? আমি বুঝিতে পারিতেছি না যে, এমন স্থান দিয়া ইহারা কোথায় যাইতেছে। দেখি যে, সে গাড়ী আমার বোটের সম্মুখে দাঁড়াইল। কোচ-বাক্স হইতে এক জন লাফাইয়া পড়িল, সে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চায়। আমি তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি চাও?" সে যোড়-করে আমাকে বলিল যে, "বৰ্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া এই গাড়ী পাঠাইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করুন।" আমি বলিলাম, "এখন আমি নদী, বন, পাহাড়, পৰ্ব্বত দেখিতে বাহির হইয়াছি; এখন আমি কোথায় রাজদর্শন করিতে যাইব? আমি এই নদী দিয়া আসিয়াছি, এই নদী দিয়াই ফিরিয়া যাইব। আমি আর ডাঙ্গায় উঠিব না।" সে বলিল যে, "আমি আপনাকে লইয়া যাইতে না পারিলে মহারাজের কাছে অত্যন্ত অপরাধী হইব। আপনি আমার প্রতি সদয় হউন। এক বার রাজাকে দর্শন দিন। আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিলে আপনি অবশ্যই পরিতৃপ্ত হইবেন। আমি আপনাকে না লইয়া যাইব না।" তার এত কাতরতা ও মিনতি দেখিয়া আমি যাইতে স্বীকার করিলাম।

আমি ভোজন করিয়া দুই প্রহরের পর বৰ্দ্ধমানে চলিলাম। যখন পঁহুছিলাম, তখন বেলা অবসান হইয়াছে। নানা উপকরণে

সুসজ্জিত একটি বাসস্থান আমার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়া রহিয়াছে। সেখানে রাজার প্রধান প্রধান অমাত্যেরা আমাকে ঘেরিয়া বসিল; তাঁর গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে, কীর্ত্তি চাটুয্যে সকলেই আমার কাছে হাজির। আমার বাসা হইতে রাজবাড়ী পর্য্যন্ত, আমি কি করিতেছি, কি বলিতেছি, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই সংবাদ লইবার জন্য ডাক বসিয়া গেল।

পর দিন প্রাতে তিন চারি খানা গরুর গাড়ী করিয়া চাল, ডাল, ময়দা, সূজী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী আমার বাসাতে আসিয়া উপস্থিত। আমি লোকদের জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এত জিনিস কেন?" তাহারা বলিল যে, "রাজগুরুর জন্য যে সিধা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সিধা আপনাকে মহারাজ পাঠাইয়াছেন।" তাহার পরে দুই প্রহরের সময় জুড়ি আসিয়া আমার দরজায় দাঁড়াইল। আমি সেই গাড়ীতে চড়িয়া রাজবাড়ীতে চলিয়া গেলাম। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি আমাকে বহু সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি বিলিয়ার্ড খেলিতেছেন, সকলেই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমিও তাঁহার বিলিয়ার্ড খেলার আমোদে যোগ দিলাম। তিনি আমাকে ধরিয়া একটা উচ্চ আসনে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার নম্রতা বিনয় ও অনুরাগ দেখিয়া আমারও অনুরাগ তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল।

আমার সহিত এই প্রকারে তাঁহার সম্মিলন হইল, এবং ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ বাড়িতে লাগিল। তিনি আমার পরামর্শে রাজবাড়ীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজের বেদীর কার্য্যের এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য আমি শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্যকে এবং তারকনাথ ভট্টাচার্য্যকে তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

ইহার পর আমি সর্ব্বদাই বর্দ্ধমানে গিয়া তাঁহাকে উৎসাহ দিতাম, এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতাম। তিনিও আমাকে পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। তাঁহার জন্মোৎসবে, তাঁহার বনভোজনে, যখন যে উপলক্ষে সেখানে যাইতাম, আমার সঙ্গে তাঁহার ব্রহ্মোপাসনা হইতই হইত।

তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিও ছিল, শ্রদ্ধাও ছিল। এক রাত্রিতে ব্রহ্মোপাসনার সময়ে তিনি বক্তৃতা[১] করিলেন, "আমি কি অকৃতজ্ঞ! তিনি আমাকে এত সম্পদ দিয়াছেন, আমি তাহার জন্য তাঁহার কাছে যথোচিত কৃতজ্ঞ হই না, তাঁহাকে স্মরণ করি না। কিন্তু কত কত দীন দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে অতি অল্প পাইয়াও তাঁহার কাছে কতই কৃতজ্ঞ হয়, তাঁহাকে পূজা করে। আমি কি অকৃতজ্ঞ! কি অধম!" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এক দিন তিনি আমাকে তাঁহার অন্তঃপুরেই লইয়া গেলেন। সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে, আমাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, "আমরা এইখানে বসিয়া মাছ ধরি।" উপরে দোতালায় লইয়া গেলেন, দেখি, সেখানে জরির মছ্‌নদ্‌ পাতা বিবাহের বাড়ীর সজ্জার মত সব সাজান। তিনি বলিলেন, "এইখানে আমরা বসি।" আর একটা ঘরে লইয়া গিয়া বলিলেন যে, "এখান হইতে রাণী আমার বিলিয়ার্ড খেলা দেখিতে পান।" তাঁহার অন্তঃপুরে গিয়া সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার বোধ হইল যে, রাজা যেমন রাণীর প্রতি সন্তুষ্ট, রাণী তেমনি রাজার প্রতি সন্তুষ্ট; "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা, ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ"[২]। এক দিন রাজা আমাকে বলিলেন, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে,

---

(১) ৮৪ পৃষ্ঠার ৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। (২) মনু. ৩।৬০।

তাহা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।” আমি ভাবিলাম, না জানি কি-ই বলিবেন। আমি বলিলাম, “কি প্রার্থনা?” তিনি বলিলেন, “আপনাকে একটু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বসিতে হইবে; আপনার একটা ছবি লইব।” তাঁহার বাড়ীতে তখন এক জন ভাল কারু ইংরাজ আসিয়াছিল, সে আমার ছবি লইল। আমার তখনকার সেই ছবি এখনো তাঁহার ঘরে আছে।

রাজা মহাতাব চাঁদ আর নাই, তাঁহার পুত্র আফতাব চাঁদও অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্ম-সমাজ এখনো রহিয়াছে। সেখানে অদ্যাপি একজন উপাচার্য্য প্রতিনিয়ত ব্রহ্ম নাম ধ্বনিত করেন। কিন্তু তাঁহার কেহ শ্রোতা নাই; সেই শূন্য সমাজ-গৃহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাই তাহার একমাত্র দীপ।

এক দিন কলিকাতায় আমি গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেছিলাম[১], এক জন আসিয়া সেই পথে আমার হাতে একখানা পত্র দিল। খুলিয়া দেখি, সে পত্র কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্রের। তিনি তাহাতে লিখিয়াছেন যে, “কল্য পাঁচটার সময় টাউন হলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সুখী হইব।” আমি তাহার পর দিন পাঁচটার সময় টাউন হলে যাইয়া অপেক্ষা করিতেছি, একটু পরে তিনি আসিয়া আমাকে দেখা দিলেন। পরস্পরের সম্মিলনে বড়ই সুখী হইলাম। সেখানে তিনি আমার সহিত কেবলই ধর্ম্মালোচনা করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন

---

(১) ব্যবসায় পতনের পরে ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে গাড়ী ঘোড়াও বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, (১৫১ পৃষ্ঠা)। এই ঘটনা তাহার ঠিক পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিবে।

যে "এখানে এত অল্পক্ষণে আলাপ করিয়া মনের পরিতৃপ্তি হইল না। আমি কলিকাতায় এখনো তিন চারি দিন আছি, যদি ইহার মধ্যে কোন দিন সন্ধ্যার সময় আমার বাসায় যাইয়া আলাপ করেন, তবে বড় সুখী হই।"

তিনি প্রকাশ্যে আমার সহিত দেখা করিতে সঙ্কুচিত। আমি ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ব্রাহ্ম; আর তিনি নবদ্বীপাধিপতি, পৌত্তলিক সমাজের কর্ত্তা। আমার সহিত তাঁহার এই প্রথম আলাপ[১]। তিনি আপনিই আসিয়া আমার সহিত আলাপ করিলেন। কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া[২] আমি সর্ব্বদাই সেখানে যাইতাম। তিনি লোকমুখে আমার কথা শুনিয়া, আমার বক্তৃতাদি পড়িয়া, আমার সহিত আলাপ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময়ে আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসাতে গেলাম। আমাকে তিনি তাঁহার দোতালার ছাদের উপরে নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি দীপও নাই। গিয়াই তিনি অমনি মাটিতে বসিয়া পড়িলেন; আমিও তাঁহার সঙ্গে সেখানে মাটিতে বসিলাম; বেশ ফকিরী ভাব হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—

"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা,
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ,
সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ[৩]"।

তাঁহার অমায়িকতা ও সরলতা দেখিয়া তাঁহার সহিত আমার

---

(১) পরিশিষ্ট ৪৪। (২) ১৮৪৭ সালে। (৩) শ্বেতা. ৬।১১।

বড়ই সদ্ভাব জন্মিয়া গেল; আমরা এক-হৃদয় হইয়া গেলাম। বিদায় পাইবার সময় তিনি আমাকে বলিলেন যে, "এবার কৃষ্ণনগরে যখন যাইবেন, তখন এক রাত্রি আমার বাড়ীতে গিয়া থাকিতে হইবে। থাকিবেন কি?" আমি বলিলাম যে, "ইহা হইতে আহ্লাদ ও সৌভাগ্য আর কি আছে? আমাকে আপনি যখনি ডাকিবেন তখনি যাইব।"

তাহার পরে আমি কৃষ্ণনগরে গেলে, তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আমি সন্ধ্যার সময় তাঁহার রাজবাটীতে গেলাম। তিনি আমাকে একটি নিভৃত সুন্দর কুঠরিতে লইয়া বসাইলেন; সেখানে আর কেহ নাই, কেবল তাঁহার পুত্র সতীশচন্দ্র আছেন। আমাদের আমোদের জন্য তাঁহার ধ্রুপদ সকল শুনাইলেন। দুই প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত গানই চলিল। ষাট্ প্রকারের ব্যঞ্জন দিয়া আমাকে ভোজন করাইলেন। তাঁহার বাড়ীতে শয়ন করিলাম। খুব ভোরে রাজা আপনি আসিয়া আমাকে জাগাইলেন, এবং তাঁহার পূজার বাড়ী দেখাইয়া প্রভাতেই আমাকে বিদায় দিলেন।

সেই সময়ে ধর্ম্মযোগে এই দুইটি রাজার সহিত আমার যোগ হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এক জন প্রকাশ্যে আমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন; আর এক জন খুব গোপনে, কিন্তু খুব অন্তরে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুনরায় উপনিষৎ-প্রসঙ্গ। আধুনিক উপনিষদের কণ্টকারণ্য। প্রাচীন উপনিষদ্ সকলেও ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী বাক্য বিদ্যমান। জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি। উপনিষদে ব্রাহ্মগণের গ্রহণের যোগ্য ও অযোগ্য নানা বচন। আপ্তকাম ও আত্মকাম পুরুষের নিত্য অভয় ও আনন্দ। (১৮৪৮)।

আমি পূর্ব্বে জানিতাম যে মোট ১১ খানি উপনিষদ্ আছে, এবং তাহা শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন। এখন দেখি, শঙ্করাচার্য্য যাহার ভাষ্য করেন নাই এমন অনেক উপনিষদ্ আছে[১]। অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম যে, ১৪৭ খানি উপনিষদ্ রহিয়াছে। যে সকল প্রাচীন উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য করিয়াছেন, সেইগুলিই প্রামাণ্য। তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মোপাসনা, এবং মুক্তির সোপানের উপদেশ আছে। সকল শাস্ত্রের মধ্যে এই উপনিষদ্, বেদের শিরোভাগ বলিয়া, এবং সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, যখন সর্ব্বত্র মান্য হইল, তখন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়গণ 'উপনিষদ্' নাম দিয়া গ্রন্থ প্রচার করিতে লাগিল; এবং তাহাতে পরমাত্মার পরিবর্ত্তে আপন আপন দেবতাদের উপাসনা প্রচার করিতে লাগিল। তখন 'গোপাল-তাপনী' উপনিষদ্ প্রস্তুত হইল; তাহাতে পরমাত্মার

---

(১) এই সকল অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ্ হইতেও দেবেন্দ্রনাথ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ৭৩,৭৪ ও ১৭৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

স্থান শ্রীকৃষ্ণ অধিকার করিলেন। সেই 'গোপাল-তাপনী' উপনিষদে মথুরাকে ব্রহ্মপুর এবং শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম উল্লেখ করা হইয়াছে। আবার একটা 'গোপীচন্দনোপনিষদ্' আছে, তাহাতে কেমন করিয়া তিলক কাটিতে হয়, তাহার উপদেশ আছে। বৈষ্ণবেরা এইরূপে আপনাদের দেবতার মহিমা ঘোষণা করিল। আবার শৈবরা 'স্কন্দোপনিষদ্' নাম দিয়া আর এক গ্রন্থে শিবের মহিমা ঘোষণা করিল। 'সুন্দরী-তাপনী উপনিষদ্', 'দেবী উপনিষদ্', 'কৌলোপনিষদ্' প্রভৃতিও আছে ; তাহাতে কেবল শক্তির মহিমা প্রচার। এমন কি, উপনিষদের নামে যে-কেহ যাহা-তাহা প্রচার করিতে লাগিল। আকবরের সময়ে হিন্দুদের মুসলমান করিবার জন্য আবার একটা উপনিষদ্ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার নাম 'আল্লোপনিষদ্' ; কি আশ্চর্য্য !

উপনিষদের এই কণ্টকারণ্য আমরা পূর্ব্বে জানিতাম না। কেবল একাদশ উপনিষদই[১] আমরা পূর্ব্বে জানিতাম, এবং সেই সকল উপনিষদেরই সাহায্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সেই সকল উপনিষদ্কেই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন এ ভিত্তি-ভূমিকেও দেখি যে, সে বালুকাময় এবং শিথিল, এখানেও মৃত্তিকা পাই না। প্রথমে বেদ ধরিলাম, সেখানে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। তাহার পরে প্রামাণ্য একাদশ উপনিষদ্ ধরিলাম ; কি দুর্ভাগ্য, সেখানেও ভিত্তি স্থাপন করিতে পারিতেছি না !

ঈশ্বরের সঙ্গে উপাস্য-উপাসক সম্বন্ধ[২], এইটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ।

---

(১) ৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) ৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যখন শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্ত দর্শনে[১] ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত দেখিলাম, তখন আর তাহাতে আমাদের আস্থা রহিল না ; আমাদের ধর্ম্ম পোষণের জন্য তাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম যে, বেদান্ত দর্শনকে ছাড়িয়া কেবল উপনিষদ্‌কে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা পাইব ; এইজন্য, সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই-সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম, 'সোঽহমস্মি[২]', তিনিই আমি, 'তত্ত্বমসি[৩]', তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম। এই উপনিষদ্ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারে না, হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না ! তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে ? আমাদের উপায় কি ? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব ? বেদে তাহার পত্তন-ভূমি হইল না, উপনিষদেও তাহার পত্তন-ভূমি হইল না, কোথায় তাহার পত্তন দিব ? দেখিলাম যে, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ-জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তন-ভূমি। পবিত্র হৃদয়েতেই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি। সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে

---

(১) শারীরক মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা, ব্রহ্ম মীমাংসা প্রভৃতি বেদান্ত-দর্শনেরই নামান্তর। ইহার সূত্রসকল (বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্র) সম্ভবতঃ বাদরায়ণ ঋষির রচিত। শঙ্করাচার্য্য তাহার একতম ভাষ্যকার মাত্র। কিন্তু সাধারণ লোকে বেদান্তদর্শন বলিতে শঙ্করাচার্য্যের মতই বোঝে; তাই দেবেন্দ্রনাথ 'শঙ্করাচার্য্যের শারীরক মীমাংসা বেদান্তদর্শন' বলিয়াছেন। ৬৫, ৭১ ও ৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) বৃহ. ১।৪।১।

(৩) ছান্দো. ৬।৮—১৬।

উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর, হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষদ্, তাহার সঙ্গে এখন আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।

উপনিষদেও আছে, "হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ[১]," হৃদয়ের সহিত নিঃসংশয় বুদ্ধির যোগে মনের আলোচনা দ্বারা, ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন। নিষ্পাপ প্রশান্ত হৃদয়ের বিশুদ্ধ ভাবে বুদ্ধির আলো পড়িয়া যে-মন উজ্জ্বলিত হয়, সেই-মনের দ্বারা ঈশ্বর অভিপ্রকাশিত হয়েন। পূর্ব্বকার যে-ঋষি জ্ঞানপ্রসাদে ধ্যান-যোগে আপনার বিশুদ্ধ হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্মকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারই পরীক্ষিত কথা এই যে, "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব স্তত স্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ[২]।" আমারও হৃদয়ের পরীক্ষার সঙ্গে এই কথার মিল হইল, অতএব আমি এই কথা গ্রহণ করিলাম।

আবার যখন দেখিলাম, উপনিষদে আছে[৩] যে, "যাহারা গ্রামে থাকিয়া যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করে, তাহারা মৃত্যুর পরে ধূমকে প্রাপ্ত হয়; ধূম হইতে রাত্রিকে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষকে, কৃষ্ণপক্ষ হইতে দক্ষিণায়নের মাস সকলকে, দক্ষিণায়নের মাস সকল হইতে পিতৃলোককে, পিতৃলোক হইতে আকাশকে, আকাশ হইতে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হয়; এবং সেই চন্দ্র-লোকে স্বীয় পুণ্য-ফল ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার এই পৃথিবী-লোকে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত

---

(১) শ্বেতা. ৪।১৭।

(২) মুণ্ড. ৩।১।৮।

(৩) ছান্দো. ৫।১০।৩—৬। এই গ্রন্থের প্রারম্ভে (৩৬ পৃষ্ঠা) 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষ দিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই উক্তির মূল উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

চন্দ্র-লোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ হইতে বায়ুকে প্রাপ্ত হয়, বায়ু হইয়া ধূম হয়, ধূম হইয়া বাষ্প হয়, বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, মেঘ হইয়া বর্ষিত হয়; তাহারা এখানে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ হইয়া উৎপন্ন হয়; সেই ব্রীহি, যব, তিল, মাষাদি অন্ন যে-যে ভক্ষণ করে, সেই-সেই স্ত্রী পুরুষ হইতে তাহারা এখানে জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে,"—তখনি এই সকল বাক্যকে অযোগ্য কল্পনা বলিয়া বোধ হইল। তাহাতে আর আমার হৃদয় সায় দিতে পারিল না। সে আমার হৃদয়ের অনুবাদ নহে।

কিন্তু উপনিষদের এই মহাবাক্যে সম্পূর্ণরূপে আমার হৃদয় সায় দিল,—"আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণ অভিসমাবৃত্য, কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো, ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ, আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সম্প্রতিষ্ঠাপ্য, অহিংসন্ত্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ, স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং, ব্রহ্ম-লোকমভিসম্পদ্যতে; ন চ পুনরাবর্ত্ততে, ন চ পুনরাবর্ত্ততে[১]"; আচার্য্যকুলে বেদ অধ্যয়ন ও যথাবিধি গুরুসেবা সমাধা করিয়া, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিবাহের পর পবিত্র স্থানে বেদ অধ্যয়ন ও ধার্ম্মিক পুত্র শিষ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক, স্বীয় আত্মাতে ইন্দ্রিয় সকলকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কোন প্রাণীর পীড়াদায়ক না হয় এরূপ ন্যায়-উপার্জ্জিত বিত্তের দ্বারা জীবনধারণ করিবেক; যিনি এইরূপে যাবদায়ু ইহলোকে জীবন যাপন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করেন; তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না, তিনি আর ইহলোকে প্রত্যাগমন করেন না।

---

(১) ছান্দো. ৮।১৫।

যে ব্যক্তি ইহলোকে থাকিয়া ঈশ্বরের আদিষ্ট ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে আত্মাকে পবিত্র করে, সে পৃথিবী হইতে অবসৃত হইয়া পুণ্য-লোকে গমন করে এবং পশুভাব পরিত্যাগ করিয়া দেব-শরীর প্রাপ্ত হয়। সেই পুণ্য-লোকে ঈশ্বরের জাজ্বল্যতর মহিমা দেখিয়া, এবং জ্ঞানে প্রেমে ধর্ম্মে আরো উন্নত হইয়া, তথা হইতে উন্নততর লোকে তাহার গতি হয়। এই প্রকারে উন্নতি হইতে উন্নতি লাভ করিয়া পুণ্য-লোক হইতে পুণ্য-লোকে, অসংখ্য স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে, গমন করিতে থাকে; "এষ দেবপথো পুণ্যপথঃ[১]"। এই পৃথিবীতে তাহার আর পুনরাগমন হয় না। স্বর্গ-লোকে পশুভাব নাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই; সেখানে স্ত্রী-ঐষণা বিত্তৈষণা নাই[২]; কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই। সেখানে চির জীবন, চির যৌবন। এইরূপ স্বর্গ হইতে স্বর্গ-লোকে, জ্ঞানের প্রেমের ধর্ম্মের ও মঙ্গলের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া সেই দেবাত্মাকে অনন্ত উন্নতির অভিমুখে লইয়া যায়, এবং আনন্দের উৎস তাঁহার হৃদয় হইতে নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে। কঠোপনিষদের উপাখ্যানে নচিকেতা মৃত্যুর নিকটে স্বর্গের এইরূপই বর্ণনা করিয়াছেন,—

"স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি,
ন তত্র ত্বং, ন জরয়া বিভেতি,
উভে তীর্ত্বা অশনায়া-পিপাসে,
শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে[৩]।"

স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই; সেখানে তুমি নাই, অর্থাৎ মৃত্যু নাই; সেখানে জরা নাই; ক্ষুৎ-পিপাসা উভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া,

---

(১) ছান্দো. ৪।১৫।৬; কিন্তু তথায় 'পুণ্যপথঃ' স্থানে 'ব্রহ্মপথঃ' আছে।
(২) বৃহ. ৩।৫।১, ৪।৪।২২ দ্রষ্টব্য।
(৩) কঠ. ১।১২।

এবং শোককে অতিক্রম করিয়া, সেই দেবাত্মা স্বর্গ-লোকে আনন্দেই থাকেন।

কিন্তু এই পৃথিবীতে যে ব্যক্তি পাপানুষ্ঠান করে, সেই পাপীর গতি কি হয়? যে এখানে পাপ করিয়া সেই কৃত পাপের জন্য অনুতাপ না করে, ও তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ পাপাচরণই করিতে থাকে, মৃত্যুর পরে তাহার পাপ-লোকেই গমন হয়। "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপং[১]", পুণ্যদ্বারা পুণ্য-লোকে ও পাপদ্বারা পাপ-লোকে নীত হয়; এই বেদ-বাক্য। পাপের তারতম্য অনুসারে তদুপযুক্ত পাপ-লোকে যাইয়া সেই পাপীর আত্মা পাপাশ্রিত দেহ ধারণ করে, এবং সেখানে নিয়ত কুটিল পাপের অনুতাপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে যখন তাহার পাপ সকল নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়, এবং যখন তাহার প্রায়শ্চিত্তের অবসান হয়, তখন সে প্রসাদ লাভ করে। সে পৃথিবীতে যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিল সেই সঞ্চিত পুণ্য-বলে তখন সে উপযুক্ত পুণ্য-লোকে গমন করে, এবং সেখানে পশুভাবের বিপরীত দেব-শরীর ধারণ করিয়া তাহার ফল ভোগ করিতে থাকে। সেখানে থাকিয়া সে যে-পরিমাণে জ্ঞান ধর্ম্ম ও পুণ্য সঞ্চয় করিবে, তদনুসারে আরো উন্নত লোকে গমন করিবে, এবং সেই দেব-পথের, পুণ্য-পথের, যাত্রী হইয়া অগণ্য স্বর্গ-লোক হইতে স্বর্গ-লোকে উন্নত হইতে থাকিবে। ঈশ্বরের প্রসাদে আত্মা অনন্ত উন্নতিশীল। পাপ তাপ অতিক্রম করিয়া এই উন্নতিশীল আত্মার উন্নতিই হইবে, পৃথিবীতে আর তাহার অধঃপতন হইবে না। ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে পাপের কখন জয় হয় না। মানবশরীরে

(১) প্রশ্ন. ৩।৭।

আত্মার প্রথম জন্ম ; মৃত্যুর পরে সে পাপ পুণ্যের ফলভোগের নিমিত্ত উপযুক্ত শরীর ধারণ করিয়া লোকলোকান্তরে সঞ্চরণ করিতে থাকিবে, তাহার আর এখানে পুনরাগমন হইবে না[১]।

আবার যখন উপনিষদে দেখিলাম, ব্রহ্মোপাসনার ফল নির্ব্বাণ-মুক্তি[২], তখন আমার আত্মা তাহাতে ভয় দর্শন করিল। "কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা পরে ঽব্যয়ে সর্ব্ব একীভবন্তি[৩]", কর্ম্মসকল এবং বিজ্ঞানময় আত্মা, অব্যয় পরব্রহ্মে সকলই এক হয় ; ইহার অর্থ যদি এই হয় যে, বিজ্ঞানাত্মার[৪] আর পৃথক সংজ্ঞা থাকে না, তবে ইহা তো মুক্তির লক্ষণ নহে, ইহা ভয়ানক প্রলয়ের লক্ষণ। কোথায় ব্রাহ্মধর্ম্মে আত্মার অনন্ত উন্নতি, আর কোথায় এই নির্ব্বাণমুক্তি! উপনিষদের এই নির্ব্বাণমুক্তি আমার হৃদয়ে স্থান পাইল না।

এই বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ উন্নতলোক স্বর্গেতেই থাকুক, কিম্বা এই অধঃস্থ পৃথিবীতেই থাকুক, যখন তাহার সমুদায় বিষয়কামনার পরিসমাপ্তি হইয়া একমাত্র অন্তর্যামী পরমাত্মাকে লাভ করিবার কামনা অহোরাত্র হৃদয়ে জাগিতে থাকে, যখন সে আপ্তকাম ও আত্মকাম[৫] হয়, সে অবস্থায় যখন তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সকল সে সাধন করিতে থাকে,—তখন সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রহ্মের তিমিরাতীত জ্ঞানো-

---

(১) দেবেন্দ্রনাথের 'পরলোক ও মুক্তি' শীর্ষক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁহার এই বিষয়ের মতামত বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা আছে। এই পরিচ্ছেদ ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য তাহা পাঠ করা আবশ্যক। ৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) অর্থাৎ ব্রহ্মে লয়। (৩) মুণ্ড. ৩।২।৭।

(৪) অর্থাৎ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন মানবাত্মার। (৫) বৃহ. ৪।৩।২০।

জ্জ্বল প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া পবিত্র হইয়া, তাঁহার কৃপাতে, জ্ঞানে-প্রেমে-আনন্দে সেই অনন্ত জ্ঞান-প্রেম-আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে। সে দিনের[১] আর অবসান হয় না, "সকৃৎ-বিভাতো হ্যে বৈষ ব্রহ্মলোকঃ[২]।" এই ইহার পরম গতি, এই ইহার পরম সম্পদ্, এই ইহার পরম লোক, এই ইহার পরম আনন্দ,—"এষাস্য পরমা গতি রেষাস্য পরমা সম্পদ্, এষোঽস্য পরমো লোক এষোঽস্য পরম আনন্দঃ[৩]।" বেদের এই মহাবাক্যে জ্ঞান তৃপ্ত হয়, আত্মা শান্তিলাভ করে, এবং হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতে থাকে, "ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ং[৪]" !

পরিপূর্ণ জ্ঞানময় !
নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত-আকাশে !
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি, চাহিয়া উদয় দিশি, ঊর্দ্ধমুখে করপুটে,
নব সুখ নব প্রাণ নব দিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে !
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয়-মুখে চ'লে যাব গান গাহি ;
কে রহিবে আর দূর পরবাসে।

—(ব্রহ্মসঙ্গীত[৫])।

---

(১) অর্থাৎ দিবাভাগের। ব্রহ্মলোকে দিবসের পর রাত্রি নাই ; ক্রমাগতই দিন।

(২) ছান্দো. ৮।৪।২।   (৩) বৃহ. ৪।৩।৩২।

(৪) বৃহ. ৪।৪।২৫।   (৫) রবীন্দ্রনাথ রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।

এইক্ষণে তাঁহার এই আশীর্ব্বাদ আমার হৃদয়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছে,—"স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ[৫]", এই অজ্ঞানান্ধকার সংসারের পরকূলে ব্রহ্মলোকে যাইবার পথে তোমাদের নির্ব্বিঘ্ন হউক। এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া এই পৃথিবী হইতেই শাশ্বত ব্রহ্মলোককে অনুভব করিতেছি।

---

(৫) মুণ্ড. ২।২।৬।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোন প্রাচীন গ্রন্থে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি হইল না, তখন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায় হইবে? ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রচনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ রচনা। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে উদ্ভাসিত সত্যসকলই উপনিষদের ভাষায় প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ড নানা স্মৃতি তন্ত্র ও মহাভারতাদি গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। (১৮৪৮, ১৮৪৯)।

আমার এখন ভাবনা হইল যে, ব্রাহ্মদের ঐক্যস্থল তবে কোথায় হইবে? তন্ত্র, পুরাণ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, কোথাও ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল, ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তন-ভূমি দেখা যায় না। আমি মনে করিলাম যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন একটি বীজমন্ত্র চাই যে, সেই বীজ-মন্ত্র ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল হইবে[১]। ইহাই ভাবিয়া আমি আমার হৃদয় ঈশ্বরের প্রতি পাতিয়া দিলাম; বলিলাম, "আমার আঁধার হৃদয় আলো কর।" তাঁহার কৃপায় তখনি আমার হৃদয় আলোকিত হইল। সেই আলোকের সাহায্যে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বীজ দেখিতে পাইলাম। অমনি একটি পেন্‌সিল দিয়া সম্মুখের কাগজ খণ্ডে তাহা লিখিলাম, এবং সেই কাগজ তখনি একটা বাক্সে ফেলিয়া দিলাম, ও সেই বাক্স বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া রাখিলাম। তখন ১৭৭০ শক[২]; আমার বয়স ৩১ বৎসর।

বীজ তো এইরূপে বাক্সের মধ্যে রহিলেন। এখন আমি ভাবিতে লাগিলাম, ব্রাহ্মদিগের জন্য একটা ধর্ম্মগ্রন্থ চাই।

---

(১) পরিশিষ্ট ৪৫। (২) ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ।

তখনি আমি অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিলাম যে, "তুমি কাগজ কলম লইয়া ব'সো, এবং আমি যাহা বলি তাহা লিখিতে থাক।" এখন আমি একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরের দিকে হৃদয় পাতিয়া দিলাম। তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্য-সকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে[১] নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম, এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন[২]।

আমি সতেজে বলিলাম, "ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি[৩]", ব্রহ্মবাদীরা বলেন। ব্রহ্মবাদীরা কি বলেন? "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম[৪]", যাঁহা হইতে এই শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু-সকলের[৫] সহিত প্রাণী জঙ্গম জীব জন্তু উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহার দ্বারা জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে যাঁহার প্রতি গমন করে ও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম।

তাহার পর আমার হৃদয়ে এই সত্য আবির্ভূত হইল যে, ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ। আমি অমনি বলিলাম, "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি,[৬]" আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে এই ভূত-সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয়কালে আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাঁহাতে প্রবেশ করে।

---

(১) অর্থাৎ উপনিষদের ভাষা অবলম্বনে। (২) পরিশিষ্ট ৪৬।
(৩) শ্বেতা. ১।১। (৪) তৈত্তি. ৩।১।
(৫) অর্থাৎ, matter instinct with energy.
(৬) তৈত্তি. ৩।৬।

আমি দেখিলাম যে, পূর্ব্বে কেবল এক অজ-আত্মা পরব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না। অমনি বলিলাম, "ইদং ব অগ্রে নৈব কিঞ্চিদাসীৎ[১]। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্[২]। সবা এষ মহানজ আত্মা ঽজরো ঽমরো ঽমৃতো ঽভয়ঃ[৩]।" এই জগৎ পূর্ব্বে কিছুই ছিল না; এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে, হে প্রিয় শিষ্য, কেবল অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম ছিলেন; তিনিই এই জন্মবিহীন মহান্ আত্মা; তিনি অজর, অমর, নিত্য, ও অভয়।

আমি দেখিলাম যে, তিনি দেশ, কাল, কার্য্য-কারণ, পাপ পুণ্য কর্ম্মের ফল, সকলি আলোচনা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। "স তপোঽতপ্যত, স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ[৪]," তিনি বিশ্বসৃজনের বিষয় আলোচনা করিলেন, তিনি আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু সৃষ্টি করিলেন।

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী[৫]।"

ইঁহা হইতে প্রাণ, মন, ও সমুদায় ইন্দ্রিয়, এবং আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল, ও সকলের আধার এই পৃথিবী উৎপন্ন হয়।

আমি দেখিলাম, তাঁহারি অনুশাসনে সকলি শাসিত হইয়া চলিতেছে। বলিলাম,—

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি, ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ,
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ[৬]।"

---

(১) বৃহ. ১।২।১। (২) ছান্দো. ৬।২।১। (৩) বৃহ. ৪।৪।২৫
(৪) তৈত্তি. ২।৬। (৫) মুণ্ড. ২।১।৩। (৬) কঠ. ৬।৩।

ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে মেঘ, বায়ু ও মৃত্যু সঞ্চরণ করিতেছে।

এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন-যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর-পর বলিতে লাগিলাম। সর্ব্বশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলাম, "যশ্চায় মস্মি ন্নাকাশে তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ[১], সর্ব্বানুভূঃ[২], যশ্চায় মস্মি ন্নাত্মনি তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ[৩], সর্ব্বানুভূঃ[২], তমেব বিদিত্বাতি-মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়[৪]"; এই অসীম আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতেছেন, এই আত্মাতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি সকলি জানিতে-ছেন, সাধক তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করেন; তদ্ভিন্ন মুক্তি প্রাপ্তির আর অন্য পথ নাই।

এই প্রকারে আমি উপনিষদের মুখে, ঈশ্বর প্রসাদে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি আমার হৃদয় হইতে বাহির করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া গেল *। কিন্তু ইহার নিগূঢ় অর্থ বুঝিতে এবং তাহা আয়ত্ত করিতে আমার সমস্ত জীবন

---

* ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অনেক দিন পরে তাহার তাৎপর্য্য লিখিত হয়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৮ সালের শেষ ভাগে রচিত হয়। সমগ্র গ্রন্থ (তাৎপর্য্য ছাড়া) ১৮৪৯ কিংবা ১৮৫০ সালে (১৭৭১ শকে) প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ সালের মে (জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা) হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাল ও কালো অক্ষরে তাৎপর্য্য সহিত সমগ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

(১) বৃহ. ২।৫।১০ (২) বৃহ. ২।৫।১৯। (৩) বৃহ. ২।৫।১৪। (৪) শ্বেতা. ৩।৮।

চলিয়া যাইবে, তথাপি তাহার অন্ত হইবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এই সকল সত্য-বাক্যে আমার অটল শ্রদ্ধা হউক, ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ঈশ্বরের নিকটে এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইহাতে আমার পরিশ্রমের ঘর্ম্ম-বিন্দু নাই, কেবলই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। কে আমার হৃদয়ে এই সত্য-সকল প্রেরণ করিলেন? "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ", যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহ-বাক্যও নহে, প্রলাপ-বাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবন্ত সত্য-সকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে। তখন আমি তাঁহার পরিচয় পাইলাম। আমি জানিলাম যে, তাঁহাকে যে চায়, সেই তাঁহাকে পায়। আমার কেবল এক মনের টানে তাঁহার পদ-ধূলি লাভ করিলাম, এবং সেই ধূলি আমার নেত্রের অঞ্জন[১] হইল।

লেখা হইয়া গেলে তাহা আমি ষোড়শ অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম *। প্রথম অধ্যায়ের নাম আনন্দ-অধ্যায় হইল।

* "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রচারের বহুদিন পরে মসূরী পর্ব্বত বিচরণ সময়ে "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততং", উপনিষদের এই শ্লোকটি ইহার ষোড়শ অধ্যায়ে আমি সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলাম।

এই শ্লোকটি ঋ. ১।২২।২০ হইতে নৃ. পূ. (৫।১০) ও অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে গৃহীত হইয়াছে। এটি সামবেদীয় সন্ধ্যাপূজার প্রথম মন্ত্র, অতএব ব্রাহ্মণদিগের নিকটে সুপরিচিত। দেবেন্দ্রনাথের মসূরী পর্ব্বত বিচরণের কাল ১৮৮২—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

(১) হাফিজের ভাষা।

এইরূপে ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্, ব্রাহ্মী উপনিষদ্, প্রস্তুত হইল। এইজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের শেষে লেখা আছে, "উক্তা ত উপনিষদ্, ব্রাহ্মীং বাব ত উপনিষদম্ অব্রূম[১], ইত্যুপনিষৎ", তোমার নিকট উপনিষদ্ উক্ত হইল, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদই তোমাকে বলিয়াছি, ইহাই উপনিষদ্।

ইহা কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদ্কে আমি একবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমাদের আর কোন সংশ্রব রহিল না। এই বেদ ও উপনিষদের যে সকল সার সত্য, তাহা লইয়াই "ব্রাহ্মধর্ম্ম" সংগঠিত হইল, এবং আমার হৃদয় তাহারই সাক্ষী হইল। বেদরূপ কল্পতরুর অগ্র শাখার ফল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্, এবং উপনিষদের শিরোভাগ ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্; তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই উপনিষদ্ হইতেই প্রথমে আমার হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ভাবের প্রতিধ্বনি পাইয়াই আমি সমগ্র বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্কে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যত্ন পাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, ইহাতেই আমার দুঃখ। কিন্তু এ দুঃখ কোন কার্য্যের নহে, যেহেতুক সমস্ত খনি কিছু স্বর্ণ হয় না; খনির অসার প্রস্তরখণ্ড সকল চূর্ণ করিয়াই তাহা হইতে স্বর্ণ নির্গত করিয়া লইতে হয়। এই খনি-নিহিত সকল স্বর্ণই যে বাহির হইয়াছে, তাহাও নহে। বেদ-উপনিষদ্-রূপ খনির মধ্যে এখনো কত সত্য কত স্থানে গভীররূপে নিহিত আছে। ভগবদ্ভক্ত বিশুদ্ধ-

---

(১) কেন. ৪।৭।

সত্ত্ব সত্যকাম ধীরেরা যখনি অনুসন্ধান করিবেন, তখনি ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহাদের হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে, এবং তাঁহারা সেই খনি হইতে সেই সত্যসকল উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবেন[১]।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, হৃদয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ না হইলে ব্রহ্মোপাসনার কেহ অধিকারী হইতে পারে না। সেই ধর্ম্ম কি, ধর্ম্মনীতি কি, ইহা ব্রাহ্মদিগের জানা নিতান্ত আবশ্যক, এবং সেই ধর্ম্ম-নীতি অনুসারে চরিত্র গঠন করা তাঁহাদের নিত্য কর্ম্ম। অতএব ব্রাহ্মদের জন্য ধর্ম্মের অনুশাসন ও উপদেশের প্রয়োজন। যেমন ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ পড়িয়া ব্রহ্মকে জানিবে, তেমনি ধর্ম্মের অনুশাসন দ্বারা অনুশাসিত হইয়া হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিবে। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের এই দুই অঙ্গ, একটি উপনিষদ্, দ্বিতীয়টি অনুশাসন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম খণ্ডের উপনিষদ্ তো সমাপ্ত হইল; এখন দ্বিতীয় খণ্ডের অনুশাসনের জন্য অন্বেষণ পড়িয়া গেল। মহাভারত, গীতা, মনু-স্মৃতি প্রভৃতি পড়িতে লাগিলাম, এবং তাহা হইতে শ্লোক-সকল সংগ্রহ করিয়া অনুশাসনের অঙ্গ পুষ্ট করিতে লাগিলাম। ইহাতে মনুস্মৃতি আমাকে বড়ই সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে অন্যান্য স্মৃতিরও শ্লোক আছে, তন্ত্রেরও শ্লোক আছে, মহা-ভারতের এবং গীতারও শ্লোক আছে। এই অনুশাসন লিপিবদ্ধ করিতে আমার বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। প্রথমে ইহাকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিভাগ করিয়াছিলাম; পরে এক অধ্যায় ত্যাগ করিয়া ইহাকেও ষোল অধ্যায়ে বিভাগ করিলাম।

(১) উপনিষদ্ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের ভাব ৪৫ পরিশিষ্টে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ইহার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই উপদেশ আছে যে, গৃহস্থের তাবৎ কর্ম্মে ব্রহ্মের সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে,—

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ[১]।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন; যে কোন কর্ম্ম করুন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে পিতা মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য বিষয়,—

"মাতরং পিতরঞ্চৈব সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষদেবতাম্
মত্বা গৃহী নিষেবেত সদা সর্ব্বপ্রযত্নতঃ[২]।"

গৃহী ব্যক্তি পিতা মাতাকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা স্বরূপ জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা করিবেন। শেষের শ্লোকে গৃহে পরিবারের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে কি প্রকারে ব্যবহার করিবে, তাহার উপদেশ,—

"ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা, ভার্য্যা পুত্রঃ স্বকা তনুঃ,
ছায়া স্বদাসবর্গশ্চ, দুহিতা কৃপণং পরম্।
তস্মাদেতৈ রধিক্ষিপ্তঃ সহেতাসংজ্বরঃ সদা[৩]।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, ভার্য্যা ও পুত্র স্বীয় শরীরের ন্যায়, দাসবর্গ আপনার ছায়া স্বরূপ, আর দুহিতা অতি কৃপাপাত্রী; এই হেতু এ সকলের দ্বারা উত্যক্ত হইলেও সন্তপ্ত না হইয়া সর্ব্বদা সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিবেক।

---

(১) মহানি. ৮।২৩।
(২) মহানি. ৮।২৫।
(৩) মনু. ৪।১৮৪, ১৮৫; মহাভা. শান্তি. ২৪২।২০,২১।

"অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত, নাবমন্যেত কঞ্চন,
নচেমং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ[১]।"

পরের অত্যুক্তি-সকল সহ্য করিবেক, কাহাকেও অপমান করিবেক না; এই মানব-দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেক না। তাহার পরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ে, পতি এবং পত্নীর মধ্যে পরস্পর কর্ত্তব্য ও ব্যবহার বিষয়ে উপদেশ। চতুর্থ অধ্যায়ে, ধর্ম্ম-নীতি। পঞ্চম অধ্যায়ে, সন্তোষ ষষ্ঠ অধ্যায়ে, সত্য পালন ও সত্য ব্যবহার। সপ্তম অধ্যায়ে, সাক্ষ্য। অষ্টম অধ্যায়ে, সাধুভাব। নবম অধ্যায়ে, দান। দশম অধ্যায়ে, রিপু-দমন। একাদশ অধ্যায়ে, ধর্ম্মোপদেশ। দ্বাদশ অধ্যায়ে, পরনিন্দা নিষেধ। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ইন্দ্রিয়-সংযম। চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে, পাপ পরিহার। পঞ্চদশ অধ্যায়ে, বাক্য মন এবং শরীরের সংযম। এবং ষোড়শ অধ্যায়ে, ধর্ম্মে মতি। ইহার শেষের দুই শ্লোকে আছে,—

"মৃতং শরীরমুৎসৃজ্য কাষ্ঠলোষ্ট্রসমং ক্ষিতৌ,
বিমুখা বান্ধবা যান্তি, ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি।
তস্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ;
ধর্ম্মেণ হি সহায়েন তমস্তরতি দুস্তরম্[২]।"

বান্ধবেরা ভূমিতলে মৃত শরীরকে কাষ্ঠলোষ্ট্রবৎ পরিত্যাগ করিয়া বিমুখ হইয়া গমন করে, ধর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়েন; অতএব আপনার সাহায্যার্থে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম নিত্য সঞ্চয় করিবেক; জীব ধর্ম্মের সহায়তায় দুস্তর সংসার-অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। "এষ আদেশ এষ উপদেশ এতদনুশাসনম্। এবমুপাসিতব্যম্

(১) মনু. ৬।৪৭। (২) মনু. ৪।২৪১, ২৪২

এবমুপাসিতব্যম্[১]।" এই আদেশ, এই উপদেশ, এই শাস্ত্র; এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক, এই প্রকারে তাঁহার উপাসনা করিবেক। যিনি সংযত ও শুচি হইয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ বা শ্রবণ করেন, এবং ব্রহ্মপরায়ণ হইয়া তদনুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার অনন্ত ফল লাভ হয়।

(১) তৈত্তি. ১।১১।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ প্রচারের পর ব্রাহ্মসমাজে নূতন সজীবতা। সমাজ-মন্দিরের তেতালা নির্ম্মিত হইলে ১১ই মাঘে নূতন স্তোত্র পাঠ, ও তাহাতে সকলের হৃদয় আর্দ্র হওয়া; (১৮৪৯)।

এই প্রকারে ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ইহাতে অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ, মায়াবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে প্রকাশিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পর পরস্পরের সখা, ও তাঁহারা সর্ব্বদা যুক্ত হইয়া আছেন,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া"; ইহাতে অদ্বৈতবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, "ন বভূব কশ্চিৎ", তিনি আপনি কিছুই হন নাই; তিনি জড়-জগৎও হন নাই, বৃক্ষ লতাও হন নাই, পশু পক্ষীও হন নাই, মনুষ্যও হন নাই; ইহাতে অবতারবাদ নিরস্ত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে, "স তপো২তপ্যত, স তপ স্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ", তিনি আলোচনা করিলেন, আলোচনা করিয়া এই সমুদায় যাহা কিছু তিনি সৃষ্টি করিলেন। পূর্ণ সত্য হইতে এই বিশ্বসংসার নিঃসৃত হইয়াছে। এই বিশ্বসংসার আপেক্ষিক সত্য; ইহার স্রষ্টা যিনি, তিনি সত্যের সত্য, পূর্ণ সত্য। এই বিশ্বসংসার স্বপ্নের ব্যাপার নহে, ইহা মানসিক ভ্রমও নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য। যে সত্য হইতে ইহা প্রসূত হইয়াছে, তিনি পূর্ণ সত্য, আর ইহা আপেক্ষিক সত্য। ইহাতে মায়াবাদ নিরস্ত হইল[১]।

---

(১) উদ্ধৃত বচন তিনটি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণের ৭৩,৫৯ ও ১১ সংখ্যক বচন।

এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না; তাঁহাদিগের ধর্ম্ম, মত, ও অভিপ্রায় নানা গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছিল; এখন ইহা একত্র সংক্ষিপ্ত হইল। ইহা অনেক ব্রাহ্মের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল, এবং পুণ্য-সলিলে প্লাবিত করিল। যাহার হৃদয় আছে, এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ তাহার হৃদয়কে আকর্ষণ করিবেই করিবে।

ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার সময়ে পূর্ব্বে যে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ আরম্ভ হইল, এবং যে উপনিষদ্ পাঠ হইত, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল। ইহার পর হইতে ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের "অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মা ঽমৃতং গময়[১]; অবিরাবী র্ম এধি[২]; রুদ্র, যত্তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যম্,[৩]" এই মন্ত্র লইয়া, কেহ বা মূল সংস্কৃত শব্দে, কেহ বা তাহার ভাষান্তর অনুবাদে, ব্রহ্মোপাসনার সময়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

গত বৎসর হইতে সমাজগৃহের তেতালা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। এ বৎসরের[৪] ১১ই মাঘের পূর্ব্বে তাহা প্রস্তুত হইবার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি করিতেছি। এবার ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ। নূতন তেতালায় বসিয়া উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরে নূতন স্বাধ্যায় পাঠ করিব, নূতন স্তোত্র আমাদের সেই স্তবনীয়কে উপহার দিব, নূতন সঙ্গীত গান করিব, তাহারই উদ্যোগে আমাদের সপ্তাহ চলিয়া গেল। এই গৃহ সেই ১১ই মাঘেই

(১) বৃহ. ১।৩।২৮। (২) ঐতরেয় উপনিষদের শান্তিপাঠ।

(৩) শ্বেতা. ৪।২১। সমগ্র বচনটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের ১০৯ সংখ্যক বচনের অন্তর্গত। (৪) ১৮৪৯ সাল।

প্রস্তুত হইল, সমাজগৃহ নূতন বেশ ধারণ করিল। শ্বেত প্রস্তরের বেদী, তাহার সম্মুখে সুসজ্জিত গীত-মঞ্চ, পূর্ব্ব পশ্চিমে ক্রমোচ্চ কাষ্ঠাসন; সকলি নূতন, সকলি সুন্দর এবং শুভ্র। ঝাড় লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত আলোকিত হইল। আমরা বাড়ীর দল বল লইয়া সন্ধ্যার সময় সমাজে উপস্থিত হইলাম। সকলেরি মুখে নূতন উৎসাহ ও নূতন অনুরাগ, সকলেই আনন্দে পূর্ণ। বিষ্ণু[১] সঙ্গীত-মঞ্চ হইতে গান ধরিলেন, "পরিপূর্ণমানন্দং[২]।" তাহার পরে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইল। আমরা সকলে মিলিত হইয়া সমস্বরে স্বাধ্যায় পাঠ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ হইতে শ্লোকের আবৃত্তি হইল। সকলের শেষে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ" বলিয়া উপাসনা সমাপ্ত হইল। সকলে স্তব্ধ হইল। তখন আমি বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া[৩] প্রহৃষ্ট মনে ভক্তিভরে এই স্তোত্র পাঠ করিলাম।

"হে জগদীশ্বর! সুশোভন দৃশ্য এই বিশ্ব তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে যে বিস্তার করিয়াছ, তাহার দ্বারা যদ্যপি অধিকাংশ মনুষ্য তোমাকে উপলব্ধি না করে, তাহা এ কারণে নহে যে, তুমি আমাদিগের কাহারো নিকট হইতে দূরে রহিয়াছ। যে কোন বস্তু আমরা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করি, তাহা হইতেও আমাদিগের সমীপে তুমি জাজ্বল্যতর আছ; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে প্রবৃত্ত ইন্দ্রিয়-সকল আমাদিগকে মহামোহে মুগ্ধ করিয়া তোমা হইতে বিমুখ রাখিয়াছে। অন্ধকার মধ্যে তোমার জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অন্ধকার তোমাকে জানে না; 'তমসি তিষ্ঠন্ তমসো হন্তরো

(১) ১৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(২) দেবেন্দ্রনাথের স্ব-রচিত সঙ্গীত। (৩) পরিশিষ্ট ৪৭ দ্রষ্টব্য

যং তমো ন বেদ[১]"। তুমি যেমন অন্ধকারে আছ, সেইরূপ তুমি তেজেতেও আছ। তুমি বায়ুতে আছ, তুমি শূন্যেতে আছ; তুমি মেঘেতে আছ, তুমি পুষ্পেতে আছ, তুমি গন্ধেতে আছ। হে জগদীশ্বর! তুমি সম্যক্ প্রকারে আপনাকে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছ, তুমি তোমার সকল কার্য্যে দীপ্যমান রহিয়াছ। কিন্তু প্রমাদী ও অবিবেকী মনুষ্য তোমাকে একবারও স্মরণ করে না। সকল বিশ্ব তোমাকেই ব্যাখ্যা করিতেছে, তোমার পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু আমাদিগের এ প্রকার অচেতন স্বভাব যে, বিশ্ব-নিঃসৃত এতদ্রূপ মহান্ নাদের প্রতি আমরা বধির হইয়া রহিয়াছি। তুমি আমাদিগের চতুর্দ্দিকে আছ, তুমি আমাদিগের অন্তরে আছ; কিন্তু আমরা আমাদিগের অন্তর হইতে দূরে ভ্রম করি। স্বীয় আত্মাকে আমরা দর্শন করি না, এবং তাহাতে তোমার অধিষ্ঠানকে অনুভব করি না। হে পরমাত্মন্! হে জ্যোতি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত উৎস! হে পুরাণ অনাদি অনন্ত, সকল জীবের জীবন! যাহারা আপনারদিগের অন্তরে তোমাকে অনুসন্ধান করে, তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্তে তাহাদিগের যত্ন কখন বিফল হয় না। কিন্তু হায়, কয় ব্যক্তি তোমাকে অনুসন্ধান করে! যে সকল বস্তু তুমি আমাদিগকে প্রদান করিয়াছ, তাহারা আমাদিগের মনকে এতদ্রূপ আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে যে, প্রদাতার হস্তকে স্মরণ করিতে দেয় না। বিষয় ভোগ হইতে বিরত হইয়া ক্ষণকালের নিমিত্তে তোমাকে যে স্মরণ করে, মন এমত অবকাশ কাল পায় না। তোমাকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিতবান্ রহিয়াছি; কিন্তু তোমাকে বিস্মৃত হইয়া

---

(১) বৃহ. ৩।৭।১৩।

আমরা জীবন যাপন করিতেছি। হে জগদীশ! তোমার জ্ঞান অভাবে জীবন কি পদার্থ? এ জগৎ কি পদার্থ? এই সংসারের নিরর্থক পদার্থ সকল,—অস্থায়ী পুষ্প, হ্রসমান স্রোত, ভঙ্গুর প্রাসাদ, ক্ষয়শীল বর্ণের চিত্র, দীপ্তিমান্ ধাতুর রাশি, আমাদিগের মনে প্রতীতি হয়, আমাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করে; আমরা তাহাদিগকে সুখদায়ক বস্তু জ্ঞান করি। কিন্তু ইহা বিবেচনা করি না যে, তাহারা আমাদিগকে যে সুখ প্রদান করে, তাহা তুমিই তাহাদিগের দ্বারা প্রদান কর। যে সৌন্দর্য্য তুমি তোমার সৃষ্টির উপর বর্ষণ করিয়াছ, সে সৌন্দর্য্য আমাদিগের দৃষ্টি হইতে তোমাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে। তুমি এতদ্রূপ পরিশুদ্ধ ও মহৎ পদার্থ যে, ইন্দ্রিয়ের গম্য নহ। তুমি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,[১]' তুমি 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ[২]'। এই নিমিত্ত যাহারা পশুবৎ আচরণ করিয়া আপনারদিগের স্বভাবকে অতি জঘন্য করিয়াছে, তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না। হায়! কেহ কেহ তোমার অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহ করে। আমরা কি দুর্ভাগ্য, আমরা সত্যকে ছায়া জ্ঞান করি, আর ছায়াকে সত্য জ্ঞান করি! যাহা কিছুই নহে, তাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব; আর যাহা আমাদিগের সর্ব্বস্ব, তাহা আমাদিগের নিকটে কিছুই নহে! এই বৃথা ও শূন্য পদার্থ-সকল, অধস্থায়ী এই অধম মনেরই উপযুক্ত। হে পরমাত্মন্! আমি কি দেখিতেছি! তোমাকেই যে সকল বস্তুতে প্রকাশমান দেখিতেছি! যে তোমাকে দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। যাহার তোমাতে আস্বাদ নাই, সে কোন বস্তুরই আস্বাদ পায় নাই। তাহার জীবন স্বপ্নস্বরূপ, তাহার অস্তিত্ব

---

১) তৈত্তি. ২।১। (২) কঠ. ৩।১৫।

বৃথা। আহা! সেই আত্মা কি অসুখী, তোমার জ্ঞান অভাবে যাহার সুহৃৎ নাই, যাহার আশা নাই, যাহার বিশ্রাম-স্থান নাই। কি সুখী সেই আত্মা, যে তোমাকে অনুসন্ধান করে, যে তোমাকে পাইবার নিমিত্তে ব্যাকুল রহিয়াছে। কিন্তু সে-ই পূর্ণ সুখী, যাহার প্রতি তোমার মুখ-জ্যোতি তুমি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছ, তোমার হস্ত যাহার অশ্রুসকল মোচন করিয়াছে, তোমার প্রীতিপূর্ণ কৃপাতে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া যে আপ্তকাম হইয়াছে। হা! কত দিন, আর কত দিন, আমি সেই দিনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব, যে দিন তোমার সম্মুখে আমি পরিপূর্ণ আনন্দময় হইব, এবং বিমল কামনা সকল তোমার সহিত উপভোগ করিব। এই আশাতে আমার আত্মা আনন্দ-স্রোতে প্লাবিত হইয়া কহিতেছে যে, হে জগদীশ্বর, তোমার সমান আর কে আছে! এই সময়ে আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে, জগৎ লুপ্ত হইতেছে, যখন তোমাকে দেখিতেছি,— যিনি আমার জীবনের ঈশ্বর, এবং আমার চিরকালের উপজীব্য।"

এই স্তোত্রটি ফরাসিস্ ব্রহ্মবাদী ফেনেলন মহাত্মার রচিত, এবং শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু ইহা সুনিপুণরূপে অনুবাদ করিয়াছেন; তাহার মধ্যে মধ্যে আমি উপযোগী উপনিষদ্-বাক্য সকল প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছি। এই স্তোত্র-পাঠের পর দেখিলাম যে, অনেক ব্রাহ্ম ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল[১]।

---

(১) ৩৬ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা রহিত হওয়া; দুর্গাপূজা এখনও চলিবে। পূজার সময় ষ্টীমার-যোগে দেবেন্দ্রনাথের আসাম ভ্রমণ; (১৮৪৯)।

দশ বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে[১], এখনো আমাদের বাড়ীতে পূজা হয়,—দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা। সকলের মনে কষ্ট দিয়া, সকলের মতের বিরুদ্ধে, আমাদের ভদ্রাসন বাড়ী হইতে চিরপ্রচলিত পূজা ও উৎসব উঠাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে না। আমি আপনিই ইহাতে নির্লিপ্ত ও স্বতন্ত্র থাকি, তাহাই ভাল। আমাদের পরিবারের মধ্যে কাহারো যদি ইহাতে বিশ্বাস থাকে, কাহারো ভক্তি থাকে, তাহাতে আঘাত দেওয়া অকর্ত্তব্য[২]। আমার ভ্রাতাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, তাঁহাদের সম্মতি লইয়া, ধীরে ধীরে পূজা উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ তখন য়ুরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার উদার মন ও প্রশস্ত ভাব দেখিয়া আমার আশা হইয়াছিল যে, তিনি প্রতিমাপূজার বিরোধী হইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিবেন। কিন্তু আমাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইল। তিনি বলিলেন যে, "দুর্গোৎসব আমাদের সমাজ-বন্ধন, বন্ধু-মিলন, ও সকলের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনের একটি

---

(১) অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতারা দল বাঁধিয়া সঙ্কল্প করিয়াছেন যে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করিবেন। ৫৮ ও ৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) প্রিয়. পরি. ২।৬২ দ্রষ্টব্য।

উৎকৃষ্ট ও প্রশস্ত উপায়। ইহার উপরে হস্তক্ষেপ করা উচিত হয় না; করিলে সকলের মনে আঘাত লাগিবে।” তথাপি আমার উপদেশ ও অনুরোধে বাধিত হইয়া জগদ্ধাত্রী পূজাটা উঠাইয়া দিতে আমার ভ্রাতারা সম্মত হইলেন। সেই অবধি জগদ্ধাত্রী পূজা আমাদের বাড়ী হইতে চিরদিনের জন্য রহিত হইল। দুর্গাপূজা চলিতেই লাগিল।

আমি সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় হইতে দুর্গোৎসবে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে যে আরম্ভ করিয়াছিলাম, এখনো তাহার শেষ হইল না। এখনো আশ্বিন মাস আইলেই আমি কোথাও না কোথাও চলিয়া যাই। এ বৎসরে ১৭৭১ শকে[১] পূজা এড়াইবার জন্য আসাম অঞ্চলে বহির্গত হইলাম। বাষ্পতরীতে ঢাকায় গেলাম; সেখান হইতে মেঘনা পার হইয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া গৌহাটীতে পঁহুছিলাম। গৌহাটীতে বাষ্পতরী লাগান হইলে সেখানকার কমিশনার সাহেব ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক তাহা দেখিতে আইলেন, ও আমার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। সকলেই আগ্রহ সহকারে আমার সহিত আলাপ করিলেন। আমি কামাখ্যার মন্দির দেখিতে যাইব শুনিয়া, সকলেই আপন আপন হস্তী পাঠাইয়া দিবেন, বলিয়া গেলেন। আমার সেই কামাখ্যার মন্দির দেখিতে যাইবার যে ব্যগ্রতা, তাহাতে আমি ভোরে ৪টার সময় উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু তীরে কাহারো হস্তী দেখিতে পাইলাম না; কেবল কমিশনার সাহেবের হস্তীই আমার জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতেছে; কেবল তিনিই আপনার কথা রক্ষা করিয়াছেন।

(১) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ; পরিশিষ্ট ৪৮।

আমি তাহা দেখিয়া আহ্লাদিত হইয়া তীরে নামিলাম, এবং পদব্রজেই চলিলাম, এবং মাহুতকে পশ্চাতে হস্তী আনিতে আদেশ করিলাম। খানিক যাইয়া দেখি যে, হস্তী পিছে পড়িয়া রহিয়াছে। মাহুত হস্তীকে লইয়া একটা ছোট নালা উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি তাহা দেখিয়া ক্ষণেক হস্তীর জন্য অপেক্ষা করিলাম। বিলম্ব হইতে লাগিল; সে মাহুত হাতীকে নালা পার করাইতে পারিতেছে না। আমার ধৈর্য্য চলিয়া গেল, আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না; পদব্রজেই তিন ক্রোশ চলিয়া কামাখ্যার পর্ব্বতের পাদদেশে পঁহুছিলাম, এবং বিশ্রাম না লইয়াই তাহাতে উঠিতে লাগিলাম। পর্ব্বতের পথ প্রস্তরে নির্ম্মিত। পথের দুই দিকে ঘোর জঙ্গল, সে জঙ্গলের ভিতরে দৃষ্টি চলে না। সে পথ সোজা হইয়া উঠিয়াছে। সেই নির্জ্জন বন-পথে একা উঠিতে লাগিলাম। তখনও সূর্য্য উদয় হইতে অল্প বিলম্ব আছে। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে, আমি তাহা না মানিয়া ক্রমিক উঠিতেছি। পথের তৃতীয় ভাগ উঠিয়াছি, পা তখন অবশ হইল, আর আমার ইচ্ছামত পা চলে না। আমি পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া একটা উচ্চ পাথরের উপরে বসিলাম। আমি একেলা সেই জঙ্গলে বসিয়া, ভিতরে পরিশ্রমের ঘর্ম্ম এবং বাহিরে বৃষ্টিতে ভিজিতেছি। ভয় হইতেছে যে, সেই জঙ্গল হইতে বাঘ ভালুক বা আর কি আসে। এমন সময় দেখি যে, সেই মাহুতটা আসিয়া উপস্থিত। সে বলিল, "আমি তো হাতী আনিতে পারিলাম না; আপনি একেলা যাইতেছেন দেখিয়া আমি আপনার পিছে পিছে ছুটিয়া আসিয়াছি।" তখন আমার শরীরে একটু বল আসিয়াছে, আমার অঙ্গ স্ববশ হইয়াছে। তাহার সঙ্গে আমি আবার পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম।

পর্ব্বতের উপরে একটি বিস্তীর্ণ সমভূমি; অনেকগুলা চালা ঘর তাহার উপরে রহিয়াছে; কিন্তু কোথাও একটি লোকও দেখিলাম না। আমি কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সে তো মন্দির নয়, একটি পর্ব্বত-গহ্বর। তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই, একটি কেবল যোনিমুদ্রা আছে। আমি ইহা দেখিয়া, এবং পথপর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়া, ফিরিয়া আসিলাম, এবং ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। তাহার স্নিগ্ধ জলের গুণে আমার শরীরে আবার নূতন বল আইল। তাহার পর দেখি যে ৪০০।৫০০ লোক ভিড় করিয়া তীরে দাঁড়াইয়া কোলাহল করিতেছে। আমি বলিলাম, "তোমরা কি চাও?" তাহারা বলিল, "আমরা কামাখ্যা দেবীর পাণ্ডা, আপনি কামাখ্যা দেখিয়া আসিয়াছেন, আমরা কিছুই পাই নাই। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত দেবীর পূজা করিতে হয়, এই জন্য আমরা বেলা না হইলে নিদ্রা হইতে উঠিতে পারি না।" আমি বলিলাম, "তোমরা চলিয়া যাও, আমার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

১৮৫০ সালের পূজার সময় দেবেন্দ্রনাথের বর্ম্মা ভ্রমণ। দ্বীপান্তরিত বাঙ্গালী; মুণ্ডিত-শীর্ষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। মুলমীনের নিকটবর্ত্তী গুহা দর্শন।

আবার পর বৎসরের আশ্বিন মাসে[১] শরতের শোভা প্রকাশ হইল, আমার মনে ভ্রমণের ইচ্ছা প্রদীপ্ত হইল। এবার কোথায় বেড়াইতে যাই, তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। জলের পথেই বেড়াইতে বাহির হইব, এই মনে করিয়া গঙ্গাতীরে নৌকা দেখিতে গেলাম। দেখি যে, একটা বড় ষ্টীমারে খালাসীরা তাহার কাজকর্ম্মে বড়ই ব্যস্ত রহিয়াছে। মনে হইল, এই ষ্টীমারটা শীঘ্রই বাহিরে যাইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ষ্টীমার এলাহাবাদ কবে যাইবে?" তাহারা বলিল যে, "এই ষ্টীমার দুই তিন দিনের মধ্যে সমুদ্রে যাইবে।" জাহাজ সমুদ্রে যাইবে শুনিয়া আমার সমুদ্রে যাইবার ইচ্ছা পূর্ণ হইবার বড়ই সুবিধা মনে করিলাম। আমি অমনি কাপ্তেনের কাছে যাইয়া তাহার একটা ঘর ভাড়া করিলাম; এবং যথা সময়ে তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রযাত্রায় বহির্গত হইলাম।

সমুদ্রের নীল জল ইহার পূর্ব্বে আর আমি কখনো দেখি নাই। তরঙ্গায়িত অনন্ত নীলোজ্জ্বল সমুদ্রে দিনরাত্রির বিভিন্ন বিচিত্র শোভা দেখিয়া অনন্ত পুরুষের মহিমায় নিমগ্ন হইলাম। সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তরঙ্গে দুলিতে দুলিতে এক রাত্রির পর

---

(১) ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর।

বেলা ৩টার সময় একটা স্থানে জাহাজ নোঙ্গর করিল। সম্মুখে দেখি, একটা শ্বেত বালুর চড়া; তাহার উপরে একটা বসতির মত বোধ হইল। আমি একটা নৌকা করিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, কতকগুলা-মাতুলী-গলায়, চট্টগ্রামবাসী বাঙ্গালীরা আমার নিকটে আসিতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, "তোমরা যে এখানে? তোমরা এখানে কি কর?" তাহারা বলিল, "আমরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করি। আমরা এখানে এই আশ্বিন মাসে মা'র একখানি প্রতিমা আনিয়াছি।" আমি এই ব্রহ্মরাজ্যের খাএক্‌ফু নগরে দুর্গোৎসবের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আবার এখানেও সেই দুর্গোৎসব!

সেখান হইতে জাহাজে ফিরিয়া আইলাম, এবং মুলমীনের অভিমুখে চলিলাম। যখন জাহাজ সমুদ্র ছাড়িয়া মুলমীনের নদীতে গেল, তখন গঙ্গাসাগর ছাড়িয়া গঙ্গা নদীতে প্রবেশের ন্যায় আমার বোধ হইল। কিন্তু এ নদীর তেমন কিছুই শোভা নাই; জল পঙ্কিল, কুম্ভীরে পূর্ণ; সে নদীতে কেহ অবগাহন করে না। মুলমীনে আসিয়া জাহাজ নোঙ্গর করিল। এখানে মান্দ্রাজবাসী একজন মুদেলিয়ার[১] আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি আপনি আসিয়া আমাকে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি এক জন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী, অতি ভদ্রলোক। তিনি আমাকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। যে কয় দিন আমি মুলমীনে ছিলাম, সেই কয় দিনের জন্য আমি তাঁহারই আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমি অতি সন্তোষে তাঁহার বাড়ীতে এ কয় দিন কাটাইলাম।

---

(১) মুলমীনের Military outpostএর তৎকালীন কমিসেরিয়েট্ কণ্ট্রাক্টর শ্রীযুক্ত মুরুগেসম্ মুদেলিয়ার।

মুলমীন নগরের পথ সকল পরিষ্কার ও প্রশস্ত। দু-ধারী দোকানে কেবল স্ত্রীলোকেরাই নানাপ্রকার পণ্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে। আমি পেটরা ও উৎকৃষ্ট রেশমের বস্ত্রাদি তাহাদের নিকট হইতে ক্রয় করিলাম। বাজার দেখিতে দেখিতে একটা মাছের বাজারে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, বড় বড় টেবিলের উপরে বড় বড় মাছ সব বিক্রয়ের জন্য রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সব অতি বড়-বড় কি মাছ?" তাহারা বলিল, "কুমীর"। বর্ম্মারা[১] কুমীর খায়; অহিংসা-বৌদ্ধধর্ম্ম কেবল ইহাদের মুখে, কিন্তু পেটে কুমীর!

এই মুলমীনের প্রশস্ত রাস্তা দিয়া এক দিন সন্ধ্যার সময়ে বেড়াইতেছি; দেখি, একজন লোক আমার দিকে আসিতেছে। একটু নিকটে আইলে বুঝিলাম, সে বাঙ্গালী। সেখানে তখন বাঙ্গালী দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এই সমুদ্রপারে বাঙ্গালী কোথা হইতে আইল? বাঙ্গালীর অগম্য স্থান নাই! আমি বলিলাম, "কোথা হইতে তুমি এখানে?" সে বলিল, "আমি একটা বিপদে পড়িয়া আসিয়াছি"। আমি অমনি সে বিপদ বুঝিতে পারিলাম[২]। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কত বৎসরের বিপদ?" সে বলিল, "সাত বৎসরের"। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি করিয়াছিলে?"

---

(১) 'বর্ম্মা' শব্দটি দেশ ও দেশবাসী উভয়ের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। সে দেশের ভাষায় দেশের নাম myau ma pye, চলিত কথায় 'বমা প্যী'। তেমনি মানুষের নাম myau ma lu myo, চলিত কথায় 'বমা লূ ম্যো'।

(২) অর্থাৎ লোকটি 'দ্বীপান্তরিত' হইয়াছে। মুলমীনে সাধারণতঃ রাজনৈতিক অপরাধীদিগকেই 'অন্তরীণ' করা হয়। কিন্তু আণ্ডামান দ্বীপের Port Blair নগর গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দ্বীপান্তর-বাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবার (১৮৫৮) পূর্ব্বে, মধ্যে মধ্যে সাধারণ অপরাধীদিগকেও তথায় প্রেরণ করা হইত। এটি ১৮৫০ সালের ঘটনা।

সে বলিল, "আর কিছু নয়, একটা কোম্পানীর কাগজ জাল করিয়াছিলাম। এখন আমার মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে বাড়ী যাইতে পারিতেছি না।" আমি তাহাকে পাথেয় দিতে চাহিলাম। কিন্তু সে কোথায় বাড়ী আসিবে! সে সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, বিবাহ করিয়াছে, এবং সুখে স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। সে কি আর কালা মুখ দেখাইতে দেশে আসিবে!

মুদেলিয়ার আমাকে বলিলেন যে, এখানে একটি দর্শনীয় পর্ব্বতগুহা[১] আছে; অভিপ্রায় হইলে আপনাকে সঙ্গে লইয়া তাহা দেখাইতে পারি। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। তিনি সেই অমাবস্যার[২] রাত্রির জোয়ারে একটা লম্বা ডিঙি আনিলেন, তাহার মাঝখানে একটা কাঠের কামরা। সেই রাত্রিতে মুদেলিয়ার এবং আমি, জাহাজের কাপ্তান প্রভৃতি ৭।৮ জনকে লইয়া তাহাতে বসিলাম, এবং রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে নৌকা ছাড়িলাম। আমরা সারা রাত্রি সেই নৌকাতে বসিয়া জাগিয়া রহিলাম। সাহেবেরা তাঁহাদের ইংরাজী গান গাহিতে লাগিলেন। আমাকেও বাঙ্গালা গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতে লাগিলাম। তাহারা কেহই তাহার কিছুই বুঝিল না; তাহারা হাসিতে লাগিল; তাহাদের তাহা ভালই লাগিল না। সেই রাত্রিতে ১২ ক্রোশ চলিয়া আমরা আমাদের গম্যস্থানে ভোর ৪টার সময়ে পঁহুছিলাম।

---

(১) এই প্রসিদ্ধ গুহার স্থানীয় নাম Kha yon gu, ইংরাজী নাম Farm cave; ইহা মুলমীন সহরের উত্তর পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। Ataran নদী দিয়া যাইতে হয়।

(২) ৪ঠা নভেম্বর, ১৮৫০।

আমাদের নৌকা তীরে লাগিল। এখনো সব অন্ধকার। তীরের অদূরে দেখি যে, একটা তরু ও লতা বেষ্টিত বাড়ী হইতে কতকগুলা দীপের আলো বাহির হইতেছে। আমি কৌতূহলবিশিষ্ট হইয়া সেই অজ্ঞাত স্থানে, সেই অন্ধকারে-অন্ধকারে একা দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখি, একটি ক্ষুদ্র কুটীর ; তাহার মধ্যে গেরুয়া বসন পরা মুণ্ডিতমস্তক কতকগুলি সন্ন্যাসী মোমবাতির আলো লইয়া তাহা একবার এখানে একবার ওখানে রাখিতেছে। এখানেও কাশীর দণ্ডীর ন্যায় লোকদের দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। এখানে দণ্ডীরা আইল কোথা হ'তে ? তাহার পরে জানিলাম যে, ইহারা ফুঙ্গী, বৌদ্ধদিগের গুরু ও পুরোহিত। আমি আড়ালে থাকিয়া ইহাদের এই বাতির খেলা দেখিতেছি, হঠাৎ তাহাদের এক জন আমাকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের ঘরের ভিতর আমাকে লইয়া গেল। বসিতে আসন দিল, এবং পা ধুইবার জল দিল। আমি তাহাদের ঘরে গিয়াছি, তাহারা এইরূপে আমার অতিথি সৎকার করিল। বৌদ্ধদিগের অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম।

প্রাতঃকাল হইল, আমি নৌকাতে ফিরিয়া আসিলাম। সূর্য্য উদয় হইল। মুদেলিয়ারের আর-আর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা আসিয়া সেখানে যোগ দিলেন। ইহাতে আমরা পঞ্চাশ জন হইলাম। মুদেলিয়ার সেখানে আমাদের সকলকে আহার করাইলেন। তিনি অনেকগুলি হস্তী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন ; আমরা দুই চারি জন করিয়া সেই হস্তীতে চড়িয়া সেখানকার মহাজঙ্গল দিয়া চলিলাম। এখানে মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়, আর ঘন ঘন জঙ্গল। হাতী ভিন্ন এখানে চলিবার আর অন্য উপায় নাই। আমরা বেলা ৩টার সময়ে সেই পর্ব্বতের গুহার

সম্মুখে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমরা হাতী হইতে নামিয়া এখান হইতে এক কোমর জঙ্গল ভাঙ্গিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। সেই পর্ব্বতগুহার মুখ ছোট; আমরা সকলে গুঁড়ি মারিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পা গুঁড়ি দিয়া গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিলাম। তাহার ভিতরে ভারি পিছল। পা পিছ্‌লে যাইতে লাগিল। সেখান হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া খানিক দূর গেলাম। ঘোর অন্ধকার, দিন ৩টার সময় বোধ হইতে লাগিল যেন রাত্রি ৩টা। ভয় হইতে লাগিল যে, যদি সুড়ঙ্গের পথ হারাইয়া ফেলি, তবে আমরা বাহির হইব কি প্রকারে? সমস্ত দিন এই গুহার মধ্যে ঘুরিতে হইবে। এই ভাবিয়া আমি যেখানেই যাই, সেই সুড়ঙ্গের ক্ষুদ্র আলোকটুকুর দিকে লক্ষ্য রাখিলাম। সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে আমরা পঞ্চাশ জন ছড়াইয়া পড়িলাম, এবং দূরে দূরে দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রতি জনের হাতে গন্ধক-চূর্ণ। যেখানে যিনি দাঁড়াইলেন, তিনি সেখানকার পর্ব্বতে খুবরীর মধ্যে সেই গন্ধক-চূর্ণ রাখিয়া দিলেন। আমাদের দাঁড়ান ঠিক হইলে কাপ্তান আপনার গন্ধকের গুঁড়া জ্বালাইয়া দিলেন। অমনি আমরা সকলেই দীয়াশলাই দিয়া আপন আপন গন্ধক-চূর্ণ জ্বালাইয়া দিলাম। একেবারে সেই গুহার পঞ্চাশ স্থানে পঞ্চাশটা রংমশালের আলো জ্বলিয়া উঠিল, আমরা গুহার ভিতরটা সব দেখিতে পাইলাম। কি প্রকাণ্ড গুহা! উপরের দিকে তাকাইলাম, আমাদের দৃষ্টি তাহার উচ্চতার সীমা পাইল না। গুহার ভিতরে বৃষ্টির ধারার বেগে স্বাভাবিক বিচিত্র কারুকর্ম্ম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম।

পরে আমরা বাহিরে আসিয়া সেই পর্ব্বতের বনে বন-ভোজন

করিলাম, এবং মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে পথে নানা যন্ত্র-মিশ্রিত একতানের একটা বাদ্য শুনিতে পাইলাম। আমরা সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া নিকটে গেলাম। দেখিলাম যে, কতকগুলা বর্ম্মা সেখানে অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া নৃত্য করিতেছে। সেই আমোদে কাপ্তান সাহেবেরাও যোগ দিয়া তদনুরূপ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বড় আমোদ পাইলেন। একটি বর্ম্মার স্ত্রী ঘরের দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। সে সাহেবদের এই বিদ্রূপ দেখিয়া আমোদোন্মত্ত পুরুষদের কাণে কাণে কি বলিয়া গেল, অমনি তাহারা নৃত্য ও বাদ্য ভঙ্গ করিয়া কে কোথায় পলাইল। কাপ্তান সাহেবরা তাহাদের কত অনুনয় বিনয় করিয়া আবার নৃত্য করিতে বলিলেন; তাহারা শুনিল না, কে কোথায় চলিয়া গেল। ব্রহ্মরাজ্যে পুরুষদিগের উপরে স্ত্রীদিগের এত অধিকার।

মুলমীনে ফিরিয়া আসিলাম। একটি উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত বর্ম্মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। তিনি বিনয়ের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন। ফরাসের উপরে তিনি চৌকিতে, আর আমি এক চৌকিতে বসিলাম। সে একটা প্রশস্ত ঘর, তাহার চারি কোণে তাঁহার চারিটি যুবতী কন্যা বসিয়া কি সেলাই করিতেছে। আমি বসিলে তিনি বলিলেন, "আদা[১]," অমনি তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ে আসিয়া আমার হাতে একটি গোলাকৃতি পানের ডিবা দিল। আমি খুলে দেখি যে, তাহাতে পানের মসলা। বৌদ্ধ গৃহীদিগের এই অতিথি

(১) বর্ম্মা ভাষায় অতিথিকে বলে ai the(y), উচ্চারণ হয় অনেকটা 'এ য্যা'; হঠাৎ শুনিলে 'আদা' শোনা আশ্চর্য্য নয়।

সংকার। তিনি তাঁহাদের দেশের উৎকৃষ্ট অশোক জাতীয় কতকগুলা ফুলের চারা আমাকে উপহার দিলেন। আমি তাহা বাড়ী আনিয়া বাগানে রোপণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এদেশে অনেক যত্নেও তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না। এই গাছের যে ফল হয়, বর্ম্মাদিগের তাহা অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। যদি ১৬ টাকা কাছে থাকে, তবে তাহা দিয়াও সেই ফল খরিদ করিবে। তাহাদের এই উপাদেয় খাদ্য কিন্তু আমাদের ঘ্রাণেরও অসহ্য[১]।

(১) ডুরিয়ান্ নামক ফল। ফল দেখিতে কতকটা কাঁঠালের মত; পাতা দেখিতে কতকটা অশোক পাতার মত, কিন্তু তার চেয়ে সরু ও ছোট।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

উড়িষ্যা ভ্রমণ, পুরী দর্শন ; (১৮৫১)।

ব্রহ্মরাজ্য হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই শকের ফাল্গুন মাসের শেষে[১] আমি কটকে যাই। যে পথে তীর্থযাত্রীরা জগন্নাথে যায়, আমি সেই পথে পাল্কীর ডাকে গিয়া কটকে পঁহুছিলাম। সেখানে একখানি খোলার ঘরে বাসা করি। চৈত্র মাসে কটকে প্রচণ্ড রৌদ্র ; তাহার উত্তাপে আমার শরীর বিকল হইয়া পড়িল। আমি সেখান হইতে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে আমার জমিদারী কাছারীতে গেলাম, এবং জমিদারী পরিদর্শন করিবার জন্য সেখানে কিছুদিন থাকিলাম।

এখান হইতে জগন্নাথ দর্শনার্থ পুরীতে যাই। আমি রাত্রিতেই পাল্কীর ডাকে চলিলাম। প্রভাত হইল, তখন পুরীর অনতিদূরে একটি সুন্দর পুষ্করিণীর ধারে পঁহুছিলাম। শুনিলাম, ইহার নাম 'চন্দন-যাত্রার পুষ্করিণী'। আমি সেখানে পাল্কী হইতে নামিলাম, এবং সেই পুষ্করিণীর স্নিগ্ধ জলে স্নান করিয়া পথের ক্লেশ দূর করিলাম। স্নান করিয়া উঠিয়াছি, জগন্নাথের একজন পাণ্ডা আসিয়া আমাকে ধরিল। আমি অমনি তাহার সঙ্গে সেখান হইতে হাঁটিয়া চলিলাম। আমার পায়ে জুতা ছিল না, তাহাতে পাণ্ডা বড় সন্তুষ্ট হইল। গিয়া দেখি যে, মন্দিরের দ্বার বন্ধ, আর তাহার সেই দ্বারে লোকারণ্য। সকলেই জগন্নাথ দেখিতে উৎসুক। পাণ্ডার হাতে মন্দিরের চাবি ছিল, সে চাবি খুলিতে লাগিল।

---

(১) ১৮৫১ সালের মার্চ।

একটা দ্বার খুলিল, মন্দিরের মধ্যে একটা দীর্ঘ দালান দেখিতে পাইলাম। তাহার ভিতর গিয়া পাণ্ডা আর একটা দ্বার খুলিল, আবার আর একটা দালান দেখিলাম। যখন পাণ্ডা শেষ দ্বার খুলিল, তখন আমার পশ্চাতে হাজার যাত্রী ছিল; "জয় জগন্নাথ" বলিয়া তাহারা বেগে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমি অসাবধানে ছিলাম, তখন তাহাদের সেই লোক-তরঙ্গের মধ্যে আমি পড়িয়া গেলাম। আমার সঙ্গীরা আমাকে কোন প্রকারে ধরিয়া সামলাইয়া রাখিল, কিন্তু আমার চশমাটা পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। সাকার জগন্নাথকে দেখিবার আর সুবিধা হইল না, আমি সেই নিরাকার জগন্নাথকেই দেখিলাম। এখানে যে একটি প্রবাদ আছে, যে যাহা মনে করিয়া এই জগন্নাথ মন্দিরে যায়, সে তাহা দেখিতে পায়, আমার নিকটে তাহা পূর্ণ হইল।

এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকার নির্ব্বাত মন্দিরের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ যাত্রীদের অসম্ভব ভিড়। স্ত্রীলোকদিগের এখানে ভদ্রতা রক্ষা করা দায়। আমি সেই ভিড়ের তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া একবার এদিকে, একবার ওদিকে, নীত হইতে লাগিলাম; এক স্থানে নিমেষ মাত্রও দাঁড়াইয়া থাকা অসাধ্য বোধ হইল। তখন আমার সঙ্গের জমাদার ও পাণ্ডা আমার তিন দিকে একের হাত আর এক জন ধরিয়া রেল করিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে স্বয়ং জগন্নাথের রত্ন-বেদী আমার রক্ষক হইল। আমি তখন নিরাপদ হইয়া দেখিতে লাগিলাম। জগন্নাথের সম্মুখে বৃহৎ একটা তাম্রকুণ্ড পূর্ণ জল, তাহাতে জগন্নাথের ছায়া পড়িয়াছে। সেই ছায়াকে দাঁতন করাইল, আবার তাহাতেই জল ঢালিয়া দিল, ইহাতেই জগন্নাথের দন্তধাবন ও স্নান হইয়া গেল। পাণ্ডারা তাহার পরে

সেই জগন্নাথের উপরে চড়িয়া তাহাকে নূতন বসন ও নূতন আভরণ পরাইল। ইহাতেই ১১টা বাজিয়া গেল। তাহার পরে ভোগের সময় হইল, আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম।

আমি সেখান হইতে বিমলা দেবীর মন্দিরে গেলাম। এখানে লোক অতি অল্প; আমি যে বিমলা দেবীকে প্রণাম করিলাম না, তাহা সকলে দেখিতে পাইল। উড়িয়ারা তাহা দেখিয়া একেবারে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল,—"কে এ, প্রণাম করিল না? এ কে?" সকলেই আমার প্রতি আক্রমণ করিল। ভাল গতিক না দেখিয়া আমার পাণ্ডা আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আমাকে আনিল। এখানে পাণ্ডা আমাকে বলিল, "বিমলা দেবীকে প্রণাম না করা ভাল হয় নাই। ইহাতে যাত্রীরা বড় অসন্তুষ্ট হইয়াছে। একটা প্রণাম বৈ তো নয়, তাহা করিলেই হইত।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমার বিমলা দেবীকে প্রণাম করিব কি, আমি মায়া দেবীকেই প্রণাম করি নাই। তুমি জান, আমি মায়াপুরীতে গিয়াছিলাম। মায়ার মন্দিরে গিয়া আমি মায়াকে দেখিয়াছিলাম। তিনি 'তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা[১]', তিনি মণি-মণ্ডিত পর্য্যঙ্ককে আলো করিয়া অর্দ্ধশয়ানা হইয়া রহিয়াছেন; আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। একজন সহচরী আমাকে ইঙ্গিত করিল, 'প্রণাম কর'। আমি বলিলাম, 'আমি কোন সৃষ্ট দেব দেবীকে প্রণাম করি না'। তাহাতে তাহারা জিব্ কাটিয়া উঠিল। মায়াদেবী তাহাদের বলিল, 'যদি এ প্রণাম না করে, তবে একটা ফুল দিয়া যাউক'। আমি তাহাতে কোন কথা না কহিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। আমি নীচের তলায় নামিয়া

(১) মেঘদূত, উত্তর মেঘ, ১৬শ শ্লোক।

বাহিরে যাইবার জন্য সম্মুখের বারাণ্ডায় গেলাম। সেই বারাণ্ডা হইতে পা বাড়াইয়াছি, দেখি যে, সম্মুখে আর একটা বারাণ্ডা। সে বারাণ্ডা ছাড়াইলাম, অমনি সম্মুখে আর এক বারাণ্ডা। এইরূপে যতই বারাণ্ডা ছাড়াই, ততই সম্মুখে বারাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হয়। কত কত বারাণ্ডা অতিক্রম করিলাম, কিন্তু ইহার আর অন্ত করিতে পারিলাম না। বুঝিলাম যে, আমি মায়া-জালে বন্দী হইয়া পড়িয়াছি। অবশেষে নিতান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলাম। স্বপ্ন-রাজ্য ভাঙ্গিয়া গেল। চেতন হইয়া দেখি যে, সেই মায়া দেবীর পুরীই এই জগন্নাথের পুরী।" পাণ্ডা আমার এই কথা শুনিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না, চলিয়া গেল।

তাহার পরে মহাপ্রসাদের গোল। মহাপ্রসাদ লইয়া ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। জমাদার, ব্রাহ্মণ, চাকর, সকলেই সেই মহা-প্রসাদ লইয়া, এ উহার মুখে, ও ইহার মুখে, দিতে লাগিল। তখন আর ব্রাহ্মণ শূদ্র ভেদ রহিল না। সকলেই একত্রে খাইয়া আনন্দ করিতে লাগিল। উড়েরা ধন্য, তাহারা এ বিষয়ে সকলকে জিতিয়াছে; তাহারা সকল জাতিকে এক করিয়া ফেলিয়াছে।

আমি এই পুরী হইতে পুনর্ব্বার কটকে ফিরিয়া আইলাম। সেখানে আসিয়া সংবাদ পাইলাম যে, আমাদের জমিদারীর দেওয়ান রামচন্দ্র গাঙ্গুলির মৃত্যু হইয়াছে। তিনি রামমোহন রায়ের একজন আত্মীয় কুটুম্ব, এবং তাঁহার পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়ের অতি বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম-দক্ষতার পরিচয় পাইয়া আমার পিতা তাঁহাকে আমাদের সমস্ত জমিদারীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং তিনি অদ্যাপি আমাদের অধীনে থাকিয়া

অতি নিপুণরূপে জমিদারীর কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি ব্যস্ত হইয়া কটক হইতে ১৭৭৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে[১] বাড়ীতে ফিরিয়া আইলাম, এবং জমিদারীর নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

---

(১) ১৮৫১, মে মাস। ইহার পর কয়েক বৎসরের কোনও ঘটনার উল্লেখ আত্ম-জীবনীতে নাই। ৪৯ পরিশিষ্টে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ[1]।

দেবেন্দ্রনাথ চৌদ্দ হাজার টাকার একটি ঋণের জন্য ওয়ারাণ্টে ধৃত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর উপস্থিত-মত ঋণ শোধ করিয়া দিবার ভার লইলেন। তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বরের সত্যতা বিষয়ে কথোপকথন (১৮৫৫)।

১৭৭৬ শকে[2] গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। তিনি হাউসের কার্য্য যে প্রকার নিপুণতার সহিত চালাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যুতে সে কার্য্য চালাইবার একটা বড়ই অভাব পড়িয়া গেল। এত দিনে অনেক ঋণ পরিশোধও হইয়াছে, অনেক অবশিষ্টও আছে। কোন কোন পাওনাদারেরা টাকা পাইবার বিলম্ব আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের নামে নালিশও করিয়াছে, এবং ডিক্রীও পাইয়াছে।

আমি এই সময়ে প্রতিদিন মধ্যাহ্নের ভোজনের পর তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্য পরিদর্শনের জন্য ব্রাহ্মসমাজের দোতালায় সভার কার্য্যালয়েই থাকিতাম। এক দিন আমি আহারের পর সভায় যাইতেছি, এমন সময় আমার বাড়ীর লোকেরা বলিল যে, “আজ সভায় যাবেন না, আজ একটা ওয়ারিণের আশঙ্কা আছে।” মিথ্যা একটা বাধা মাত্র মনে করিয়া, আমি ইহা শুনিয়াও সভাতে চলিয়া গেলাম, এবং সেখানে বসিয়া সভার কার্য্য দেখিতে

---

(১) এই পরিচ্ছেদ হইতে গ্রন্থশেষ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে কালক্রম ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। পাঠক ৫০ পরিশিষ্ট দেখিয়া লইবেন।

(২) ১৮৫৪, ১৯ ডিসেম্বর।

লাগিলাম। ক্ষণেক পরে দেখি যে, একজন বাঙ্গালী কেরাণী আসিয়া চোক মুখ লাল করিয়া[১] আমাকে আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল, "আমি যে আজ আপনাকে এখানে আসিতে মানা করিয়া পাঠাইয়াছিলাম ; আপনি আজ এখানে কেন এলেন ?" পরে সে পশ্চাদ্বর্ত্তী বেলিফকে আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিল, "ইনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" তখন সেই বেলিফ আমাকে একখানা ওয়ারেণ্ট দিল। বলিল, "১৪০০০ চৌদ্দ হাজার টাকা এখনি দাও।" আমি বলিলাম, "চৌদ্দ হাজার টাকা এখন আমার কাছে নাই।" সে বলিল, "তবে এখনি আমার সঙ্গে শেরিফের নিকট এস।" আমি তাহাকে একটু বসিতে বলিয়া গাড়ী আনিতে পাঠাইলাম। গাড়ী আসিল, এবং সেই সাহেব-বেলিফ সেই গাড়ীতে করিয়া আমাকে শেরিফের নিকটে লইয়া গেল।

এদিকে আমাদের বাড়ীতে মহা গোল উঠিয়াছে,—আমাকে ওয়ারেণ্ট দিয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আজ সকলেই আমাকে বাড়ীর বাহিরে যাইতে বারণ করিয়াছিল, আমি কাহারো কথা শুনি নাই, আমাকে ওয়ারেণ্ট ধরিয়াছে ; সকলেরি মুখে এই কথা।

আমাদের উকিল জর্জ সাহেবই[২] ঘটনাক্রমে সেই বৎসরে শেরিফ ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার আফিসে বসাইলেন, এবং

---

(১) ইনি বেলিফের অফিসের কেরাণী। পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যার সময় দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিজে আসিয়া সাবধান করিয়া গিয়াছিলেন, যেন পরের দিন তিনি তত্ত্ববোধিনী কার্য্যালয়ে না যান। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া ধৃত হইলেন, তাই তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

(২) "Our attorney Mr. George."—আত্মজীবনীর ইংরাজী অনুবাদ।

আমি যে কেন আজ বাড়ীর বাহির হইয়াছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

এদিকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ জজ কলবিলের[১] নিকট গিয়া উপস্থিত। তিনি জামিন দিয়া আমাকে খালাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তখন আমাদের বাড়ীর চন্দ্র বাবু[২] প্রভৃতি জামিন হইয়া আমাকে কারাবাসের দায় হইতে মুক্ত করিয়া আনিলেন।

আমার পিতৃব্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহা অবগত হইয়া ক্ষোভ করিয়া বলিলেন, "দেবেন্দ্র আমাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না, কিছুই বলে না; আমাকে জানাইলেই তো আমি তার ঋণের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারি।" আমি ইহা শুনিয়া তাহার পরদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "দেখ, তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা দিবে, আমি উপস্থিত-মত তোমার দেনা পরিশোধ করিব। কেহ আর এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।" আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম, এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনফাই তাঁহাকে দিতে লাগিলাম, এবং তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের কাছে আমি প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে যাইতাম। তাঁহাকে হিসাব পত্র দেখাইতাম, এবং দেনা-পাওনার কথা-বার্ত্তা কহিয়া আসিতাম।

---

(১) পরিশিষ্ট ৫১। (২) দ্বারকানাথের ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। বংশলতিকা, সময়সূচী, ও ৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

সেই সময়ে যখনি আমি যাইতাম, দেখিতাম, তাঁহার এক প্রান্তে সাদা একটি মোড়াশা পাগড়ি[১] পরিয়া তাঁহার প্রিয় মোসাহেব নব বাঁড়ুয্যা নিয়তই রহিয়াছে। যেমন জজের কোর্টে শেরিফ, সেইরূপ ইহাঁর দরবারে নব বাঁড়ুয্যা। নব বাঁড়ুয্যার সহিত তাঁহার সকল বিষয়েরই পরামর্শ হইত। নব বাঁড়ুয্যা কেবল তাঁহার একমাত্র বিশ্বাস-পাত্র ছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সাক্ষাতে এই নব বাঁড়ুয্যা এক দিন আমাকে বলিলেন, "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বড় ভাল কাগজ। আমি বাবুর লাই-ব্রেরীতে বসিয়া ইহা পড়ি; ইহা পড়িলে জ্ঞান হয়, চৈতন্য হয়।" আমি বলিলাম, "তুমি কি তত্ত্ববোধিনী পড়? প'ড়ো না, প'ড়ো না।" প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিলেন, "কেন? তত্ত্ব-বোধিনী পড়িলে কি হয়?" আমি বলিলাম, "তত্ত্ববোধিনী পড়িলে আমার যে দশা, তাই হয়।" তিনি বলিলেন, "আরে, দেবেন্দ্র কোব্‌লো জবাব দিলো, একেবারে যে কোব্‌লো জবাব দিলো," এই বলিয়া তিনি বড়ই হাসিতে লাগিলেন।

তিনি আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, ঈশ্বর যে আছেন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও দেখি?" আমি বলিলাম, "ঐ দেওয়ালটা যে ওখানে আছে, আপনি তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেন দেখি?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "আরে, দেওয়াল যে ঐ রহিয়াছে, আমি দেখিতেছি, ইহা আর আমি বুঝাইব কি?" আমি বলিলাম, "ঈশ্বর যে এই সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, আমি দেখিতেছি, ইহা আর বুঝাইব কি?" তিনি বলিলেন, "ঈশ্বর আর দেওয়াল বুঝি

(১) মোগলাই পাগড়ি, যেরূপ দেবেন্দ্রনাথও পরিতেন। রামমোহন রায়ের ছবিতে যেরূপ আছে, তাহা শাম্‌লা। মোড়াশা পাগড়িতে brim নাই।

সমান হইল? হাঃ, দেবেন্দ্র বলে কি?" আমি বলিলাম যে, "এই দেওয়াল হইতেও ঈশ্বর আমার নিকটের বস্তু; তিনি আমার অন্তরে আছেন, আমার আত্মাতে আছেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে মানেন না, শাস্ত্রে তাঁহাদের নিন্দা আছে। 'অসত্যং তে প্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরং[১]', অসুরেরা অসত্যকে অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা 'জগতে ঈশ্বর নাই' বলিয়া থাকে।" তিনি বলিলেন, "শাস্ত্রের কিন্তু আমি এই কথাটি সকল হইতে মান্য করি, 'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি নিত্যমুক্তস্বভাববান্[২]', আমি নিত্যমুক্তস্বভাববান্ পরমেশ্বর, আমি অন্য কেহ নই"!

তিনি যদি এ প্রকার অভিমান করিতেন যে, "আঢ্যোঽহং, জনবানস্মি, কো ঽন্যো ঽস্তি সদৃশো ময়া[৩]," আমি ধনাঢ্য, আমি বহুলোকের প্রভু, আমার সমান আর কে আছে, তবে তাঁহার এ অভিমানও বরং শোভা পাইত। কিন্তু, 'আমি স্বয়ং পরমেশ্বর,' এমন অভিমান বড়ই অনর্থের বিষয়; ইহাতে জিব্ কাটিতে হয়। বিষয়ের শত পাশে বদ্ধ হইয়া, জরা-শোকে পাপে-তাপে মগ্ন হইয়া, আপনাকে 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্' মনে করার চেয়ে

---

(১) গীতা ১৬।৭। মূলে আছে, "অসত্যং অপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্," অর্থাৎ অসুরভাবাপন্ন লোকেরা বলে, জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ও অনীশ্বর।

(২) স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য রচিত আহ্নিকতত্ত্বের প্রাতঃকৃত্যাধ্যায়ে প্রতিদিন প্রভাতে এই শ্লোকটি চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে,—

"অহং দেবো, ন চান্যোঽস্মি, ব্রহ্মৈবাহং, ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্।"

(৩) গীতা ১৬।১৫। মূলে আছে, "আঢ্যোঽভিজনবানস্মি," অর্থাৎ আমি ধনী, আমি কুলীন।

আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? শঙ্করাচার্য্য জীব-ব্রহ্মে ঐক্য মত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের মস্তক বিঘূর্ণিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশমতে সন্ন্যাসীরা, এবং গৃহস্থেরাও, এই প্রলাপ-বাক্য বলিতেছে যে, 'সোঽহং,' আমি সেই পরমেশ্বর!

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ বিষয়। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী হইলেন (১৮৫৭)। ব্রাহ্মধর্ম্মবীজের সংশোধন (১৮৪৯)। ঐ বীজের সারগর্ভতা। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাশীর্ষে ঐ বীজের বচন মুদ্রিত হইতে লাগিল (১৮৫১, ১৮৫৭)। গোরিটীতে ব্রাহ্মদিগের উৎসব, ও উপবীত ত্যাগ বিষয়ক আলোচনা (১৮৫৪)।

১৭৭৮ শকের ২৯শে পৌষ[1] ব্রাহ্মসমাজের একটি সাধারণ সভা হয়। এই সভাতে শ্রীযুক্ত রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের দুই জন ট্রষ্টীর পদ শূন্য ছিল। এই সভার উদ্দেশ্য, সেই দুই শূন্য পদে দুই জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করা। ট্রষ্ট্‌ডীডের নিয়মানুসারে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা কেবল শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরই ছিল। তাঁহার ইচ্ছানুসারে অদ্যকার সভায় সভাপতি মহাশয় সর্ব্ব-সম্মতিতে আমাকে এবং রমাপ্রসাদ রায়কে ব্রাহ্মসমাজের দুই জন ট্রষ্টী নিযুক্ত করিলেন।

আমি ১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে বীজ লিখিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম, এক বৎসর পরে[2] তাহা আমি বাক্স হইতে বাহির করি। আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলাম যে, এই বীজ সারগর্ভ[3]। ইহার দ্বিতীয় মন্ত্রে "আনন্দং" ও "বিচিত্রশক্তিমৎ" শব্দের পরিবর্ত্তে "অনন্তং" ও "সর্ব্বশক্তিমৎ" শব্দ বসাইয়া দিলাম, এবং তৃতীয়

---

(১) ১৮৫৭, ১১ জানুয়ারী, রবিবার।

(২) ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (৩) পরিশিষ্ট ৫২।

মন্ত্রে "সুখং" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "শুভং" শব্দ বসাইয়া দিলাম। দ্বিতীয় মন্ত্রের শেষে "ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমং" শব্দ যোগ করিয়া দিলাম। ১৭৭৩ শকের[১] অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে এই বীজের চতুর্থ মন্ত্র প্রকাশিত হয়,—"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব", তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ১৭৭৯ শকের[২] বৈশাখ মাস হইতে সম্পূর্ণ বীজমন্ত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে প্রকাশিত হইতে লাগিল,—"ব্রহ্ম বা এক মিদ মগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ, তদিদং সর্ব্ব মসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞান মনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়ব মেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণ মপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিক মৈহিকঞ্চ শুভ স্তবতি। তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসন-মেব।" পূর্ব্বে কেবল এক পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় সৃষ্টি করিলেন। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্ব্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, সর্ব্ব-শক্তিমান্, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ; কাহারো সহিত তাঁহার উপমা হয় না। একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

এই বীজ প্রকাশ হওয়ার পর দেখি যে, সকল ব্রাহ্মেরই ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি, সকলেরই ইহাতে সন্তোষ। ইহাতে

---

(১) ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ। (২) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ।

অদ্য পর্য্যন্ত কাহারো আপত্তি হয় নাই। যদিও ব্রাহ্মসমাজ বহুধা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর-প্রসাদে এই বীজমন্ত্র সকল ব্রাহ্মেরই একমাত্র ঐক্যস্থল হইয়া রহিয়াছে। এমন কি, ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান্ চিন্তাশীল ব্রাহ্ম বক্তৃতাতে এই বীজের প্রশংসায় বলিয়াছিলেন যে, "পৃথিবী-মধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয়-সিংহাসনে বিবেক রাজার অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয় দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মানব-প্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই।"

[১৭৭৫ শকের] ১৮ পৌষে আমাদিগের পল্‌তার উদ্যানে কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম; প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম একত্র হইয়াছিলেন। বৃক্ষতলে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইল, এবং সামিয়ানার ছায়াতে ভোজন কার্য্য সমাধা হইল। সেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মদিগের এক দল বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কন্যা আদান-প্রদান চালান যায়। তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে কাহারও বাধ্য হইতে হয় না। এই প্রস্তাবে ৮ জন ব্রাহ্ম অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, আমরা ইহাতে প্রস্তুত আছি, এবং আমারদিগের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান-প্রদান করিব।[১]

উপাসনা ভঙ্গ হইলে জগদ্দলের রাখালদাস হালদার প্রস্তাব করিলেন যে, "ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন আমরা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসক হইয়াছি, তখন বর্ণ-প্রভেদ না থাকাই শ্রেয়ঃ। অলখ-নিরঞ্জনের উপাসক শিখ সম্প্রদায়

---

(১) এই স্মল পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত অংশ দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্র (পত্রাবলী, ৩৭) হইতে উদ্ধৃত। ৮৭ পৃষ্ঠা ও ৫৩ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

বর্ণভেদ পরিত্যাগ করিয়া 'সিংহ' এক উপাধি দিয়া সকলে এক জাতি হওয়াতে, তাহাদের মধ্যে এত ঐক্যবল হইল যে, দিল্লীর দুর্দ্দান্ত ঔরঙ্গ্‌জেব্‌ বাদশাকেও পরাজয় করিয়া তাহারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল।" রাখালদাস হালদারের পিতা উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন[১]।

(১) দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তির ভিতরে ভ্রম আছে। ৫৪ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবিধ অশান্তি। নগেন্দ্রনাথের কৃত নূতন ঋণ, ১৮৫৬। অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে ধর্ম্মভাবের অভাব দর্শনে ক্লেশ। অক্ষয়কুমার দত্তের 'আত্মীয়-সভা', ও হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ (১৮৫২—১৮৫৫)। একান্তে চলিয়া গিয়া 'আত্মার মূলতত্ত্ব' অন্বেষণের সঙ্কল্প। সংসার হইতে মুক্ত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণের আকাঙ্ক্ষা (১৮৫৬)।

এত দিনে, এই দশ বৎসরে[১], আমাদের ঋণ অনেক পরিশোধ হইয়া গিয়াছে। পিতৃ-ঋণের মহাভার আমার অনেক কমিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার নূতন বিপদভার, ঋণভার, আমাকে জড়াইতে লাগিল। গিরীন্দ্রনাথ যখন জীবিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার নিজের খরচের জন্য অনেক ঋণ করিয়াছিলেন; আমি তাঁহার কতক ঋণ পিতৃ-ঋণের সঙ্গে পরিশোধ করিয়াছিলাম। এখন আবার নগেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজ ব্যয়ের জন্য অধিকাধিক ঋণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল নিজের ব্যয়ের জন্য নয়,—এমন কি, ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়া তিনি আর এক জনকে আনুকূল্য করিতেন; তিনি এমনি পরদুঃখে দুঃখী ও দয়ালু ছিলেন। তাঁহার বদান্যতা, তাঁহার প্রিয় ব্যবহার, লোকের মনকে অতিমাত্র আকর্ষণ করিয়াছিল। এক দিন এক জন ঋণ-দাতা তাঁহাকে টাকার জন্য কিছু তীব্রোক্তি করিয়াছিল, ইহাতে তিনি আমার কাছে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। বলিলেন,

---

(১) ১৮৪৬ হইতে ১৮৫৬ সাল। এখানে দশ বৎসর পিতার মৃত্যুর পর হইতে গণনা করা হইয়াছে, ব্যবসায় পতনের পর হইতে নহে।

"ঋণ-দাতাকে আমি যে নোট লিখিয়া দিয়াছি, তাহাতে আপনি আমার সহিত স্বাক্ষর না করিলে সে আমাকে ছাড়িতেছে না।" আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, "আমার যাহা আছে তাহা তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু নোটে কি খতে আমি সহি করিয়া দিতে পারি না। আমি একে এই উপস্থিত ঋণই পরিশোধ করিতে পারিতেছি না, আমি কোথায় আবার তোমাদের এই নূতন ঋণে আবদ্ধ হইতে যাইব? জানিয়া শুনিয়া আমি আর এই ঋণের পাপানলে ঝাঁপ দিতে পারিব না।" তিনি আমার এই কথা শুনিয়া একটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া তিন ঘণ্টা কাঁদিলেন। তাঁহার ক্রন্দনে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু আমি তাঁহার নোটে সহি করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে বলিলাম, "আমাদের গালিমপুরের রেশমের কুঠী ইজারা দিয়া[১] যে টাকা পাওয়া যাইবে, এবং আমাদের যত পুস্তক আছে তাহা বিক্রয় করিয়া যত টাকা হইবে, সব তুমি লও; আমি দিতেছি। কিন্তু পরিশোধ করিবার উপায় না জানিয়া, আমি ধর্ম্মের বিরুদ্ধে, কর্জ্জা-নোটে সহি দিতে পারিব না।" তিনি নিতান্ত দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। "দাদা আমাকে সাহায্য করিলেন না" বলিয়া অভিমান-পূর্ব্বক তিনি আমাদের বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, এবং আমার ছোট কাকা রমানাথ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি অতঃপর তাঁহাকে আট হাজার টাকার নোটে সহি দিলাম; এবং তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন যে, আমাদের যে সকল পুস্তক আছে তাহা তিনি বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা

---

(১) অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোনও লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া। গালিমপুর রাজসাহী জেলায় অবস্থিত।

শোধ দিবেন ; ইহার জন্য আর আমাকে ভবিষ্যতে কোন যন্ত্রণা পাইতে হইবে না। নগেন্দ্রনাথ তথাপি আর বাড়ীতে আসিলেন না, ছোট কাকার বাড়ীতেই থাকিলেন।

এই সকল ঘটনায় আমার মন নিতান্ত ভগ্ন হইয়া গেল। মনে করিলাম, বাড়ীতে থাকিলে এইরূপ নানা উপদ্রব আমাকে ভোগ করিতে হইবে, এবং ক্রমে আবার ঋণ-জালেও বদ্ধ হইতে হইবে[১]। অতএব আমিও বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, আর ফিরিব না।

ওদিকে, অক্ষয় কুমার দত্ত একটা "আত্মীয়-সভা" বাহির করিলেন, তাহাতে হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে মীমাংসা হইত। যথা, এক জন বলিলেন, "ঈশ্বর আনন্দ-স্বরূপ কি না ?" যাহার যাহার আনন্দ-স্বরূপে বিশ্বাস আছে, তাহারা হাত উঠাইল। এইরূপে অধিকাংশের মতে ঈশ্বরের স্বরূপের সত্যাসত্য নির্দ্ধারিত হইত।

এখানে যাঁহারা আমার অঙ্গস্বরূপ, যাঁহারা আমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যে আর কোন ধর্ম্মভাব ও নিষ্ঠাভাব দেখিতে পাই না। কেবলি নিজের নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার লড়াই। কোথাও মনের মত সায় পাই না। আমার বিরক্তি ও ঔদাস্য অতিশয় বৃদ্ধি হইল[২]।

ইহাতে আমার এই একটি মহৎ উপকার হইল যে, এখন আমি আত্মার গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যগ্র হইলাম। আত্মার মূলতত্ত্ব কি[৩],

( ) ৪১ পরিশিষ্ট। (২) ৫৫ পরিশিষ্ট।

(৩) ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-স্রোতে যে সকল সত্য ঈশ্বরের প্রসাদে আমার নিকট ভাসিয়া আসিয়াছে[১], তাহা জ্ঞানালোকে পরীক্ষা করিতে এবং তাহার নিগূঢ় অর্থ সকল আবিষ্কার করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ় যত্নবান্ হইলাম।

عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم
دری و دریغ که غافل ز کار خویشتنم

[অ.য়াঁ ন শুদ্, কে চেরা আমদম্, কুজা বূদম্,
দর্দ্ ও দরেগ্., কে গা.ফি.ল্ জে. কারে খে.শ্.তনম্।
দীবান্ হাফি.জ্., ৩৮৮।৩]

"প্রকাশ হ'লো না যে, কোথায় ছিলাম, এখানে কেন আইলাম ; দুঃখ ও পরিতাপ যে, আপনার কাজ আপনি ভুলিয়া র'য়েছি"। কোথায় ছিলাম, কেন এখানে আইলাম, আবার কোথায় যাইব, অদ্যাপি আমার নিকটে প্রকাশ হইল না ; অদ্যাপি এখানে থাকিয়া ব্রহ্মকে যতটা জানা যায়, তাহা আমার জানা হইল না। আর আমি লোকেদের সঙ্গে হো হো করিয়া বেড়াইব না, বৃথা জল্পনা করিয়া আর সময় নষ্ট করিব না। একাগ্রচিত্ত হইয়া একান্তে তাঁহার জন্য কঠোর তপস্যা করিব। আমি বাড়ী হইতে চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য আমাকে উপদেশ দিতেছেন,—

"কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ।
তত্ত্বং তদিদং চিন্তয় ভ্রাতঃ[২]।"

কার তুমি, এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাতঃ, এই তত্ত্বটি চিন্তা কর।

---

(১) ১৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (২) মোহমুদ্গর।

এই সময়ে ১৭৭৮ শকের শ্রাবণ মাসে[১] আমি বরাহনগরে শ্রীযুক্ত গোপাল লাল ঠাকুরের[২] বাগানে ছিলাম। এখানে শ্রীমদ্ভাগবত পড়িতাম। পড়িতে পড়িতে তাহার এই শ্লোকটী আমার মনে লাগিয়া গেল,—

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতং[৩]।"

হে সুব্রত, জীবদিগের যে রোগ যে দ্রব্য দ্বারা জন্মে, সে দ্রব্য কখনো রোগীকে আরাম করিতে পারে না।—আমি সংসারে থাকিয়াই এই বিপদ ঘোরে পড়িয়াছি, অতএব এ সংসার আর আমাকে এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না, অতএব এখান হইতে পলাও।

সন্ধ্যার সময়ে আমি এই বাগানে গঙ্গাতীরে বন্ধুদিগের সঙ্গে বসিতাম। বর্ষার ঘন মেঘ আমার মাথার উপরে আকাশ দিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইত। সেই নীল নীরদ আমাকে তখন বড়ই সুখ দিত, বড়ই শান্তি দিত। মনে করিতাম, ইহারা কেমন কামচার, কেমন মুক্তভাবে যেখানে সেখানে ইচ্ছা-মত চলিয়া যাইতেছে। আমি যদি ইহাদের মত কামচার হইতে পারি, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে চলিয়া যাইতে পারি, তবে আমার বড়ই আনন্দ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখিলাম, "য ইহাত্মান মনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামাং, স্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি[৪]"; যাহারা এখানে এখন আত্মাকে জানিয়া, এবং এই সকল সত্য কামনাকে জানিয়া,

---

(১) ১৮৫৬, জুলাই-আগষ্ট। (২) বংশলতিকা দ্রষ্টব্য।
(৩) শ্রীমদ্ভা. ১।৫।৩৩। (৪) ছান্দো. ৮।১।৬।

পরিব্রজন করে, তাহারা পরকালে সকল লোকেই কামচার হয়, সকল লোকেই ইচ্ছানুসারে যাতায়াত করিতে পারে।—এইটি আমার বড়ই লোভনীয় হইল। ভাবিলাম, আমি এখান হইতে গিয়া সকল স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইব। আবার যখন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ভাষ্যে[১] দেখিলাম,—"ন ধনেন, ন প্রজয়া, ন কর্ম্মণা, ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ", না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা, কিন্তু কেবল এক ত্যাগের দ্বারাই সেই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়,—তখন আর এ পৃথিবী আমার মনকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। সংসারের মোহগ্রন্থি সকলি আমার ভাঙ্গিয়া গেল। তখন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, কখন্ আশ্বিন মাস আসিবে, আমি এখান হইতে পলাইব, সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইব, আর ফিরিব না।

ترا ز کنگرهٔ عرش میزنند صفیر
ندانمت که درین دامگه چه افتاد است

[তোরা জে. কঙ্গুরয়ে অ.র্শ্ মী জ.নন্দ্ সফ.ীর্,
ন দানমৎ, কে দরীঁ দাম্গহ্ চে উফ্.তাদ্ অস্ত।
দীবান্ হাফি.জ্., ২৩।৭।]

"সপ্তম স্বর্গ হইতে তোমার আহ্বান আসিতেছে ; না জানি, এই পৃথিবীর মোহ-পাশে তোমার কি কাজ আটকাইয়াছে !"

---

(১) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের ভূমিকায়। মহানারায়ণোপনিষদ্ (১০।৫) এবং কৈবল্যোপনিষদ্ (২), এই দুই উপনিষদেও এই বচন পাওয়া যায়।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ সালের পূজার সময় দেশ ও গৃহ ত্যাগ। নৌকায় কাশী পর্য্যন্ত গিয়া, তৎপরে গাড়ীর ডাকে প্রয়াগ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, অম্বালা, লাহোর হইয়া অমৃতসর গমন (১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী)। সুখানন্দ স্বামী।

আমি যে-আশ্বিন মাসের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত হইল। কাশী পর্য্যন্ত এক শত টাকায় একটি বোট ভাড়া করিলাম। ১৭৭৮ শকের ১৯শে আশ্বিন[১] বেলা ১১টার সময় গঙ্গায় জোয়ার আইল, আমার মনেও নব উৎসাহের উৎস ছুটিল। আমি গিয়া সেই নৌকাতে আরোহণ করিলাম। নোঙ্গর উঠিল, বোট চলিল, আমি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া বলিলাম,—

کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز
باشد که باز بینیم دیدار آشنا را

[কিশ্‌তী-নিশস্তগান্‌ এম্‌, অয়্‌ বাদে শুর্তা, বর্‌খে.জ্‌.,
বাশদ্‌ কে বাজ্‌. বীনেম্‌ দীদারে আশনারা।
দীবান্‌-হাফি.জ্‌., ৩।৩]

"আমরা এখন নৌকাতে বসিয়াছি; হে অনুকূল বায়ু, তুমি উঠ। হয়তো আবার আমাদের সেই দর্শনীয় বন্ধুকে দেখিতে পাইব।"

আশ্বিন মাসের গঙ্গার প্রতিকূল স্রোতে নবদ্বীপে পঁহুছিতে ছয় দিন লাগিল। গঙ্গার মধ্যে একটা চড়াতে রাত্রিতে থাকিলাম।

---

(১) ১৮৫৬, ৩রা অক্টোবর।

চারিদিকে গঙ্গা, মধ্যে এই দ্বীপটি ভাসিতেছে। প্রবল বাতাস ও বৃষ্টির জন্য দুই দিন এখান হইতে আর নড়িতে পারিলাম না। ১৬ই কার্ত্তিকে[১] মুঙ্গেরে পঁহুছিলাম।

ভোর ৪টার সময়ে এখান হইতে সীতাকুণ্ড দেখিতে চলিলাম। নৌকা হইতে তিন ক্রোশ হাঁটিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পঁহুছিলাম। সেই কুণ্ডের জল এত তপ্ত যে, তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। তাহার চারিদিকে রেল দেওয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাতে রেল দেওয়া কেন?" সেখানকার লোকেরা বলিল, "যাত্রীরা আসিয়া মধ্যে মধ্যে ইহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তাই হাকিমের হুকুমে রেল দেওয়া হইয়াছে।" আমি তাহা দেখিয়া আবার সেই তিন ক্রোশ হাঁটিয়া, ক্ষুধিত তৃষিত পরিশ্রান্ত হইয়া বোটে ফিরিয়া আইলাম; "পরিশ্রান্তেন্দ্রিয়াত্মাঽহং তৃট্-পরীতো বুভুক্ষিতঃ[২]"।

তাহার পরে ফতুয়ায় বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্যস্থান দিয়া চলিতেছি, এমন সময়ে প্রবল ঝড় উঠিল। তাড়াতাড়ি বোট ডাঙ্গার দিকে লইয়া গেল। ডাঙ্গায় তো আসিল, কিন্তু প্রতিকূল ঝড় গঙ্গার উচ্চ পাড়ে নৌকাকে আছড়াইতে লাগিল। নৌকা ভাঙ্গে, আর কিছুতেই রক্ষা করা যায় না। আমি সেই দোলায়মান বোট হইতে উঠিয়া পাড়ের উপর দাঁড়াইলাম। সেখানে ভূমি যদিও আমার প্রতিষ্ঠা হইল, কিন্তু ঝড়ে আমি অস্থির; চড়ার বালু যেন ছিটা-গুলির মত আমার শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। আমি একটা মোটা চাদর গায়ে দিয়া পাড়ে দাঁড়াইয়া গঙ্গার

(১) ১৮৫৬, ৩১শে অক্টোবর।
(২) শ্রীমদ্ভা. ১।৫।১৫, পূর্ব্বার্দ্ধ।

সেই প্রমত্ত ভীষণ মূর্ত্তির মধ্যে সেই "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং[১]" পরমেশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমাদের সঙ্গের পান্সীখানা সকল আহারীয় সামগ্রী লইয়া গঙ্গার গর্ভে ডুবিয়া গেল।

পরে আমরা পাটনায় আসিয়া নূতন আহারের সামগ্রী লইলাম। সেখানে গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল, নৌকা আর চলিতে পারে না। সেই দুর্জ্জয় স্রোতের প্রতিকূলে পাটনা ছাড়াইয়া ৬ই অগ্রহায়ণে[২] কাশীতে পঁহুছিলাম। কলিকাতা হইতে কাশী আসিতে প্রায় দেড় মাস লাগিল।

প্রাতঃকালেই সেই বোট হইতে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, কোথায় থাকি, কোথায় বাসা পাই, তাহা দেখিতে দেখিতে সিক্‌রোলের দিকে চলিলাম। খানিক দূর গিয়া দেখি, একটা বাগানের মধ্যে একটা ভাঙ্গা শূন্য বাড়ী পড়িয়া রহিয়াছে; সেখানে একটা কূপের ধারে কতকগুলা সন্ন্যাসী বসিয়া জল্পনা করিতেছে। আমি মনে করিলাম, এ বাড়ীটা বুঝি সাধারণের জন্য, এখানে যে-সে থাকিতে পায়; এই মনে করিয়া আমার জিনিস পত্র লইয়া সেই বাড়ীতে উঠিলাম। তাহার পর দিন দেখি যে, কাশীর প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র গুরুদাস মিত্র[৩] আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ভাবিলাম, আমার এখানে আসিবার কথা ইনি কেমন করিয়া জানিলেন? আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া আমার নিকটে বসাইলাম। তিনি বলিলেন যে, "আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, আপনি আমাদের এ বাড়ীতে উঠিয়াছেন। এ বাড়ীর দরজা নাই, পর্দ্দা নাই, আবরণ নাই,

---

(১) কঠ. ৬।২। (২) ২০ নভেম্বর, ১৮৫৬।
(৩) পরিশিষ্ট ৫৬।

হিম পড়িতেছে। না জানি রাত্রিতে আপনার কতই কষ্ট হইয়া থাকিবে। আপনার এখানে আগমন হবে, তাহা পূর্ব্বে জানিলে সকলি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম।” তিনি অনেক শিষ্টাচার করিলেন, এবং সেই স্থান আমার বাসোপযোগী করিয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিলেন। কাশীতে দশ দিন ছিলাম, বেশ আরামে ছিলাম।

আমি একটা ডাক গাড়ী করিয়া ১৭ই অগ্রহায়ণ কাশী ছাড়িলাম। সঙ্গে যে সকল চাকর ছিল তাহাদিগকে বাড়ী ফিরাইয়া দিলাম; কেবল দুই জন চাকরকে সেই গাড়ীর ছাদে বসাইয়া লইলাম। কিশোরীনাথ চাটুয্যে এবং কৃষ্ণনগরের এক জন গোয়ালা, এই দুই জনকে সঙ্গে লইলাম। তাহার পর দিন সন্ধ্যার সময়ে এলাহাবাদের পূর্ব্বপারে পঁহুছিয়া, আমার গাড়ী একখানা পারের খেওয়ার নৌকাতে চড়াইয়া রাখিলাম। ভয়, পাছে ভোরে পারের নৌকা না পাই। আমি সেই নৌকার উপরে গাড়ীর মধ্যে রাত্রিতে নিদ্রাটা ভোগ করিলাম।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে সেই পারের নৌকা শিথিল ভাবে চলিয়া, বেলা দুই প্রহরের সময়ে ওপারে পঁহুছিল। দেখি যে, কেল্লার নীচে গঙ্গার চড়াতে অনেকগুলি ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে। এই সকল ধ্বজা যজমানদিগের পিতৃলোকে সমুন্নত হইয়াছে বলিয়া পাণ্ডারা অর্থ সংগ্রহ করে। এই প্রয়াগ তীর্থ। এই প্রসিদ্ধ বেণী-ঘাট; এই ঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া শ্রাদ্ধ করে, তর্পণ করে, দান করে। আমার নৌকা পঁহুছিতে পঁহুছিতেই কতকগুলা পাণ্ডা আসিয়া তাহা আক্রমণ করিল, তাহাতে চড়িয়া বসিল। এক জন পাণ্ডা, “এখানে স্নান কর, মাথা মুণ্ডন কর,” বলিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিল। আমি বলিলাম,

"আমি এ তীর্থে যাইব না, মাথাও মুণ্ডন করিব না।" আর এক জন বলিল, "তীর্থে যাও আর না যাও, আমাকে কিছু পয়সা দাও।" আমি বলিলাম, "আমি কিছুই দিব না; তোমার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, পরিশ্রম করিয়া খাও।" সে বলিল, "হম্ পয়্সা লেকে তব্ ছোড়েঙ্গে, পয়্সা দেনে হী হোগা।" আমি বলিলাম, "হম্ পয়্সা নহীঁ দেঙ্গে, কিস্তরে লেওগে, লেও তো?" এই শুনিয়া সে নৌকা হইতে লাফ দিয়া ডাঙ্গায় পড়িল, এবং দাঁড়িদের সঙ্গে গুণ ধরিয়া জোরে টানিতে লাগিল। খানিক টানিয় আমার কাছে নৌকায় দৌড়িয়া আসিল; বলিল, "হম্ তো কাম কিয়া, অব্ পয়্সা দেও।" আমি বলিলাম, "এ ঠিক হইয়াছে"; আমি হাসিয়া তাহাকে পয়সা দিলাম। দুই প্রহর বাজিয়া গেল, তখন এইরূপ কষ্ট করিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে নির্দ্দিষ্ট খেওয়া ঘাটে উপস্থিত হইলাম। তাহার পরে দুই ক্রোশ গিয়া একটা বাঙ্গালা পাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

এলাহাবাদ ছাড়িয়া ২২শে অগ্রহায়ণে[১] আগ্রাতে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার ডাকের গাড়ী দিন রাত্রি চলিত। মধ্যাহ্ন সময়ে পথের একটা গাছের তলায় রন্ধন করিয়া আহার করিতাম। আগ্রায় আসিয়া "তাজ" দেখিলাম। এ তাজ পৃথিবীর তাজ। আমি তাজের একটা মিনারের উপর উঠিয়া দেখি, পশ্চিম দিক সমুদায় রাঙা করিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছে; নীচে নীল যমুনা; মধ্যে শুভ্র স্বচ্ছ তাজ, সৌন্দর্য্যের ছটা লইয়া যেন চন্দ্রমণ্ডল হইতে পৃথিবীতে খসিয়া পড়িয়াছে।

আমি এই যমুনা দিয়া ২৬শে অগ্রহায়ণে[২] দিল্লী যাত্রা

---

(১) ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৫৬। (২) ১০ ডিসেম্বর, ১৮৫৬।

করিলাম। পৌষ মাসের শীতে কোন কোন দিন আমি যমুনাতে অবগাহন করিতাম, তাহাতে আমার শরীরের রক্ত জমাট হইয়া যাইত। বজ্‌রা চলিত, কিন্তু আমি যমুনার ধারে ধারে শস্য ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া, গ্রাম ও উদ্যানের মধ্য দিয়া, হাঁটিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতাম। তাহাতে আমার মনের বড়ই শান্তি হইত।

১১ দিনে এই যমুনা তীরে মথুরাপুরীতে উপস্থিত হইলাম। মথুরাতে পঁহুছিয়াই মথুরা দেখিতে চলিলাম। যমুনার ধারে সন্ন্যাসীদিগের সত্র আছে। সেই সত্র হইতে একজন সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিতেছে, "ইধার আইয়ে, কুছ্ শাস্ত্র-চর্চ্চা করেঙ্গে।" আমার তখন মথুরাপুরী দেখিতে উৎসাহ, আমি তখন তাহাকে কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিবার সময়ে তাহার নিকটে গেলাম। সে তাহার দপ্তর খুলে কতকগুলি পুঁথি বাহির করিল। দেখিলাম যে, সকলি রামমোহন রায়ের পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ। সে মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তোত্র "নমস্তে সতে" পড়িতে লাগিল। দেখিলাম যে, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের অনেকটা মিল। পথের মধ্যে এমন একটা লোক পাইয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। তাহাকে আমার বজ্‌রাতে ডাকিয়া আনিলাম। সে বজ্‌রাতে আসিয়া আমার সঙ্গে আহারও করিল, কেবল একটু "কারণ" তাহাকে দিতে হইয়াছিল। সে সেই মদ খাইতে খাইতে পড়িতে লাগিল, "অলিনা বিন্দুমাত্রেণ ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ[১]", যে এক বিন্দু মদ্য পান করে, সে ত্রিকোটি কুল উদ্ধার করে। সে

(১) রামমোহন রায়ের মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভূমিকাতে এই শ্লোকার্দ্ধটি উদ্ধৃত আছে।

বলিল, "আমি শব-সাধন করিয়াছি।" সে ঘোর তান্ত্রিক। রাত্রিতে সে আমার বজ্‌রাতে শুইয়া রহিল, ভোরে উঠিয়া কত কি পড়িতে লাগিল। সকালে যমুনাতে স্নান করিয়া তবে চলিয়া গেল।

আমি তাহার পরে বৃন্দাবনে পঁহুছিলাম। সেখানে লালা বাবুর কীর্ত্তি "গোবিন্দজীর মন্দির" দেখিতে গেলাম। নাট-মন্দিরে চারি পাঁচ জন বসিয়া সেতারের বাজনা শুনিতেছে। আমি গোবিন্দজীকে প্রণাম করিলাম না দেখিয়া তাহারা সচকিত হইল।

আগ্রা হইতে এক মাসে দিল্লীর চড়াতে আসিয়া ২৭শে পৌষে[১] আমার বজ্‌রা লাগিল। দেখিলাম, উপরে বড়ই ভিড়; সেখানে দিল্লীর বাদশাহ ঘুঁড়ি উড়াইতেছেন। এখন তো তাঁহার হাতে কোন কাজ নাই, কি করেন? দিল্লীর সহরে গিয়া বাজারের উপর একটা বাড়ী ভাড়া করিলাম।

আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য নগেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি দিল্লী সহরের বড় রাস্তার ধারে বাজারের উপরে রহিয়াছি, কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইয়া নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমি এ সংবাদ পরে জানিলাম।

এখানে সুখানন্দনাথ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসক, হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর[২] শিষ্য। এই হরিহরানন্দের সঙ্গে রামমোহন রায়ের বড় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রামমোহন রায়ের বাগানেই থাকিতেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। আমি দিল্লীতে পঁহুছিবামাত্রই সুখানন্দ স্বামী আমাকে আঙ্গুর প্রভৃতি পাঠাইয়া দিলেন। আমিও তাঁহাকে

---

(১) ৯ জানুয়ারী, ১৮৫৭। (২) ১৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

উপহার পাঠাইয়া দিলাম, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। এইরূপে তাঁহার সহিত আমার দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় হইল। সুখানন্দ স্বামী বলিলেন যে, "আমি এবং রামমোহন রায় উভয়েই হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর শিষ্য; রামমোহন রায় আমার মতন তান্ত্রিক ব্রাহ্মাবধূত ছিলেন।" সকল ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকেরাই রামমোহন রায়কে আপনার আপনার দিকে টানে!

এখান হইতে প্রসিদ্ধ কুতব-মিনার ৮ ক্রোশ দূর। আমি তাহা দেখিতে গেলাম। ইহা হিন্দুর পূর্ব্বকীর্ত্তি। মুসলমানেরা এখন ইহাকে কুতবুদ্দীন বাদশাহের জয়স্তম্ভ বলে; এই জন্য ইহার নাম কুতব-মিনার। হিন্দুদিগকে মুসলমানেরা যেমন পরাজয় করিল, তেমনি তাহাদের কীর্ত্তিও লোপ করিল। মিনার কি, না, উন্নত স্তম্ভাকার প্রাসাদ। কুতব-মিনার প্রায় ১৬১ হাত উচ্চ। আমি সেই মিনারের সর্ব্বোচ্চ চূড়াতে উঠিয়া অর্দ্ধ-নভোমণ্ডলের নিম্নে মহদায়তন ভূমির বিচিত্রতা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এ সেই মহতো মহীয়ানেরই মহিমা।

এখান হইতে ডাকের গাড়ী করিয়া আরো পশ্চিমে অম্বালায় পঁহুছিলাম। এখানে ডুলি করিলাম, এবং কেবল কিশোরীনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া লাহোরে গেলাম। লাহোর হইতে ফিরিয়া ৪ঠা ফাল্গুনে[১] অমৃতসরে পঁহুছিলাম। তখন এখানে বিলক্ষণ শীত অনুভব করিলাম।

---

(১) ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অমৃতসরে দুই মাস। শিখ মন্দির। শিখগণের সপ্তপ্রহর ভগবৎ-কীর্ত্তন। অমৃতসরে বসন্তকাল। সিমলা যাত্রা। (১৮৫৭, ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল)।

যদিও আমি অমৃতসরে পঁহুছিয়াছি, তথাপি আমার লক্ষ্য সেই অমৃতসর, সেই অমৃতসরোবর, যেখানে শিখেরা অলখ-নিরঞ্জনের উপাসনা করে। আমি অতি প্রত্যুষেই অমৃতসর সহর দিয়া সেই পুণ্যতীর্থ অমৃতসর দেখিতে ধাবিত হইলাম। অনেক পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "অমৃতসর কোথায়?" সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এহী তো অমৃতসর্।" আমি বলিলাম, "নহীঁ, ৱো অমৃতসর কাহাঁ, যাহাঁ পরমেশ্বরকা ভজন হোতা হ্যায়?" বলিল, "গুরু-দ্বারা? ৱো তো নজ্‌দীক হী হ্যায়্; ইসী রাস্তাসে যাও।" আমি সেই নির্দ্দিষ্ট পথে গিয়া লাল বনাতের শাল রুমালের বাজারের বাহিরে দেখি যে, মন্দিরের স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া তরুণ সূর্য্যকিরণে দীপ্তি পাইতেছে। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া মন্দিরে গিয়া দেখি, কলিকাতার লালদীঘির ৪।৫ গুণ হইবে, এমন একটা বৃহৎ পুষ্করিণী; তাহাই সরোবর। মাধবপুর হইতে জল-প্রণালী[1] দিয়া ইরাবতী

---

(১) মাধবপুর অমৃতসর হইতে ৬৭ মাইল (পাঠানকোট হইতে ৯ মাইল) দূরবর্ত্তী, রাবী (ইরাবতী) নদীর কূলে অবস্থিত একটি গ্রাম। রাবী নদীর খাল এখান হইতে আরম্ভ হইয়া, অমৃতসরের নিকট দিয়া চলিয়া গিয়াছে। জলপ্রণালীটি এই খাল হইতে আসিয়াছে।

নদীর জল আসিয়া সেই সরোবরকে পূর্ণ রাখে। গুরু রাম-দাস এই উৎকৃষ্ট সরোবর এখানে খনন করিয়া ইহার নাম "অমৃতসর" রাখেন। ইহার পূর্ব্ব নাম "চক্" ছিল। সেই সরোবরের মধ্যে উপদ্বীপের ন্যায় শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। একটা সেতু দিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। তাহার সম্মুখে একটা বিচিত্রবর্ণ রেশমের বস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ স্তূপাকৃতি হইয়া গ্রন্থসকল রহিয়াছে। মন্দিরের এক জন প্রধান শিখ তাহার উপর চামর ব্যজন করিতেছে। এক দিকে গায়কেরা গ্রন্থের গান সকল গাহিতেছে। পঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষেরা আসিয়া মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এবং কড়ি ও ফুল ফেলিয়া দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেহ বা ভক্তিভাবে সঙ্গীত করিতেছে। এখানে যে যখন ইচ্ছা এসো, যে যখন ইচ্ছা চ'লে যাও; কেহ কাহাকে ডাকেও না, কেহ কাহাকে বারণও করে না। এখানে খ্রীষ্টান মুসলমান সকলেই যাইতে পারে; কেবল নিয়ম এই যে, গুরুদ্বারা সীমানার মধ্যে কেহ জুতা পায়ে দিয়া যাইতে পারে না। গবর্ণর জেনারল লর্ড লীটন এই নিয়ম রক্ষা না করাতে সকল শিখেরা নিতান্ত অপমানিত ও পরিতাপিত হইয়াছিল।

আমি আবার সন্ধ্যার সময়ে মন্দিরে গেলাম। দেখি যে, তখন আরতি হইতেছে। এক জন শিখ পঞ্চপ্রদীপ লইয়া গ্রন্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে। অন্য সকল শিখেরা দাঁড়াইয়া যোড়-করে তাহার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে পড়িতেছে,—

"গগনমৈ থাল, রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকা-মণ্ডল জনক মোতী।
ধূপ মলয়ানিলো পবন চমরো করে,
সকল বনরাই ফূলন্ত জ্যোতি।

কৈসী আরতি হোএ, ভবখণ্ডনা, তেরী আরতি,
অনাহতা শব্দ বাজন্ত ভেরী।
হরি-চরণ-কমল-মকরন্দ-লোভিত মনো,
অনুদিনো মোহি আহী পিয়াসা,
কৃপা-জল দেহি নানক-সারঙ্গকো,
হোএ জাত তেরে নাএ বাসা[১]"।

[গগনের থালে রবি-চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা-মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।
হরি-চরণ-কমল-মকরন্দ-লোভিত মন,
অনুদিন তাহে মোর পিপাসা রে।
কৃপা-জল দে চাতক নানককে,
যেন হয় তব নামে মম বাসা রে।]

আরতি শেষ হইল ; তখন সকলকে কড়া-ভোগ (মোহন-ভোগ) দিতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে এই প্রকার দিন রাত্রি সপ্ত প্রহর ঈশ্বরের উপাসনা হয় ; মন্দির পরিষ্কার করিবার জন্য রাত্রির শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। ব্রাহ্মসমাজে সপ্তাহে দুই ঘণ্টা মাত্র উপাসনা হয়, আর শিখদিগের হরিমন্দিরে দিন রাত উপাসনা। কাহারো মন ব্যাকুল হইলে নিশীথ সময়েও সেখানে

(১) গ্রন্থ সাহিব, মহল্লা পহ্‌লা, রাগ ধানশ্রী। মহল্লা পহ্‌লা—প্রথম গুরুর অর্থাৎ গুরু নানকের রচিত সঙ্গীত।

গিয়া উপাসনা করিয়া চরিতার্থ হইতে পারে। এই সদ্দৃষ্টান্ত ব্রাহ্মদিগের অনুকরণীয়।

এখন আর শিখেদের কোন গুরু নাই। তাহাদের গ্রন্থ সকল তাহাদের গুরুস্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তাহাদের শেষ গুরু, দশম গুরু, গুরু গোবিন্দ। তিনিই শিখেদের জাতিভেদ নিবারণ করেন, এবং তাহাদের মধ্যে "পাহল[১]" বলিয়া যে দীক্ষার প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা তিনিই সৃষ্টি করেন। সেই পাহল আজও চলিয়া আসিতেছে। যে শিখ হইবে, তাহাকে আগে পাহল করিতে হইবে। পাহল প্রথা এইরূপ,—একটা পাত্রে জল রাখিয়া তাহাতে চিনি ফেলিয়া দিতে হয়, এবং সেই জল খড়্গ বা ছুরিকার দ্বারা নাড়িতে হয়, এবং যাহারা শিখ হইবে তাহাদের গাত্রে তাহা ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর তাহারা সেই চিনির জল সকলে এক পাত্রে পান করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, সকল জাতিই শিখ হইতে পারে ; বর্ণ-বিচার নাই। মুসলমানও শিখ হইতে পারে। শিখ হইলেই তাহার উপাধি সিংহ হইয়া যায়।

শিখেদের এই মন্দিরে কোন প্রতিমা নাই। নানক বলিয়া গিয়াছেন যে, "থাপিয়া ন জাই, কীতা ন হোই, আপে আপ্ নিরঞ্জন সোই[২]", তাঁহাকে কোথাও স্থাপন করা যায় না, কেহ তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তিনিই সেই স্বয়ম্ভু নিরঞ্জন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, নানকের সেই সকল মহৎ উপদেশ পাইয়াও,—শিখেরা নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইয়াও,—সেই গুরুদ্বারার

---

(১) শব্দটি "পৌহল্" ; উচ্চারণ, "পাওহল্"। ইহার অপর নাম "অমৃত চখানা", অর্থাৎ অমৃত আস্বাদ করানো।

(২) জপজী সাহিব, পোড়ী ৫, প্রথম শ্লোক।

সীমানার মধ্যে এক প্রান্তে শিব-মন্দির স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা কালী দেবীকেও মানিয়া থাকে। "পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা করিব না", এই ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা কাহারো পক্ষে বড় সহজ নহে।

দোলের সময় এই মন্দিরের মধ্যে বড় উৎসব হয়। সেই সময়ে শিখেরা মদ্যপানে মত্ত হয়। শিখেরা মদ্যপায়ী, কিন্তু তাহারা তামাক খায় না, একেবারে হুঁকা ছোঁয় না, কলিকে ছোঁয় না। আমার বাসাতে অনেক শিখেরা আসিত। আমি তাহাদের কাছে গুরুমুখী ভাষা[1] ও তাহাদের ধর্ম্ম শিক্ষা করিতাম। তাহাদের মধ্যে বড় ধর্ম্মের উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। এক জন উৎসাহী শিখ দেখিয়াছিলাম; সে আমাকে বলিল, "জো অমৃতরস চাখা নহীঁ, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া?" আমি বলিলাম, "উন্‌কে রাস্তে রোনা পিটনা বেফায়্‌দা নহীঁ[2]।"

আমি অমৃতসরে রামবাগানের নিকট যে বাসা পাইয়াছিলাম, তাহা ভাঙ্গা বাড়ী, ভাঙ্গা বাগান, এলোমেলো গাছ,—জঙ্গলা রকম। কিন্তু আমার নবীন উৎসাহ, তাজা চক্ষু, সকলি তাজা সকলি নূতন সকলি সুন্দর করিয়া দেখিত। অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল-সকল শিশির-জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যান-ভূমিতে জরির মছনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, যখন দূর হইতে পঞ্জাবীদের সুমধুর সঙ্গীত-স্বর উদ্যানে সঞ্চরণ করিত, তখন তাহাকে

---

(১) অর্থাৎ যে ভাষায় শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল রচিত। এখন এই ভাষার বর্ণমালাকে গুরুমুখী বলে।

(২) পরিশিষ্ট ৫৭।

আমার এক গন্ধর্ব্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতালায় বসিত, এবং তাহাদের চিত্র-বিচিত্র দীর্ঘ পুচ্ছ সূর্য্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইতে থাকিত। কখনো কখনো তাহারা ছাদ হইতে নামিয়া বাগানে চরিত। আমি তাহাদের ভাল বাসিয়া কিছু চাউল হাতে করিয়া লইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইতে যাইতাম। তাহারা ভয় পাইয়া কেকা শব্দ করিয়া কে কোথায় উড়িয়া যাইত। এক জন এক দিন আমাকে বারণ করিল,—"অমন করিবেন না, উহারা বড় দুষ্ট। যদি ঠোকর মারে তো একেবারে চোকে ঠোকর মারিবে।" এক দিন মেঘ উঠিল, আর দেখি যে, ময়ূরেরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। এ কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম, তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম। দেখিলাম যে, কবিরা ঠিক বলিয়া গিয়াছেন, মেঘ উঠিলেই ময়ূরেরা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, "নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা[১]।" এ তাঁহাদের কেবল মনের কল্পনা মাত্র নহে[২]।

ফাল্গুন মাস চলিয়া গেল, চৈত্র মাস মধুমাসের সমাগমে বসন্তের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, এবং অবসর পাইয়া দক্ষিণ বায়ু আম্র-মুকুলের

---

(১) পতত্যবিরতং বারি, নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা,
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি।

লক্ষ্মণসেন যখন যুবরাজ ছিলেন তখন একবার তাঁহাকে প্রবাস হইতে গৃহে আনিবার জন্য তাঁহার পত্নী এই শ্লোক লিখেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

(২) রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত এক পত্র হইতে (পত্রাবলী, ৪৭) জানা যায় যে দেবেন্দ্রনাথ এই সময়ে Sir William Hamiltonএর দার্শনিক গ্রন্থাবলী পাঠে নিযুক্ত ছিলেন।

গন্ধে সদ্য প্রস্ফুটিত লেবু ফুলের গন্ধ মিশ্রিত করিয়া কোমল সুগন্ধের হিল্লোলে দিগ্বিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিল। ইহা সেই করুণাময়েরই নিশ্বাস। চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে দেখি যে, আমার বাসার সংলগ্ন জলাশয়ে কোথা হইতে অপ্সরারা আসিয়া রাজহংসীর ন্যায়[১] উল্লাসের কোলাহলে জলক্রীড়া করিতেছে। এমনি করিয়া চকিতের মধ্যে সুখে কালস্রোত চলিয়া গেল।

বৈশাখ মাস আসিয়া পড়িল। তখন সূর্য্যের তাপ অনুভব করিলাম। দোতালায় থাকিতাম, একতালায় নামিয়া আইলাম। দুই দিন পরে সেখানেও সূর্য্যের তাপ প্রবেশ করিল। বাড়ীওয়ালাকে বলিলাম, "আমি আর এখানে থাকিতে পারি না; ক্রমে উত্তাপ বাড়িতেছে, আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব।" সে বলিল, "নীচে তয়খানা[২] আছে; গ্রীষ্মকালে সেখানে বড় আরাম।" আমি এত দিনে জানিতাম না যে, ইহার মাটির নীচে আবার ঘর আছে। আমাকে সেই মাটির নীচে লইয়া গেল। সেই নীচে ঠিক তাহার উপরের একতালার মত ঘর, পাশ দিয়া আলোক ও বাতাস আসিতেছে। সে ঘর খুব শীতল। কিন্তু আমার সেখানে থাকিতে পছন্দ হইল না। মাটির ভিতরে ঘরের মধ্যে বন্দীর ন্যায় থাকিতে পারিব না। আমি চাই মুক্ত বায়ু, প্রমুক্ত গৃহ। আমাকে একজন শিখ বলিল যে, "তবে সিমলা

---

(১) অর্থাৎ রাজহংসীর আকার ধরিয়া। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।১।১—১৭) উর্ব্বশীর উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে অপ্সরোগণ রাজহংসীর রূপ ধারণ করিয়া জলাশয়ে ক্রীড়া করে। এখানে দেবেন্দ্রনাথ রাজহংসীগণকেই অপ্সরা বলিতেছেন। (২) হিন্দী তহ্‌খানা, অর্থাৎ মাটীর নীচের ঘর।

পাহাড়ে যান, সে বড় ঠাণ্ডা জায়গা।” আমি তাহাই আমার মনের অনুকূল স্থান ভাবিয়া ১৭৭৯ শকের ৯ই বৈশাখে[১] সিমলার অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তিন দিনের পথ অতিক্রম করিয়া, পঞ্জোর[২] ছাড়াইয়া ১২ই বৈশাখে কাল্‌কা নামক উপত্যকায় আসিয়া পঁহুছিলাম। দেখি যে, সম্মুখে পর্ব্বত বাধা দিয়া রহিয়াছে। আমার নিকটে অদ্য ইহার নূতন মনোহর দৃশ্য বিকশিত হইল। আমি আনন্দে ভাবিতে লাগিলাম যে, “কা’ল আমি ইহার উপরে উঠিব, পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিব।” এই আনন্দে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলাম। সুখে নিদ্রা হইল, পথের পরিশ্রম দূর হইল।

(১) ২০ এপ্রিল, ১৮৫৭।

(২) পঞ্জোর কাল্‌কা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার শালিমার বাগ প্রসিদ্ধ; তাহা মহর্ষি সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় দেখিয়া গিয়াছিলেন; (৩৮ পরিচ্ছেদ)।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সিমলা। বাজারের একটি বাড়ীতে বাসা লইয়া তাহাতে এক বৎসর বাস। জলপ্রপাত দর্শন। সিপাহী বিদ্রোহ, ও গুর্খা সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সিমলা আক্রমণের আশঙ্কা। (১৮৫৭, এপ্রিল, মে)।

কিন্তু বৈশাখ মাসের অর্দ্ধেক চলিয়া গেল। আমি ১৬ই বৈশাখের[১] প্রাতঃকালে একটা ঝাঁপান[২] লইয়া পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পর্ব্বতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। যত উচ্চ পর্ব্বতে উঠি, ততই আমার মন উচ্চ হইতে লাগিল। উঠিতে উঠিতে দেখি যে, আবার আমাকে লইয়া অবতরণ করিতেছে। আমি চাই ক্রমিক উঠিতে, আর এরা আবার আমাকে নামায় কেন? কিন্তু ঝাঁপানীরা আমাকে একেবারে খদে, একটা নদীর ধারে গিয়া নামাইল। সম্মুখে আবার আর একটা উচ্চতর পর্ব্বত; তাহার পাদদেশে এই ক্ষুদ্র নদী। এখন বেলা দুই প্রহর। তখনকার প্রখর রৌদ্রে নিম্ন পর্ব্বত উত্তপ্ত হইয়া আমাকে বড়ই পীড়িত করিল। সমভূমির উত্তাপ বরং সহ্য হয়, আমার এ উত্তাপ অসহ্য হইল। এখানে একটি ছোট মুদির দোকান, তাহাতে বিক্রয়ের জন্য মক্কার খই রহিয়াছে; আমার বোধ হইল, এই রৌদ্রে মক্কা[৩] আপনিই খই হইয়া গিয়াছে। সেই নদীর ধারে আমাদের রান্না ও আহার হইল। আমরা নদী পার

---

(১) ২৭ এপ্রিল, ১৮৫৭।

(২) "ইহা একটি বড় কেদারা; দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বরগাতে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারি জন লোকেতে বহন করে।" (পত্রাবলী, ৫০)। (৩) ভুট্টা।

হইয়া এখন আবার সম্মুখের পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম, এবং শীতল স্থান প্রাপ্ত হইলাম। হরিপুর নামক একটা স্থানে রাত্রি যাপন করিলাম।

পরদিন সকালে চলিতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্নে একটা বৃক্ষতলে আহার করিয়া সন্ধ্যার সময়ে সিমলার বাজারে উপস্থিত হইলাম। আমার ঝাঁপান বাজারেই রহিল। দোকানদারেরা আমার প্রতি হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। আমি ঝাঁপান হইতে উঠিয়া দোকানে তাহাদের জিনিস পত্র দেখিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গী কিশোরী-নাথ চাটুয্যে বাসার অনুসন্ধানে চলিয়া গেল, এবং সেই বাজারেই এক বাসা স্থির করিয়া শীঘ্রই আমাকে সেখানে লইয়া গেল। সেইখানে আর এক বৎসর[১] কাটিয়া গেল।

অনেক বাঙ্গালীর সেখানে কর্ম্ম কাজ; তাহারা অনেকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইল। প্যারীমোহন বাঁড়ুয্যা প্রত্যহ আমার সংবাদ লইতে আসিতেন। তিনি সেখানে ইংরাজের একটা দোকানে কর্ম্ম করিতেন। তিনি এক দিন আমাকে বলিলেন যে, "এখানে একটি বড় সুন্দর জলপ্রপাত আছে, যদি আপনি যান তো আপনাকে তাহা দেখাইয়া আনিতে পারি।" তাঁহার সঙ্গে আমি খদে নামিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। খদের নীচে যাইতে যাইতে দেখি যে, মধ্যে মধ্যে সেখানে লোকের বসতি, মধ্যে মধ্যে শস্য-ক্ষেত্র। কোন খানে গোরু মহিষ চরিতেছে, কোন খানে পার্ব্বতীয় মহিলারা ধান ঝাড়িতেছে। আমি ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। এখানেও দেশের মত গ্রাম ও ক্ষেত্র আছে, তাহা আমি এই প্রথম জানিতে পারিলাম। এইরূপে দেখিতে দেখিতে খদের নিম্নতম

(১) ১৮৫৭ সালের ২৮শে এপ্রিল হইতে ১৮৫৮ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদের শেষ ভাগে পুনরায় এই কথা বলা হইয়াছে।

স্থানে গিয়া আমাদের ঝাঁপান রাখিলাম। আর ঝাঁপান যাইবার পথ নাই। আমরা এখন পার্ব্বতীয় লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই জল-প্রপাতের নিকটে শিলাতলে উপস্থিত হইলাম। এখানে তিন শত হস্ত উর্দ্ধ হইতে জলধারা পড়িতেছে, এবং প্রস্তরের উপরে প্রতিঘাত পাইয়া রাশি রাশি ফেণা উদ্গীরণ করিতেছে, এবং বেগে স্রোত নিম্নমুখে ধাবিত হইতেছে। আমি একখানা শিলাতলে বসিয়া এই জল-ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। যেমন এই জল-প্রপাতের অতি শীতল কণা সকল খদে নামিবার পরিশ্রমে আমার ঘর্ম্মাক্ত শরীর স্পর্শ করিতে লাগিল, অমনি আমার চক্ষে অন্ধকার ঠেকিল। আমি ধীরে ধীরে সেই শিলাতলে অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক পরে আমার চৈতন্য হইল, আমি চক্ষু মেলিলাম। দেখি যে, আমার সঙ্গী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ একেবারে শুষ্ক; তিনি বিষণ্ণ মনে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন। আমি অমনি আমার ও তাঁহার অবস্থা স্মরণ করিলাম, এবং তাঁহাকে সাহস দিবার জন্য হাসিয়া উঠিলাম। আমি এইরূপে জল-প্রপাত দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আইলাম।

তাহার পরের রবিবারে আবার আমরা কয়েক জন সেই জল-প্রপাতের ধারে বন-ভোজন করিবার জন্য গেলাম। আমি গিয়া সেই জল-প্রপাতের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার মস্তকে তিন শত হস্ত উচ্চ হইতে সেই জল-ধারা পড়িতে লাগিল। পাঁচ মিনিট সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম। সে হিম জল-কণা সকল আমার প্রতি লোম-কূপ ভেদ করিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি বাহিরে আইলাম। কিন্তু এ বড় আমার আমোদ হইল; আমি আবার তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এইরূপে জল-প্রপাতের ধারার মধ্যে আমার স্নান হইল। আমরা সেই পর্ব্বতের বনে কত আনন্দে বন-ভোজন করিয়া সন্ধ্যার সময়ে বাসাতে ফিরিয়া আইলাম। আমার বাম চক্ষুতে একটু পীড়া ছিল, পর দিন প্রাতে দেখি, তাহা আরক্ত বর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। উপবাস করিয়া চক্ষুরোগ আরাম করিলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ[১] সেই রোগ-শান্তির পর সুস্থতার হিল্লোলে আমার শরীর মন বড়ই প্রসন্ন হইল। আমি মুক্তদ্বার গৃহের মধ্যে বেড়াইতে বেড়াইতে চিন্তা করিতেছি যে, এই সিমলার গৃহে আমি চিরজীবন সুখে কাটাইতে পারি। এমন সময়ে আমার ঘরের নীচে দেখি যে, রাস্তা দিয়া কতকগুলা লোক দৌড়িয়া যাইতেছে। আমি তাহা দেখিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, "কি হইয়াছে ? এত দৌড়িতেছ কেন ?" উত্তর না দিয়া তাহার মধ্যে এক জন আমাকে হাত নাড়িয়া বলিল, "পলাও, পলাও!" জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন পলাইব ?" কিন্তু কে কার উত্তর দেয়, সকলেই আপন প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। আমি ইহার কিছুই ভাব বুঝিতে না পারিয়া, প্যারী বাবুর নিকট তথ্য জানিতে চলিলাম। গিয়া দেখি, তিনি দেওয়ালের চূণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, "গুর্খারা বামুন মানে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "হয়েছে কি ?" তিনি বলিলেন যে, "গুর্খা সৈন্যেরা সিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব।" আমি বলিলাম যে, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব।" এই

---

(১) ১৮৫৭ সালের ১৫ই মে ; দেবেন্দ্রনাথের জন্মদিন ; এই দিনে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হইল।

কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি একাকী খদে পলাইয়া থাকেন। দুই জন একত্রে গেলে পাহাড়ীদের লোভ বাড়িবে, তাতে বাঁচা ভার হইবে। আমি তাঁহার ভাব বুঝিয়া বলিলাম, "না, আমি খদে যাইব না।" আমি বাসায় ফিরিলাম। আসিয়া দেখি যে, আমাদের বাসার তালা বন্ধ। আমি ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। একটু পরেই কিশোরী আসিয়া বলিল যে, "টাকার থোলেটা আমি উননের ধারে মাটিতে পুঁতিয়া তাহার উপর কাঠ চাপাইয়া রাখিয়াছি, আর গুর্খা চাকরটাকে ঘরের মধ্যে পূরিয়া চাবি দিয়াছি; গুর্খারা গুর্খা দেখিলে কিছু বলিবে না।" আমি বলিলাম, "তাহা তো হইল; তোমার নিজের প্রাণের জন্য কি করিতেছ?" সে বলিল, "রাস্তার ধারে যে এই নর্দ্দমাটা আছে, গুর্খারা আসিলে তাহার মধ্যে আমি প্রবেশ করিয়া থাকিব; আমাকে কেউ দেখিতে পাইবে না।" গুর্খারা বাস্তবিক আসিতেছে কি না, একটা উচ্চস্থানে উঠিয়া তাহা আমি দেখিতে গেলাম। সেখানে গিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। একটা বিজ্ঞাপন দেওয়া ছিল, "যদি গুর্খারা সিমলা আক্রমণ করিতে আসে, তবে সকলকে জানাইবার জন্য তোপ পড়িবে।" দেখি যে, খানিক পরে ভয়ানক তোপও পড়িল। তখন আমি ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া রাস্তায় বেড়াইতে লাগিলাম। রাত্রি হইল; কোন উপদ্রবই নাই। আমি গৃহে গিয়া নিরাপদে শয়ন করিলাম। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখি যে, আমি বাঁচিয়া আছি, গুর্খারা আক্রমণ করে নাই। বাহিরে গিয়া দেখি যে, গবর্ণমেণ্ট-ট্রেজরী প্রভৃতি সকল কার্য্যালয়ে এবং রাস্তায় বন্দুকধারী গুর্খার পাহারা।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুর্খা সৈন্যগণের সিমলায় আগমন। ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের পলায়ন। দেবেন্দ্রনাথের ডগ্‌শাহী গমন ; তথায় এগারো দিন অবস্থান। (১৮৫৭, মে)।

১লা জ্যৈষ্ঠ দিবসে সিমলাতে সংবাদ আইল যে, সিপাইদের বিদ্রোহে দিল্লী ও মিরাটে একটা ঘোরতর হত্যাকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২রা জ্যৈষ্ঠতে কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ জেনারেল আন্সন্[১] দাড়ি কামাইয়া একটা বেতো ঘোড়ায়[২] চড়িয়া সিমলা হইতে নীচে চলিয়া গেলেন। সিমলার অতি নিকটবর্ত্তী স্থানে একদল গুর্খা সৈন্য ছিল, তিনি যাইবার সময় সেই গুর্খা সৈন্যদলের কাপ্তানকে হুকুম দিয়া গেলেন যে, "গুর্খা সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিও।" গুর্খারা নির্দ্দোষ, তাহাদের সঙ্গে সিপাহিদিগের যোগ নাই, কোন সম্বন্ধ নাই। সাহেবেরা জানেন যে, কালা সিপাই সবই এক। বুদ্ধির দোষে গুর্খাদিগকে নিরস্ত্র করিবার হুকুম হইল। কাপ্তান যেই গুর্খাদিগকে বন্দুক রাখিতে হুকুম দিলেন, অমনি তাহারা আপনাদিগকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। তাহারা ভাবিল যে, প্রথমে তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিয়া পরে তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দিবে। এই ভাবিয়া তাহারা প্রাণের দায়ে সকলে একমত একজোট হইল। তাহারা কাপ্তানের হুকুম মানিল না, বন্দুক রাখিল না ; পরন্তু তাহারা ইংরাজ অফিসর-

---

(১) পরিশিষ্ট ৫১।

(২) অর্থাৎ country ponyতে।

দিগকে বাঁধিয়া ফেলিল, এবং তরা জ্যৈষ্ঠতে সিমলা আক্রমণ করিতে আসিতে লাগিল।

এই সংবাদে সিমলার বাঙ্গালীরা তাহাদের পরিবার লইয়া উৎকণ্ঠিত ও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল। এখানকার মুসলমানেরা মনে করিল যে, তাহাদের রাজ্য আবার তাহারা ফিরিয়া পাইল। একজন দীর্ঘকায় শ্বেতবর্ণ প্রকাণ্ড দাড়ীওয়ালা ইরাণী কোথা হইতে বাহির হইয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিতে লাগিল, "মুসল্‌মান্‌কো হারাম খিলায়া, হিন্দুকো গৌ খিলায়া; অব্‌ দেখ্‌ লেঙ্গে কৈসে ফিরিঙ্গী হ্যায়।" এক জন বাঙ্গালী আসিয়া আমার কাছে বলিল, "আপনি নিরুপদ্রবে বেশ বাড়ীতে ছিলেন, এ উপদ্রবে কেন এখানে এলেন? আমরা এ পর্য্যন্ত এমন উপদ্রব দেখি নাই।" আমি বলিলাম, "আমি একলা মানুষ, আমার ভাবনা কি? কিন্তু যাঁহারা পরিবার লইয়া এখানে রহিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই জন্য ভাবিতেছি। তাঁহাদেরই মহা বিপদ।"

তথাকার সাহেবেরা সিমলা রক্ষা করিবার জন্য একত্র হইয়া, কতকগুলা বন্দুক লইয়া একটা উচ্চ পাহাড়ে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া বিবিদের সঙ্গে বসিয়া রহিল। সিমলা রক্ষা করিবেন কি, সেখানে তাঁহারা মদ্য পানে মত্ত হইয়া আমোদ কোলাহল ও আস্ফালন করিতে লাগিলেন।

তথাকার কমিশনর সুধীর ও কার্য্য-কুশল লর্ড হে[১] সাহেবই সিমলা রক্ষা করিয়াছিলেন। যখন গুর্খা সৈন্যের সিমলাতে আগমন সূচক তোপ পড়িল, তখন তিনি নিজের প্রাণের ভয়

---

(১) পরিশিষ্ট ৫১।

ত্যাগ করিয়া, সেই মাহুত-বিহীন প্রমত্ত হস্তীযূথের ন্যায় সৈন্যদলের সম্মুখে মাথার টুপী খুলিয়া সেলাম করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন, এবং বিনয়ের সহিত আশ্বাসবাক্যে তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া সিমলাতে আসিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে ট্রেজরী প্রভৃতি রক্ষণের ভার তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন।

ইহাতে সেখানকার সাহেবরা লর্ড হে সাহেবের প্রতি ভারি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল,—"লর্ড হে সাহেব কিছুই বিবেচনা করিলেন না; তিনি আমাদের ধন, প্রাণ, মান সকলি বিদ্রোহী শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন; তাহাদিগের নিকট নম্রতা স্বীকার করিয়া ইংরাজ জাতির কলঙ্ক করিলেন। তিনি আমাদের প্রতি ভার দিলে আমরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিতাম।" আমাকে একজন বাঙ্গালী আসিয়া বলিল, "মহাশয়! গুর্খারা যদিও সব অধিকার পাইয়াছে, কিন্তু এখনো তাহাদের রাগ পড়ে নাই। তাহারা ইংরাজদিগকে বড়ই গালি দিতেছে।" আমি বলিলাম, "উহাদের রক্ষক নাই,—কাপ্তান-হীন সেনা; এখন বকুক, আবার সব শান্ত হইয়া যাইবে।"

কিন্তু সাহেবেরা একেবারে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা নিরাশ হইয়া স্থির নিশ্চয় করিলেন যে, গুর্খারা যখন সিমলা অধিকার করিয়াছে, তখন পলায়ন ব্যতীত প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই। প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহারা সিমলা হইতে পলাইতে আরম্ভ করিলেন। দুই প্রহরের সময় দেখি যে, দাণ্ডি[১] নাই, ঝাঁপান নাই, ঘোড়া নাই, সহায় নাই, এমন অনেক বিবি খদ দিয়া ভয়ে দৌড়িতেছে। কে বা কাহাকে

---

(১) ঝাঁপানের ন্যায় চারি জন লোকে বাহিত এক প্রকার যান। (২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দেখে, কে বা কাহার তত্ত্ব লয়? সকলে আপনার আপনারই প্রাণ লইয়া ব্যস্ত। সিমলা একেবারে সন্ধ্যার মধ্যে লোকশূন্য হইয়া পড়িল। যে সিমলা মনুষ্যের কোলাহলে পূর্ণ ছিল, তাহা আজ নিঃশব্দ নিস্তব্ধ। কেবল কাকের কা কা ধ্বনি সিমলার বিশাল আকাশকে পূর্ণ করিতেছে!

সিমলা যখন একেবারে মানবশূন্য হইল, তখন অগত্যা আমাকে আজ[১] সিমলা ছাড়িতে হইবে। যদিও গুর্খারা কোন অত্যাচার না করে, তথাপি খদ হইতে উঠিয়া পাহাড়ীরা সব লুঠ করিয়া লইতে পারে। তবে আজ বেহারা কোথায় পাওয়া যায়? সওয়ারী না পাইলেও সিমলা হইতে যে হাঁটিয়া পলাইতে হইবে, আমার এত ভয় হয় নাই। এই সময়ে একটা রক্ত-চক্ষু দীর্ঘ কৃষ্ণ পুরুষ আসিয়া আমাকে বলিল, "কুলিকা দরকার হ্যায়? কুলি চাহিয়ে?" আমি বলিলাম "হাঁ, চাহিয়ে।" বলিল, "কয় ঠৌ?" বলিলাম, "বিশঠৌ কুলি চাহিয়ে।" "আচ্ছা, হম্ লাকে দেগা, হম্‌কো বক্সিষ্ দেনে হোগা," এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ইত্যবসরে সওয়ারীর জন্য আমি একটা দোলা সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম।

আমি রাত্রিতে আহার করিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে শয়ন করিলাম। রাত্রি দুই প্রহর হইয়াছে, তখন, "দরজা খোলো, দরজা খোলো" শব্দের সহিত দুয়ারে ধাক্কা পড়িতে লাগিল। বড়ই কোলাহল হইতে লাগিল। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, অত্যন্ত ভয় হইল,—বুঝি এইবার গুর্খাদের হস্তে মারা পড়িলাম। আমি ভয়ে ভয়ে দুয়ারটা খুলিয়া দিলাম। দেখি যে, দীর্ঘাকার কৃষ্ণবর্ণ

---

(১) ১৬ই মে, ১৮৫৭।

লোকটা বিশ জন কুলি লইয়া ডাকাডাকি করিতেছে। আমি প্রাণের ত্রাস হইতে রক্ষা পাইলাম। তাহারাই আমার রক্ষক হইয়া ঘরের মধ্যে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিল। আমার প্রতি ঈশ্বরের যে করুণা, তাহা একেবারে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, আমি সিমলা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। কুলিরা বলিল যে, অগ্রে টাকা না পাইলে তাহারা যাইবে না। আমি টাকা দিবার জন্য "কিশোরি, কিশোরি" করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। কিন্তু কোথায় কিশোরী? তাহার কাছে খরচের টাকা ছিল, আর আমার কাছে একটা বাক্সভরা এক বাক্স টাকা ছিল। ভাবিয়াছিলাম, এত টাকা কুলিদিগকে দেখাইব না। কিন্তু কিশোরী নাই, কুলিরাও টাকা ব্যতীত উঠে না। আমি তখন তাহাদিগের সম্মুখে সেই বাক্স খুলিয়া প্রতি জনকে তিনটা করিয়া টাকা দিলাম, সেই সর্দ্দারটাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিলাম; এমন সময়ে কিশোরী উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমন সঙ্কট সময়ে তুমি এখান হইতে কোথায় গিয়াছিলে?" বলিল যে, "একটা দরজি আমার কাপড় সেলাইয়ের দর চারি আনা অধিক চায় বলিয়া তাহা চুকাইতে এত বিলম্ব হইয়া গেল!"

আমি এখন সেই দোলায় চড়িয়া ডগশাহী নামক আর একটা পর্ব্বতে চলিলাম। সমস্ত দিন চলিয়া সন্ধ্যার সময় কুলিরা আমাকে একটা প্রস্রবণের নিকটে রাখিয়া জল খাইতে বসিল, এবং তাহারা পরস্পর কথা বার্ত্তা ও হাস্য পরিহাস করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলাম যে, "ইহারা হয় তো আমাকে মারিয়া ফেলিয়া এই সকল টাকা লইবার জন্য পরামর্শ করিতেছে। ইহারা এখন এই জনশূন্য

অরণ্য হইতে আমাকে খদে ফেলিয়া দিলে আর কেহই জানিতে পারিবে না।" এ কেবল আমার মনের বৃথা আতঙ্ক। তাহারা জল পান করিয়া পুনর্ব্বার সবল হইয়া আমাকে একটা বাজারে লইয়া দুই প্রহর রাত্রিতে নামাইল।

সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া আবার চলিতে লাগিলাম। আমার পকেটের কতকগুলা টাকা পয়সা বিছানাতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, দেখি যে, সেই কুলিরা সেই সব কুড়াইয়া আনিয়া আমাকে দিল। তাহাতে তাহাদের উপরে আমার বড়ই বিশ্বাস জন্মিল। আমি মধ্যাহ্নকালে ডগশাহীতে পঁহুছিলাম।[১] তাহারা আমাকে একটা খোলার ঘরে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। কিশোরী সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে পঁহুছিল। খদের ধারে একটা গোয়ালার বাড়ীর উপরে একটা ভাঙ্গা ঘর থাকিবার জন্য পাইলাম, এবং শয়নের জন্য একখানা দড়ির খাটিয়া পাইলাম। ইহাতেই সেই রাত্রি যাপন করিলাম।

তাহার পর আমি সকালে উঠিয়া পর্ব্বতের চূড়াতে চলিয়া গেলাম। দেখি, সেই চূড়াতে মদের খালি বাক্স বসাইয়া গোরা সৈন্যেরা এক চক্রাকৃতি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরোয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি আস্তে আস্তে সেই বাক্সের প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া সেই কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং অতি ভয়ে ভয়ে সেই গোরার কাছে গেলাম। মনে করিলাম, এ বা আমার উপরে তাহার তলওয়ার চালায়। কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে

---

(১) ১৮ই মে, ১৮৫৭।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?" আমি বলিলাম, "না, এখনো এখানে আসে নাই।" আমি সেখান হইতে বাহিরে আসিলাম, এবং খুঁজিয়া একটি ক্ষুদ্র গুহা পাইলাম, তাহার মধ্যে ছায়াতে বসিয়া রহিলাম। সন্ধ্যাকালে নীচে পর্ব্বতে আসিয়া সেই গৃহে শয়ন করিলাম। সেই রাত্রিতে অল্প বৃষ্টি হইল ; আর সে ঘরের ঘরত্ব থাকিল না, ভাঙ্গা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই প্রকারে আমার সেই বনবাসে দিন রাত্রি কাটিয়া যাইত।

কাবুল লড়াইয়ের ফেরতা ঘোষজা ও বসুজা দুই জন এই ডগশাহীতে এখন ডাকঘরের কর্ম্ম করেন। তাঁহারা আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইলেন। বসুজা বলিলেন, "আমি কাবুলের লড়াই হইতে বড় বেঁচে এসেছি। পলাইয়া আসিবার সময় কাবুলের পথে একখানা শূন্য ঘর দেখিতে পাইয়া আমি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, এবং একটা মাচার উপর উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। সেখানে কাবুলীরা আমাকে দেখিতে পাইয়া মারে আর কি! অনেক কষ্টে বাঁচিয়া আসিয়াছি। আবার এখন এই বিপদ!"

আমি সেখানে যে কয় দিন ছিলাম, প্রতি দিন ঘোষজা আমার তত্ত্ব লইতেন। আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, আজিকার খবর কি?" তিনি বলিলেন, "আজিকার খবর বড় ভাল নয়। আজ সব ডাক জ্বালাইয়া দিয়াছে।" তাহার পর দিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঘোষজা, আজিকার কি খবর?" বলিলেন, "আজিকার বড় ভাল খবর নয়। আজ জলন্ধর হইতে বিদ্রোহীরা আসিতেছে।" ঘোষজার নিকট হইতে এক দিনও ভাল খবর পাওয়া যায় না। তিনি প্রতি

দিনই মুখ ভার করিয়া আসেন। আমি এইরূপে অতি কষ্টে এগারো দিন অতিবাহিত করিলাম।

এখন সংবাদ আইল যে, সিমলা নির্ব্বিঘ্ন হইয়াছে, আর কোন ভয় নাই। আমি সিমলা যাইবার জন্য উদ্যোগ করিলাম। কুলি আনিতে পাঠাইলাম, শুনিলাম কুলি নাই, ওলাউঠার ভয়ে তাহারা পলাইয়াছে। একটা ঘোড়া পাইলাম। সেই ঘোড়াতে বৈকালে সওয়ার হইয়া চলিলাম। খানিক দূর আসিয়া রাত্রিতে একটা আড্ডায় থাকিলাম। তাহার পর দিন প্রাতঃকালে আমি আবার সেই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতে লাগিলাম। কিশোরীকে আর আমার সঙ্গে পাইলাম না। সেই আবরণহীন পর্ব্বতে তখন জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের উত্তাপ বড়ই প্রখর হইয়াছে। একটু ছায়ার জন্য আমি লালায়িত হইলাম, কিন্তু একটি বৃক্ষ নাই যে, আমাকে একটু ছায়া দেয়। পিপাসায় কণ্ঠ শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গে আর একটি মানুষ নাই যে, একবার ঘোড়াটা ধরে। আমি সেই অবস্থায় মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত চলিয়া একটা বাঙ্গালা পাইলাম। ঘোড়াটিকে এক স্থানে বাঁধিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে গেলাম। একটু জল চাহিতেছি, দৈবক্রমে পলায়িতা একটি বিবি সেখানে ছিলেন, তিনি সমদুঃখে দুঃখী হইয়া আমার জন্য একটু মাখন ও তপ্ত আলু আর একটু জল পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহা খাইয়া ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া প্রাণ ধারণ করিলাম। সন্ধ্যার সময়ে সিমলাতে পঁহুছিলাম। দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিতেছি, "কিশোরি, আছ এখানে? এখানে কি আছ?" দেখি যে, কিশোরী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি ডগশাহী হইতে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ দিবসে[১] সিমলায় ফিরিয়া আইলাম।

(১) ৩০শে মে, ১৮৫৭।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্জ্জন ও দুর্গম পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ব্রহ্ম-সহবাস সম্ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা। একাকী সুংগ্রী যাত্রা। পথের দুর্গমতা ও সৌন্দর্য্য। বনফুলে ঈশ্বরের করুণার পরিচয় ও হাফিজের সঙ্গীত গান। অবরোহণের পথে বোয়ালি, 'নগরী' নদী, ও সিরাহন পর্ব্বত দর্শন। 'নগরী' নদী তীরে দাবানল। (১৮৫৭, জুন)।

আমি সিমলাতে ফিরিয়া আসিয়া কিশোরী নাথ চাটুয্যেকে বলিলাম, "আমি সপ্তাহের মধ্যে আরো উত্তর দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত ভ্রমণে যাইব। আমার সঙ্গে তোমাকে যাইতে হইবে। আমার জন্য একটা ঝাঁপান ও তোমার জন্য একটা ঘোড়া ঠিক্ করিয়া রাখ।" "যে আজ্ঞা," বলিয়া তাহার উদ্যোগে সে চলিল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ[১] দিবস সিমলা হইতে যাত্রা করিবার দিন স্থির ছিল। আমি সে দিবস অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার ঝাঁপান আসিয়া উপস্থিত, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা[২] সব হাজির। আমি কিশোরীকে বলিলাম, "তোমার ঘোড়া কোথায়?" "এই এলো বো'লে, এই এলো বো'লে," বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া পথের দিকে তাকাইতে লাগিল। এক ঘণ্টা চলিয়া গেল, তবু তাহার ঘোড়ার কোন খবর নাই। আমার যাইবার এই বাধা ও বিলম্ব আর সহ্য হইল না। আমি বুঝিলাম যে, অধিক শীতের ভয়ে আরো উত্তরে কিশোরী আমার সঙ্গে যাইতে অনিচ্ছুক। আমি তাহাকে

---

(১) ৬ই জুন, ১৮৫৭। ৫৮ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
(২) ভার-বাহক কুলীরা।

বলিলাম, "তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি আমার সঙ্গে না গেলে আমি একাকী ভ্রমণে যাইতে পারিব না। আমি তোমাকে চাই না, তুমি এখানে থাক। তোমার নিকট পেটরার ও বাক্সর যে সকল চাবি আছে, তাহা আমাকে দাও।" আমি তাহার নিকট হইতে সেই সকল চাবি লইয়া ঝাঁপানে বসিলাম। বলিলাম, "ঝাঁপান উঠাও।" ঝাঁপান উঠিল, বাঙ্গীবর্দ্দারেরা বাঙ্গী লইয়া চলিল, হতবুদ্ধি কিশোরী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি আনন্দে, উৎসাহে, বাজার দেখিতে দেখিতে সিমলা ছাড়াইলাম। দুই ঘণ্টা চলিয়া একটা পর্ব্বতে যাইয়া দেখি, তাহার পার্শ্ব-পর্ব্বতে যাইবার সেতু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর চলিবার পথ নাই। ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। আমার কি তবে এখান হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? ঝাঁপানীরা বলিল, "যদি এই ভাঙ্গা পুলের কার্নিশ দিয়া একা একা চলিয়া এই পুল পার হইতে পারেন, তবে আমরা খালি ঝাঁপান লইয়া খদ দিয়া ওপারে যাইয়া আপনাকে ধরিতে পারি।" আমার তখন যেমন মনের বেগ, তেমনি আমি সাহস করিয়া এই উপায়ই অবলম্বন করিলাম। কার্নিশের উপরে একটি মাত্র পা রাখিবার স্থান, হাতে ধরিবার কোন দিকে কোন অবলম্বন নাই, নীচে ভয়ানক গভীর খদ। ঈশ্বর-প্রসাদে আমি তাহা নির্ব্বিঘ্নে লঙ্ঘন করিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে যথার্থই "পঙ্গুর্লঙ্ঘয়তে গিরিং[১]।" আমার ভ্রমণের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল না।

---

(১) শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীধরস্বামীকৃত টীকার মঙ্গলাচরণের ৬ষ্ঠ শ্লোক—
মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্,
যৎকৃপা, তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।
এখানে দেবেন্দ্রনাথ নিজের বাক্যের সহিত মিল রাখিবার জন্য কর্তৃকারক 'পঙ্গুঃ' লিখিয়াছেন।

তথা হইতে ক্রমে পর্ব্বতের উপরে উঠিতে লাগিলাম। সেই পর্ব্বত একেবারে প্রাচীরের ন্যায় সোজা হইয়া এত উচ্চে উঠিয়াছে যে, সেখান হইতে নীচের খদের কেলু[১] গাছকেও ক্ষুদ্র চারার মত বোধ হইতে লাগিল। নিকটেই গ্রাম, সেই গ্রাম হইতে বাঘের মত কতকগুলা কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ছুটিয়া আইল। সোজা খাড়া পর্ব্বত, নীচে বিষম খদ, উপরে কুকুরের তাড়া। ভয়ে ভয়ে এ সঙ্কট পথটা ছাড়াইলাম। দুই প্রহরের পর একটা শূন্য পান্থ-শালা পাইয়া সে দিনের জন্য সেইখানেই অবস্থিতি করিলাম।

আমার সঙ্গে রন্ধন করিবার কোন লোক নাই। ঝাঁপানীরা বলিল, "হম্ লোগ্‌কা রোটী বড়া মিঠা হ্যায়।" আমি তাহাদের নিকট হইতে তাহাদের মক্কা-যব মিশ্রিত একখানা রুটী লইয়া তাহারই একটু খাইয়া সে দিন কাটাইলাম। তাহাই আমার যথেষ্ট হইল। "রূখা সূখা গ.ম্‌কা টুক্‌ড়া, লোনা অওর্ অলোনা ক্যা? সির্ দিয়া তো রোনা ক্যা?[২]" খানিক পরে কতকগুলা পাহাড়িয়া নিকটস্থ গ্রাম হইতে আমার নিকটে আসিল, এবং নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করিয়া আমোদে নৃত্য করিতে লাগিল। ইহাদের একজনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, তাহার নাক নাই, মুখখানা একেবারে চেপ্‌টা। জিজ্ঞাসা

---

(১) পাইন (Pine) গাছ।

(২) হিন্দী প্রবচন। রূখা সূখা = রুক্ষ, শুষ্ক, অর্থাৎ ঘৃতলেশবর্জ্জিত। গ.ম্ = কষ্ট। গ.ম্‌কা টুক্‌ড়া = কষ্টে লব্ধ রুটীর টুকরা। লোনা, অলোনা = লবণ-যুক্ত, লবণহীন। সির্ দিয়া = মস্তক দিয়াছি, অর্থাৎ জীবন দিয়াছি। প্রিয়তমের জন্য যে (ফকীর) প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছে, সে কাঁদিবে কেন? তাহার যেমন আহারই জুটুক, সে বিষয়ে সে বিচার করিবে কেন?

করিলাম, "তুম্‌হারে মুখমেঁ ইয়ে ক্যা হুয়া ?" সে বলিল, "আমার মুখে একটা ভালুকে থাবা মারিয়াছিল।" আমার সম্মুখের একটা পথ দেখাইয়া বলিল, "ঐ পথে ভালুক আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়াইতে গিয়া সে থাবা মারিয়া আমার নাকটা উঠাইয়া লইয়াছে।" সেই ভাঙ্গা মুখ লইয়া তাহার কতই নৃত্য, কতই তাহার আমোদ! আমি সেই পাহাড়ীদের সরল প্রকৃতি দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অপরাহ্ণে একটা পর্ব্বতের চূড়ায় যাইয়া অবস্থান করিলাম। সেখানে গ্রামের অনেকগুলা লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। তাহারা বলিল, "আমাদের এখানে বড় ক্লেশে থাকিতে হয়। বরফের সময়ে এক হাঁটু বরফ ভাঙ্গিয়া সর্ব্বদাই চলিতে হয়। ক্ষেতের সময় শূকর ও ভালুক আসিয়া সব ক্ষেত নষ্ট করে। রাত্রিতে মাচার উপর থাকিয়া আমরা ক্ষেত রক্ষা করি।" সেই পর্ব্বতের খদেই তাহাদের গ্রাম। তাহারা আমাকে বলিল, "আপনি আমাদের গ্রামে চলুন, সেখানে আমাদের বাড়ীতে সুখে থাকিতে পারিবেন, এখানে থাকিলে আপনার কষ্ট হইবে।" আমি কিন্তু সেই সন্ধ্যার সময়ে তাহাদের গ্রামে গেলাম না। সে পাকদণ্ডীর[১] পথ, বড় কষ্টে উঠিতে নামিতে হয়; আমার যাইবার উৎসাহ সত্ত্বেও দুর্গম পথ বলিয়া গেলাম না।

তাহাদের দেশে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অতি অল্প। পাণ্ডবদের মত তাহারা সকল ভাই মিলে একজন স্ত্রীকে বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই বাপ বলে।

---

(১) হিন্দী 'পগ্‌দণ্ডী', অর্থাৎ পদরেখা; পায়ে পায়ে চলিয়া যে পথ হইয়া যায়।

আমি সে দিন সেই চূড়াতেই থাকিয়া প্রভাতে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। এই দিন, দুই প্রহর পর্য্যন্ত চলিয়া ঝাঁপানীরা ঝাঁপান রাখিল। বলিল, "পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আর ঝাঁপান চলে না।" এখন কি করি? পথটা চড়াইয়ের পথ, কোন পাকদণ্ডীও নাই। ভাঙ্গা পথ, ঊর্দ্ধের দিকে কেবল পাথরের উপরে পাথরের ঢিবি পড়িয়া রহিয়াছে। এই পথ-সঙ্কট দেখিয়াও কিন্তু আমি ফিরিতে পারিলাম না। আমি সেই ভাঙ্গা পথে পাথরের উপর দিয়া হাঁটিয়া হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম। এক জন পিছনের দিকে আমার কোমরটার অবলম্বন হইয়া ধরিয়া রহিল। তিন ঘণ্টা এইরূপ করিয়া চলিয়া চলিয়া সেই ভাঙ্গা পথ অতিক্রম করিলাম। শিখরে উঠিয়া একটা ঘর পাইলাম। সে ঘরে একখানা কৌচ ছিল, আমি আসিয়াই তাহাতে শুইয়া পড়িলাম। ঝাঁপানীরা গ্রামে যাইয়া আমার জন্য এক বাটী দুগ্ধ আনিল। কিন্তু অতি পরিশ্রমে আমার ক্ষুধা চলিয়া গিয়াছে, আমি সে দুগ্ধ খাইতে পারিলাম না। সেই যে কৌচে পড়িয়া রহিলাম, সমস্ত রাত্রি চলিয়া গেল, একবারও উঠিলাম না।

প্রাতে শরীরে একটু বল আইল, ঝাঁপানীরা এক বাটী দুগ্ধ আনিয়া দিল, আমি তাহা পান করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আরো উপরে উঠিয়া সেই দিন নারকাণ্ডাতে উপস্থিত হইলাম। এ অতি উচ্চ শিখর। এখানে শীতের অতিশয় আধিক্য বোধ হইল।

পর দিন[১] প্রাতঃকালে দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বন ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ

(১) ১১ জুন, ১৮৫৭।

ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে; তাহাতে বনের শোভা আরো দীপ্তি পাইতেছে। যাইতে যাইতে দেখি যে, বনের স্থানে স্থানে বহুকালের বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষসকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণত রহিয়াছে। অনেক তরুণবয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিদ্বর্ণ ঘন-পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল দেখিতে পাই। তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই। কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিদ্বর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয়, তাহা পক্ষীতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ লতাদি যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, নীলবর্ণ, স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হইল। যদিও ইহাদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, কিন্তু আর এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছসকল বন হইতে বনান্তরে প্রস্ফুটিত হইয়া সমুদায় দেশ গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধ দান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্ট্রাবেরি ফলসকল খণ্ড খণ্ড রক্তবর্ণ উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। আমার সঙ্গের এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা

আমার হস্তে দিল। এমন সুন্দর পুষ্পের লতা আমি আর কখনো দেখি নাই। আমার চক্ষু খুলিয়া গেল, আমার হৃদয় বিকশিত হইল। আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিল-মাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য্য দেখিবে; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া, লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাতে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার করুণা ও স্নেহ আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা! "তোমার করুণা আমার মন প্রাণ হইতে কখনই যাইবে না। তোমার করুণা আমার মন প্রাণে এমনি বিদ্ধ হইয়া আছে যে, যদি আমার মস্তক যায়, তথাপি প্রাণ হইতে তোমার করুণা যাইবে না।"

هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود

* * * * *

انچنان مهر توام در دل و جان جائی گرفت

که گرم سر برود مهر تو از جان نرود

[হর্‌গিজ.ম্ মেহ্‌রে তো অজ্. লওহে দিল্ ও জাঁ ন-রবদ্।

... ...

আঁচুনাঁ মেহ্‌রে তো অম্ দর্ দিল্ ও জাঁ জায়ে গিরিফ্.ৎ,

কে গর্ অম্ সর্ বে-রবদ্, মেহ্‌রে তো অজ্. জাঁ ন-রবদ্।

দীৱান্-হাফি.জ্., ২৬৬।১, ২।]

হাফেজের এই কবিতা পথে সমস্ত দিন উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে পড়িতে তাঁহার করুণারসে নিমগ্ন হইয়া সূর্য্য অস্তের কিছু পূর্ব্বে সায়ংকালে

সুঙ্ঘ্রী নামক পর্ব্বত-চূড়াতে উপস্থিত হইলাম[১]। দিন কখন্ চলিয়া গেল কিছুই জানিতে পারিলাম না। এই উচ্চ শিখর হইতে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্ব্বতশ্রেণীর শোভা দেখিয়া পুলকিত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে কোন পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস স্থান। কোন পর্ব্বতের আপাদ-মস্তক পক্ক গোধূম-ক্ষেত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহপুঞ্জ সূর্য্য-কিরণে দীপ্তি পাইতেছে। কোন পর্ব্বত আপাদ-মস্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণশূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ-ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্কিত,—একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই। সূর্য্য অস্তমিত হইল, অন্ধকার ভুবনকে ক্রমে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, তখনো আমি সেই পর্ব্বত-শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি। দূর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্য-বসতির পরিচয় দিতেছে।

পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ, সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অব-রোহণ করা তেমনি সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন।

(১) দেবেন্দ্রনাথের পত্র হইতে জানা যায় যে সিমলা হইতে নারকাণ্ডা প্রায় ২০ ক্রোশ, এবং নারকাণ্ডা হইতে সুঙ্ঘ্রী ১২ ক্রোশ। সুঙ্ঘ্রীতেই আরোহণ শেষ হইল; ইহার পরে অবরোহণ।

ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না, ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, এবং ঝাউ-গাছের পত্রের ন্যায়, অথচ সূচী-প্রমাণ দীর্ঘমাত্র, ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। বৃহৎ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় প্রসারিত ও ঘন পত্রাবৃত শাখাসকল শীতকালে বহু তুষার ভার বহন করে, অথচ ইহার পত্রসকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়, কখনো আপনার হরিৎ বর্ণ পরিত্যাগ করে না। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য! এই পর্ব্বতের তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই বৃক্ষসকল সৈন্যদলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা? এই কেলু বৃক্ষের কোন পুষ্প হয় না। ইহা বনস্পতি, এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই। ইহাতে আল্কাতরা[১] জন্মে।

কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবণ প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার-পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম, এবং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া পবিত্র হইলাম। পথে এক পাল অজা অবি[২] চলিয়া যাইতেছিল। আমার ঝাঁপানী একটা দুগ্ধবতী অজা ধরিয়া আমার নিকটে আনিল, এবং বলিল যে "ইস্‌সে দুধ মিলেগা।" আমি তাহা হইতে এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ পাইলাম। উপাসনার

(১) পাইন গাছ হইতে ধূনা ও তার্পিন জন্মে; আলকাতরা নহে।

(২) ছাগল ও ভেড়া।

পরে আমার নিয়মিত দুগ্ধ পথের মধ্যে পাইয়া আশ্চর্য্য হইলাম, এবং করুণাময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তাহা পান করিলাম। "সভ্‌নাঁ জীয়াকা তুম্‌ দাতা, সো মৈঁ বিসর না জাই[১]," সকল জীবের তুমি দাতা, তাহা যেন আমি বিস্মৃত না হই। তাহার পরে পদব্রজে অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম, পুনর্ব্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদির ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে আফিমের ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্নমনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে, অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবী ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে।

রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময় বোয়ালি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুঙ্গ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্নে। এই পর্ব্বতের তলে "নগরী" নদী এবং ইহার নিকটেই অন্যান্য পর্ব্বত-তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। বোয়ালি পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে, এবং তাহা রৌপ্য-পত্রের ন্যায় সূর্য্য-কিরণে চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে। এই শতদ্রু নদী তীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে, তাহা এখানে অতিশয় প্রসিদ্ধ, যেহেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ইহার সন্নিকট দেখা যাইতেছে; তথাপি ইহাতে যাইতে হইলে নিম্নগামী বহু পথ ভ্রমণ করিতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর হইবে, এবং ইংরাজী ভাষাও অল্প অল্প শিখিয়াছেন। শতদ্রু নদী এই

(১) জপজী সাহিব, পোড়ী ৫, ৬, ৭। মূলের পাঠ, 'একো দাতা'।

রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী সোহিনী হইয়া, তাহার নিম্নে বিলাসপুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে।

গত কল্য সুজ্ঘ্রী হইতে ক্রমিক অবরোহণ করিয়া বোয়ালিতে আসিয়াছিলাম, অদ্যও[১] তদ্রূপ প্রাতঃকালে এখান হইতে অবরোহণ করিয়া অপরাহ্নে নগরী নদী তীরে উপস্থিত হইলাম। এই মহা বেগবতী স্রোতস্বতী স্বীয় গর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ হস্তিকায় তুল্য প্রস্তর-খণ্ডে আঘাত পাইয়া রোষান্বিতা ও ফেণময়ী হইয়া গম্ভীর শব্দ করতঃ সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে সমুদ্র সমাগমে গমন করিতেছে। ইহার উভয় তীর হইতে দুই পর্ব্বত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় অনেক উচ্চ পর্য্যন্ত সমান উঠিয়া পরে পশ্চাতে হেলিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের কিরণ বিস্তর কাল এখানে থাকিবার স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই নদীর উপর একটি সুন্দর সেতু ঝুলিতেছে, আমি সেই সেতু দিয়া নদীর পর পারে গিয়া একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালাতে বিশ্রাম করিলাম। এই উপত্যকা ভূমি অতি রম্য ও অতি বিরল। ইহার দশ ক্রোশ মধ্যে একটি লোক নাই, একটি গ্রাম নাই। এখানে স্ত্রীপুত্র লইয়া কেবল একটি ঘরে এক জন মনুষ্য বাস করিতেছে। সে তো ঘর নহে, সে পর্ব্বতের গহ্বর; সেখানেই তাহারা রন্ধন করে, সেখানেই তাহারা শয়ন করে। দেখি যে, তাহার স্ত্রী একটি শিশুকে পিঠে নিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে, তাহার আর একটি ছেলে পর্ব্বতের উপরে সঙ্কট স্থান দিয়া হাসিয়া হাসিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে; তাহার পিতা একটি ছোট ক্ষেত্রে আলু চাষ করিতেছে। এখানে ঈশ্বর তাহাদের সুখের কিছুই অভাব রাখেন নাই। রাজা-সনে বসিয়া রাজাদিগের এমন শান্তি সুখ দুর্ল্লভ।

---

(১) ১৩ই জুন, ১৮৫৭।

আমি সায়ংকালে এই নদীর সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া একাকী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছিলাম, হঠাৎ উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্," পর্ব্বতের উপরে দীপমালা শোভা পাইতেছে। সায়ংকালের অবসান হইয়া রাত্রি যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, সেই অগ্নিও ক্রমে তত ব্যাপ্ত হইল। উপর হইতে অগ্নিবাণের ন্যায় নক্ষত্র বেগে শত সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ পতিত হইয়া নদীতীর পর্য্যন্ত নিম্নস্থ বৃক্ষ সকলকে আক্রমণ করিল। ক্রমে একে একে সমুদায় বৃক্ষ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিরূপ ধারণ করিল, এবং অন্ধ তিমির সে স্থান হইতে বহু দূরে প্রস্থান করিল। অগ্নির এই অপরূপ রূপ দেখিতে দেখিতে, যে দেবতা অগ্নিতে তাঁহার মহিমা অনুভব করিতে লাগিলাম। আমি পূর্ব্বে এখানকার অনেক বনে দাবানলের চিহ্ন দগ্ধ বৃক্ষসকল দেখিয়াছি, এবং রাত্রিতে দূরস্থ পর্ব্বতের প্রজ্বলিত অগ্নির শোভাও দর্শন করিয়াছি; কিন্তু এখানে দাবানলের উৎপত্তি, ব্যাপ্তি, উন্নতি, নিবৃত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আমার বড়ই আহ্লাদ হইল। সমস্ত রাত্রি এই দাবানল জ্বলিয়াছিল। রাত্রিতে যখনই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তখনি তাহার আলোক দেখিয়াছি। প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, অনেক দগ্ধ দারু হইতে ধূম নির্গত হইছে, এবং উৎসব-রজনীর প্রভাতকালের অবশিষ্ট দীপালোকের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে সর্ব্বভুক্ লোলুপ অগ্নিও ম্লান ও অবসন্ন হইয়া জ্বলিত রহিয়াছে।

আমি সেই নদীতে যাইয়া স্নান করিলাম। ঘটি করিয়া তাহা হইতে জল তুলিয়া মস্তকে দিলাম। সে জল এমনি হিম যে, বোধ হইল যেন মস্তকের মস্তিষ্ক জমিয়া গেল। স্নান ও উপাসনার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া এখান হইতে প্রস্থান করিলাম। প্রাতঃকাল অবধি আবার এখান হইতে ক্রমিক আরোহণ করিয়া

দুপ্রহরের সময় 'দারুণ ঘাট' নামক দারুণ উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, সম্মুখে আর এক নিদারুণ উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ তুষারাবৃত হইয়া উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহদ্ভয় ঈশ্বরের মহিমা উন্নত মুখে ঘোষণা করিতেছে। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে[১] দারুণ ঘাটে উপস্থিত হইয়া সম্মুখস্থিত তুষারাবৃত পর্ব্বত-শৃঙ্গের আশ্লিষ্ট মেঘাবলী হইতে তুষার বর্ষণ দর্শন করিলাম। আষাঢ় মাসে তুষার বর্ষণ সিমলাবাসিদিগের পক্ষেও আশ্চর্য্য, যেহেতু চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই সিমলা পর্ব্বত তুষার-জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখ মাসে মনোহর বসন্তবেশ ধারণ করে।

২রা আষাঢ়ে এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহন নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাণার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্মকালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখনো কখনো শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে পর্ব্বত তলে আমাদিগের দেশ অপেক্ষাও অধিক উত্তাপ হয় ; পর্ব্বত চূড়াতেই বারো মাস শীতল বায়ু বহিতে থাকে। ৪ঠা আষাঢ় এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ১৩ই আষাঢ়ে[২] ঈশ্বর প্রসাদাৎ নির্ব্বিঘ্নে আমার সিমলার প্রবাস-ঘরের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া ঘা মারিলাম।

কিশোরী দরজা খুলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "তোমার মুখ যে একেবারে কালি হইয়া গিয়াছে।" সে বলিল, "আমি এখানে ছিলাম না। যখন আপনার আজ্ঞা অবহেলা করিলাম, এবং আপনার সঙ্গে যাইতে পারিলাম না, তখন আমি

---

(১) ১৪ই জুন, ১৮৫৭। মেঘদূতের ছায়া এখানকার বর্ণনায় পড়িয়াছে।
(২) ২৬ জুন, ১৮৫৭।

অনুশোচনা ও অনুতাপে একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি আর এখানে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বত হইতে নামিয়া জ্বালামুখী চলিয়া গেলাম। জ্বালামুখীর অগ্নির তাপে, জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্রের তাপে, আমার শরীর দগ্ধ হইয়া গেল। আমি তাই কালামুখ লইয়া এখানে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হইয়াছে। আমি আপনার নিকট বড় অপরাধী ও দোষী হইয়াছি। আমার আশা নাই যে, আপনি আর আমাকে আপনার নিকট রাখিবেন।" আমি হাসিয়া বলিলাম, "তোমার ভয় নাই, আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম। তুমি যেমন আমার কাছে ছিলে, তেমনি আমার কাছে থাক।" সে বলিল, "আমি নীচে যাইবার সময় একটা চাকর বাসায় রাখিয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি যে, সে চাকর পলাইয়া গিয়াছে, দরজা সব বন্ধ। আমি দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আমাদের কাপড় ও বাক্স পেটরা সকলই আছে, কিছুই লইয়া যায় নাই। আমি তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছি।" আমি তাহার এই কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। যদি আমি তিন দিন পূর্ব্বে এখানে আসিতাম, তবে বড়ই বিভ্রাটে পড়িতে হইত!

এই বিংশতি দিবসের পর্ব্বতভ্রমণে ঈশ্বর আমার শরীরকে আধিভৌতিক কত বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন, আমার মনকে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, বিবেক ও বৈরাগ্যের কত উচ্চ শিক্ষা দিলেন, তাঁহার সহবাসসুখে আমার আত্মাকে কত পবিত্র ও উন্নত করিলেন, ইহার জন্য কৃতজ্ঞতা আমার হৃদয়ে ধরিল না। আমি তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া ঘরে গিয়া তাঁহার প্রেমগান করিতে লাগিলাম।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

(সিমলা)। ঋতুভেদে ঈশ্বরের মহিমা। হিমালয়ে বর্ষা, ঈশ্বরের জল-যন্ত্র। শীতের তুষার। সিমলায় যাপিত দুই বৎসরের দৈনিক জীবনের বর্ণনা। 'আত্মার মূল তত্ত্ব' চিন্তা; মূল তত্ত্বের স্বরূপ; রাত্রিতে ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফিজের সঙ্গীত গান। পুণ্যভূমি হিমালয়ে ব্রহ্মের দর্শন ও তজ্জনিত আনন্দ। (১৮৫৭, ১৮৫৮)।

এখন হিমালয়ে বর্ষা ঋতু আরম্ভ হইল, ঈশ্বরের জল-যন্ত্র দিবানিশি চলিতে লাগিল। চিরকাল মেঘ ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসিয়াছি; এখন দেখি, অধস্তন পর্ব্বতের পাদমূল হইতে শ্বেত বাষ্পময় মেঘ উঠিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হইলাম। ক্রমে ক্রমে তাহা পর্ব্বত-শিখর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমি একেবারে মেঘের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ঋষি-কল্পিত ইন্দ্রের রাজত্ব প্রত্যক্ষ করিলাম। খানিক পরেই বৃষ্টি হইয়া মেঘ পরিষ্কার হইয়া গেল। আবার পর্ব্বত হইতে তুলা-রাশির ন্যায় মেঘ উঠিয়া সকল আচ্ছন্ন করিল। তার পরেই বৃষ্টি হইয়া আবার সূর্য্যের প্রকাশ হইল। এই প্রকারে ঈশ্বরের জল-যন্ত্র দিবা-নিশি কার্য্য করিতে লাগিল। শ্রাবণ মাসের ঘোর বর্ষাতে, হয়তো এক পক্ষ চলিয়া গেল, সূর্য্যের সঙ্গে আর দেখা হইল না। তখন মেঘে সকল এমনি আবৃত, যেন দশ হাত দূরে আর সৃষ্টি নাই। আমি আছি, আর আমার সঙ্গে কেবল ঈশ্বর আছেন। তখন সহজেই আমার মন সংসার হইতে উপরত হইল, তখন সহজেই আমার আত্মা সমাহিত হইয়া পরমাত্মাতে বিশ্রাম করিল। ভাদ্র মাসে হিমালয়ের জটাজূটের মধ্যে জল-কল্লোলের বিষম

কোলাহল, তাহার প্রস্রবণ সকল পরিপুষ্ট, নির্ঝর সকল প্রমুক্ত, পথ সকল দুর্গম।

এখানে আশ্বিন মাসে শরৎকালের তেমন কিছুই বিকাশ নাই। কার্ত্তিক মাস হইতেই শীতল বায়ু অনাবৃত শরীরকে শীতার্ত্ত করিতে লাগিল। অগ্রহায়ণ মাসের অর্দ্ধেক যাইতে না যাইতেই এক প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর বাহিরে আসিয়া উৎফুল্ল নেত্রে দেখি যে, পর্ব্বত তল হইতে শিখর পর্য্যন্ত বরফে আবৃত হইয়া সকলি শ্বেত। গিরিরাজ শুভ্র রজত বসন পরিধান করিয়াছেন। বরফে শীতল বায়ুর নিঃশ্বাস আমি এই প্রথম উপভোগ করিলাম।

দিন যত যাইতে লাগিল, শীত ততই বাড়িতে লাগিল। এক দিন দেখি যে, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে ধূনিত লঘু তুলার ন্যায় বরফ পড়িতেছে। জমাট বরফ দেখিয়া মনে ছিল যে, বরফ প্রস্তরের ন্যায় ভারি এবং কঠিন; এখন দেখি যে, তাহা তুলার ন্যায় পাতলা ও হালকা। বস্ত্র ঝাড়িয়া ফেলিলেই বরফ পড়িয়া যায় এবং যেমন শুষ্ক তেমনি শুষ্কই থাকে।

পৌষ মাসের[১] এক দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি যে, দুই তিন হাত বরফ পড়িয়া সকল পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। মজুরেরা আসিয়া সেই বরফ কাটিয়া পথ মুক্ত করিয়া দিলে তবে লোক যাতায়াত করিতে লাগিল। আমি কৌতূহলে আবিষ্ট হইয়া সেই বরফের পথেই চলিলাম। প্রাতে আর বেড়ান বন্ধ হইল না। স্ফূর্ত্তি ও আনন্দে আমি এত দূর এত বেগে চলিয়া গেলাম যে, সেই শীতকালে বরফের মধ্যে আমি গ্রীষ্ম অনুভব করিলাম, এবং ভিতরের বস্ত্র ঘর্ম্মে আর্দ্র হইয়া গেল। তখনকার আমার শরীরের বল ও সুস্থতার এই পরিচয়।

---

(১) ১৮৫৭ ডিসেম্বর অথবা ১৮৫৮ জানুয়ারী।

প্রতি দিন[১] প্রাতঃকালেই আমি এইরূপ আনন্দে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিতাম, এবং পরে চা ও দুগ্ধ পান করিতাম। দুই প্রহরের সময়ে স্নানে বসিয়া বরফ মিশ্রিত জল আপনাপনি মস্তকে ঢালিয়া দিতাম। নিমেষের জন্য আমার হৃদয়ের শোণিত চলা বন্ধ হইত, এবং পরক্ষণেই তাহা দ্বিগুণ বেগে চলিয়া আমার শরীরে সমধিক স্ফূর্ত্তি ও তেজের সঞ্চার করিত। পৌষ মাঘ মাসের শীতেতেও আমি গৃহে আগুন জ্বালাইতে দিতাম না। শীত কতদূর শরীরে সহ্য হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য, এবং তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিবার জন্য, আমি এইরূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্রিতে আমি আমার শয়ন ঘরের দরজা খুলিয়া রাখিতাম; রাত্রির সেই শীতের বাতাস আমার বড়ই ভাল লাগিত।

আমি কম্বল জড়াইয়া বিছানায় বসিয়া সকল ভুলিয়া অর্দ্ধেক রাত্রি পর্য্যন্ত ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাফেজের কবিতা গান করিতাম,—

"যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে।
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান,
প্রীতি ব্রহ্মে যার, সেই জাগে[২]"।

یارب آن شمع شب افروز ز کاشانهٔ کیست
جان ما سوخت بپرسید که جانانهٔ کیست

[য়া রব্, আঁ শমে শব্-অফ্‌রোজ্. জে. কাশানা-এ-কীস্ত্?
জানে-মা সোখ্‌.ৎ, বে-পুর্সীদ্ কে জানানা-এ-কীস্ত্?
দীবান্-হাফি.জ্. ৬১।১]

---

(১) ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ সালে সিমলা অবস্থিতি কালের দৈনিক জীবন এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে।

(২) দেবেন্দ্রনাথের স্ব-রচিত সঙ্গীত।

"যে দীপ রাত্রিকে দিন করে, সে দীপ কাহার ঘরে ? আমার তো তাতে প্রাণ দগ্ধ হ'লো, জিজ্ঞাসা করি তাহা প্রিয় হ'লো কার[১] ?"

যে রাত্রিতে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহবাস অনুভব করিতাম, মত্ত হইয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে বলিতাম—

گو شمع میارید درین جمع که امشب
در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است

[গো, শম্‌অ. ম-য়ারেদ্ দরী জম্‌অ., কে ইম্‌শব্
দর্ মজ্‌লিসে-মা মাহে রুখে. দোস্ত্ তমাম্ অস্ত্।
দীবান্-হাফি.জ্., ৫৬।২]

"আজ আমার এ সভাতে দীপ আনিও না। আজিকার রাত্রিতে সেই পূর্ণচন্দ্র আমার বন্ধু এখানে বিরাজমান।"

রাত্রি তো এইরূপে আনন্দে কাটাইতাম ; দিনের বেলায় গভীর ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম। প্রতিদিন দুই প্রহর পর্য্যন্ত আমি দৃঢ় আসন-বদ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে আত্মার মূল তত্ত্বের আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকিতাম[২]। অবশেষে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম যে, যাহা মূলতত্ত্ব, তাহার উল্টা ভাবনা

---

(১) যে দীপ রজনীকে উদ্ভাসিত করে, তাহা (অর্থাৎ সখা) আজ কাহার (হৃদয়-) ঘরে উদিত ? সে দীপ আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া গিয়াছে, (অর্থাৎ আমার হৃদয় তাঁহাকে হারাইয়া আজ সন্তপ্ত)। জানিয়া এস, সে দীপ কাহার প্রিয় হইল, (অর্থাৎ, সেই ভাগ্যবান্ কে, যিনি প্রেমের দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিয়াছেন।)

(২) ২২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ ও হাফি.জ্. ব্যতীত, Kant, Fichte, Victor Cousin এবং Scottish Intuitionistদিগের ও Francis Newman-এর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিতেন। ১৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি যে আত্মপ্রত্যয়ের কথা বলিয়াছেন, মূলতত্ত্বসকল সেই আত্মপ্রত্যয়ে প্রকাশিত হয়। মূলতত্ত্বের তিনটি লক্ষণ এখানে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

মনেতেও স্থান পাইতে পারে না ; তাহা কোনো মনুষ্যের ব্যক্তিগত সংস্কার নহে, তাহা সকল কালে নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববাদী-সম্মত ; মূলতত্ত্বের প্রামাণিকতা আর কাহারো উপর নির্ভর করে না, তাহা আপনি আপনার প্রমাণ, তাহা স্বতঃসিদ্ধ, যেহেতুক ইহা আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত।

এই মূলতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া উপনিষদের পূর্ব্বকার ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন, "দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে, যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং[১]", পরম দেবেরই এই মহিমা যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিতেরা মোহে মুগ্ধ হইয়া বলেন, প্রকৃতির স্বভাবেতে, জড়ের অন্ধ-শক্তিতে,—কেহ কেহ বা বলেন, কোন কারণ ব্যতীত কেবল কালেরই প্রভাবে,—এই প্রকাণ্ড জগৎ চলিতেছে ; কিন্তু আমি বলি, পরম দেবেরই এই মহিমা, যাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব-চক্র চালিত হইতেছে,—

"স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি,
কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।
দেবস্যৈষ মহিমা তু লোকে,
যেনেদং ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রং[২]" ॥

"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং,[৩]" যাহা এই কিছু, সমুদায় জগৎ, প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে, এবং প্রাণ-স্বরূপ পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছে। "এষ দেবো বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ,[৪]" এই দেবতা বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা সর্ব্বদা লোকদিগের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া

(১) শ্বেতা. ৬।১। (২) শ্বেতা. ৬।১।
(৩) কঠ. ৬।২। (৪) শ্বেতা. ৪।১৭।

আছেন।—মূলতত্ত্বের এই অকাট্য সত্যসকল ঋষিদিগের পবিত্র হৃদয়ের উচ্ছ্বাস।

সম্মুখে বৃক্ষ যে আছে, তাহাকে দেখিতেছি ও স্পর্শ করিতেছি। কিন্তু সেই বৃক্ষ যে-আকাশে আছে, সে-আকাশকে আমরা দেখিতেও পাই না, স্পর্শ করিতেও পাই না। কালে কালে বৃক্ষের শাখা হইতেছে, পল্লব হইতেছে, ফুল হইতেছে, ফল হইতেছে; এ সকল দেখিতেছি। কিন্তু তাহার সূত্র সেই কালকে দেখিতে পাই না। বৃক্ষ যে জীবনী-শক্তির প্রভাবে মূল হইতে রস আকর্ষণ করিয়া আপনাকে পুষ্ট করিতেছে, যে শক্তি তাহার প্রতি পত্রের শিরায় শিরায় কার্য্য করিতেছে, সেই শক্তির প্রভাব আমরা দেখিতেছি; কিন্তু সে শক্তিকে আমরা দেখিতে পাই না। যে বিজ্ঞানবান্ পুরুষের ইচ্ছাতে বৃক্ষ এই জীবনী-শক্তি পাইয়াছে, তিনি তো এই বৃক্ষেতে ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। "এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়োহত্মা ন প্রকাশতে,[১]" এই গূঢ় পরমাত্মা সর্ব্বভূতে, সকল বস্তুতে আছেন, কিন্তু তিনি প্রকাশিত হন না। ইন্দ্রিয়-সকল বাহিরের বস্তুই দেখে, অন্তরের বস্তুকে দেখিতে পায় না; ধিক্ ইন্দ্রিয়-সকলকে!

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূ
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষু রমৃতত্বমিচ্ছন্[২]।"

স্বয়ম্ভু ঈশ্বর ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্ম্মুখ করিয়াছেন; সেই হেতু তাহারা বাহিরেই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখে না; কোন ধীর

---

(১) কঠ. ৩।১২। (২) ঠক. ৪।১

অমৃতত্বকে ইচ্ছা করিয়া, মুদিত-চক্ষু হইয়া, সর্ব্বান্তর্গত এক আত্মাকে দেখেন।—এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, মনন করিয়া, নিদিধ্যাসন করিয়া, এই ব্রহ্ম-যজ্ঞ-ভূমি হিমালয় পর্ব্বত হইতে আমি ঈশ্বরকে দেখিতে পাইলাম ; চর্ম্ম-চক্ষুতে নয়, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষুতে। আমার প্রতি উপনিষদের উপদেশ এই, "ঈশাবাস্য-মিদং সর্ব্বং,[১]" ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন কর ; আমি ঈশ্বরের দ্বারা এই সকল আচ্ছাদন করিলাম।

"বেদাহ মেতং পুরুষং মহান্তং
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ,[২]"

আমি এই তিমিরাতীত আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি !

بعد ازین نور بآفاق دهم از دل خویش
که بخورشید رسیدیم غبار آخر شد

[বাদ্ অজ্.-ঈঁ নূর্ ব-আফ.াক্ দেহেম্ অজ্.দিলে খে.শ্,
কে ব-খু.শীদ্ রসীদেম্ ও গো.বার্ আখি.র্ শুদ্।
দীবান্-হাফি.জ্., ২০০।৩]

"এখন অবধি জ্যোতি আমার হৃদয় হইতে পৃথিবীতে ছড়াইব, যেহেতুক আমি সূর্য্যেতে পঁহুছিয়াছি, ও অন্ধকার বিনাশ হইয়াছে !"

(১) ঈশা. ১। (২) যজু. বা. মা. ৩১।১৮; শ্বেতা. ৩।৮

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিমলা)। ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণে তথায় গমন; সুখানন্দ নাথ। শতদ্রুতীরে ভ্রমণ। সিমলায় বাজারের ঘর ছাড়িয়া পর্ব্বতোপরি সুরম্য বাঙ্গলায় অবস্থিতি। একাকী নির্জ্জন ধ্যান, একাকী নির্জ্জন ভ্রমণ, অনিমেষ আঁখি। (১৮৫৮, ফেব্রুয়ারী—এপ্রিল)।

মাঘ মাসের শেষে[১] আমি বসিয়া ব্রহ্মচিন্তাতে মগ্ন, এমন সময়ে এক জন সম্ভ্রান্ত লোক আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুই হাতে দেখি, সোণার বালা। তিনি আমাকে বলিলেন যে, "আমি ভজ্জীর রাণার মন্ত্রী, উজীর। রাণা সাহেব আপনাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, আপনার সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভজ্জী এখান হইতে অধিক দূর নয়। আর, যাহাতে আপনার সেখানে যাইতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিব।" আমি তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলাম, এবং তথায় যাইবার দিন স্থির হইল।

উজীর সেই নির্দ্দিষ্ট দিনে আসিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তিনি এক অশ্বে, আর আমি এক ঝাঁপানে। সিমলা হইতে নীচে উপত্যকায় নামিতে লাগিলাম; এ নামা আর ফুরায় না। যতই নীচে যাই, ততই আরো নীচে যাইতে হয়। তাহার পরে যখন নদী-তীরে আইলাম, তখন বুঝিলাম যে, আর নামিতে হইবে না। এই শতদ্রু নদী-তীরে রাণার রাজধানী সোহিনী

---

(১) ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৮।

নগরী শোভা পাইতেছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা সেখানে পঁহুছিলাম[১]।

পর দিন প্রাতঃকালে রাজ-ভবনে প্রবেশ করিলাম। তথাকার লোকেরা প্রথমেই আমাকে রাজগুরুর আশ্রমে লইয়া গেল। আশ্রম-দ্বারে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই রাজ-গুরু সুখানন্দ নাথ আসিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং দোতালায় আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার নিকটে বসাইলেন; ইনি আমার দিল্লীর পরিচিত সুখানন্দ নাথ[২]। ইনি ইঁহার গুরু হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সঙ্গে রামমোহন রায়ের বাগানে থাকিতেন। ইনি তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানী। ইঁহার মত, মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত অদ্বৈত মত। আমি সিমলাতে আছি শুনিয়া ইনিই রাণাকে বলিয়া আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। তাঁহার এই আশা ছিল যে, আমাকে লইয়া পান ভোজনে তাঁহাদের একটা মহোৎসব হইবে, পরস্পর সদ্ভাব ও সুহৃদ্‌ভাবের বন্ধন হইবে। তাঁহারা জানিতেন না যে, আমি মদ্যপানে বিরত, এবং আমার মতে মদ্যপান ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যং[৩]", মদ্য কাহাকে দিবে না, মদ্য পান করিবে না, একেবারে স্পর্শ করিবে না। আমি তাঁহাদের সঙ্গে মদ্যপানে যোগ দিতে না পারাতে তাঁহাদের সকল আমোদ ও উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল। তাঁহারা ইহাতে অত্যন্ত

---

(১) "সিমলা হইতে প্রায় দেড় দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে চলিয়া,"—(পত্রাবলী, ৫০)।   (২) ২৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) রামমোহন রায়ের 'পথ্য-প্রদান' নামক গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, তাঁহার প্রতিপক্ষ ('ধর্ম্মসংহারক') উশনার বচন বলিয়া 'মদ্যমদেয়মপেয়মনিগ্রাহ্যম্' এই বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। কিন্তু এ বাক্য উশনা সংহিতায় নাই।

দুঃখিত ও বিষণ্ণ হইলেন, এবং আমার আহারের পৃথক বন্দোবস্ত করিবার জন্য কিশোরীর উপর ভার দিলেন।

আমি কঠোপনিষদের যে সংস্কৃত বৃত্তি করিয়াছিলাম, তাহার উপরে তিনি অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আমাকে বলিলেন যে, এ সকল বৃত্তি শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য-সম্মত হয় নাই, অতএব ইহা আমাদিগের আদরণীয় নহে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছেন ; তাহা আমাকে দেখাইলেন, এবং তাহা মুদ্রিত করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সে দিন ইঁহার নিকট হইতে যাইবার জন্য বিদায় লইলে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে নীচে আইলেন, এবং একতালার একটি ঘর দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি যে, তাহার সম্মুখের দেওয়ালে একটি সুন্দর পট ঝুলিতেছে, তাহার মধ্যে 'ওঁ তৎসৎ' বড় দেবনাগর স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। সুখানন্দ নাথ অতি ভক্তির সহিত সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। তিনি আবার বলিলেন, "যেমন কলিকাতার নিকটে কালীঘাট আছে, তেমনি আমরা এই নদীতীরে একটা কালীঘাট করিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আমি তাহা দেখিতে যাইতে পারিব না।"

পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাণার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। একটা বড় দালানে চৌকী সাজান আছে, সভাসদ্‌গণ সহ রাণা আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে তাহার একটা চৌকীতে বসাইলেন, এবং তাঁহারা সকলে পৃথক পৃথক চৌকীতে আসন গ্রহণ করিলেন। ক্ষণেক পরে কুমার-সদৃশ রাজকুমার আসিয়া সভার শোভা করিয়া বসিলেন। রাণা সাহেব আমাকে বলিলেন যে, "কুমার সংস্কৃত পড়্‌তে হৈঁ, আপ ইন্‌কী কুছ্ পরীক্ষা লীজিয়ে।" ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "হম্ সব

ব্যাকরণ পঢ়্‌লিয়া।” বলিলাম, “কহো তো, গঙ্গা উদকং, ইস্‌কী সন্ধিমেঁ ক্যা হোগা?” তাড়াতাড়ি জোরে বলিল, “গঙ্গোদকং”। রাণার নিকট হইতে বাসায় আসিয়া আমি স্নানাহার করিলাম।

তাহার পর দিন প্রাতঃকালে শতদ্রু নদী-তীরে ভ্রমণে একাকী বহির্গত হইলাম। কৃষ্ণনগরের জলঙ্গী নদীর ন্যায় এখানে শতদ্রু নদীর প্রশস্ততা। তাহার জল সমুদ্রজলের ন্যায় নীল, উজ্জ্বল, এবং পরিষ্কার। এখানকার শতদ্রু নদীর জলের উপমা, বাল্মীকি কবির তমসা নদীর ন্যায়, “সজ্জনানাং যথা মনঃ”[১]। আমি চর্ম্ম-মশকের উপরে চড়িয়া এই নদীর পারেও গিয়াছিলাম। তাহার জলমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর নিমগ্ন থাকাতে কাষ্ঠের নৌকা চলিতে পারে না; মশক ভিন্ন পারে যাইবার আর অন্য উপায় নাই। পার হইয়া তাহার তীরের জল মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় উত্তপ্ত দেখিলাম। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষাকালে যেমন নদী ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে, এবং সেই উত্তপ্ত জলের স্থান অধিকার করিতে থাকে, সেই উত্তপ্ত জলও তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে তত অগ্রসর হইতে থাকে; তীরের জল যেখানে থাকে সেইখানেই তাহা উত্তপ্ত হয়। দেখিলাম যে, সেখানে অনেক পীড়িত লোক স্নান করিতে আসিয়াছে। বলে যে, এখানে স্নান করিলে অনেক প্রকার ব্যাধির উপশম হয়।

এই পর্ব্বতবাসী ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা, পরে ঠাকুর, সর্ব্বশেষে জমিদার। এখানকার জমিদারেরাই কৃষক[২]। হিন্দুস্থানের জমিদারদিগেরও এই দশা।

---

(১) রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ২য় সর্গ, ৫ম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ। কিন্তু এদেশে প্রচলিত পুস্তকের পাঠ এইরূপ—“রমণীয়ং প্রসন্নাম্বু সন্মনুষ্যমনো যথা।”

(২) পঞ্জাব অঞ্চলে, “জমিদারী” প্রথা নাই; সেখানে গভর্ণমেণ্টই ভূস্বামী। সেখানে কৃষককে ‘জ়মিন্‌দার’ বলে।

পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক; ইহারাই প্রজাদিগের শাসনকর্ত্তা। রাজা ও রাণাদিগের বিবাহকালে সখীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণা হয়। সখীর গর্ভের পুত্র রাজপরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সখীর গর্ভে জাত কন্যা রাজকন্যার সখী রূপে পরিচিতা থাকে, এবং সেই রাজকন্যারই স্বামীর হস্তে তাহাদিগের জীবন ও যৌবন সমর্পণ করিতে হয়। কি অনর্থ! কি অনর্থ! রাজার এবং রাণার রাণীও অনেক, সুতরাং সখীও বিস্তর। এক স্বামীর মৃত্যু হইলে ইহারা সকলে বন্দীর ন্যায় কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া যাবজ্জীবন রোদন করিতে থাকে। ইহাদিগের পরিত্রাণের আর উপায় নাই।

আমি সপ্তাহ কাল সেখানে থাকিলাম। পরে রাণা ও রাজগুরুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া সিমলার অভিমুখে আরোহণ করিতে লাগিলাম। পথে আসিতে আসিতে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দেখি যে, মৃগয়াশীল রাজকুমার রত্ন-কুণ্ডল, হীরার কণ্ঠী, মুক্তার মালা, ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্যের আভাতে তাঁহার সেই নবীন মুখ-মণ্ডল দীপ্তি পাইয়া অতীব শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাকে আমার বোধ হইল, যেন একটি বনদেবতা। এই তাহাকে দেখিতেছি, এই সে বনের মধ্যে ডুবিয়া গেল; এই সে কাছে, এই সে দূরে; এই নীচে, এই পর্ব্বতের উপরে। তাহার পরে আমি অতি কষ্টে একটা ভাঙ্গা সঙ্কীর্ণ পথ আরোহণ করিয়া নির্ব্বিঘ্নে সিমলাতে উপস্থিত হইলাম।

সিমলার উপরের পথে দেখি যে, সেই ফাল্গুন মাসেও[১] তথায়

(১) ১৮৫৮, ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ।

বরফ পড়িয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা-সকল শুষ্ক ও নীরস। বাঁশের অসার কঞ্চির মত বাতাসে তাহারা ঝন্ ঝন্ করিতেছে। চৈত্র মাসও শেষ হইল, ফুলে ফুলে সকল ভূমি একবারে মনোরম উদ্যানভূমি হইয়া উঠিল। নূতন বৎসর[১] আবার দেখিলাম। গত বৎসর বৈশাখ মাসে প্রথম যে ঘরে উঠিয়াছিলাম, এক বৎসর সেই ঘরেই কাটিয়া গেল।

এখন বাজারের ঘর ছাড়িয়া পর্ব্বতের উপরে একটি সুরম্য নির্জ্জন স্থানে একটা বাঙ্গালা লইলাম। এই স্থান আমার বড় ভাল লাগিল। সেই চূড়ার উপরে একটি মাত্র বৃক্ষ ছিল, সে আমার নির্জ্জনের বন্ধু হইল। এই বৈশাখ মাসে[২] মধ্যাহ্ন আহারের পর মনের আনন্দে আমি সকল খালি বাড়ীর বাগানে বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইতাম। বৈশাখের দুই প্রহরের রৌদ্রে পশমের চোগা গায়ে দিয়া বেড়াইতেছি, ইহার রহস্য আমার স্বদেশী বঙ্গবাসীরা কি বুঝিবেন?

আমি কখন কখন কোন নির্জ্জন পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ শিলাতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইয়া এক বেলা কাটাইতাম। এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি যে, একটা বনাকীর্ণ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া একটা পথ চলিয়া গিয়াছে। আমি অমনি মনের সাধে সেই পথে চলিতে আরম্ভ করিলাম। তখন বেলা চারিটা বাজিয়াছে। আমি তন্মনস্ক হইয়া সেই যে চলিতে আরম্ভ করিলাম, তাহার আর বিরাম নাই; পদক্ষেপের উপর পদক্ষেপ করিতেছি, কিন্তু আমি তাহা জানি না। আমি কোথায় যাইতেছি, কতদূর এলাম, কতদূর যাইব, তাহার গণনা নাই। অনেক ক্ষণ পরে

---

(১) ১৭৮০ শক। ২৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
(২) ১৮৫৮, এপ্রিল।

একটি পথিককে দেখিলাম, সে আমার বিপরীত দিকে চলিয়া গেল। ইহাতে আমার ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, আমাতে সংজ্ঞা আইল। আমি দেখি যে, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; আমার তো আবার এতটা পথ ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি দ্রুতবেগে ফিরিলাম। রাত্রিও দ্রুতবেগে আসিয়া আমাকে ধরিল। গিরি, বন, কানন, সকলই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেই অন্ধকারের দীপ হইয়া অর্দ্ধচন্দ্র আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। কোন দিকে কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল পায়ের শব্দ পথের শুষ্ক পত্রের উপরে খড়্ খড়্ করিতেছে। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের কি এক গম্ভীর ভাব হইল। রোমাঞ্চিত শরীরে সেই বনের মধ্যে ঈশ্বরের চক্ষু দেখিলাম,—আমার উপরে তাঁহার অনিমেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। সেই চক্ষুই সেই সঙ্কটে আমার নেতা হইল। নানা ভয়ের মধ্যে নির্ভীক হইয়া, রাত্রি ৮ টার মধ্যে বাসাতে পঁহুছিলাম। তাঁহার এই দৃষ্টি চির-কালের জন্য আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। যখনি কোন সঙ্কটে পড়ি, তখনি তাঁহার সেই দৃষ্টি দেখিতে পাই[১]।

---

(১) রবীন্দ্রনাথের 'অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে' গানে এই ভাবের আভাস আছে।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

(সিমলা)। পুনরায় বর্ষা। আশ্বিন মাসে নদীর সেতু হইতে স্রোতের গতি দেখিতে দেখিতে নিম্নগামী হইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ। সিমলা ত্যাগ। কানপুর ও এলাহাবাদ। (১৮৫৮, অক্টোবর)।

আবার সেই শ্রাবণ ভাদ্র মাসের[১] মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল, এবং ঘন ঘন ধারা পর্ব্বতকে সমাকুল করিল। সেই অক্ষয় পুরুষেরই শাসনে পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,[২] তাঁহার শাসনকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়।

✓এক দিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্ম্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জ্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত

---

(১) ১৮৫৮, আগষ্ট। (২) বৃহ. ৩।৮।৯।

করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা? সেই সর্ব্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দ্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।

এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ বাণী শুনিলাম, "তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা শিক্ষা করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম! তবে কি আমাকে এই পুণ্যভূমি হিমালয় হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে? আমার তো এ ভাবনা কখনই ছিল না। কত কঠোরতা স্বীকার করিয়া সংসার হইতে উপরত হইয়াছি; আবার সংসারে যাইয়া কি সংসারীদিগের সহিত মিশিতে হইবে? আমার মনের গতি নামিয়া পড়িল। সংসার মনে পড়িল; মনে হইল, আবার আমাকে ফিরিয়া বাড়ী যাইতে হইবে, সংসার-কোলাহলে কর্ণ বধির হইয়া যাইবে। এই ভাবনাতে আমার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল, ম্লানভাবে বাসায় ফিরিয়া আইলাম। রাত্রিতে আমার মুখে কোন গান নাই। ব্যাকুল হৃদয়ে শয়ন করিলাম, ভাল নিদ্রা হইল না।

রাত্রি থাকিতে থাকিতে উঠিয়া পড়িলাম; দেখি যে, হৃদয় কাঁপিতেছে, বুক জোরে ধড়্ ধড়্ করিতেছে। আমার শরীরের এমন অবস্থা পূর্ব্বে কখনই ঘটে নাই। ভয় হইল, কোনরূপ সাংঘাতিক পীড়াই বা আমার হইল? বেড়াইতে গেলে যদি ভাল হয়, এই মনে করিয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেকটা পথ

বেড়াইয়া সূর্য্য উদয় হইলে বাসাতে আসিলাম; তাহাতেও আমার বুকের ধড়্ধড়ানি গেল না। তখন কিশোরীকে ডাকিলাম, এবং বলিলাম, "কিশোরি! আমার আর সিমলাতে থাকা হইবে না; ঝাঁপান ঠিক কর।" এই কথা বলিতে বলিতে দেখি যে, আমার হৃৎকম্প কমিয়া যাইতেছে। তবে এই কি আমার ঔষধ হইল? আমি সেই সমস্ত দিনই বাড়ী যাইবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম; ইহাতেই আমি আরাম পাইলাম। দেখি যে, আমার হৃদয়ের সে ধড়্ধড়ানি আর নাই, সব ভাল হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরের আদেশ, বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়া; সে আদেশের বিরুদ্ধে কি মানুষের ইচ্ছা টিঁকিতে পারে? সে আদেশের বাহিরে একটু ইচ্ছা করিতে গিয়া প্রকৃতি-শুদ্ধ বিরুদ্ধে দাঁড়াইল, এমনি তাঁহার হুকুম! "হুক্‌মেঁ-অন্দর্ সব কোই, বাহর-হুকুম্ ন কোই[১]।" আর কি আমি সিমলাতে থাকিতে পারি? প্রকৃতিরা তখন আমাকে বলিতেছে, "এই দুই বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে কত কষ্ট দিলে। কত সাধ্য সাধনা করিলাম, আমাদের একটি নির্দ্দোষ প্রবৃত্তিকেও পরিতোষ করিলে না; এখন আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, আর তোমার শুশ্রূষা করিতে পারি না।" প্রকৃতিরা দুর্ব্বলই হউক, আর সবলই হউক, আর কি আমি সিমলাতে থাকিতে পারি? তাঁহার ইচ্ছাতেই আমার কার্য্য। তাঁহার ইচ্ছার সহিত আমার ইচ্ছা মিশাইয়া বাড়ী আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমার মনে বল আইল। এখনো পথে অনেক ভয় আছে, স্থানে স্থানে এখনো অনেক বিদ্রোহীদল রহিয়াছে; কিন্তু আমি আর সে সকল

(১) জপজী সাহিব, পোড়ী ২। সকলেই ঈশ্বরের শাসনের অধীন; তাঁহার শাসনের বহির্ভূত কেহ নয়। মূলে 'কোই' স্থানে 'কো' পাঠ আছে।

ভাবনাকে মনে স্থান দিলাম না। নদী যেমন আপনার বেগ-মুখে প্রস্তরের বাধা মানে না, আমিও তেমনি আর কোন বাধা মানিলাম না।

১লা কার্ত্তিক বিজয়া দশমী[১], সিমলার বাজারে সদর রাস্তায় আমার ঝাঁপান দোলা ও ঘোড়া সকলই প্রস্তুত। আমার চারি-দিকে আমার স্বদেশীয় বন্ধুরা অতি দুঃখের সহিত আমাকে বিদায় দিলেন। আমি সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ঝাঁপানে চড়িয়া প্রস্থান করিলাম। বিজয়া দশমীতে আমার সিমলা হইতে বিসর্জ্জন হইল।

পাহাড়ের পথে নামিতে বড় সহজ। শীঘ্রই পর্ব্বতের পাদদেশ কাল্‌কাতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে শোভাময় সূর্য্যোদয় দেখিলাম, তাহার সঙ্গে আমার মনও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কাল্‌কা ছাড়াইয়া পঞ্জোরে[২] আইলাম। এখানে একটা বাগানে বড় সমারোহ দেখিলাম। বাগানের শত শত ফোয়ারা সব খুলিয়া দিয়াছে, তাহারা আজ যেন নব জীবন পাইয়া উল্লাসে জল উদ্গিরণ করিয়া অনবরত জলধারায় বর্ষা ঋতুর অনুকরণ করিতেছে। ফোয়ারার এমন শোভা পূর্ব্বে আমি কোথাও দেখি নাই।

এখান হইতে অম্বালায় আসিয়া ডাকের গাড়ী ভাড়া করিলাম, এবং তাহাতে চড়িয়া দিনরাত্রি চলিতে লাগিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ফুটিয়া রহিয়াছে, খোলা মাঠ হইতে শীতল বায়ু আসিতেছে। গাড়ী হইতে বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি যে, ঘোড়সওয়ার আমার গাড়ীর পাশে পাশে ছুটিতেছে। বিদ্রোহীদিগের ভয়ে গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগের

(১) ১৬ই অক্টোবর, ১৮৫৮, শনিবার। (২) ২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

নিরাপদের জন্য গাড়ীর সঙ্গে রাত্রিতে সওয়ার ছুটিবার নিয়ম করিয়া দিয়াছেন। আমি ইহাতে পথের সঙ্কট বুঝিতে পারিলাম, এবং আমার মনে মনে কিছু শঙ্কা হইল।

বেলা দুই প্রহরের সময় কানপুরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থানে ঘোড়া বদলাইবার জন্য আমার গাড়ী থামিল। দেখি যে, সেখানে একটা মাঠে অনেক তাম্বু পড়িয়াছে, লোকের বিস্তর ভিড়, এবং সেখানে একটা বাজার বসিয়াছে। কিছু খাদ্যের জন্য কিশোরীকে পাঠাইলাম ; সে সেখান হইতে আমার জন্য মহিষের দুগ্ধ আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখানে কিসের বাজার ?" বলিল, "দিল্লীর বাদশাকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহারই জন্য বাজার।" সিমলাতে যাইবার সময়ে ইঁহাকে যমুনার চরে সুখে ঘুঁড়ি উড়াইতে দেখিয়াছিলাম[১] ; আজি আসিবার সময়ে ইঁহাকে দেখিলাম যে, ইনি বন্দী হইয়া কারাগারে যাইতেছেন। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর দুঃখময় সংসারে কাহার ভাগ্যে কখন্ কি ঘটে, তাহা কে বলিতে পারে ?

সিমলা হইতে বিপদ্‌সঙ্কুল অতি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া কানপুরে উপস্থিত হইলাম। এখন এখান হইতে রেল পথ খুলিয়াছে। শুনিলাম, প্রাতে ছয়টার সময়ে গাড়ী ছাড়িবে। আমি ভোরে উঠিয়া একটু চা পান করিয়া তাড়াতাড়ি ষ্টেষণে পঁহুছিলাম। সাতটা বাজিয়া গেল, কিশোরী ষ্টেষণ হইতে আসিয়া বলিল যে, "টিকিট পাওয়া যাইবে না। আজ গাড়ীতে দিল্লীর ফেরত আঘাতী সৈন্যেরা যাইবে। অন্যের জন্য তাহাতে জায়গা নাই।" আমি নিজে অনুসন্ধানের জন্য ষ্টেষণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একজন বাঙ্গালী ষ্টেষণ মাষ্টার আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "আপনি ? ও রে, গাড়ী থামা, থামা। আমি মনে করিয়া-

(১) ২৩০ পৃষ্ঠা।

ছিলাম আর কেউ!" সে বলিল, "আপনাকে আমি টিকিট দিতেছি, এবং আমার ক্ষমতা আছে আমি গাড়ী থামাইয়া আপনাকে উঠাইয়া দিতে পারিব। আমি আপনার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পুরাতন ছাত্র; পরীক্ষায় আমাকে কতবার পুরস্কার দিয়াছেন। আমার নাম দীননাথ[১]।" সে আমাকে টিকিট দিল; আমি কাপ্তান সাহেবদের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িয়া কানপুর ছাড়িলাম।

বেলা তিনটার সময়ে এলাহাবাদে পঁহুছিলাম। তখন তথাকার ষ্টেষণ নির্ম্মিত হয় নাই। পথের মধ্যে একটা স্থানে গাড়ী লাগিল, আমরা সেখান হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। তিন ক্রোশ দূরে এলাহাবাদের ডাক বাঙ্গালা পাইলাম। সেখানকার ঘর সব লোকে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে; আমি সে বাঙ্গালায় আর স্থান পাইলাম না। আমার সঙ্গে একটা চৌকী ছিল, একটা বৃক্ষ-তলায় জিনিস পত্র রাখিয়া সেখানে সেই চৌকীতে আমি বসিলাম। কিশোরী ডাক বাঙ্গালা হইতে আমার জন্য এক কুঁজা জল আনিল। আমি কিশোরীকে বলিলাম যে, "তুমি এলাহাবাদ সহরে যাইয়া আমার জন্য একটা বাড়ী ঠিক করিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও; বাড়ীতে না উঠিয়া আমি জল গ্রহণ করিব না।" কিশোরী চলিয়া গেল। পরেই এক খানা গাড়ী আসিয়া উপস্থিত। গলায় কাচা বান্ধা দুই জন লোক তাহা হইতে নামিয়া আমাকে বলিল, "কেল্লার নিকটেই আমাদের লালকুঠি[২]। যদি মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া সেখানে থাকেন, তবে আমরা বড়ই কৃতার্থ হই। আমাদের এখন পিতৃদায়।" আমি তাহাদের সঙ্গে সেই লালকুঠিতে গেলাম। তাহাদের ঠাকুর-সেবা ছিল, আমার জন্য সেখান হইতে ডাল আর

(১) ১৭ পরিশিষ্ট। (২) ৫৯ পরিশিষ্ট।

রুটী সন্ধ্যার সময়ে আসিল। আমার তখন অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে। সে ডাল আর রুটী আমার বড়ই সুস্বাদু লাগিল। আমি তাহা তৃপ্তিপূর্ব্বক সব খাইয়া আরো প্রত্যাশা করিতেছিলাম; কিন্তু কেহই আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল না। আমি সে দিন ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ খাইয়া সেখানে বিশ্রাম করিলাম।

উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এলাহাবাদ হইতে কলিকাতাগামী ষ্টীমারে যাত্রা। পথে নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত। কলিকাতায় প্রত্যাগমন। (১৮৫৮, নভেম্বর)।

আমি তাহার পর দিনে দেখিলাম যে, এলাহাবাদের রাস্তায় গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে এই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন যে, "যিনি আরো পূর্ব্বাঞ্চলে যাইতে চাহিবেন, গবর্ণমেণ্ট তাঁহার জীবনের জন্য দায়ী হইবেন না।" এই বিজ্ঞাপন দেখিয়া আমার মন বড়ই উৎক্ষিপ্ত হইল। শুনিলাম, তখনো দানাপুরে কুমার সিংহের লড়াই চলিতেছে। মনে করিলাম, ডাঙ্গা পথে যাইতে যদি এত বিপদ, জল-পথেও কি যাইবার সুবিধা নাই? এই ভাবিতে ভাবিতে আমি গঙ্গার ধারে বেড়াইতে চলিলাম। বেড়াইতে গিয়া দেখি যে, একটা ষ্টীমারে ধূমা উড়িতেছে, সে তখন ছাড়ে ছাড়ে। আমি দৌড়াদৌড়ি গিয়া তাহাতে উঠিয়া পড়িলাম। কাপ্তানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ষ্টীমার কোথায় যাইবে?" সে বলিল, "একটা ষ্টীমার কিছু দূরে মাঝ-গঙ্গায় চড়ায় ঠেকিয়া রহিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য এখন এ ষ্টীমার যাইতেছে। এখানে ফিরিয়া আসিয়া তিন দিন পরে এ কলিকাতায় যাইবে।" তখন আমি তাহার একটা ঘর ভাড়া করিবার জন্য আগ্রহ জানাইলাম। সে বলিল, "রুগ্ন ও আহত সৈনিক পুরুষদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইবার জন্য এ ষ্টীমার গবর্ণমেণ্ট ভাড়া করিয়াছেন। পথিকদিগের জন্য ইহার ঘর মিলিবে না। তবে যদি তুমি সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ারের নিকট হইতে এক হুকুম আনিতে পার, তবে আমি তোমাকে ইহাতে লইতে পারি।" আমি তাহার এই উপদেশ অনুসারে

খুঁজিয়া খুঁজিয়া সেই ব্রিগেডিয়ারের কার্য্যালয়ে, একটা মস্ত বাঙ্গালায়, উপস্থিত হইলাম। তখন ব্রিগেডিয়ার অন্য কাজে বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া আমাকে পর দিন সকালে আসিতে বলিলেন। সকাল বলিতে প্রভাতে কিম্বা বেলা দশটার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, ইহা আমি বুঝিতে না পারিয়া, আমি প্রভাতেই তাঁহার দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলাম। বসিয়া বসিয়া দশটা বাজিয়া গেল; তখন তিনি তাঁহার আফিসেই আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইলাম। তিনিও বলিলেন যে, "এ ষ্টীমারে সৈনিক পুরুষেরা যাইবে; তাহাদের সহিত তাহাদের স্ত্রী পুত্র পরিবার ভিন্ন ইহাতে আর কেহ স্থান পাইতে পারে না।" আমি বলিলাম, "যখন গবর্ণমেণ্ট পথিকদিগকে ডাঙ্গাপথে যাইতে নিষেধ করিতেছেন, এবং জলপথে গবর্ণমেণ্টের লোকদের সঙ্গে নিরাপদে যাইবার আমার সুযোগ হইতেছে, তখন তুমি আমাকে যাইতে দিবে না কেন?" ব্রিগেডিয়ার মনে করিয়াছিলেন যে, আমি বিদ্রোহী দলের কেহ হইব; আমার এইরূপ কথা শুনিয়া তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সিমলাতে লর্ড হে প্রভৃতির সঙ্গে আমার আলাপ আছে[১], জানাইয়া, তাঁহাকে আমার সকল পরিচয় দিলাম। তখন তিনি একটা ক্যাবিন আমাকে ভাড়া দিবার জন্য ষ্টীমারের কাপ্তানকে চিঠী দিলেন।

ইতিমধ্যে সেই ষ্টীমার ফিরিয়া আসিয়াছে, এবং কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। আমি যাইয়া কাপ্তানকে ব্রিগেডিয়ারের চিঠী দিলাম। কিন্তু এখন কাপ্তান বলিলেন যে, "এ চিঠীতে কি হইবে? ষ্টীমারে ক্যাবিন তো খালি নাই, তোমাকে

---

(১) ২৪৬ পৃষ্ঠা ও ৫১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ক্যাবিন কি করিয়া দিব ?" আমি বলিলাম, "যদি ক্যাবিন নাই, তো আমি ডেকেই যাইব; তুমি ক্যাবিনের ভাড়া লও, ও আমাকে ষ্টীমারের ডেকে যাইতে দাও।" ষ্টীমারের সঙ্গে যে কার্গো-বোট ছিল, তাহার কাপ্তান আমাদের এই বিতণ্ডা শুনিয়া সেখানে আইল, এবং বলিল, "ষ্টীমারে ক্যাবিন নাই, কিন্তু আমার বোটে আমার যে ক্যাবিন আছে, তাহার ভাড়ার টাকা দিলে আমি তাহা ছাড়িয়া দিব"। আমি বলিলাম যে, "আচ্ছা, আমি টাকা দিতেছি, তুমি তোমার ক্যাবিন আমাকে ছাড়িয়া দাও।" সে বলিল, "তুমি তোমার জিনিসপত্র লইয়া আইস, আমি ইতিমধ্যে তোমার জন্য ক্যাবিন পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছি।" তখন আমি তাহার কথাতে আহ্লাদিত হইয়া দৌড়াদৌড়ি লাল-কুঠিতে গিয়া আমার সকল দ্রব্যাদি আনিলাম। আমার চির-সুহৃৎ নীলকমল মিত্র[১] আমার পথের খাওয়ার জন্য এক ঝুড়ি মিঠাই সন্দেশ দিলেন; তাহাতে আমার বড়ই উপকার হইয়াছিল।

শীঘ্রই ষ্টীমার কলিকাতাভিমুখে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কাশীতে পঁহুছিয়াই একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কাপ্তান এক টেলিগ্রাফ পাইলেন যে, এ কার্গো-বোটের জন্য দ্বিতীয় ষ্টীমার আসিতেছে, তাহাকে অন্য কার্গো-বোট আনিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কাপ্তান এই টেলিগ্রাফ পাইয়া অস্থির হইল। সে বলিতে লাগিল, "আমি আর গবর্ণমেণ্টের চাকরী করিব না, গবর্ণমেণ্টের হুকুমের কিছুই ঠিকানা নাই। এতটা পথ আসিয়া আবার আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এ বড় অন্যায়।" কাপ্তানের বাড়ী যাইবার জন্য মনে ব্যগ্রতা ছিল, এদিকে ষ্টীমার কার্গো-

---

(১) ৫৯ পরিশিষ্ট।

বোটকে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেলে ষ্টীমারের সাহেব বিবিদিগেরও ফিরিয়া যাইতে হইবে; অতএব সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, "এ টেলিগ্রাফে কিছু এমন বলিতেছে না যে, এই খানেই কার্গো-বোট রাখিয়া ষ্টীমার চলিয়া যাইবে। যেখানে আগন্তুক ষ্টীমারের সহিত তাহার দেখা হইবে, সেইখানে তাহাকে কার্গো-বোট দিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে। হয়তো তাহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই এ ষ্টীমার কলিকাতায় পঁহুছিতে পারে।" সাহেবদিগের এইরূপ পরামর্শে কাপ্তান সম্মত হইয়া ষ্টীমার কলিকাতার দিকে ছাড়িলেন।

আমি এই ষ্টীমারে যাইতে পথে এক সংবাদ পত্রে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ[১] পাইলাম। এই সংবাদে শোকাবিষ্ট হৃদয়ে অন্যমনস্ক হইয়া একটা কি দ্রব্য আনিবার জন্য ডেক হইতে ক্যাবিনে প্রবেশ করিলাম, এবং সেই দ্রব্য লইয়া তাড়াতাড়ি যেই ক্যাবিনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইয়াছি, আমার পা আর প্রতিষ্ঠা-ভূমি পাইল না। আমি আচম্বিতে দ্বিতীয় পা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠের দিকে একটা ঝোঁক দিয়া ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। খালাসীরা হাঁ হাঁ করিয়া দৌড়িয়া আসিয়া দেখে যে, আমার এক পা খোলের মধ্যে ঝুলিতেছে, ও আমার সমস্ত শরীরটা ক্যাবিনের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বলিল, "জিনিস তুলিবার জন্য এই ক্যাবিনের সম্মুখের রাস্তার পাটাসকল উঠাইয়া ফেলিয়াছিলাম, আপনি কি তাহা দেখেন নাই?" আমি তো তাহা দেখি নাই; আমি জানি যে, পূর্ব্বের মত সে রাস্তা ঠিকই আছে। আমি যদি দ্বিতীয় পা

---

(১) মৃত্যুর তারিখ, ২৪শে অক্টোবর ১৮৫৮।

বাড়াইতাম, তবে পঞ্চাশ হাত নীচে খোলের মধ্যে পড়িয়া আমার মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। সে দিনকার জন্য তো আমার প্রাণ বাঁচিল। কিন্তু, "সংসারের ডাকাত ঘুমায় নাই, তাহা হইতে নির্ভয় হইও না; যদি আজ সে না নিয়া যায়, কা'ল সে নিয়া যাবে,"—

رهزن دهر نخفت است مشو ایمن ازو
اگر امروز نبرده است که فردا ببرد

[রহ্.জ.নে দহ্.র্ ন খু.ফ্.তস্ত্, ম-শও অয়্মন্ অজ্.-ও,
অগর্ ইম্‌রোজ্. ন বুর্দস্ত, কে ফ.র্দা বে-বরদ্।
দীবান্ হাফি.জ্., ২৫৬।৮।]

রামপুর-বোয়ালিয়াতে পঁহুছিতে পঁহুছিতে দেখি যে, ধূমা উড়াইতে উড়াইতে একটা ষ্টীমার আসিতেছে। তাহা দেখিয়া কাপ্তান আমাদের ষ্টীমার থামাইলেন। আগন্তুক ষ্টীমার তাহার কাছে আসিয়া থামিল, এবং সেইখানেই দুই ষ্টীমার নোঙ্গর ফেলাইয়া রহিল। সাহেব বিবিরা এ ষ্টীমারে যাইয়া দেখিলেন যে, সে ষ্টীমার খানি ছোট, এবং তাহার ঘর সংখ্যায় অতি অল্প, ইহাতে তাঁহাদের সকলের সম্পোষ্য হইবে না। সাহেবেরা ডেকে থাকিয়াও একপ্রকারে কাটাইতে পারেন, কিন্তু বিবিরা কোথা থাকিবেন? কার্গো-বোটে মিলিটারী সার্জন প্রভৃতি যে সকল সাহেবেরা ছিলেন, কাপ্তান তাঁহাদের কাছে যাইয়া তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। মিলিটারী সার্জন কিছু স্পষ্টবাদী; তিনি বলিলেন, "এমন কতবার আমি বিবিদের সন্তোষার্থে ক্যাবিন ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু তাহার জন্য একটা 'থ্যাঙ্ক্ও' পাই নাই।" কার্গো-বোটের ক্যাবিনের অধিকারী সাহেবেরা কেহই বিবিদের জন্য তাঁহাদের ক্যাবিন ছাড়িতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে কাপ্তান আমার কাছে আসিয়া নম্রভাবে

অনুরোধ করিলেন, "বিবিদের থাকিবার আর স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ক্যাবিনটা ছাড়িয়া দেন, তবে তাঁহারা বড় বাধ্য হন।" আমি অতি আহ্লাদের সহিত আমার ক্যাবিন তাঁহাদের জন্য ছাড়িয়া দিলাম। কাপ্তান ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "ইংরাজেরা বিবিদের স্বদেশীয় হইয়াও তাঁহাদের একটু স্থান দিলেন না; আপনি কেমন উদার ভাবে তাঁহাদের জন্য আপনার ক্যাবিন ছাড়িয়া দিলেন; ইহাতে আমরা সকলেই আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম।" ক্যাবিন ছাড়াতে আমার নিজের কিছু কষ্ট হইল না। যাহাতে আমি ডেকে আরামে থাকি, তাহার জন্য কাপ্তানেরা সকলে মিলিয়া সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি সেই ডেকের মুক্ত বায়ুতে রাত্রিতে সুখে শয়ন করিলাম। রামপুরে ষ্টীমার বদল ও বন্দোবস্ত করিতে কিছু বিলম্ব হইবে, অতএব আমার আসিবার সংবাদ দিবার জন্য আমি কিশোরীকে একটা ডিঙ্গি করিয়া অগ্রেই বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। তাহার পর দিনই ১৭৮০ শকের ১লা অগ্রহায়ণ[১] আমি নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় উপস্থিত হইলাম। তখন আমার বয়স ৪১ বৎসর।

কত যে তোমার করুণা, ভুলিব না জীবনে।
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে, কত যে তোমার করুণা[২]!

ওঁ নমস্তেঽস্তু, ব্রহ্মন্! নমস্তেঽস্তু।

---

(১) ১৫ই নভেম্বর, ১৮৫৮, সোমবার।

(২) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক লিখিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীর

পরিশিষ্ট।

১

দেবেন্দ্রনাথের পিতামহী।

আত্মজীবনীর প্রারম্ভে দেবেন্দ্রনাথ যে পিতামহীর কথা লিখিয়াছেন, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের গর্ভধারিণী নহেন; তিনি রামলোচন ঠাকুরের পত্নী অলকাসুন্দরী। নীলমণি ঠাকুরের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামলোচন ও মধ্যম রামমণি, যশোহর জেলার অন্তর্গত দক্ষিণডিহি নিবাসী রামকান্ত রায়ের দুই কন্যা অলকা ও মেনকাকে বিবাহ করেন। (বংশলতিকা দ্রষ্টব্য)। মেনকা দেবীর গর্ভে রামমণির, রাধানাথ ও দ্বারকানাথ নামে দুই পুত্র, এবং দুর্গামণি নাম্নী দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে রমানাথ নামক আর এক পুত্র হয়। রামলোচনের পত্নীর গর্ভে একটী কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল; অল্প বয়সেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহার পর ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামলোচন, মধ্যম ভ্রাতা রামমণির চারি বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় পুত্র দ্বারকানাথকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে আর তাঁহার সন্তানাদি হয় নাই। রামলোচন ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর পরলোকগত হন।

দ্বারকানাথ আবাল্য রামলোচন ঠাকুরের গৃহেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। তিনি মাতা অলকাসুন্দরীর প্রতি ভক্তিমান্ এবং তাঁহার একান্ত আজ্ঞাবহ ছিলেন। উত্তরকালে তিনি কলিকাতার দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সমাজে লোকরঞ্জন ও আতিথেয়তার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, (২ এবং ৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য); কিন্তু, মাতা অলকাসুন্দরীর জীবদ্দশায় কখনও য়ুরোপীয়দিগের সহিত আহার করেন নাই।

২

দেবেন্দ্রনাথের পিতা মাতা

জননী দিগম্বরী দেবী।

দেবেন্দ্রনাথের জননী দিগম্বরী দেবী যশোহর জেলার অন্তর্গত নরেন্দ্রপুর গ্রামের রামতনু রায় চৌধুরীর কন্যা ছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মে দৃঢ় নিষ্ঠাবতী ও তেজস্বিনী নারী ছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন সাহেবদিগের সহিত একত্রে আহার করিতে লাগিলেন, তখন দিগম্বরী দেবী "স্বামীর সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে জীবন নির্ব্বাহের ব্রত ধারণ করিয়া, মৃত্যুর দ্বারা তাহা উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন।" (তত্ত্ববো. ১৮৩৮ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা; ২৮ পৃষ্ঠা)[১]।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজের পিতা মাতার কথা বিশেষ কিছু লিখেন নাই। মাতার বিষয়ে একবার মাত্র উল্লেখ আছে (১২৩ পৃষ্ঠা)। পিতৃশ্রাদ্ধের পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথের মনে যখন ঘোর সংগ্রাম চলিয়াছে, তখন তিনি একদিন স্বর্গগতা জননীকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। আত্মজীবনীর ঐ স্থানে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে মাতার মৃত্যুকালে তিনি মনে করিতে পারেন নাই যে সত্যসত্যই মাতা মরিয়াছেন। ইহা পড়িয়া আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে, দেবেন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া থাকিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। মাতার মৃত্যুকালে (আনুমানিক ১৮৩৯ সালে) দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন যুবা পুরুষ; বিশ্বাসবলে তিনি তখন অনুভব করিতেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও মাতা নিশ্চয়ই জীবিতা আছেন।

জননীর প্রতি দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলিয়াছিলেন (তত্ত্ববো. ঐ সংখ্যা, ঐ পৃষ্ঠা), "তাঁহার ন্যায় ভক্তিশালী মনুষ্য অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।" ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে দেবেন্দ্রনাথ যখন পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া ধর্ম্মসংগ্রামে পতিত, তখন তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যে তাঁহার তেজস্বিনী

(১) ৫ পরিশিষ্টের 'বৈঠকখানা বাড়ী' শীর্ষক অংশ (৩১১ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

ও লৌকিক ধর্ম্মে দৃঢ়-নিষ্ঠাবতী জননী তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিতেছেন, "তুই নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াছিস্? কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।" স্বপ্নে এমন মাতার এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত যে সে সময়ে অতিশয় আশ্বস্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই।

বৃহৎ পরিবারে শিশুরা একটু বড় হইলে প্রায়ই সংসার কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্তা পিতামহীর কাছে প্রতিপালিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের বেলায়ও তাহাই হইয়াছিল। তাই আত্মজীবনীতে পিতামহীর উল্লেখ অধিক, জননীর উল্লেখ অত্যল্প। তাঁহার জননীর বিষয়ে আরও জানিতে আমাদিগের কৌতূহল হয়। কিন্তু সে কৌতুহল অপরিতৃপ্ত থাকিয়া যাইবে।

পিতা দ্বারকানাথ।

পিতার সহিত দেবেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁহার একজন চরিতাখ্যায়ক লিখিতেছেন, "শুনিয়াছি যে দেবেন্দ্রনাথ কোন দিন তাঁহার পিতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেন না। একদিন শুধু বলিয়াছিলেন যে, পিতা ইংলণ্ডে থাকিতে তাঁহার হাতখরচের জন্য মাসিক লাখ টাকা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইতে হইত। সুতরাং লোকে যে তাঁহাকে 'প্রিন্স' বলিয়া ডাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!"..."ছেলেবেলায় দেবেন্দ্রনাথ যে তাঁহার পিতার সঙ্গ খুব বেশি পাইতেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহার সাতাত্তর বছর বয়সে তিনি স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে এক দিন গল্প করিয়াছিলেন যে, ছেলেবেলায় ইস্কুল হইতে আসিয়া বাবার বৈঠকখানার চারিদিকে তিনি ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বৈঠকখানায় ঢুকিতে ইচ্ছা হয়, অথচ সাহস হয় না। এক দিন তাঁহার পিতা বলিলেন, 'তুই ছুটে ছুটে বেড়াস্ কেন, বৈঠকখানার ভিতরে বস্‌তে পারিস্ না?' তবু তাঁহার ভরসা হয় না। তার পরে এক সময় হঠাৎ গিয়া দেখেন যে ভিতরে বেশ ফুলের তোড়া, বৈঠকখানাটি নানা সুন্দর জিনিস দিয়া সাজানো। তখন হইতে বৈঠকখানায় বসিবার অধিকার হইল। সেইখানে বসিয়া অভিধান দেখিয়া তিনি পড়া শিখিতে লাগিলেন। এই গল্প করিয়া তিনি উমেশ বাবুকে বলিলেন, 'এখন সে বাবা নাই, আদত বাবা

ছুটাছুটি ছাড়িয়া তাঁর ঘরে বসিতে বলিয়াছেন। বেশ লাগিতেছে!'" (অজিত, ১২, ২৮)।

উপরে উদ্ধৃত উক্তিসকল হইতে পাঠকের মনে এই ভুল ধারণা জন্মিতে পারে যে, দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালে দ্বারকানাথ তাহাকে নিজের কাছে আসিতে দিতেন না। পিতার বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন, এবং ধর্ম্মবন্ধুদের কাছে যে দু একটি কথা বলিয়াছেন, তাহা পিতার সহিত পুত্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতার পরিচায়ক নয় বটে। কিন্তু বাল্যজীবনে পিতার সহিত তাঁহার কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা তাঁহার আত্মজীবনী হইতে অথবা তাঁহার পরিণত বয়সের ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইতে বুঝিতে পারিবার উপায় নাই। তাহার জন্য দ্বারকানাথের জীবনচরিত আলোচনা করা আবশ্যক। সেকালে পিতায় পুত্রে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হওয়া সাধারণ রীতি ছিল না। কিন্তু সেকালের হিসাবে দ্বারকানাথ অতিশয় পুত্রবৎসল পিতা ছিলেন।

বিষয়সম্পত্তির প্রসারণে ও পরিচালনে, তৎকালীন কলিকাতার নানা লোকহিতকর অনুষ্ঠানে, এবং দেশীয় ও ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত বিবিধ সামাজিকতায়, দ্বারকানাথকে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিতে হইত। দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন ৬ বৎসর মাত্র, তখনই দ্বারকানাথ গভর্ণমেণ্টের বিশ্বাস ভাজন হইয়া ভাবী অতুল সম্পদের ভিত্তি স্থাপনের নানা চেষ্টায় নিযুক্ত (১৮২৩)। কিন্তু এরূপ কার্য্যবাহুল্য সত্বেও তিনি শিশু দেবেন্দ্রনাথের প্রতি যৎপরোনাস্তি যত্ন ও স্নেহ প্রকাশ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাচর্চ্চার জন্য, এবং শরীরের স্বাস্থ্য ও আরামের জন্য দ্বারকানাথের ব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না। নিজেই দ্বারকানাথ সর্ব্বদা এ সকলের তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পরে, দ্বারকানাথের বিষয়-বাণিজ্যের সফলতা যখন (১৮৩৪) এত অধিক হইতে লাগিল যে তিনি গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মটিও ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ১৭ বৎসর। তখন দেবেন্দ্রনাথ কলেজের ছাত্র, অথবা সবে-মাত্র কলেজ ত্যাগ করিয়াছেন। দ্বারকানাথের ইচ্ছা ছিল, জ্যেষ্ঠ পুত্র এই সময় হইতে তাঁহার বিষয়সম্পদ্ রক্ষণাবেক্ষণে প্রধান সহায় হন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পিতার সে আশা পূর্ণ

করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ এই সময়ে পিতার ঐশ্বর্য্যের আস্বাদ পাইয়া দেবেন্দ্রনাথ হঠাৎ কিছুকালের জন্য "বিলাসের আমোদে" নিমগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেজন্য পিতার অসন্তোষ ও ভৎর্সনাভাজন হইলেন। (৮ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। তৎপরে, বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে ১৮৩৫ সালে দেবেন্দ্রনাথের চিত্তের গতি একেবারে বিপরীত মুখে প্রবল বেগে চালিত হইয়া গেল; পিতামহীর মৃত্যুর পরে বৈরাগ্য এবং ধর্ম্মপিপাসা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করিল। এই পরিবর্ত্তিত জীবনের প্রবল ধর্ম্মাবেগও দ্বারকানাথের মনঃপূত হইল না। ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করা, ব্রাহ্মসমাজ-পক্ষীয় পণ্ডিত ও ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য প্রভৃতিকে অর্থসাহায্য করা, ইত্যাদি কার্য্যে দ্বারকানাথ উৎসাহী ছিলেন বটে। কিন্তু তিনি কখনও দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য মত্ত হইয়া উঠেন নাই।

দ্বারকানাথের প্রকৃতিটি ছিল অন্যরূপ। তিনি নিষ্ঠাবান্ এবং সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ হইলেও, সংসারী মানুষ ছিলেন। তিনি মান সম্ভ্রম ভালবাসিতেন, নিজপদোচিত জাঁকজমক করিয়া চলিতেন, এবং তৎকালীন ধনীদিগের রীতি অনুসারে বিলাসের ও প্রমোদের আয়োজন করিতেন। কিন্তু তিনি নিজে চিরজীবন সংযতচরিত্র মানুষ ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত ভোজে মদ্যের স্রোত বহিয়া যাইত, অথচ তিনি নিজে, কি স্বদেশে কি বিলাতে, কোথাও মদ্য স্পর্শ করেন নাই[১]। তিনি নিজ পূজা অর্চ্চনাতেও অতিশয় নিষ্ঠাবান্ ছিলেন; এমন কি, ইংলণ্ডে যখন তাঁহার ভবনে তাঁহার সাক্ষাতের জন্য কোনও Duchess আসিয়া অপেক্ষা করিতেন, তখনও তিনি নিজের জপ শেষ না করিয়া উঠিতেন না।

যখন দ্বারকানাথের সম্পদ্‌সূর্য্য মধ্যাহ্নগগনে আরূঢ় (১৮৪০), যখন দ্বারকানাথ কলিকাতার সর্ব্বপ্রধান দাতা, সর্ব্বজন-অন্বেষিত পরামর্শদাতা ও ভদ্রসমাজের প্রায় একচ্ছত্র অধিপতি, যখন কলিকাতার সমুদয় দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্যে ও বদান্যতায় মুগ্ধ, তাঁহার স্তুতিগানে মুখরিত, ও তাঁহার প্রসাদ-কণা লাভের জন্য লালায়িত, সেই সময়ে দেবেন্দ্র-

(১) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে এই কথা বলিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকটে তাঁহার এই উক্তির বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।

নাথের ক্ষুধিত তৃষিত চিত্ত একমাত্র ধর্ম্মকেই অন্বেষণ করিতেছিল, এবং পিতার ঐশ্বর্য্যে, পিতৃভবনের ও পিতার উদ্যানের বিলাসের আয়োজনে ও লোকসমারোহে, অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়ে দ্বারকানাথও দেবেন্দ্রনাথের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু সে অসন্তোষের কারণ দেবেন্দ্র-নাথের ধর্ম্মভাব বা বিলাসবিমুখতা নহে; বিষয় পরিদর্শনে দেবেন্দ্রনাথের অমনোযোগ। এই সময়ে পিতায় পুত্রে কিয়ৎপরিমাণে মনের বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, সন্দেহ নাই। আত্মজীবনীতে বিশেষভাবে এই সময়ের ছবিই পড়িয়াছে। কিন্তু ইহা হইতে কেহ যেন এরূপ অনুমান না করেন যে, বাল্যকালাবধি দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে আপনা হইতে দূরেই রাখিয়া আসিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে পিতার কোন ছাপ নাই, এরূপ মনে করিলেও অত্যন্ত ভুল করা হইবে। বরং ইহার বিপরীত কথাই সত্য। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী বলিতে গেলে তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইতিহাস মাত্র; তাই ইহাতে পিতার সদ্‌গুণ ও সদনুষ্ঠানসকলের উল্লেখ নাই, এবং পিতার চরিত্রের প্রভাবেরও পরিচয় নাই। কিন্তু, শোণিত-সূত্রে, ও বাল্য-জীবনে পিতৃদৃষ্টান্তের প্রভাবসূত্রে, দেবেন্দ্রনাথ পিতার চরিত্র হইতেই স্বীয় অধিকাংশ সদ্‌গুণ আহরণ করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সদাশয়তা, ও দানে মুক্তহস্ততা, তাঁহার ক্ষুদ্রচিত্ততায় ঘৃণা ও জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহ, তাঁহার আত্মমর্য্যাদাবোধ ও জাতীয় গৌরবে গর্ব্ব, তাঁহার সূক্ষ্ম বিষয়ে দৃষ্টি ও সৌন্দর্য্যবোধ, এবং সর্ব্বোপরি ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা, আমরা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রেও দেখিতে পাই। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ বয়স্ক হইবার পর হইতে, পিতা ও পুত্রের জীবনের লক্ষ্যের ভিন্নতা অতিশয় স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দ্বারকানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে সংসারে প্রতিপত্তি-শালী ও যশস্বী হইব, এবং প্রাণ মন দিয়া পরোপকার ও দেশের হিতসাধন করিব। দেবেন্দ্রনাথ সংসারে নিঃস্পৃহ এবং যশ হইতে সঙ্কুচিত ছিলেন। তাঁহার মর্ম্মের কথা ছিল,—"তোমা বিহনে আমার জীবনে কি কাজ?" (আত্মজীবনী ৮০ পৃষ্ঠা); তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল যে কিসে ব্রহ্মের পূজা দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ সংসারের মানুষ ছিলেন, মানবপ্রেমিক

ছিলেন, সর্ব্বশ্রেণীর মানুষদের লইয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মের মানুষ ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন, ঈশ্বরপ্রেমিকদের লইয়াই থাকিতে ভালবাসিতেন। বিষয়-পরিচালনে দ্বারকানাথের বুদ্ধি এবং অনুরাগ উভয়ই প্রকাশ পাইত; দেবেন্দ্রনাথ বিষয়-পরিচালনে বুদ্ধি প্রয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত ঈশ্বরে। মানুষকে স্বদলে ও স্বমতে আনিবার এবং বিষয় সম্পদ্ নানা দিক দিয়া প্রসারিত করিবার কৌশলটি দ্বারকানাথের বিশেষ অধিগত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ সে-সকল পথ দিয়া যান নাই, সে-সকল কৌশল শিখিতে পারেন নাই। অপর দিকে, ধর্ম্মের প্রভাবে আসিয়া অবধি, দেবেন্দ্রনাথ আহারে বিহারে, আমোদে প্রমোদে, ধনের ব্যবহারে এবং বন্ধু ও সহচর নির্ব্বাচনে, যে কঠোর সংযমের ও শুচিতার নিয়মে আপনাকে বাঁধিয়াছিলেন, দ্বারকানাথে তাহা ছিল না। কিন্তু এই পার্থক্য সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে, গতিবিধিতে, ও আচরণে এমন বহু লক্ষণ বিদ্যমান ছিল, যাহা তাঁহাকে দ্বারকানাথের পুত্র বলিয়াই পরিচিত করিয়া দিত।

৩

পিতামহীর স্বহস্তে সংসারের কাজ করা।

দেবেন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখনো দ্বারকানাথের পৈতৃক গোলপাতার ঘর বর্ত্তমান। এই গৃহই দেবেন্দ্রনাথের সূতিকাগৃহ। মহর্ষি বলিয়াছেন যে,...'প্রথম যে দিন শাল আমার গাত্রে উঠিল, তাহাও আমার মনে পড়িতেছে।' মহর্ষি অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তাহার সূচনাক্ষেত্রে জন্মিয়াছিলেন।"—(প্রিয়. পরি. ২।৮৮)।

পরে যখন দ্বারকানাথ অতুল সম্পদের অধিকারী হইলেন, তখনও তাঁহার গৃহে অন্তঃপুরের জীবনযাত্রা সাধারণ গৃহস্থগণের ন্যায়ই নির্ব্বাহিত হইত। সে যুগে ধনী পরিবারের মহিলাগণও স্বহস্তে সংসারের অধিকাংশ কাজ করিতেন।

৪

মা-গোসাঁই ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী।

['মা-গোসাঁই' ও বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রীদের সম্বন্ধে এই নিবন্ধটি শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন।]

"নীলমণি ঠাকুরের পরিবারবর্গ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন, এবং খড়দহের গোস্বামীদের শিষ্য ছিলেন। সেই গোস্বামীদের নিকটে তাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিতেন। দীক্ষাগুরুর পত্নীকে 'মা-গোসাঁই' বলা হইত। অনেক সময়ে গুরুর অভাবে অথবা গুরুর পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে, গুরুপত্নীরাও দীক্ষা দিতেন। মা-গোসাঁইরা শিষ্য বাড়ীতে আসিবার সময় প্রায়ই নিজের কন্যা পুত্রবধূ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন। তাঁহারা আসিলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে ও নানারূপ ন্যায় ও অন্যায় দাবী মিটাইতে শিষ্যদের বিব্রত হইতে হইত। আমার মনে হয় যে ইহাই লক্ষ্য করিয়া মহর্ষি তাঁহার পিতামহীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'কিন্তু তিনি মা-গোসাঁইয়ের সতত যাতায়াত বড় সহিতে পারিতেন না।'

রামলোচন ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম ছিল হরিমোহন গোস্বামী; ইঁহার পত্নী কাত্যায়নী দেবীই অলকাসুন্দরীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। তিনিই আত্ম-জীবনীতে বর্ণিত 'মা-গোসাঁই'।

'মা-গোসাঁই' ছাড়া আর এক শ্রেণীর বৈষ্ণবী শিক্ষয়িত্রী সে যুগে পরিবারে পরিবারে গমন করিয়া মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতেন। দ্বারকানাথের পরিবারেও তাহা করা হইত। এই বৈষ্ণবীগণও খড়দহের গোস্বামীদের বিশেষ জানিত না হইলে পরিবারে অবাধ প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা প্রতিদিন পড়াইতে আসিতেন; অনেক সময়ে ছাত্রীদের বাটীতেও থাকিতেন। এই সকল বৈষ্ণবীর শিক্ষাদান কেবল বাংলায় শেষ হইত না; তাঁহারা সংস্কৃত বৈষ্ণব স্তবগুলিও অর্থের সহিত শিক্ষা দিতেন। (এই শিক্ষাদানের নিদর্শন, চমৎকার হস্তলিপিতে বৈষ্ণবীকর্ত্তৃক লিখিত বাংলা অনুবাদ সহ সংস্কৃত পুঁথি, আমার নিকটে আছে)। এই সকল বৈষ্ণবীদের কিন্তু 'মা-গোসাঁই' বলা হইত না। এই সকল বৈষ্ণবীরা পরিবারের কর্ত্রীর

সহিত 'মা' প্রভৃতি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন, এবং তদনুসারে পরিবারের অন্যান্য সকলের সহিত তাঁহাদের যথোপযুক্ত সম্বোধনের সম্বন্ধ হইত।"

৫

মহর্ষির আত্মজীবনীতে বর্ণিত বাড়ী ও বাগান।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনীতে নানা স্থানে পুরাতন বাড়ী, ভদ্রাসন বাড়ী, বৈঠকখানা বাড়ী ও বেলগাছিয়ার বাগানের উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে সে সকলের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

পুরাতন বাড়ী ও 'গোপীনাথ' বিগ্রহ।

[এই অংশ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লিখিয়া দিয়াছেন।]

"পুরাতন বাটী অর্থে পাথুরিয়াঘাটায় ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি বাসভবন। নীলমণি ঠাকুরের পরিবারে কোনও দিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বর্ত্তমান কালে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের বাটীতে যে 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের পূজা হয়, সেই বিগ্রহই ঠাকুর-বংশের পূর্ব্বপুরুষ জয়রাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। পরে যখন দর্পনারায়ণের পুত্রগণ পৃথক হন, তখন (মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পিতামহ) গোপীমোহন ঠাকুর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাটীতে 'গোপীকান্ত' বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিগ্রহ এখনও মূলাযোড়ের ঠাকুরবাটীতে বিদ্যমান। 'গোপীনাথ' বলিয়া কলিকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর কোনও বিগ্রহের কথা আমার জানা নাই[১]।

নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের জমিদারী সেরেস্তার মোহরে দেখিতে পাওয়া যায়,—

'বঙ্গোত্তরে রঙ্গপুরে পরগণে পাতিলাদহে।
গোপীনাথঃ প্রভুর্যত্র, ভূপতিস্তত্র ঠাকুরঃ॥'

---

(১) দ্বারকানাথের বাটীতে লক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলার পূজা হইত। এই নিবন্ধেই কিঞ্চিৎ পরে (৩১০ পৃষ্ঠায়) পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন।—(আত্মজীবনী-সম্পাদক)।

উত্তরকালে প্রসন্নকুমারের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে বোধ হয় মহর্ষি পুরাতন বাটীর ঠাকুরের নাম ভুলিয়া গিয়া 'রাধাকান্ত' স্থলে 'গোপীনাথ' ব্যবহার করিয়াছেন। মহর্ষি এখানে পুরাতন বাটীর 'রাধাকান্ত' বিগ্রহের কথাই বলিতেছেন, গোপীমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'গোপীকান্ত' বিগ্রহের কথা বলিতেছেন না, এরূপ অনুমান করিবার হেতু এই যে, গোপীমোহন ঠাকুরের বাটীকে 'আমাদের পুরাতন বাটী' বলা মহর্ষির পক্ষে সম্ভবপর নয়।"

ভদ্রাসন বাটী।

বর্ত্তমান ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাহাই দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভদ্রাসন বাটী। কিন্তু এ বাড়ীর অনেক অংশ পূর্ব্বে অন্যরূপ ছিল; ভিতরের দিকে অনেক খোলা জমি ছিল, পুকুর ছিল। রবীন্দ্রনাথও তাহা দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবনস্মৃতিতে আছে,—"বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত। ... জানলার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্ব্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট, দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী।...তাহার [বট গাছের] গুঁড়ির চারি ধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল।...বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল, তাহাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাতাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাতি আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ তাহার প্রধান সঙ্গতি। মাঝখানে ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল।...আমাদের বাড়ির উত্তর অংশে আর একখণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের দ্বারা প্রমাণ হয়, কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বৎসরের শস্য রাখা হইত।" ('জীবনস্মৃতি', শান্তিনিকেতন প্রেস, ৯—১৫ পৃষ্ঠা।)

বাড়ীর ভিতরে আর একটি পুকুর ছিল। একটি বালক (রামবল্লভ ঠাকুরের পুত্র) ডুবিয়া মারা যাওয়াতে সে পুকুর বুজাইয়া ফেলা হয়। আত্মজীবনীর ৬৩, ৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তত্ত্ববোধিনী (সে সময়ের নাম

‘তত্ত্বরঞ্জিনী’) সভার প্রথম অধিবেশন বাহির-বাড়ীর পুকুরের ধারের কোনও কুঠরীতে হইয়া থাকিবে। সেই পুকুর বুজাইয়া এখন ৬নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন ভবনের দক্ষিণের বাগান হইয়াছে।

বেলগাছিয়ার বাগানবাড়ী।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার প্রসিদ্ধ বাগান বর্ত্তমান কালে পাইকপাড়ার রাজাদের অধিকারে আছে। ইহা বেলগাছিয়া রোডে অবস্থিত।

১৮২৩ হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত, অর্থাৎ বিলাত-যাত্রার পূর্ব্বের আঠারো উনিশ বৎসর কাল, দ্বারকানাথের সম্পদ্ ও প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। উচ্চপদস্থ দেশীয় ও ইংরেজ উভয় শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য তিনি এই সকল লোককে ‘বেলগাছিয়া ভিলায়’ প্রায়ই নিমন্ত্রণ করিতেন। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীদের মধ্যেও দ্বারকানাথের এতদূর প্রতিপত্তি ছিল যে, এই বেলগাছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রিত সাহেবেরা তাঁহার সাহায্যে নিজ নিজ চাকরী প্রভৃতির সুবিধা করিয়া লইতেন। “তখনকার দিনে বেলগেছিয়া ভিলায় নিমন্ত্রণ হয় না, বা দ্বারকানাথের সহিত পরিচিত নহেন, এ কথা বলিতে যেন সাহেবেরা আপনাদের মর্য্যাদার হানি মনে করিতেন।” (ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩৩০, ৩৩১)।

দ্বারকানাথের চরিতাখ্যায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখিতেছেন, “দ্বারকানাথ বেলগাছিয়া ভিলাকে সূক্ষ্ম সুরুচির সহিত সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। এই ভিলাই তাঁহার আতিথ্যের প্রধান ক্ষেত্র ছিল। এখানে তিনি রাজার মতন খরচ করিয়া নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করিতেন। ‘মোতি ঝিল’ নামক একটি খাল সমস্ত বাগানটির মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া প্রসারিত ছিল; এই ঝিল নীলপদ্ম, রক্তপদ্ম এবং অন্যান্য নানা ফুলে সর্ব্বদা ঝলমল করিত। চারিদিকে বাগানের তৃণাচ্ছাদিত প্রাঙ্গণটি বিস্তৃত; ফাল্গুন চৈত্র মাসে তাহা গোলাপ ফুলে এবং অন্যান্য নানাবর্ণের ফুলে সুশোভিত থাকিত। বাগানে একটি সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর ছিল। তাহা তখনকার

পক্ষে নূতন প্রণালীতে সজ্জিত করা হইয়াছিল। নব্যতন্ত্রের য়ুরোপীয় শিল্পীদিগের ভাল ভাল ছবিতে গ্যালারির দেওয়ালগুলি অলঙ্কৃত ছিল। দ্বারকানাথ ছবির ও প্রস্তরমূর্ত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারে অভিজ্ঞ ছিলেন। বৈঠকখানার পশ্চাতে একটি মার্ব্বল পাথরের ফোয়ারা ছিল। মোতিঝিলের মাঝখানে একটি দ্বীপ; দ্বীপের উপরে একটি 'summer house'; তাহাতে যাইবার জন্য একটি কাঠের সেতু ও একটি ঝুলানো লোহার সেতু ছিল। এইটি বিশেষভাবে আমোদ-প্রমোদের স্থান ছিল।

দ্বারকানাথ প্রায়ই তাঁহার এই বেলগাছিয়া ভিলাতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকদের ভোজ দিতেন। ভোজ্যের পারিপাট্যে ও নিমন্ত্রিতদের পদমর্য্যাদায় এই ভোজের দিনগুলি তৎকালীন কলিকাতার ইতিহাসে এক-একটি চিহ্নিত দিন হইয়া উঠিত।

এই সকল ভোজে সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই দ্বারকানাথ নিমন্ত্রণ করিতেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার লোকদিগকে একত্র করিয়া, তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে ও মন খুলিয়া পরস্পরের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ করিয়া দিতে, দ্বারকানাথ অতিশয় উৎসাহী ছিলেন। সরকারী দরবার প্রভৃতিতে দেশীয় ও য়ুরোপীয়গণ একত্র মিলিত হইতেন বটে; কিন্তু পদের অনৈক্য ভুলিয়া সমানভাবে বন্ধুর মতন মিশিবার স্থান একমাত্র বেলগাছিয়া ভিলাই ছিল। স্বয়ং দ্বারকানাথ মানুষটি এমন ছিলেন যে, তাঁহার গুণেই এই সকল মিলনের ব্যাপার এমন সফল হইয়া উঠিত। তাঁহার মধুর ব্যবহার, সৌজন্য ও সহৃদয়তায় সকলেই মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেন।

এই বেলগাছিয়া ভিলাতে দ্বারকানাথ এক দিন অনারেব্‌ল্ মিস্ ইডেনের সম্মানার্থ একটি নাচ এবং সান্ধ্যভোজের অনুষ্ঠান করেন। মিস্ ইডেন লাট-ভগিনী, অতএব য়ুরোপীয় সমাজের অধিনেত্রী, এবং দ্বারকানাথ বাঙ্গালীসমাজের শীর্ষস্থানীয় পুরুষ; অনুষ্ঠানটি এই নিমন্ত্রিতা ও নিমন্ত্রণকারী উভয়েরই পদমর্য্যাদার অনুরূপ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল। ঘরগুলি আলোকে, আরশীতে, মির্জ্জাপুরের কার্পেটে, লাল জাজিমে, সবুজ রেশমে, পুষ্পগুচ্ছশোভিত মার্ব্বেলের টেবিলে, দর্শকদিগের চোখ ঝলসাইয়া দিতেছিল।

সিঁড়িতে, বারান্দায়, হলে, অজস্র নানাজাতীয় অর্কিড, সুদৃশ্য লতা, ও পাতা-বাহারের গাছ রক্ষিত হইয়াছিল। Summer houseটি এবং ঝুলানো সেতুটি, ফুল লতা ও দেবদারুপাতার মালায় এবং নানা বর্ণের পতাকায় ভূষিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র রঙ্গীন আলোতে জল ও স্থল উদ্ভাসিত হইতেছিল। হলের ভিতরে অবিশ্রাম বাজনা বাজিতেছিল; রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরও নাচ চলিতেছিল। বাহিরে ঘন ঘন বিচিত্র জমকাল আতসবাজি জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সকলেই বলিতেছিলেন যে, এমন জাঁক-জমকের ভোজ কলিকাতায় কখনও দেখা যায় নাই[১]

কিন্তু শ্রেষ্ঠভাবে বিচার করিলে বলিতে হয় যে, ইহা কেবল একটি বড় ভোজ নয়; ইহা দেশের সামাজিক ইতিহাসেরও একটি বড় ঘটনা। দ্বারকানাথ ইংরেজসমাজ ও হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্যবধান ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য কতরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন, এই ঘটনা তাহার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন।"—(Mem.70—74 ; সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

লর্ড অক্‌লণ্ডের ভগিনীর এই সম্বর্দ্ধনার বৃত্তান্ত আত্মজীবনীর ৭৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারকানাথ ঠাকুর দেশীয় ও য়ুরোপীয় ভদ্রলোকদিগকে সামাজিক ভাবে মিলিত করিবার যে চেষ্টা করিতেছিলেন, উপরে উদ্ধৃত বিবরণ হইতে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হই। কিন্তু ইহাতে তখন দেবেন্দ্রনাথের একটুকুও উৎসাহ ছিল না। ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। এই সকল প্রমোদসভার কার্য্যকলাপ দেবেন্দ্রনাথের রুচি ও প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু দেশীয় ও য়ুরোপীয় সমাজের সামাজিক মিলন সংঘটন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় পরবর্ত্তী কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই।

---

(১) *Calcutta Courier* পত্রিকার ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় এই ভোজের উল্লেখ আছে। তৎপূর্ব্বদিন অর্থাৎ ২৫শে ফেব্রুয়ারী এই ভোজ হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে দেশীয় ভদ্রলোকদিগের জন্য একটি ভোজ দেওয়া হয়। দেবেন্দ্রনাথ তাহার কার্য্যে অবহেলা করিয়া পিতার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন (৩৯ পৃঃ)। এই দ্বিতীয় ভোজের তারিখ সম্ভবতঃ ১৪ই মার্চ্চ, ২রা চৈত্র, রবিবার ; কারণ বাংলা মাসের প্রথম রবিবার তত্ত্ববোধিনী সভার মাসিক অধিবেশন ও উপাসনা হইত। *Calcutta Courier* এবং *Bengal Hurkaru* হইতে জানা যায় যে ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালে দ্বারকানাথ বহুবার এইরূপ ভোজ ও নাচের আয়োজন করিয়াছিলেন।—(আত্মজীবনী-সম্পাদক)।

দ্বারকানাথের চেষ্টা ও প্রভাব সত্ত্বেও তৎকালীন হিন্দু ভদ্রলোকদের পক্ষে য়ুরোপীয়দিগের সহিত আহার করা সহজ হয় নাই। ১৮৪০ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলগাছিয়ার বাগানে একটী জমকাল ball নাচ ও ভোজ হয়। যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক নাচ ও বাজি পোড়ান দেখিয়াই চলিয়া গেলেন, খানার টেবিলে বসিলেন না, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া *Bengal Hurkaru* পত্রিকা (২১শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায়) লিখিয়াছিলেন, "There were a great many native gentlemen present on the occasion. Many of them remained to witness the exhibition of the fireworks only, and then returned, no doubt to escape the steam of the supper table." অপর দিকে, যাঁহারা সেখানে গোপনে গোপনে খানা খাইয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া বাংলা কাগজে ছড়া বাহির হইয়াছিল,—

> 'বেলগাছিয়ার বাগানে হয় ছুরি কাঁটার ঝন্‌ঝনি,
> খানা খাওয়ার কত মজা, আমরা তার কি জানি ?
> জানেন ঠাকুর কোম্পানী।'

('প্রবাসী', ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ২৩২ পৃষ্ঠা, সৌদামিনী দেবী লিখিত 'পিতৃস্মৃতি' দ্রষ্টব্য)।

বৈঠকখানা বাড়ী।

বিলাত যাত্রার পূর্ব্বেই বেলগাছিয়ার বাগানে দ্বারকানাথ এইরূপে ইংরেজ-দিগের সহিত আহার করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহার ফলে তাঁহাকে নিজ ভবনের একাংশে 'বৈঠকখানা বাড়ী' নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইতে হয়। দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর নানা স্থানে এই বৈঠকখানা বাড়ীর উল্লেখ আছে।

"দ্বারকানাথ প্রথম বয়সে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তি ছিল। তিনি প্রত্যহ হোম, তর্পণ, জপ করিতেন। অন্যান্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ন্যায় স্বহস্তে গৃহদেবতা ৺লক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলার নিত্য পূজা করিতেন। যে পূজক নিযুক্ত ছিল, সে ভোগাদি পাক করিয়া ভোগ

দিত ও আরত্রিক করিত। ...তাহার পর যখন সাহেব মেমদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা বাড়িল, তাঁহার বেলগেছিয়ার বাগানে খানা চলিতে লাগিল, তখন প্রথম প্রথম দ্বারকানাথ খানার টেবিলে বসিতেন না; দূরে দূরে থাকিতেন, এবং খানার শেষে গঙ্গাজলাদি স্পর্শ ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হইতেন। যত দিন এইভাবে চলিয়াছিল, তত দিন তিনি নিজে দেবপূজা করিতেন। কিন্তু যে দিন হইতে মেম [ও] সাহেবদিগের প্ররোচনায় তাঁহাদের সহিত ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইলেন, সেই দিন হইতে নিজে দেবপূজা ত্যাগ করিলেন, এবং নিজের অনুষ্ঠিত প্রত্যেক কাজের জন্য,—অর্থাৎ পূজা, হোম, তর্পণ, পিতৃমাতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের জন্য,—ভিন্ন ভিন্ন বেতনভুক্ ব্রাহ্মণ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া দিলেন। শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ পুরোহিতের সংখ্যা ১৮ জন ছিল।

এই সময় হইতে তিনি ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেন না, পূজা-পার্ব্বণে ঠাকুরদালানে উঠিতেন না, সাধারণ দর্শকের ন্যায় উঠানে দাঁড়াইয়া দেবদেবী দর্শন করিয়া প্রণামাদি করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবারস্থা মহিলারা, এমন কি তাঁহার পত্নীও, তাঁহার সহিত একাসনে বসিতেন না; হঠাৎ স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতেন। এই সময়ে দ্বারকানাথের জ্ঞাতিগণ তাঁহার ভ্রষ্টাচার জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুরবংশীয় হরকুমার, কানাইলাল, প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই স্থির করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথ ইহা অবগত হইয়া তাঁহার পৈত্রিক ভদ্রাসনের পার্শ্বে এক বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া লইয়াছিলেন, এবং এই নূতন বাড়ীতেই থাকিতেন।...

তাহার পর যখন দ্বারকানাথ প্রথমবার বিলাত যান, তখন পাথুরিয়াঘাটার জ্ঞাতিগোষ্ঠীর নেতা কানাইলাল ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'আর চলিবে না, এইবার আমরা বাধ্য হইয়া তোমায় ত্যাগ করিব।'...প্রথম যাত্রায় দ্বারকানাথের সহিত তাঁহার এক ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বিলাতে গিয়াছিলেন। এই যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিলে দ্বারকানাথ তাঁহার ভদ্রাসন হইতে স্বতন্ত্র বৈঠকখানায় বাস করিলেন। এবং তাঁহার ভাগিনেয় তাঁহার জ্যেষ্ঠের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার

বাসের জন্য বাহির মহলের বৈঠকখানার উপরে স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মিত হইল, তাঁহার আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইল।" (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৪৯—৩৫১ পৃষ্ঠা ও সংশোধন-পত্র দ্রষ্টব্য।)

প্রথম বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে, দ্বারকানাথ অনেক অনুরুদ্ধ হইয়াও কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করিলেন না। পরিবার ও সমাজ কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়াও তিনি রামমোহন রায়ের শিষ্যের উপযুক্ত দৃঢ়তা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনস্থ যে বাড়ীতে এখন দ্বারকানাথের পুত্র গিরীন্দ্রনাথের বংশধর শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়েরা বাস করিতেছেন, সেই বাড়ীই দ্বারকানাথ ঠাকুরের বৈঠক-খানা বাড়ী ছিল।

৬

প্রথম বয়সে দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মবিশ্বাস।

"প্রথম বয়সে আমার নিকটে এই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ অনন্ত দেবের পরিচয় দেয়। একদিন শুভক্ষণে এই অগণ্য নক্ষত্রপূর্ণ অনন্ত আকাশ আমার নয়নপথে প্রসারিত হইয়া প্রদীপ্ত হইল। তাহার আশ্চর্য্য ভাবে একেবারে আমার সমুদায় মন, সমুদয় আত্মা, আকৃষ্ট হইল! অমনি বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়া সিদ্ধান্ত করিল যে, এ কখনো পরিমিত হস্তের রচনা নহে। সেই মুহূর্ত্তে অনন্তের ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত হইল; সেই মুহূর্ত্তে জ্ঞান-নেত্র বিকশিত হইল। তখন আমার পাঠ্যাবস্থা। একথা অদ্যাপি আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করি নাই। আপনাদের অদ্যকার সৌহার্দ্দে বাধ্য হইয়া হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহা এখন ব্যক্ত করিতেছি।

প্রথমে এই অনন্ত আকাশ হইতে অনন্তের পরিচয় পাইলাম। যেন আবরণ ভেদ করিয়া অনন্ত ঈশ্বর আমাকে দেখা দিলেন, যেন যবনিকার এক পার্শ্ব হইতে মাতার প্রসন্ন বদন দেখিতে পাইলাম। সেই প্রসন্ন বদন আমার চিত্তপটে চিরদিনের নিমিত্ত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

প্রথম বয়সে উপনয়নের পর প্রতিনিয়ত যখন গৃহেতে শালগ্রাম শিলার অর্চ্চনা দেখিতাম, প্রতিবৎসরে যখন দুর্গাপূজার উৎসবে উৎসাহিত হইতাম, প্রতিদিন যখন বিদ্যালয়ে যাইবার পথে ঠন্‌ঠনিয়ার সিদ্ধেশ্বরীকে প্রণাম করিয়া পাঠের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য বর প্রার্থনা করিতাম, তখন মনের এই বিশ্বাস ছিল যে, ঈশ্বরই শালগ্রামশিলা, ঈশ্বরই দশভুজা দুর্গা, ঈশ্বরই চতুর্ভুজা সিদ্ধেশ্বরী।

কিন্তু সেই শুভক্ষণে যেমন এই অনন্ত আকাশের উপরে আমার নয়নযুগল উন্মীলিত হইল, অমনি আমার জ্ঞান উন্মীলিত হইয়া মনের পৌত্তলিক ভাবকে ক্ষণকালের মধ্যে তিরোহিত করিয়া দিল। অমনি জানিলাম, অনন্ত আকাশের অগণ্য নক্ষত্র পরিমিত হস্তের কার্য্য নহে, অনন্ত পুরুষেরই এই অনন্ত রচনা।

প্রথম উপদেশ অনন্ত আকাশ হইতে পাইলাম। পরে শ্মশানে বৈরাগ্যের উপদেশ হইল। সহসা উদাসীনের আনন্দ হৃদয়ে উত্থিত হইল।”—(ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তর, ভব. ৩২৮—৩৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

অনন্ত আকাশ দর্শনে দেবেন্দ্রনাথের মনে এই ভাবের উদয় আনুমানিক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে, হিন্দু কলেজে পাঠকালে হইয়া থাকিবে।

৭

দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যাশিক্ষা ও হিন্দুকলেজ।

রামমোহন রায়ের স্কুল।

ছয় বৎসর বয়সে (১৮২৩ সালে) বাড়ীর পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের কাছে ‘হাতে খড়ি’ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। তৎপরে কিছুকাল বাড়ীতেই গৃহশিক্ষকগণের নিকটে তিনি ইংরেজী, বাংলা ও ফারসী ভাষা এবং সঙ্গীত বিদ্যা ও ব্যায়াম শিক্ষা করেন। দ্বারকানাথ এবং রামমোহন রায়

উভয়েই হিন্দুকলেজ স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন; কিন্তু রামমোহন রায়ের অনুরোধে দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে হিন্দুকলেজে না দিয়া রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িতে পাঠান। স্বয়ং রামমোহন নিজের গাড়ী করিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করিতে লইয়া গিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের স্কুলের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাচরণ দে প্রভৃতি ছিলেন[১]।

১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতগমনের উদ্যোগে ব্যস্ত হইয়া আর নিজ বিদ্যালয়ের প্রতি উপযুক্তরূপে মনোযোগ দিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারই পরামর্শ অনুসরণে এই বৎসর নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সতীর্থের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।

হিন্দুকলেজ।

দেবেন্দ্রনাথ যখন হিন্দুকলেজে পড়িতেছিলেন, সে সময়ে ঐ কলেজ বঙ্গদেশে সামাজিক বিপ্লবের একটি কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। হেনরী ভিভিয়ান্ ডিরোজিও নামে একজন ফিরিঙ্গী যুবক ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ঐ কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্রদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিবার শক্তি তাঁহার চরিত্রে অসাধারণ ভাবে বিদ্যমান ছিল। তিনি ফরাসী বিপ্লববাদীদিগের শিষ্য ছিলেন; তাই প্রচলিত ধর্ম্মের ও সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য তিনি নিজ ছাত্রগণকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তিনি রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি প্রিয় ছাত্রদিগকে লইয়া

---

(১) দেবেন্দ্রনাথ কোন্ সালে রামমোহন রায়ের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন, (তত্ত্ববো. ১৮৩৮ শকের আষাঢ় সংখ্যা, ৫৬ পৃঃ), ১৮২৭ সালে রামমোহন রায়ের বন্ধু Adam সাহেব ঐ স্কুল পরিদর্শন করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলে, রামমোহন রায় দ্বারকানাথকে নিঃসঙ্কোচে অনুরোধ করিয়া ও তাঁহার সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথকে তথায় ভর্ত্তি করিয়া লন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ নিজে বলিয়াছেন (১১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য), যে, রামমোহন রায়ের স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার বয়স আট কিংবা নয় বৎসর ছিল; তাহা হইলে ভর্ত্তি হইবার বৎসর ১৮২৫ কিংবা ১৮২৬ হয়। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারা গেল না।

Academic Association নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন; এই সমিতিতে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতার মন্ত্র ঘোষিত ও প্রচারিত হইত।

ডিরোজিও যে শ্রেণীতে পড়াইতেন, দেবেন্দ্রনাথ তাহার নীচের শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের ভর্ত্তি হইবার চারি মাস পরেই কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া ডিরোজিওকে কলেজ ছাড়িতে হয়। দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে সতেরো বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিন্দুকলেজে পড়িয়াছিলেন। ডিরোজিও-শিষ্যগণের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

রামমোহন রায় এবং তাঁহার প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর, উভয়েই হিন্দুকলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষার যেটুকু ভাল, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও দেশীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করেন নাই। উভয়েই স্বদেশের মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে অতিশয় তেজস্বিতা প্রকাশ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে তাঁহাদের অনুগামী ছিলেন। এইজন্য হিন্দুকলেজের প্রথম দলের বিপ্লববাদী ছাত্রগণ একসময়ে দ্বারকানাথের প্রতি[১], এবং পরে বেদ-বেদান্তে ভক্তিমান্ দেবেন্দ্রনাথের প্রতি[২], বিদ্বেষ-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা।

এখানে হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের প্রাচ্য-বিরোধিতার ও বিপ্লবমুখীনতার উল্লেখ করিতে হইল বটে। কিন্তু সে সময়ে তাঁহারাই যে এ দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণকর্ম্মের অগ্রণী ছিলেন, এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মন্ত্রের প্রধান উপাসক ছিলেন, ইহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দুকলেজ হইতে উত্তীর্ণ প্রধান প্রধান যুবকগণ মিলিত হইয়া ১৮৩৮ সালের প্রথম ভাগে Society for the Acquisition of General Knowledge অথবা

---

(১) Mem. 41, এবং ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩৩৪ দ্রষ্টব্য।

(২) ৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল, সর্ব্ববিধ জ্ঞান উপার্জ্জনে পরস্পরের সহায়তা করা ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্দ্ধন করা। প্রায় দুই শত যুবক ইহার সভ্য হইয়াছিলেন; তন্মধ্যে দেবেন্দ্রনাথও ছিলেন। এই সভা যুবকগণের জ্ঞানবৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিত, কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা হইত না।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মন ঈশ্বর ও ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন সকল লইয়া অতিশয় আন্দোলিত হইতেছিল; এবং বহু কষ্টে নিজের একাগ্র চিন্তার দ্বারা তিনি একাকী যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতেছিলেন, তাহাতে অপরের 'সায়' পাইবার জন্য তাঁহার হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইতেছিল। এই ব্যাকুলতা আত্মজীবনীর চতুর্থ ও পঞ্চম পরিচ্ছেদে ব্যক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই ব্যাকুলতার দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার' সভ্য হন। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি এই সভা হইতে কিছুমাত্র সাহায্য পাইলেন না।

হিন্দুকলেজের তৃতীয় ছাত্রদল।

হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রসিককৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতিকে প্রথম দল, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহপাঠীদিগকে দ্বিতীয় দল, এবং রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার সহাধ্যায়ীগণকে তৃতীয় দল বলা যাইতে পারে। এই তৃতীয় দলের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের তর্কবিতর্ক ৩৯ ও ৪৫ পরিশিষ্টে বর্ণিত হইবে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়াছিলেন (১০৬ পৃষ্ঠা)। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বীয় আত্মচরিতের ২৭—২৯ পৃষ্ঠায় এই তৃতীয় দলের কয়েক জনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

হিন্দুকলেজের পাঠ্যতালিকা।

হিন্দু কলেজে দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতের ২০, ২১ পৃষ্ঠায় প্রথম শ্রেণীর কোন কোন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দিয়াছেন। তাহাতে Philosophyর বা Logicএর তালিকা নাই। যাহা হউক, যে তালিকা আছে তাহা

হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথকে বর্ত্তমান বি-এ পরীক্ষার্থীদিগের অপেক্ষাও অধিক পড়িতে হইয়াছিল। ১৭ বৎসর বয়সের বালকের পক্ষে তাহা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকিবে। এই শিক্ষা দ্বারাই তিনি (আত্মজীবনীর তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লিখিত) য়ুরোপীয় দার্শনিকদিগের গ্রন্থ বুঝিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, এবং উত্তরকালে বিশ্বজগতে ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিবার সাধনায় অনেক সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের প্রদত্ত পাঠ্যতালিকা এই :—

"*English Literature :* Bacon's Essays. Shakespeare,—Macbeth, Lear, Othello, and Hamlet. Milton,—Paradise Lost, Lycidas, Comus, L'Allegro, Il Penseroso, Sonnets, etc. Pope,—Essay on Criticism, Rape of the Lock, Eloisa to Abelard, Elegy on the Death of a Young Lady, Prologue to the Satires, etc. Young,—Night Thoughts. Gray's Poems.

History : পুরাবৃত্তে কোন্ পুস্তক হইতে প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহা নির্দ্ধারিত না থাকাতে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বৎসরের ভিতর পড়িতে হইত,—Hume's History of England (unabridged.) Gibbon's Roman Empire (unabridged.) Mitford's History of Greece. Fergusson's Roman Republic. Elphinstone's India. Russell's Modern Europe. সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ছত্রিশ ভালাম হইবে।

Mathematics : Euclid,—First six books and Eleventh book. Algebra. Plane and Spherical Trigonometry. Analytical Conic Sections. Differential and Integral Calculus.

Mixed Mathematics : Whewell's Mechanics. Berkley's Astronomy. Webster's Hydrostatics. Phelp's Optics. Calculation of Eclipses."

৮

দেবেন্দ্রনাথের জীবন পরিবর্ত্তন।

দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথমে লিখিয়াছেন, "এত দিন আমি বিলাসের আমোদে ডুবিয়া ছিলাম।" ইহা কোন্ সময়? এবং 'এত দিন' বলিতে কত দিন বুঝিতে হইবে?

আমাদের ধারণা, ১৮৩৪ সালের শেষভাগ হইতে ১৮৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যু পর্য্যন্ত, ন্যূনাধিক এক বৎসর কাল দেবেন্দ্রনাথের বিলাসের আমোদে মগ্ন থাকিবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম পরিশিষ্টে আমরা দেখিয়াছি যে, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার একটি নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পরিবার ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকালে মাংসাদি তাঁহাদের বাড়ীর ত্রিসীমায় আসিতে পারিত না, মদ্যের তো কথাই নাই। তদুপরি দেবেন্দ্রনাথের শয়ন ভোজন উপবেশন সকলই পিতামহীর নিকটে হইত বলিয়া তিনি সাত্ত্বিক আহারে, এমন কি নিরামিষ আহারেই, অভ্যস্ত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বাল্যকাল এইরূপ শুদ্ধাচার ও সাত্ত্বিকতার আবেষ্টনে কাটিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার যৌবনকালে যখন তাঁহার পিতা কলিকাতার এক জন প্রধান ধনী হইয়া উঠিলেন, তখন এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল।

১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ 'কার ঠাকুর কোম্পানী' নামক ব্যবসায়ের পত্তন করেন। এই সময় হইতে তাঁহাকে ব্যবসায়ের সুবিধার জন্য দেশীয় ও য়ুরোপীয় পদস্থ লোকদিগকে লইয়া নাচ ও ভোজের ব্যবস্থা করিতে হইত, এবং স্বয়ং সাত্ত্বিক আচারের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহাকে কলিকাতার অন্যান্য ধনীদিগের অনুকরণে ও তাঁহাদের অনুরূপ চালে জাঁকজমক করিয়া চলিতে হইত। অনেক সময়ে সামাজিকতার খাতিরে পুত্রদিগকে এই সকল প্রমোদ-সভার খানা খাওয়া, বাইনাচ, ও সুরাপানের সংশ্রবে লইয়া যাইতে হইত।

কিশোর দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে প্রলোভনের অনলে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ইহার ফলে সুরা, নাচ, ও ধনীপুত্রদিগের কুসঙ্গ কিছুকালের জন্য তাঁহাকে অধিকার করিল। দেবেন্দ্রনাথের সেই বয়সকে (১৭,১৮ বৎসর) আমরা এখন সচরাচর 'যৌবন' নাম দিয়া গৌরবান্বিত করি না। সে যুগে এই কাঁচা বয়সেই ছেলেদের কাছে কিরূপ সর্ব্বনাশকর প্রলোভন আসিয়া উপস্থিত হইত, তাহা ভাবিলে কম্পিত হইতে হয়!

বিষয় বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বারকানাথ যে-সকল উপায় অবলম্বন করিতেছিলেন, তাহার ফলে যখন প্রিয় পুত্রের অনিষ্ট হইতে লাগিল, তখন

তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বার বার ভর্ৎসনা ও অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন বটে; কিন্তু পুত্রের অর্থব্যয়ের অধিকার সঙ্কুচিত করিয়া দিতে তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয় সম্মত হইল না। অবশেষে পুত্রকে কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাখিলে তাহার মতি গতি পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং সেই সঙ্গে নিজেরও কাজকর্ম্মের কিঞ্চিৎ সাহায্য হইবে, এই মনে করিয়া তিনি দেবেন্দ্রনাথকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহকারী কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দিলেন, (১৮৩৪)। কিন্তু পর বৎসর (১৮৩৫) দেবেন্দ্রনাথের উপরে গৃহসংসারের সমুদয় কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ভ্রমণে বহির্গত হইতে হইল। দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে এইরূপে কিছুকাল আপনি আপনার প্রভু হইয়া থাকা আরও অনিষ্টের কারণ হইল।

এই অবস্থায় বিলাসের আবর্ত্তে পতিত হওয়াতে দেবেন্দ্রনাথকে দোষী করা যায় না; বরং আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, এমন অবস্থা হইতেও ঈশ্বর তাঁহাকে এত শীঘ্র ধর্ম্মের দিকে টানিয়া লইলেন।

দ্বারকানাথ যখন পশ্চিমাঞ্চলে, সেই সময়ে, দেবেন্দ্রনাথ যে-পিতামহীর প্রাণাধিক প্রিয় ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। এই শোকের দারুণ আঘাতে দেবেন্দ্রনাথের জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। পিতামহীর শ্মশানে বসিয়া তাঁহার চিত্তে এমন একটি আনন্দময় উদাস ভাবের উদয় হইল, যাহার ছাপ মন হইতে আর কিছুতেই মুছিয়া গেল না। সেই আনন্দের তুলনায় বিলাস ও আমোদকে ঘৃণার বস্তু বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই আনন্দ কিসে ফিরিয়া পাওয়া যায়, ইহাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান হইল। অবসর পাইলেই তিনি বোটানিকেল গার্ডেনে গিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং কোন্ সত্য বস্তু হইতে সেই আনন্দের উদ্ভব হইয়াছিল, একাগ্র চিন্তার দ্বারা তাহার অন্বেষণে নিযুক্ত হইতেন। (৯ম পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৪৪ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, "আমার চারিদিকে কেবল বিলাসের- ও আমোদের-অনুকূল বায়ু অহর্নিশি প্রবাহিত হইতেছিল। এত প্রতিকূল অবস্থাতেও ঈশ্বর আপনি দয়া করিয়া আমার মনে বৈরাগ্য দিলেন ও আমার সংসারাসক্তি কাড়িয়া লইলেন; এবং তাহার পরে সেই আনন্দময় স্বীয় আনন্দের ধারা আমার মনে বর্ষণ করিয়া আমাকে নূতন জীবন

প্রদান করিলেন।” ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে মানুষের জীবন-পরিবর্ত্তনই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা, ও ভগবানের করুণার সর্ব্বাপেক্ষা জ্বলন্ত প্রকাশ; সেই জ্বলন্ত প্রকাশ দেবেন্দ্রনাথের জীবনে অতি সমুজ্জ্বল।

দেবেন্দ্রনাথের এই হৃদয় পরিবর্ত্তন, একটি সাধারণ ধনী যুবকের বিলাসিতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র নহে। বিলাস ব্যসনে মজিবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার কিশোর হৃদয়ে ধর্ম্মতত্ত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্রতা বর্ত্তমান ছিল। বালক বয়সেই নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ দেখিয়া তাঁহার অন্তরে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল যে, ঐ আকাশ যাঁহার রচনা তিনি কখনও পরিমিত দেবতা নহেন, তিনি অনন্ত পরমেশ্বর। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে ধর্ম্মালোকের জন্য এই ব্যাকুলতা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল বলিয়া, যখন তাঁহার মন ভোগ বিলাস হইতে ফিরিল, তখন তাহা একেবারে ধর্ম্মেতে না পৌঁছিয়া মধ্যপথে স্থির থাকিতে পারিল না।

দেবেন্দ্রনাথের জীবন-পরিবর্ত্তনের দুইটী ফল তাঁহার চরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বাল্যকালে উদিত সেই আকাঙ্ক্ষা, তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তনের পর আরও বর্দ্ধিত হইল। যত দিন তিনি ঈশ্বরকে সত্য পুরুষ বলিয়া এবং জগতের ও নিজ জীবনের নিয়ন্তা বলিয়া উজ্জ্বল ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলেন, ততদিন তাঁহার মন এক গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হইল; এবং ইহার পরে তত্ত্বজ্ঞান অন্বেষণের জন্য এক অসাধারণ ব্যাকুলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া আজীবন তাঁহার অন্তরে সমভাবে প্রদীপ্ত হইয়া রহিল। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির অন্তর্মুখীনতা ও নির্জ্জনপ্রিয়তা ইহারই ফল।

জীবন পরিবর্ত্তনের দ্বিতীয় ফল এই হইল যে, তাঁহার মন চিরদিনের জন্য বিলাস-ব্যসনের প্রতি, এবং বহু বৎসর পর্য্যন্ত বিষয় বিভবের প্রতি, একান্ত বিমুখ হইয়া রহিল। একটি প্রবল বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার চিত্তকে যেন এই সময় হইতে গ্রাস করিয়া রহিল। আমরা দেখিতে পাই, লাট-ভগিনীর সম্বর্দ্ধনার ব্যাপারে (১৮৪১) দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত; পিতার ইংলণ্ডবাস হেতু বিষয় দেখিতে হইতেছে বলিয়া (১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথ অসুখী; পিতার ব্যবসায়ের পতনের পর (১৮৪৮) যখন বিষয় বিভব সব বিক্রয় হইয়া যাইবার

উপক্রম হইতেছে, তখনও দেবেন্দ্রনাথ উদাসীন ; বরং বিষয় সম্পত্তির যতটা চলিয়া যায় ততই ভাল, তাঁহার মনের যেন এই প্রকার ভাব। ট্রষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করা যায় না, তথাপি তাহা করিতে দেবেন্দ্রনাথ উদ্যত ; যে যে দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রয় করা হইল, তাহা যাহাতে ভাল দামে বিক্রয় হয়, সে বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ একান্ত নিশ্চেষ্ট। (৪১ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।)

দেবেন্দ্রনাথ এই বৈরাগ্যের ভাবকে নিজ ধর্ম্মজীবনে অতিশয় মূল্যবান মনে করিতেন। পিতার ব্যবসায়ের পতনের পরে বিত্তহীন হইয়া তিনি মনে করিলেন যে, ধর্ম্মজীবনের আর এক সোপান ঊর্দ্ধে আরোহণ করা গেল। তিনি বলিতেছেন, (১৪৯—১৫১ পৃষ্ঠা), "আমি যা চাই, তাই হইল। বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল।...আমি বলি যে, 'হে ঈশ্বর, আমি তোমা ছাড়া আর কিছু চাই না।' তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন।...সে শ্মশানের সেই এক দিন, আর অদ্যকার এই আর এক দিন ! আমি আর এক সোপানে উঠিলাম।"

মহর্ষিদেব নিজে আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, এই সময়ে ধর্ম্মোন্মাদের অনুরূপ একটি অবস্থা তাঁহার অন্তরে রাজত্ব করিতেছিল, এবং এই সময়ে তিনি পরম বৈরাগী ও প্রমত্ত প্রেমিক হাফিজের ভাব-রসে নিমগ্ন হইয়া গভীর তৃপ্তি লাভ করিতেন। তাঁহার পরিবারের লোকেদের কাছে শুনিয়াছি যে, যখন তিনি এইরূপে সর্ব্বস্ব খোয়াইতে আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন, তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনে করিয়াছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।

সম্ভবতঃ পিতৃঋণ শোধের জন্য দেবেন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তির দিকে প্রথম মন দিতে আরম্ভ করেন।

৯

শ্মশানের আনন্দ হারাইয়া দেবেন্দ্রনাথের অশান্তি।

শ্মশানে উপলব্ধ আনন্দ যখন চলিয়া গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথের মনে যে গভীর অশান্তির ও অনুসন্ধানের উদয় হইল, তাহার প্রকৃতিটি কিরূপ ?

দেবেন্দ্রনাথ মনে করিলেন, এই আনন্দ যদি কেবল আমার মনের একটি ভাবমাত্র না হয়, যদি এ আনন্দের পশ্চাতে আনন্দ-দাতা সত্য পুরুষ কেহ থাকেন, তবে আমি পুনরায় ইহা লাভ করিতে পারিব ; নতুবা নয়। কিন্তু সত্য পুরুষ কেহ আছেন কি না, তাহা আমাকে কে বলিয়া দিবে ?

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের অভিনন্দনের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"সেই উদাস ভাবের আনন্দে হৃদয় এমনি বিকশিত হইল যে, সে রাত্রি চক্ষুতে নিদ্রা আইল না। তাহার পরদিনে সে আনন্দ চলিয়া গেল। তখন আমি ঘোর বিষাদে, অকূল চিন্তাতে, নিমগ্ন হইলাম। পিপাসাতুর পথিকের ন্যায় সেই আনন্দের আকর প্রেমের সাগর সত্যস্বরূপের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তপটের জ্ঞান-ভূমিতে অনন্তের যে সুন্দর ছবি মুদ্রিত রহিয়াছে, তাহা কি কেবল ছবিমাত্র ? তাহা কি মনের ভাবমাত্র সেই বাস্তবিক সত্য কি নাই, যাহার এই প্রতিবিম্ব, যাহার এই প্রতিরূপ ? এই প্রকারে বুদ্ধির মহা আন্দোলন চলিল। এই আন্দোলন ও আলোচনাতে যখন আমার মন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছিল, তখন হঠাৎ উপনিষদের এক ছিন্ন পত্র আমার হস্তে নিপতিত হইল।" (ভব. ৩৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

১০

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ১৮৩৮ সালের পূর্ব্বে পঠিত য়ুরোপীয় দর্শনশাস্ত্র।

এই সময়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক ও বিপ্লববাদী লেখকগণের এবং হিউম প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী গ্রন্থকারদিগের মত ও শিক্ষা হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে অতিশয় প্রসার লাভ করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেই দার্শনিকগণের মধ্যে কাহারও কাহারও মূল গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন, এবং অপর কয়েক জনের মূল গ্রন্থ পাঠ না করিয়া থাকিলেও দর্শনের ইতিহাস (History of Philosophy) পাঠসূত্রে তাঁহাদের মত ও শিক্ষার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

(১) "প্রকৃতির অধীনতাই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব" এই ভাবটি তিনি Julien Offroy de la Mettrie (1709—1751) হইতে লাভ করিয়া থাকিবেন। এই লেখকের মতে মনের সকল ক্রিয়া শরীরের গঠনের উপর নির্ভর করে, শরীরের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, এবং শরীরের মৃত্যুতে আত্মারও ধ্বংস হয়। (২) এই শ্রেণীর জড়বাদী ফরাসী দার্শনিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ছিল Baron Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723—1789) প্রণীত Systeme de la Nature, etc.; তাহাতে স্পষ্টতঃ জড়বাদ ও নিরীশ্বরবাদের সমর্থন, এবং মানবাত্মার স্বাধীনতার মতের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (৩) দেবেন্দ্রনাথ যে ইংরেজ দার্শনিক John Locke (1632—1704) প্রণীত Essay concerning Human Understanding পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। ফটোগ্রাফের কাচপাত্রে প্রতিবিম্ব পতনের অনুরূপ একটি তুলনার দ্বারা মানবের ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যা Lockeই করিয়াছিলেন। "আমরা বিষয়-জ্ঞানের সহিত আপনাদিগকেও জানি", এই তত্ত্বের আভাসও Lockeএর পুস্তকে আছে। (৪) David Hume (1711—1776) প্রণীত Enquiry concerning Human Understanding নামক গ্রন্থও তিনি এই সময়ে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে এই গ্রন্থের বিশেষ সমাদর ছিল। (৫) আত্মজীবনীর চতুর্থ অধ্যায়ের 'প্রয়োজন বিজ্ঞানবান্ ঈশ্বরের' কথা পড়িয়া মনে হয় যে তিনি Systematic Materialismএর অন্যতম প্রবর্ত্তক Gassendiর (1592—1655) সহিত, এবং ইংরেজ বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক Sir Robert Boyle (1627—1691) রচিত Disquisition about the Final Causes of Natural Things নামক পুস্তকের সহিত পরিচিত ছিলেন।

(৬) কিন্তু এখনও তিনি Thomas Reid প্রমুখ Scottish দার্শনিক-গণের সহিত পরিচিত হন নাই। আত্মজীবনীর চতুর্থ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আলোক-লাভের পর, প্রথমে উপনিষদ্ হইতে, এবং কিছুকাল পরে এই Scottish দার্শনিকগণের রচনা হইতে, তিনি নিজ সিদ্ধান্ত সকলের সায় প্রাপ্ত হন। কিন্তু এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত সময়ে, য়ুরোপীয় দার্শনিক

গ্রন্থসকলের মধ্যে যে কয়খানি হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের দ্বারা পঠিত ও সমাদৃত হইত, কেবল তাহারই সহিত দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় হইয়াছিল; তাহাতেই তাঁহার মনের সংগ্রাম এত বাড়িয়া গিয়াছিল, এবং তিনি প্রকৃতিকে 'পিশাচী' বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

১১

দেবেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে রামমোহন রায়ের সহিত যোগ।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ নিজ বাল্যজীবনে তাঁহার উপরে যে রামমোহন রায়ের নিগূঢ় প্রভাব পতিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বিশেষ কিছুই লিখেন নাই। এক সময়ে তিনি কয়েকজন কুতূহলী জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রচিত রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে বিবৃত আছে।

রমাপ্রসাদ রায়ের সহিত রামমোহন রায়ের বাগানে যাওয়া এবং দোল্‌নায় দোল খাওয়ার কথা মহর্ষি বর্ণনা করাতে, উপস্থিত ভদ্রলোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তখন তাঁহার বয়স কত ছিল? মহর্ষি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তখন আমার বয়স আট কিম্বা নয় বৎসর হইবে।" সুতরাং ইহা আনুমানিক ১৮২৬ সালের ঘটনা[১]।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়ের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাধারণতঃ বন্ধুর পুত্রকে লোকে যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখে, তদপেক্ষা অনেক অধিক গভীর স্নেহের চক্ষে রামমোহন দেবেন্দ্রনাথকে দর্শন করিতেন। যখন ইচ্ছা, রামমোহন রায়ের কাছে যাইতে দেবেন্দ্রনাথের অকুণ্ঠিত অধিকার ছিল। সেই বাল্যবয়সেই দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহনের স্নান, আহার, বিশ্রাম, লোকের সঙ্গে আলাপ ও তর্ক করিবার প্রণালী, সকলই গভীর অনুরাগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রামমোহনের সস্নেহ ব্যবহার ও সুমিষ্ট মেজাজ বালক দেবেন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বয়ঃক্রমের এত অধিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এই দুইজনের মধ্যে এই নিগূঢ় আকর্ষণ, বিধাতার এক অপূর্ব্ব বিধান!

---

(১) কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ৩১৪ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। আমি তখন বালক ছিলাম, সুতরাং তাঁহার সহিত কথোপকথনের সুযোগ ছিল না। কিন্তু আমার উপরে তাঁহার মুখের এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, আমি আর কাহারও মুখ দেখিয়া কখনও সেইরূপ আকৃষ্ট হই নাই।…

আমি প্রায়ই রাজার গাড়ীতে রাজার সহিত যাইতাম। তখন রাজার সহিত আমার প্রায়ই কোনও কথাবার্ত্তা হইত না। আমি তাঁহার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সুন্দর মুখ দর্শন করিতাম। তাঁহার মুখের প্রতি আমি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম। রাজার সহিত গাড়ীতে বেড়াইবার সময় আমি প্রায়ই রাজার বিষয়ে চিন্তাতে মগ্ন থাকিতাম। রাস্তায় কি হইতেছে, সে বিষয়ে কিছু জানিতে পারিতাম না। আমি পুত্তলিকার ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কেবলই রাজাকে দেখিতাম। আমার হৃদয় এক প্রকার গভীর ও অবর্ণনীয় ভাবে পরিপ্লুত হইত। স্পষ্টই বুঝা যায় যে, রাজার সহিত আমার কোন নিগূঢ় সম্বন্ধ ছিল। আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হইতাম।…

তিনি আমাকে কখনও কথা কহিয়া উপদেশ দেন নাই। তখন আমি বড় ছোট ছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে উপদেশ লইবার সময় হয় নাই। তথাচ আমি তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, আমার উপরে তাঁহার এক নিগূঢ় প্রভাব ছিল। যে কার্য্যের জন্য তিনি পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, সেই কার্য্যের জন্য পরিশ্রম করিবার উৎসাহ আমি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি।

ইংলণ্ড গমন করিবার সময়ে, রাজা আমার পিতার নিকটে বিদায় লইতে আসিলেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এবং আমাদের অনেক প্রতিবেশী, রাজাকে দেখিবার জন্য আমাদের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে একত্র হইয়াছিলেন। আমি তখন সেখানে ছিলাম না। তখন আমি সামান্য বালক। তথাচ, রাজা আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার হস্তমর্দ্দন না করিয়া তিনি এ দেশ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমার পিতা আমাকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন রাজা আমার হস্তমর্দ্দন করিয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। রাজা যে সস্নেহে আমার

হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব ও অর্থ তখন আমি বুঝিতে পারি নাই। বয়স অধিক হইলে, উহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি।

যখন রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু-সংবাদ আসিল, তখন আমি আমার পিতার নিকটে ছিলাম। আমার পিতা বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আমারও অতিশয় শোক হইয়াছিল। যদিও রাজার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও তিনি আমাকে কোন উপদেশ দেন নাই, তথাচ তাঁহার মুখশ্রী এবং চরিত্র আমার হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহা দ্বারা আমি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।"—(নগেন্দ্র, ৭৩৪—৭৩৮)।

১২

রামমোহন রায়কে দুর্গাপূজায় নিমন্ত্রণ করিতে গমন।

দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন রায়কে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উত্তর, ও যে স্বরে তিনি সে উত্তর দিলেন সেই স্বর, সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল, এবং পরবর্ত্তী জীবনে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা ও কার্য্যকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "আমাদের বাটীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আমি একবার রাজাকে নিমন্ত্রণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি আমার পিতামহের প্রতিনিধিস্বরূপ গিয়াছিলাম। চলিত প্রণালী অনুসারে আমি রাজাকে বলিলাম, 'রামমণি ঠাকুরের বাড়ীতে আপনার দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রণ।' রাজা ব্যগ্রভাবে উত্তর করিলেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?'

সেই স্বর আমি যেন এখনও শুনিতেছি! তিনি আমার উপর বিরক্ত হন নাই; আমার প্রতি তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকিতেন। রাজা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে, তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এত প্রতিবাদ করিতেছেন, তথাচ লোকে তাঁহাকে দুর্গোৎসবে নিমন্ত্রণ:করিয়া থাকে! যাহা হউক, রাজা বুঝিলেন যে, ইহা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্র রাধাপ্রসাদের নিকট যাইতে বলিলেন। প্রচলিত পৌত্তলিকতায় রাধাপ্রসাদের কোন আপত্তি ছিল না। সুতরাং তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, এবং আমাকে কিছু মিষ্টান্ন ও ফল খাইতে দিলেন।…

তিনি কেমন বলিলেন, 'আমাকে পূজায় নিমন্ত্রণ?' তিনি যখন এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন, ভাবেতে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল। আমার জীবনে চিরকাল উহার আশ্চর্য্য প্রভাব রহিয়াছে। তাঁহার কথাগুলি আমার পক্ষে গুরুমন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। তাহা হইতেই আমি ক্রমে পৌত্তলিকতা ত্যাগ করিলাম। ঐ কথাগুলি এখনও যেন আমার কানে বাজিতেছে। আমার এই দীর্ঘ জীবনে ঐ কথাগুলি আমার নেতা স্বরূপ হইয়াছে।"—(নগেন্দ্র, ১৩২, ১৩৫)।

নিমন্ত্রণ করিবার সময় পরিবারের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জীবিত ব্যক্তির নামে তাহা করিতে হয়। রামলোচন ঠাকুর ১৮০৭ সালেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। এইজন্য এই নিমন্ত্রণ রামমণি ঠাকুরের নামে করা হইল। পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে দ্বারকানাথ রামলোচন ঠাকুরের পোষ্যপুত্র ও রামমণি ঠাকুরের ঔরস পুত্র ছিলেন।

১৩

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ধর্ম্মবিশ্বাস।

দ্বারকানাথ যে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি যে ভক্তিসহকারে হোম, তর্পণ, জপ, ও বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার পূজা করিতেন, এবং প্রথম অবস্থায় তিনি যে আহারাদি বিষয়ে হিন্দু আচারে নিষ্ঠাবান্ ছিলেন, এ সকল কথা পূর্ব্বেই (৩০৫—৩১১ পৃঃ) উল্লিখিত হইয়াছে। নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব পরিবারের সমুদয় সদাচার তাঁহার বাড়ীতে পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইত।

দ্বারকানাথ রামমোহন রায় কর্তৃক প্রচারিত একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেন বটে; কিন্তু তিনি স্বীয় পরিবারে প্রচলিত পূজাদি কখনও তুলিয়া দেন নাই, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত সে সকল পূজা নিজেও পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার বাটীর জগদ্ধাত্রী

ও সরস্বতী প্রতিমা কলিকাতায় বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। শেষ জীবনে তিনি নিষ্ঠার সহিত গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেন, এরূপ শ্রুত হওয়া যায়।

দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, (নগেন্দ্র, ৭৩১, ৭৩২), "রাজা মধ্যে মধ্যে আমাদের বাটীতে আসিতেন। আমার পিতা রাজাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি অল্প বয়সে দেশের প্রচলিত ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; কিন্তু রাজার সহিত আলাপ পরিচয় হওয়াতে প্রচলিত ধর্ম্মে তাঁহার অবিশ্বাস হইয়াছিল। কিন্তু রাজা যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি কখনই তাহা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। যখন রাজার সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল, তখন আমার পিতা প্রতিদিন প্রাতঃকালে পুষ্পাদি উপকরণ লইয়া দেবতার পূজা করিতেন। তিনি প্রকৃত ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, কিন্তু পূজা অপেক্ষাও রাজার প্রতি তাঁহার ভক্তি অধিক হইয়াছিল। কখনও কখনও এমন হইত যে, তিনি পূজায় বসিয়াছেন, এমন সময়ে রাজা তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। রাজা আমাদের গলিতে প্রবেশ করিবামাত্র আমার পিতার নিকটে সংবাদ যাইত যে তিনি আসিতেছেন। আমার পিতা তৎক্ষণাৎ পূজা হইতে উঠিয়া রাজাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিতেন। রাজার বন্ধুদিগের উপরে তাঁহার এই প্রকার প্রভাব ছিল।"

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মনে করেন, রামমোহন রায় আসিলে দ্বারকানাথ পূজা ছাড়িয়া নয়, কিন্তু পূজান্তে জপের সময় জপ ছাড়িয়া উঠিতেন; কারণ জপ পরেও সম্পূর্ণ করা যায়। (তত্ত্ববো. ১৮৩৭ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

যেখানে এই জপ সমাপনের ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, সেখানে দ্বারকানাথ জপ ছাড়িয়াও উঠিতেন না। বিলাতে এমন ঘটিয়াছে যে Duchess of Sutherland দ্বারকানাথের বাড়ীতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তথাপি দ্বারকানাথ জপ শেষ না করিয়া উঠিলেন না। (৩০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দ্বারকানাথ যখন প্রচলিত পূজা পরিত্যাগ করেন নাই, তখনও তিনি রামমোহন রায়ের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় সর্ব্বদা গমন করিতেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন. (নগেন্দ্র, ৭৩৬, ৭৩৭), "যদিও রাজা সমাজে

পদব্রজে যাইতেন, কিন্তু তিনি কখনও ধুতি চাদর পরিয়া যাইতেন না। সমাজে যাইবার সময়ে পোষাক পরিয়া যাইতেন। ... রাজার এই এক মনের ভাব ছিল যে, পরমেশ্বর মানুষের রাজা ও প্রভু। তাঁহার দরবারে যাইবার সময়ে উপযুক্ত রূপ পোষাক পরিয়া যাওয়া উচিত। রাজরাজেশ্বরের দরবারে, তাঁহার সম্মুখে, উপস্থিত হইতে হইলে উপযুক্ত ভাবে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য। ... রাজার সকল বন্ধুগণ তাঁহার ন্যায় পোষাক পরিয়া সমাজে যাইতেন। আমার পিতা এ নিয়মের ব্যতিক্রম স্থল ছিলেন। তিনি সমাজে ধুতি চাদর পরিধান করিয়া গমন করিতেন। রাজা ইহা পছন্দ করিতেন না। ... কিন্তু আমার পিতা সর্ব্বদাই এই উত্তর দিতেন যে, সমস্ত দিন আপিসের পোষাকে থাকিয়া আবার সন্ধ্যার সময়ে পোষাক পরিধান করিবার কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে পারি না। বিশেষতঃ পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আসিলে, অতি সামান্য পরিচ্ছদেই আসা উচিত।”

১৪

দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়-সম্পত্তি, ও তাঁহার ব্যবসায়ের পতন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনকাহিনীর সহিত সংস্পৃষ্ট বলিয়া এ বিষয়টির আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। পাঠক দেখিতে পাইবেন যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্মজীবনী লিপিবদ্ধ করাইবার সময়ে সকল ঘটনা যথাযথভাবে স্মরণ করিতে পারেন নাই। ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বহু বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা স্মৃতি হইতে বর্ণনা করিতে গিয়া সকলেরই কিছু কিছু ভুল ভ্রান্তি হইয়া যায়। তদুপরি মনে রাখিতে হইবে যে, ১৮ বৎসর বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৩১।৩২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথের মন ধর্ম্ম লইয়া একেবারে উন্মত্ত ছিল। এই সময়ে বিষয়সম্পত্তির দিকে মন দিতে, এবং ব্যবসাবাণিজ্যের কথা শুনিতে কিংবা ভাবিতে, তাঁহার একেবারেই ভাল লাগিত না। পিতার মৃত্যুর কিছু কাল পরে যখন পিতার ব্যবসায়টির পতন হইল, তখনও তিনি ‘যাক্, যাক্, যাক্,’ বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র বিষয়ের জঞ্জাল হইতে মুক্ত হইতেই ব্যস্ত ছিলেন। মানুষ যে বস্তুকে মন-প্রাণ দিয়া ধরে না,

তৎসম্বন্ধে তাহার স্মৃতিও অস্পষ্ট হইয়া যায়। এই কারণে বিষয়-ঘটিত ব্যাপারের বর্ণনা করিতে গিয়া স্থানে স্থানে মহর্ষির ভুল হইয়া গিয়াছে।

দ্বারকানাথের দুইখানি দলিলের ও কয়েকটি মোকদ্দমার বিবরণ, এবং ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রের নানা উল্লেখ,—এই সকল হইতেই এখন এ বিষয়ের যাহা কিছু তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায়। এই সকলের সহিত দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর কোন কোন উক্তির অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। আত্মজীবনীর এই পরিশিষ্টে উভয়ের তুলনা করিয়া দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। আমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৪৮ শকের (১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের) কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি" নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন।

দ্বারকানাথের চাকরী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও দেবেন্দ্রনাথকে ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিয়োগ।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর চব্বিশ পরগণার কালেক্টার ও নিমক মহালের অধ্যক্ষ (Salt Agent) Mr. Plowdenএর দেওয়ান নিযুক্ত হন। সে সময়ে কলিকাতায় Bengal Bank ভিন্ন Commercial Bank ও Calcutta Bank নামে আরও দুই ব্যাঙ্ক ছিল। Commercial Bankএর পরিচালকমণ্ডলীর নাম ছিল Mackintosh & Co.; এই কোম্পানীর প্রধান দুই অংশীদার J. G. Gordon এবং James Calder দ্বারকানাথের পাঠ্যাবস্থা হইতে তাঁহার সহিত বন্ধুতায় আবদ্ধ ছিলেন। দ্বারকানাথের সাংসারিক অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা দর্শনে ইঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ১৮২৮ সালে তাঁহাকে ঐ কোম্পানীর অংশীদার করিয়া লইলেন। ইহাতে দ্বারকানাথ Commercial Bankএরও একজন Director হইলেন। ১৮২৯ সালে দ্বারকানাথের সরকারী চাকরীতে আরও পদোন্নতি হইল; তিনি Customs Salt, and Opium Boardএর দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন।

তৎকালীন অর্দ্ধ-সরকারী Bengal Bankএর সনন্দ (charter) এমন সকল কঠিন সর্ত্তে আবদ্ধ ছিল যে, ঐ ব্যাঙ্ক ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যার্থ

টাকা ধার দিতে পারিত না। এই কারণে কৃষি ও বাণিজ্যের সুবিধার জন্য দ্বারকানাথের বিশেষ সহায়তায় ১লা আগষ্ট ১৮২৯ তারিখে Union Bank নামে নূতন একটি ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান বলিয়া দ্বারকানাথ প্রথম প্রথম প্রকাশ্যভাবে এই ব্যাঙ্কে যোগ দিতে পারেন নাই, এবং সেই কারণে তাঁহার পক্ষ হইতে তাঁহার ভ্রাতা রমানাথকে আলিপুরের সেরেস্তাদারের আফিস হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া ব্যাঙ্কের Treasurer নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে যোগ না দিলেও দ্বারকানাথ প্রথম হইতেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রাণস্বরূপ ছিলেন।

১৮৩৩ সালে ম্যাকিণ্টশ কোং (এবং তৎসহ কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্ক) ফেল হইল। তাহার অংশীদারগণের মধ্যে একমাত্র দ্বারকানাথেরই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল; তাঁহার উপরেই কমার্শিয়াল্ ব্যাঙ্কের সমুদয় দায় শোধের গুরু ভার পড়িয়া গেল।

এদিকে অল্পকালের মধ্যেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক কলিকাতার ব্যবসায়ীগণের প্রধান সহায় হইয়া উঠিল। যত দিন দ্বারকানাথ এই ব্যাঙ্কের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাহার মধ্যে ইহাকে অর্থসঙ্কট ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছিল।

সতেরো বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ পিতা কর্তৃক এই ব্যাঙ্কের কার্য্যে নিযুক্ত হন (৩১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। দেবেন্দ্রনাথ কতদিন এই ব্যাঙ্কে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। "ব্যাঙ্কে তাঁহাকে প্রতিদিন কেরাণীর কাজ করিতে হইত, তহবিল মিলাইতে হইত, হিসাব রাখিতে হইত। হিসাবের কাজে তিনি এমনি পাকা হইয়া গিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধ বয়সেও কানে শুনিয়াও তিনি সমস্ত হিসাব বুঝিতে পারিতেন।" (অজিত, ৮২)।

কার ঠাকুর কোম্পানী।

১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে দ্বারকানাথ আরও স্বাধীনভাবে ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার সরকারী চাকরীটি (Customs, Salt and Opium Boardএর দেওয়ানী) পরিত্যাগ করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই কার ঠাকুর কোম্পানী (Carr, Tagore & Co.) নামক হৌস স্থাপন করিলেন।

"কলিকাতা নগরীতে য়ুরোপীয় আদর্শে ব্যবসায়ের কুঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে বিলাতের সহিত বাণিজ্য করিবার দৃষ্টান্ত দেশীয়দিগের মধ্যে ইহাই প্রথম।

দ্বারকানাথ, মিঃ উইলিয়ম্ কার, ও মিঃ উইলিয়ম্ প্রিন্সেপ, এই তিন জন কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রথম অংশীদার ছিলেন। পরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মেজর্ হেণ্ডার্সন্, মিঃ প্লাউডেন্, ডাঃ ম্যাক্‌ফার্সন, কাপ্তান টেলার্, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইহার অংশীদার করিয়া লওয়া হয়। মিঃ ডি এম্ গর্ডন ও বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইহার কর্ম্মচারী ছিলেন। ডি এম গর্ডন ইহার কর্ম্মেই নিযুক্ত রহিলেন ও ক্রমশঃ ইহার অংশীদারের পদবীতে উন্নীত হইলেন; প্রসন্নকুমার ঠাকুর ক্রমে এই কোম্পানীর সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া তৎকালীন সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিলেন।

দ্বারকানাথই কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রাণ ছিলেন। ইহার কাজকর্ম্ম তিনিই পরিচালন করিতেন, এবং টাকাও তিনিই যোগাইতেন। সুতরাং ইহার আর্থিক ব্যাপারে তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন; অন্য কোনও অংশীদারকে আর্থিক বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। দ্বারকানাথের নিজের অর্থবল, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার যোগ, এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও কুঠীতে তাঁহার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে অগাধ বিশ্বাস, —এই সকলের ফলে, এই কারবারে যখন যত টাকার দরকার হইত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইতে পারিতেন।"—(Mem. 10—16, সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

দ্বারকানাথের ট্রষ্টডীড্।

তখনও যৌথ কারবারের জন্য "লিমিটেড্ কোম্পানী"র আইন হয় নাই। কোনও কারবার ফেল হইলে, লিকুইডেটরগণ আপন আপন খেয়াল-মত', যে অংশীদারকে যত অধিক ধনী বলিয়া মনে করিতেন, তাহার উপরে তত অধিক পরিমাণে ক্ষতিপূরণের ভার নিক্ষেপ করিতেন। এই কারণেই

গিরীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিলেন, (আত্মজীবনী, ১২৯, ১৩০ পৃষ্ঠা), "সাহেবদের তো কোন বিষয় বিভব পৃথক সম্পত্তি নাই। যদি কখন বাণিজ্যের পতন হয়, তবে মহাজনেরা আমাদিগকেই আসিয়া ধরিবে, আমাদেরই বিষয় আটক পড়িবে, আমাদিগকেই সকল টাকা বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেনার দায়ে আমাদেরই বিষয় বিক্রয় হইয়া যাইবে। লাভের সময় এখন তাহারা ভাগী, কিন্তু ক্ষতির দায়ে তাহাদের কোন ক্ষতি হইবে না। লাভ খাইয়া তাহারা চলিয়া যাইবে, ক্ষতি গণনা করিয়া কেবল আমরাই যথাসর্ব্বস্ব দিতে থাকিব।"

পাঠক পূর্ব্বেই ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন ; কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ফেল হইলে তাহার সব দেনা দ্বারকানাথের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছিল। যদিও এই ক্ষতি তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হয় নাই, এবং যদিও কার ঠাকুর কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার সময়ে তিনি কলিকাতার একজন প্রধান ধনী ব্যক্তি ছিলেন, তথাপি এই পূর্ব্বতন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে এখন সাবধান হইতে হইল যে, যদি কোন দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অথবা কার ঠাকুর কোম্পানী ফেল হয়, তবে যেন আবার ঐরূপ ঘটিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব না নষ্ট হয়। কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের তুলনায় ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের এবং কার ঠাকুর কোম্পানীর মূলধন অনেক বেশী ছিল, সুতরাং তাহাতে দ্বারকানাথের আর্থিক দায়িত্বও অনেক অধিক ছিল। এই কারণেই তিনি ১৮৪০ সালের ২০শে আগষ্ট তারিখে একটী Deed of Settlement সম্পাদন করেন, এবং তদ্দ্বারা নিজের কতকগুলি সম্পত্তির উপরে ট্রষ্টী নিযুক্ত করিয়া তাহা রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই দ্বারকানাথের 'ট্রষ্টডীড্'।

দ্বারকানাথ নিজের ৮টি পরগণা (অর্থাৎ অধিকাংশ সম্পত্তি) এই ট্রষ্টডীড্ ভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (১২৮ পৃঃ) এই সম্পত্তির সংখ্যা 'চারিটি' বলিয়া কেন লিখিয়াছেন, তাহা এখন আর বুঝিতে পারা যাইতেছে না।

দ্বারকানাথের ন্যায়, বাণিজ্য এবং জমিদারী, এই দ্বিবিধ কার্য্যে লিপ্ত হওয়াতে সেই যুগে কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত বংশের অতি দ্রুত উত্থান ও পতন সংঘটিত হইতেছিল। এই জন্য তৎকালীন ধনীদিগের মধ্যে Deed of

Settlement অথবা Willএর দ্বারা পুত্রগণকে কেবল জীবন-স্বত্ব (life-interest) এবং পৌত্রগণকে সম্পূর্ণ নির্ব্যূঢ় স্বত্ব (absolute proprietorship) প্রদান করা, একটি প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, গোপাললাল ঠাকুর, প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারকানাথ গুপ্ত (ডি গুপ্ত), প্রভৃতি অনেকেই এইরূপ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা বিষয়-সম্পত্তি অন্ততঃ দুই পুরুষের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত রক্ষা পাইবে, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

এই ব্যবস্থা হেতু, যখন গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ একা সমগ্র পরিবারের কর্ত্তা ও অভিভাবক হইলেন, তখনও (তিনি কেবল জীবনস্বত্ব-ভাগী বলিয়া) সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অধিকার জন্মিল না। বহুকাল পরে সমুদয় উত্তরাধিকারীগণ একত্র হইয়া কোর্টের সাহায্যে দেবেন্দ্রনাথকে এই অধিকার দান করেন; তখন এই অধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় উইলের দ্বারা সম্পত্তির ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হন।

সাধারণতঃ পত্নীবিয়োগের পরে, অথবা যখন আর সন্তানাদি জন্মিয়া সম্পত্তির অংশীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই এমন সময়ে, এইরূপ Deed of Settlementএর ব্যবস্থা করা হইত। দ্বারকানাথের পত্নী-বিয়োগের তারিখ এখন আর জানিতে পারা যাইতেছে না; কিন্তু খুব সম্ভবতঃ দ্বারকানাথ পত্নী-বিয়োগের পরেই এই Deed সম্পাদন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (১২৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন, "তাঁহার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তিনি [দ্বারকানাথ] বুঝিয়াছিলেন যে, ভবিষ্যতে এই সকল বৃহৎ কার্য্যের ভার আমাদের [পুত্রগণের] হাতে পড়িলে আমরা তাহা রক্ষা করিতে পারিব না।" দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি আত্মাবমাননা-প্রসূত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। পুত্রগণ সুদক্ষ হইলেও ট্রষ্টডীড্ সম্পাদনের প্রয়োজন বিদ্যমান থাকিত; এবং গিরীন্দ্রনাথ বিষয় সম্পত্তি পরিচালনে অতি সুদক্ষই ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ সেরূপ না হইলেও, পিতার এত অধিক অনাস্থাভাজন ছিলেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ, দেখা যায় যে

দ্বারকানাথ নিজ উইলে দেবেন্দ্রনাথকে একজন এগ্‌জিকিউটার নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততা ও বহুব্যয়শীলতা।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথকে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত। ইহাকে রক্ষা করিতে গিয়া যে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, দ্বারকানাথ আইনঘটিত বিধি-ব্যবস্থায় এবং ব্যবসায় পরিচালনে যেরূপ সতর্কতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় প্রদান করিতেন, কেহ ব্যক্তিগত দুঃখ নিবেদন করিতে আসিলে তাহাকে অর্থ দান করিবার সময়ে সে সতর্কতা ও বিচক্ষণতা রক্ষা করিতে পারিতেন না। সহৃদয়তা ও প্রতিপত্তি রক্ষার আকাঙ্ক্ষা, এই দুই মিলিয়া তাঁহাকে অতিরিক্ত মাত্রায় মুক্তহস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। শুধু তাঁহার স্বদেশীয়গণই যে তাঁহার দান গ্রহণ করিতেন তাহা নহে। "অনেক সাহেব টাকা শোধ করিতে না পারিলে দ্বারকানাথের দয়া ভিক্ষা করিতেন, এবং দ্বারকানাথ নিজে সেই দেনা শোধ দিতেন। ইহাতে যেমন আর্থিক ক্ষতি হইত, তেমনি প্রতিপত্তি লাভ হইত। সরকারী কর্ম্মচারী সকলেই এজন্য এক প্রকার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং সকল প্রকার কার্য্যেই তাঁহার সাহায্য করিতেন।" (ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩৩২)।

দ্বারকানাথের মুক্তহস্ততার কাহিনী প্রায় আরব্যোপন্যাসের গল্পের মত। কৌতূহলী পাঠক 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তকের ব্রাহ্মণকাণ্ডের ৬।৩৩৪—৩৪৯ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। ১৮৩৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে [১] দ্বারকানাথ District Charitable Societyতে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন ; এই দানের পরিমাণ সে সময়ে সকলকে চমকিত করিয়াছিল। স্বীয় উইলেও তিনি এক লক্ষ টাকা দরিদ্রদিগের সাহায্যার্থে দান করিবার ব্যবস্থা করেন। এই বদান্যতা ব্যতীত তাঁহার পদোচিত সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্যও তাঁহাকে বহু ব্যয়শীল হইতে হইত। তাঁহার বেলগাছিয়া ভিলার ভোজের ব্যয় ও বিলাতের ব্যয়ের কথা সর্ব্বজনবিদিত।

---

(১) *Bengal Almanac*, 1847 পুস্তকের 'Chronological Events' নামক অংশে এই তারিখ উল্লিখিত আছে।

দ্বারকানাথের উইল।

১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে দ্বারকানাথ উইল করেন। পূর্ব্বোক্ত Deed of Settlement এই উইলে স্বীকৃত ও দৃঢ়ীকৃত হয়; এবং ঐ Deedএর অতিরিক্ত যে-যে সম্পত্তি দ্বারকানাথের মৃত্যুকালে থাকিবে, এই উইলে তাহার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করা হয়। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ১২৮, ১২৯ পৃষ্ঠায় এই উইলের ব্যবস্থার বিবরণ দিয়াছেন।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন।

কার ঠাকুর কোম্পানীর বাণিজ্য যতই বহুমুখীন হইয়া প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই ইহার ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের আর্থিক দায়িত্বের পরিমাণ অধিক অধিক বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, কার ঠাকুর কোম্পানী, এবং দ্বারকানাথের বিষয়সম্পত্তি, এই তিনটির জীবন-মরণ প্রায় পরস্পর-সাপেক্ষ হইয়া পড়িল। দাঁড়াইলে তিনটিই দাঁড়াইবে, পড়িলে তিনটিই একসঙ্গে পড়িবে। যখন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর অবস্থা এইরূপ, সেই সময়ে ইংলণ্ডে অবস্থিতি হেতু দ্বারকানাথের নিজের ব্যয় অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল।

এদিকে আবার এই সময়েই বাণিজ্যজগতের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ১৮৪০ সালের কাছাকাছি হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেকগুলি ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় ফেল হইল। যতদিন দ্বারকানাথ জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বাণিজ্যজগতের এই সকল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত-প্রসূত বিপদ, এবং নিজ মুক্তহস্ততা-প্রসূত বিপদ, এই উভয় বিপদ অতিক্রম করিয়া, অসাধারণ বুদ্ধিবলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীকে দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আর এই দুইটি অধিক দিন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না।

১৮৪৬ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে উক্ত উভয় ব্যবসায়ের প্রধান স্তম্ভটি যেন খসিয়া পড়িল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসরের মধ্যে, ১৮৪৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন ঘটিল।

তখন রমানাথ ঠাকুর ইহার অন্যতম লিকুইডেটর নিযুক্ত হইলেন। এই ব্যাঙ্কের জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের এষ্টেট্ অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; তাহা হইতে, দ্বারকানাথের ক্রীত শেয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী, ঋণের হারাহারি অংশ মাত্র শোধ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্যাঙ্কের সমগ্র ঋণ শোধ না হওয়াতে কলিকাতার অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ঘর ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হন। তৎকালীন সংবাদপত্র সকলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সম্প্রদায় অতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সম্পাদকীয় উক্তিতে এই ব্যাঙ্কের পতন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর কার ঠাকুর কোম্পানীর ইতিহাস।

দ্বারকানাথ নিজ উইলে কার ঠাকুর কোম্পানীর বিষয়ে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর ১২৮, ১২৯ পৃষ্ঠায় সে সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—"আমাদের কার ঠাকুর কোম্পানি নামে যে বাণিজ্যব্যবসায় ছিল, তাহার অর্দ্ধেক অংশ আমার পিতার, আর অর্দ্ধেক অংশের অংশী অন্য অন্য ইংরাজ সাহেবেরা ছিলেন। ইহার মধ্যে এক আনা অংশ আমার ছিল। আমার পিতা, এই ব্যবসায়ে তাঁহার যে অর্দ্ধাংশ ছিল, তাহা কেবল একা আমাকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু সে অর্দ্ধাংশ আমি কেবল আপনার জন্য রাখিলাম না; আমরা তিন ভাইয়ে তাহা সমান ভাগ করিয়া লইলাম।" তৎপরে বর্ণিত হইয়াছে যে দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথের সহিত এই কোম্পানী পরিচালন বিষয়ে পরামর্শ করেন। এই পরামর্শ ১৮৪৬ সালের শেষ ভাগে হইয়া থাকিবে; কারণ, *Englishman* পত্রিকায় (বিজ্ঞাপনে) দেখিতে পাওয়া যায় যে ১৮৪৭ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে গিরীন্দ্রনাথ অংশীদার হইলেন।

কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে অংশীদাররূপে গ্রহণ করিবার কোনও বিজ্ঞাপন বা উল্লেখ সংবাদপত্রে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। যখন কার ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া যাইতেছে, লিকুইডেশনের ব্যবস্থা হইতেছে, কোম্পানীর নাম পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখনও সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে অংশীদার রূপে কেবল দেবেন্দ্রনাথ ও গিরীন্দ্রনাথেরই নাম দেখা যায়।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (১৪৬ পৃষ্ঠা) কার ঠাকুর কোম্পানীর পতনের যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন (১৭৬৯ শকের ফাল্গুন = ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী-মার্চ্চ), এবং পতন সময়ে তাহার দেনা-পাওনার যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাও সমসাময়িক পত্রিকায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ও হিসাবের সহিত মিলিতেছে না।

Calcutta Gazette পত্রিকার ১৮৪৮ সালের ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যার ৭১ পৃষ্ঠায় এই বিজ্ঞাপন দেখিতে পাওয়া যায় যে ১২ই জানুয়ারী তারিখে কার ঠাকুর কোম্পানী উঠিয়া গেল। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে আত্ম-জীবনীর ১৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ত্রিশ হাজার টাকার হুণ্ডী ফিরাইয়া দেওয়া ও দরোজা বন্ধ করার ব্যাপারটি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের (২৭শে ডিসেম্বর ১৮৪৭) অব্যবহিত পরেই ঘটিয়া থাকিবে।

১৮৪৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল কার ঠাকুর কোম্পানীর পাওনাদারদের একটি সভা হয়। ৫ই এপ্রিল তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। ১২ই জানুয়ারী ও ৪ঠা এপ্রিলের মধ্যবর্ত্তী অন্য কোনও তারিখে এই কোম্পানীর আর কোনও সভার উল্লেখ সংবাদপত্রে নাই।

ঐ সভায় কার ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে কোম্পানীর মোট দেনা ২৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ছিল; এবং কোম্পানীর সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইলে ও সমুদয় অনাদায়ী টাকা আদায় হইলে যত টাকা হাতে আসিত, তাহার (অর্থাৎ মোট assetsএর) পরিমাণ ছিল ২৯ লক্ষ ২ হাজার ৯৫০ টাকা। তাহার দ্বারা দেনা শোধ করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু যে-কোনও একজন পাওনাদারের দাবী উপস্থিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহা মিটাইতে না পারিলেই হৌসের অথবা ব্যাঙ্কের পতন হয়। এ ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথ মোট দেনা 'এক কোটি টাকা' ও মোট পাওনা 'সত্তর লক্ষ টাকা' বলিয়া লিখিয়াছেন; তাহা এই হিসাবের সহিত মিলিতেছে না। ইহার কারণ কি? এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথের বর্ণিত সভা *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় বর্ণিত সভার পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং সেই প্রথম সভাতে দ্বারকানাথের ব্যক্তিগত দেনা পাওনা ও হৌসের

দেনা-পাওনা, দুইয়েরই হিসাব একত্র করা হইয়াছিল। মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ বিস্তর ব্যক্তিগত ঋণও রাখিয়া গিয়াছিলেন (৩৪০ পৃঃ)।

দেবেন্দ্রনাথের বর্ণনাতে দেখা যায়, ঐ সভাতে প্রথমতঃ গর্ডন সাহেব জানাইলেন যে, ট্রষ্টডীড্ দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তিসকল ঋণশোধার্থে দেওয়া হইবে না; তৎপরে দেবেন্দ্রনাথ তাহাও ঋণের জন্য দিতে সাগ্রহে স্বীকৃত হইলেন; এবং সভাভঙ্গের সময়ে সকলে এই ধারণা লইয়া চলিয়া গেলেন যে ঐ ট্রষ্টসম্পত্তিও ঋণশোধে যাইবে।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে নাই। ঐ সভাতে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় মহত্ত্বগুণে ঐরূপ প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু আর সকলে তখনই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে দেবেন্দ্রনাথের (কিংবা কাহারোই) Deed of Settlementএর দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির উপরে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার নাই। *Bengal Hurkaru* পত্রিকার সভার বিবরণে দেখা যায়, পাওনাদারগণ বিনা আপত্তিতে এই ব্যবস্থা মানিয়া লইতেছেন যে ঐ সকল সম্পত্তি দ্বারকানাথের পুত্রগণেরই থাকিবে; বরং তদুপরি তাঁহারা দ্বারকানাথের পুত্রগণকে যোড়াসাঁকোর পৈতৃক বসতবাটীখানিও রাখিতে অনুমতি দিতেছেন।

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, আত্মজীবনীতে উল্লিখিত সভা ও *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় বর্ণিত সভা এক নহে; আত্মজীবনী-বর্ণিত সভা আগে হইয়াছিল; এবং তাহা কতকটা ঘরোয়া ভাবে ও পরামর্শসভার ভাবেই করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন বিষয়ের আইনসঙ্গত চরম মীমাংসা হয় নাই।

অথচ আত্মজীবনীর ১৪৮ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ এমন সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা বিধিমতে আহূত ও অধিকারপ্রাপ্ত সভার (formal meetingএর) নির্দ্ধারণের সূচনা করে; যথা,—ভরণপোষণের জন্য পঁচিশ হাজার টাকার অনুমোদন, বিষয়পরিচালনের জন্য কমিটি নিয়োগ, কোম্পানীর লিকুইডেশনের ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিতে একাধিক সভার ঘটনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালের ১২ই জানুয়ারীর সন্নিহিত কোনও তারিখে আহূত একটি সভার, এবং মার্চ-এপ্রিল মাসের দুইটি সভার ঘটনা আত্মজীবনীর উনবিংশ পরিচ্ছদের আরম্ভের বিবরণে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পতিত ঋণভার।

ব্যবসায়ের পতনের পর দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে পিতৃকৃত ব্যক্তিগত ঋণ, হৌসের ঋণ, ও পিতার উইলে প্রতিশ্রুত দানের ঋণ, এই সকলের গুরুভার আসিয়া পড়িল। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'-প্রণেতা লিখিতেছেন, "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্য্য পরিচালনার্থ দ্বারকানাথের বিস্তর ঋণ হয়। দ্বারকানাথকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তখনকার কলিকাতার প্রভূত ধনশালী ৺রামদুলাল সরকারের বংশধরেরা, রাজা সুখময়ের বংশধরেরা, বীরনৃসিংহ মল্লিকের বংশধরেরা, ৺জয়রাম মিত্র, রাজচন্দ্র দাস (মাড়), রাণী কাত্যায়নী (পাইকপাড়া) প্রভৃতি, এবং কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ, বর্দ্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র প্রভৃতি ব্যক্তি, অনেক সময় বিস্তর টাকা বিনা লেখাপড়াতেই কর্জ্জ দিতেন। বিলাতে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় এই সকল ব্যক্তির অনেকের নিকট অনেক টাকা দেনা পড়িয়া যায়, এবং দেবেন্দ্রনাথ গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ পিতার বিপুল বিত্ত প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই বিপুল ঋণভারেরও উত্তরাধিকারী হন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পর তাঁহারা অধিকাংশ বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিপুল পিতৃঋণ পরিশোধ করেন।"— (ব. জা. ই. ব্রা. ৬।৩৫৫)।

এই 'অধিকাংশ বিষয়সম্পত্তি' বলিতে ট্রষ্ট্‌ডীড্ দ্বারা রক্ষিত সম্পত্তির বহির্ভূত অন্যান্য সম্পত্তি বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথ ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া দিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন, কিন্তু আইনতঃ সেরূপ করা অসম্ভব ছিল বলিয়া তাহা ঘটে নাই।

১৫

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগের এই দুই জন বিশ্বস্ত সেবকের কিঞ্চিৎ বিবরণ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৮৩৭ শকের অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন সংখ্যা) হইতে সংগৃহীত হইল।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ।

গঙ্গাতীরে মালপাড়া গ্রামে ১৭০৭ শকের ২৯শে মাঘ বুধবার (১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী) রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ। লক্ষ্মীনারায়ণের চারি পুত্র,—নন্দকুমার, রামধন, রামপ্রসাদ, এবং রামচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ নন্দকুমার অবধূতাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী নাম গ্রহণ করেন। তদবধি নানা তীর্থে পর্য্যটন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়াছিল। রামচন্দ্রও দেশে ব্যাকরণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া কাশী প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। তদনন্তর পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি শান্তিপুরের রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতির নিকটে স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন।

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী দেশপর্য্যটন সূত্রে রঙ্গপুরে উপস্থিত হইয়া রামমোহন রায়ের সহিত পরিচিত হন। রামমোহন রায় তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চায় ও উদারতায় মুগ্ধ হন, এবং তীর্থস্বামীও রামমোহন রায়ের প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ইহার পর তীর্থস্বামী কাশীবাসী হন।

কিছুকাল পরে রামমোহন রায় কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাস করিতে আসিলেন। তাঁহার সহিত বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রথম সাক্ষাৎ বিষয়ে একটি কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। বিদ্যাবাগীশ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগান হইতে প্রতিদিন পূজার ফুল আহরণ করিতেন। একদিন তিনি দ্বারকানাথকে বাগানে পুষ্পের অল্পতার কথা জানাইলে, দ্বারকানাথ তাঁহাকে রামমোহন রায়ের বাগানে যাইতে বলেন। রামমোহন রায় ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া, বিদ্যাবাগীশ তাঁহার বাগানে যাইতে প্রথমতঃ একান্ত অসম্মত ছিলেন। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশেষ অনুরোধে তিনি তথায় গমন করেন। সে বাগানের একটি বিশেষ স্থানের ফুল তোলা নিষিদ্ধ ছিল। বিদ্যাবাগীশ সেই ফুল তুলিতে গিয়া প্রহরী কর্ত্তৃক নিবারিত হওয়ায় ক্রোধান্ধ হইয়া রামমোহন রায়ের উদ্দেশে কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় সকলই দেখিতেছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, ঠাকুর, এত উষ্ণ হইয়াছেন? আর, বলুন দেখি, কিসে আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম?" উভয়ের মধ্যে ঘোর তর্ক চলিল। উভয়েই অনাহারে থাকিয়া দিবসের অধিকাংশ সময়

তর্কে কাটাইলেন। অবশেষে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তর্কে পরাস্ত হইয়া, ফুলের সাজি ফেলিয়া দিয়া, গুরুসম্বোধনে রামমোহন রায়ের পদতলে পতিত হইলেন। রামমোহন রায় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, মহাসমাদরে বিদ্যাবাগীশের হস্ত ধারণপূর্ব্বক একত্র ভোজন করিতে গেলেন।

এক বার রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বিষয়-ঘটিত এমন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইল, যাহা আদালতের সাহায্যে মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর সাক্ষ্যের প্রয়োজন হয়। রামমোহন রায়ের পরামর্শে তীর্থস্বামীকে মোকদ্দমার সাক্ষী করিয়া কলিকাতায় আসিতে বাধ্য করা হইল। রামমোহন রায়ের বহুদিনাবধি ইচ্ছা ছিল যে, তিনি পুনরায় কিছুকাল হরিহরানন্দের সহিত একত্র ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিবার জন্য তীর্থস্বামীকে কাশীর ঠিকানায় বার বার পত্র লিখিয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। এখন তীর্থস্বামী আদালতের আহ্বানে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইয়া, রামমোহন রায়ের উপর অতিশয় ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় বিনীতভাবে গলবস্ত্রে তীর্থস্বামীর পদতলে পতিত হইয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন। তীর্থস্বামী রামমোহন রায়ের মাণিকতলাস্থ ভবনেই বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে তীর্থস্বামীর অনুরোধে রামমোহন রায় রামচন্দ্রকে নানা প্রকারে সাহায্য করেন। বিদ্যাবাগীশ তখনও বেদান্ত অধ্যয়ন করেন নাই; তাই রামমোহন রায় নিজের পণ্ডিত শিবপ্রসাদ মিশ্রের নিকটে তাঁহার উপনিষদ্ ও বেদান্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবার পর রামমোহন রায়ের সাহায্যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় হেদুয়ার দক্ষিণ দিকে এক চতুষ্পাঠী খুলিয়া কয়েক জন ছাত্রকে বেদান্ত শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত হইলে, তিনি সেই সভায় উপনিষদ্ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন।

বোধ হয় এই সময়েই বিদ্যাবাগীশ সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দশ বৎসর কাল নির্ব্বিরোধে এই কাজ করিবার পর, একবার তিনি কলেজের এক য়ুরোপীয় সেক্রেটারী কর্ত্তৃক হিন্দু আইন সম্বন্ধে ভ্রমপূর্ণ ব্যবস্থা দিবার অছিলায় পদচ্যুত হন। রামমোহন রায়ের সহিত বন্ধুতাই

নাকি এই পদচ্যুতির প্রকৃত কারণ। রামমোহন রায় এই বিষয়টি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টর-সভায় এক আবেদনপত্র প্রেরণ করেন; তাহার ফলে বিদ্যাবাগীশ স্বীয় পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পাণ্ডিত্য অসাধারণ ছিল। কলিকাতাবাসের প্রথম অবস্থাতেই তিনি বঙ্গভাষায় এক অভিধান এবং জ্যোতিষ-বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে তিনি হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তরে এক বাটী ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সাপ্তাহিক অধিবেশনে রামমোহন রায়ের রচিত অথবা স্ব-রচিত উপনিষদ্-ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন। রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ৯৮টি এইরূপ ব্যাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন অবধি প্রায় অবিচ্ছেদে তিনি বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের পঠিত ব্যাখ্যানগুলির মধ্যে ১৭টি মাত্র স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; অবশিষ্টগুলি পাওয়া যায় না।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুর যখন হিন্দুকলেজের গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি উক্ত কলেজের অধীনে স্বপ্রতিষ্ঠিত এক উচ্চশ্রেণীর পাঠশালায়[১] ছাত্রদিগকে নীতি বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশকে নিযুক্ত করেন। সেই সকল উপদেশ পরে 'নীতি দর্শন' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় কার্য্যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় দেবেন্দ্রনাথকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু ১৭৬৫ শকের মাঘ মাসে (অর্থাৎ দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার এক মাস পরে), দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ ও শ্রদ্ধার ফলে, তাঁহার আচার্য্য পদে 'অভিষেক' ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সম্ভবতঃ এই বৎসর বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া থাকিবেন; কারণ, ইহার অল্পকাল পরেই তিনি

(১) ৩৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। ১৭৬৬ শকের ৯ই ফাল্গুন তিনি কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন, ও পথিমধ্যে মুর্শিদাবাদে ২০শে ফাল্গুন রবিবার (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ) ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়ঃক্রমে দেহত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অনুরাগের কথা সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহার জীবদ্দশায় দুই পুত্র ও তিন কন্যার মৃত্যু হয়; কিন্তু কোন বাধাবিঘ্নই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য্য হইতে অনুপস্থিত রাখিতে পারে নাই। তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়াও মৃত্যুকালে ব্রাহ্মসমাজকে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান।

বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বিষ্ণুচন্দ্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাণাঘাট অঞ্চলের 'আন্দুলে কায়েত পাড়া' নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। কালী-প্রসাদের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে কৃষ্ণপ্রসাদ, দয়ানাথ, ও বিষ্ণুচন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই দয়ানাথ দেহত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের প্রথম দিবসাবধি কৃষ্ণ ও বিষ্ণু তাহার গায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই কৃষ্ণপ্রসাদেরও মৃত্যু হইল। তখন হইতে একা বিষ্ণুই আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়কের কার্য্য করিতেন।

বিষ্ণুর চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তিনি কেবল বেতনের জন্য ব্রাহ্মসমাজে গান করিতেন না; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজে মাসে মাসে যে ৮০৲ টাকা সাহায্য করিতেন, তাহা হইতে বিষ্ণুচন্দ্রকে ৪০৲ টাকা দেওয়া হইত। পরে নানা কারণে সেই বেতন কমিয়া গিয়া ১০৲ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। বেতনের এতটা হ্রাস হওয়াতেও বিষ্ণুচন্দ্র সমাজের কাজ পরিত্যাগ করেন নাই। এক সময়ে বিষ্ণুর সঙ্গীতের জন্যই আদি ব্রাহ্মসমাজের নাম চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হইয়াছিল। বিষ্ণুচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকের ষষ্ঠভাগ পর্য্যন্ত প্রায় সকল গানেরই সুর বসাইয়া দিয়াছেন।

বিষ্ণুচন্দ্র এগারো বৎসর বয়সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া আটাত্তর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, সাতষট্টি বৎসর কাল একাদিক্রমে তাহার গায়কের কাজ করেন।

শুনিলে অবাক্ হইতে হয় যে, এই সুদীর্ঘ কার্য্যকালের মধ্যে তিনি **একটি দিনের জন্যও সমাজে অনুপস্থিত হন নাই**। প্রায় বিরাশি বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৬

দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ চর্চ্চার বিভিন্ন যুগ।

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন উপনিষদ্ চর্চ্চার দ্বারাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছিল। আত্মজীবনীর অন্তর্গত কালের মধ্যে তাঁহার উপনিষদ্ চর্চ্চার এই কয়েকটী যুগ পৃথক করিতে পারা যায়।

১। প্রথম যুগে তিনি উপনিষদ্ হইতে স্বীয় :চিন্তাপ্রসূত সিদ্ধান্তের সমর্থন ও হৃদয়ের প্রতিধ্বনি লাভ করেন। এই যুগের কাল ১৮৩৮ হইতে ১৮৪৩ সাল; বয়স ২১ হইতে ২৬ বৎসর; আত্মজীবনীর ৫ম হইতে ৯ম পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত। এই সময়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১১খানি প্রধান উপনিষদের অনেক অংশ পাঠ করেন। এই পাঠে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ এগারো খানি উপনিষদ্ তিনি যে এসময়ে আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এই প্রথম অধ্যয়নের ফলে তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন; পত্রিকাতে উপনিষদের বৃত্তি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; ব্রাহ্মসমাজের সহিত নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসের মিল দেখিয়া তাহার সহিত যুক্ত হন, এবং তাহার কার্য্য পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন; বিধিপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের জন্য আকাঙ্ক্ষিত হন, ও তাহার উপযোগী একটি প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন; এবং কুড়ি জন সঙ্গী সহ তাহা পাঠ করিয়া রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করেন।

২। দ্বিতীয় যুগ,—ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণের পরে উপনিষদ হইতে ধর্ম্মসাধনে সহায়তা লাভের যুগ। এই যুগের কাল ১৮৪৪ ও ১৮৪৫ সাল; বয়স ২৭ ও ২৮ বৎসর; আত্মজীবনীর ১০ম, ১১শ, ১২শ পরিচ্ছেদে এবং ১৪শ পরিচ্ছেদের আদিতে ইহা বিবৃত। এই সময়ে নিষ্ঠাপূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা

সাধন করিতে করিতে, সেই সাধনের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের পূর্ব্বাধীত অংশ সকলের মর্ম্মে ক্রমশঃ গভীরতর ভাবে প্রবেশ করিতে থাকেন। এইকালের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে জীবনের নিয়ন্তা বলিয়া অনুভব করেন, ও ঈশ্বরের প্রেমরঞ্জিত নিত্য সহবাস লাভের জন্য ব্যাকুল হন, (২৮ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। এই যুগের উপনিষদ্ চর্চ্চার ফল,— ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি রচনা, এবং উপনিষদের দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার ও ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে, এই আশায় উৎসাহিত হওয়া।

৩। তৃতীয় যুগে খ্রীষ্টানদিগের সহিত সংঘর্ষের ফলে, উপনিষদ্ অভ্রান্ত কিনা, এবং তাহা কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানেরই আধার কিনা, এই সকল প্রশ্ন উত্থিত হয়। এই কারণে তাঁহাকে সমুদয় উপনিষদ্ তন্ন তন্ন করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িতে হয়। তিনি ইহার সঙ্গে বেদ জানিবার আবশ্যকতাও অনুভব করেন, এবং এজন্য কাশীতে ছাত্র প্রেরণ করেন। পরে স্বয়ং কাশী গমন করিয়া বেদ বিষয়ে আলোচনা করেন। এই যুগের কাল ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৮ সাল; বয়স ২৮ হইতে ৩১ বৎসর ; আত্মজীবনীর ১৪, ১৭—২০, ও ২২ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত। এই গভীরতর অধ্যয়নের ফলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উপনিষদ্ সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের 'পত্তনভূমি' ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায় হইতে পারিবে না। (৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

[৪। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থ রচনা করেন (১৮৪৮)। এই গ্রন্থ রচনার পর তিনি তাঁহার পরিণত জীবনের চিন্তা ও ধর্ম্মসাধন সম্ভূত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও অনেকবার উপনিষদ্ সকল পাঠ করিয়াছিলেন।]

১৭

তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম যুগ।

(১৮৩৯—১৮৪৩)

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার প্রথম কয়েক বৎসরের (১৮৩৯—১৮৪৩ সালের) যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐ সময়ের সকল

ঘটনা বর্ণিত হয় নাই। বিশেষতঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উল্লেখ একেবারেই নাই। এখানে ঐ কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।

১৮৩৮ সালে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই অধ্যয়নের ফলে তাঁহার চিত্তে যে অমৃত সঞ্চিত হইতে লাগিল, তাহা অপরকে দান করিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। তখনও ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার যোগ হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ তখন নামে-মাত্র জীবিত। ব্রাহ্ম-সমাজ বলিয়া যে একটি বস্তু আছে, ইহা তখন রামমোহন রায়ের জন-কয়েক বন্ধু ভিন্ন আর কেহই জানিত না; জানিলেও মনে রাখিত না। দ্বারকানাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন ও তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, নতুবা দেবেন্দ্রনাথও কোন দিন ব্রাহ্মসমাজের নাম শুনিতে পাইতেন কি না, সন্দেহ। ১৮৩৯ সালে যখন উপনিষদ্-বেদ্য ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে অধিকার করে, তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ হন নাই; এই কারণে, তখন তিনি নিজ অভিপ্রায়ের উপযোগী নূতন একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন। তাহাই তত্ত্ববোধিনী সভা।

১৮৩৯ সালের ৬ই অক্টোবর রবিবার তত্ত্ববোধিনী সভার জন্ম হয়। আত্ম-জীবনীতে বর্ণিত আছে যে প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় আত্মীয় বন্ধু বান্ধব এবং ভ্রাতৃগণকে লইয়া নিভৃত ভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। দশ জন সভ্য লইয়া ইহা আরম্ভ হয়। দেখা যায়, দ্বিতীয় বৎসরে সভ্যসংখ্যা ১০৫ হইয়াছিল।

আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে প্রথম দুই বৎসরে সভার খ্যাতি বিস্তার হইল না বলিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইতেছিলেন। এই খ্যাতিহীন প্রথম যুগের মধ্যেই (১৮৪০ সালে) দেবেন্দ্রনাথের সহিত অক্ষয়কুমার দত্তের যোগ স্থাপিত হয়। ইহা একটি স্মরণযোগ্য ঘটনা। ইহা হইতে উত্তরকালে অনেক গুরুতর ফল প্রসূত হইয়াছিল।

ক্রমে বর্দ্ধমান-রাজ মহ্‌তাব চন্দ্ বাহাদুর, নবদ্বীপরাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রভৃতি দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি ইহার সভ্য হইলেন।

ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারের জন্য দেবেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহা তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন।

এই পাঠশালার ইতিবৃত্ত এই। রামমোহনের ন্যায় দ্বারকানাথও হিন্দু কলেজের ধর্ম্মহীন শিক্ষায় অসন্তুষ্ট ছিলেন। উহাতে প্রদত্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত সংস্কৃত ভাষার ও ধর্ম্মশাস্ত্রের গভীরতর অধ্যয়ন যুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৪০ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের চেষ্টায় ঐ কলেজের অধীনে 'কলেজ পাঠশালা' নামে একটি পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহার একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। ঐ সালের ২০শে জানুয়ারী তারিখের *Calcutta Courier* পত্রিকায় দেখা যায় যে পাঠশালা প্রতিষ্ঠার দিনে (১৮ই জানুয়ারী) প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, এবং রাধাপ্রসাদ রায় ব্যতীত Chief Justice Sir Edward Ryan, Doctors Grant, O'Shaughnessy and Wise, Mr. Hare, Capt. Richardson প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইহার নাম 'পাঠশালা' হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা একটী উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল। প্রতিষ্ঠার দিনে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে বক্তৃতা করেন, তাহার ইংরেজী অনুবাদ *Calcutta Courier* পত্রিকার ২রা এপ্রিলের সংখ্যায় মুদ্রিত আছে।

প্রসন্নকুমার এবং দ্বারকানাথের এই আয়োজনকে রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ১৮২৬ সালে স্থাপিত Vedanta College বা বেদবিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারা যায়। ঐ বেদান্ত কলেজের উদ্দেশ্যও ইহার অনুরূপ ছিল, এবং সম্ভবতঃ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশই তাহার শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু বেদান্ত-চর্চ্চাই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, এমন একটি বিদ্যালয় কলিকাতার ন্যায় বিষয়-বাণিজ্য-প্রধান স্থানে চলা কঠিন বলিয়া তাহা অধিক দিন জীবিত থাকে নাই।

দেবেন্দ্রনাথের মনে হইল, তাঁহার পিতার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত 'কলেজ পাঠশালা' কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যে কার্য্য করিবে, স্কুলের বালকগণের মধ্যেও তদনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য একটি আয়োজন করা আবশ্যক। কিন্তু 'কলেজ পাঠশালা' যেরূপ হিন্দুকলেজের আনুষঙ্গিক একটি অনুষ্ঠান হইল, সেভাবে অপরের প্রতিষ্ঠিত কোনও সাধারণ স্কুলের আনুষঙ্গিকরূপে একটী পাঠশালা স্থাপন করিতে দেবেন্দ্রনাথ ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি নূতন প্রণালীতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্কুল খুলিয়া তাহাকে তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালনাধীন রাখিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন।

৩রা জুন ১৮৪০ তারিখের *Calcutta Courier* পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় 'Indian News' শীর্ষে এই সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"A NEW SCHOOL.—We have been given to understand that a new School, having for its object the education of the rising youths in the vernacular languages of the country is about to be established in Calcutta under the auspices of some enlightened native Baboos. It is to be conducted on the same principles as the new College Patsala. The boys will further receive religious education, which is a new feature in the system of native instruction. It is said that new books suited to the capacities of youth, are now in course of preparation in the vernacular languages by Baboo Debendernauth Tagore, the son of Baboo Dwarkeynauth Tagore."

এই নূতন স্কুলই দেবেন্দ্রনাথের 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'। ইহা উক্ত 'কলেজ পাঠশালার' মত একটি উচ্চাঙ্গের চতুষ্পাঠী হইল না বটে ; কিন্তু ইহাতেও উপনিষদ্ পড়ান হইতে লাগিল, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতে লাগিল। ঐ পত্রিকার উল্লেখ হইতে জানিতে পারিতেছি যে, 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' প্রতিষ্ঠার কাল, ১৮৪০ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। এবং, এখন যে 'native' শব্দটি ভদ্রতার অভিধান হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, তখন তাহার কিরূপ অজস্র ব্যবহার হইত, তাহাও ঐ উদ্ধৃত সংবাদটুকুর ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপনের উদ্দেশ্য তৎকালে যে ভাবে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সকল কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়,—"ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা এবং খৃষ্টীয় ধর্ম্মকে পৈতৃক ধর্ম্মরূপে গ্রহণ,—এই সকল সাংঘাতিক ঘটনা নিবারণ করা, বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ করিয়া বিনা বেতনে ছাত্রগণকে পরমার্থ ও বৈষয়িক উভয় প্রকার শিক্ষা প্রদান করা," ইত্যাদি। এই পাঠশালায় প্রাতঃকালে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত ইহাতে ভূগোল ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি ইহাতে পড়াইবার জন্য এই দুই বিষয়ে পুস্তক রচনা করেন ; তাহা তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক ১৮৪১ সালে মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাংলা ভাষায় যে কয়েক-

খানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক ছিল, তাহার অধিকাংশ সাহেবদিগের রচিত ছিল, এবং সে সকলের ভাষা অতি কদর্য্য ছিল।

এদিকে দ্বারকানাথ এই সময়ে বিষয় সম্পত্তির চিন্তায় মগ্ন। কারবার বাড়িয়া চলিয়াছে, তাই বাণিজ্যলক্ষ্মীর চঞ্চলতায় যাহাতে স্থাবর সম্পত্তি নষ্ট হইতে না পারে, সেরূপ আয়োজন করিতে তিনি ব্যস্ত। তাঁহার Deed of Settlement সম্পাদনের কথা পূর্ব্বেই (৩৩২—৩৩৪ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে। কিন্তু বিপুল বিষয় সম্পত্তি পরিচালনের কঠিন কার্য্যে তিনি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তা কিংবা মনোযোগ কিছুই পাইতেছিলেন না।

ব্যবসায়ের সহায়তার জন্য দ্বারকানাথকে এই সময়ে বেলগাছিয়ার বাগানে ঘন ঘন নাচ ও ভোজের ব্যবস্থা করিতে হইত। একবার দেশীয়-দিগকে লইয়া আমোদ প্রমোদের দিনে দেবেন্দ্রনাথের উপরে অভ্যাগত-দিগের পরিচর্য্যার ভার দেওয়া হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই কার্য্যেও মন দিতে পারিলেন না। ইহাতে তিনি পিতার বিরাগভাজন হইলেন। (৭৯ ও ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এক দিকে পিতার বিষয়কার্য্যের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের এই অমনোযোগ, অপর দিকে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহা ধূম ধাম করিয়া রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে তত্ত্ববোধিনী সভার উৎসব করিলেন। ইহাতেও দ্বারকানাথ নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি আর কয়েক মাস পরেই ইংলণ্ডে চলিয়া গেলেন, ও এক বৎসর তথায় থাকিলেন।

দ্বারকানাথ যখন বিলাতে, সেই সময়ে (১৮৪২ সালে) দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাটিকে লইয়া ক্রমশঃ বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। যে কারণে রামমোহন রায়ের Vedanta College কলিকাতায় অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই, সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাও যায়-যায় হইয়া উঠিল। কলিকাতা বিষয়ী লোকদিগের স্থান। যাঁহারা দেবেন্দ্র-নাথের অনুরোধে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ছেলে পাঠাইতেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ছেলেরা প্রধানতঃ অর্থকরী বিদ্যা উপার্জ্জন করুক, এবং তাহার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব জ্ঞান ধর্ম্ম উপার্জ্জন করুক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোপরি স্থান দিয়াছিলেন, এবং

বাংলা ভাষাতেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইবে, ইহা তাঁহার দৃঢ় পণ ছিল এই ভাবে পরিচালিত একটি স্কুলকে কলিকাতায় অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখা বোধ হয় এখনও সম্ভব নহে, তখনকার তো কথাই নাই। কিছুদিন পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার ছাত্রেরা দেবেন্দ্রনাথের খাতিরে সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ঐ পাঠশালায় পড়িয়া, আবার ১০টার সময় ইংরেজী স্কুলে যাইতে লাগিল। কিন্তু এত কষ্ট স্বীকার আর কত দিন করা সম্ভব? অল্প কালের মধ্যেই তাহারা একে একে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা ছাড়িয়া যাইতে লাগিল, পাঠশালা প্রায় ছাত্রশূন্য হইল।

দেবেন্দ্রনাথ তখন বুঝিলেন, কলিকাতায় এরূপ পাঠশালা টিঁকিবে না। কিন্তু তাঁহারও সঙ্কল্প ছিল যে, "সাধারণ ইংরেজী স্কুলের মত আর একটা স্কুল চালাইব না; আমার যে উদ্দেশ্য তদনুরূপ একটি পাঠশালাই রাখিতে হইবে; যদি তাহা কলিকাতায় না চলে, তবে যেখানে চলে, সেখানেই তাহা স্থাপন করিতে হইবে।" তাই পাঠশালা বাঁশবেড়ে গ্রামে চলিয়া গেল।

অথবা, প্রকৃত কথা এই যে, বাঁশবেড়ে গ্রামে নূতন করিয়া আর একটি পাঠশালা স্থাপন করা হইল। এই গ্রামটি ব্রাহ্মণপণ্ডিত-প্রধান, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার কয়েজন সভ্যের বাড়ী এই গ্রামে ছিল। তাই, ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল) রবিবার, দেবেন্দ্রনাথ নবোৎসাহে এই গ্রামে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা খুলিলেন। কলিকাতার পাঠশালাটি উঠিয়া গেল। অক্ষয়কুমার দত্ত কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গ্রামে যাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশকে পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল; তাঁহার বাড়ী ঐ গ্রামেই ছিল। রামগোপাল ঘোষ পাঠশালার পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করিলেন।

"এই পাঠশালায় বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা হইত। এক শতের অধিক ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত না, এবং ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক কোন বালককে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হইত না।... এই বংশবাটীর পাঠশালার প্রথম পরীক্ষার পর পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে প্রায় পাঁচ শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।... ৩৯ ছাত্রকে পুরস্কার দেওয়া যায়, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর

প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত দীননাথ রায় একত্রিংশ মুদ্রা এবং বঙ্গ ও ইংলণ্ডীয় ভাষায় কতকগুলি পুস্তক প্রাপ্ত হয়েন।” (তত্ত্ববো. ১৮৩৭ শকের চৈত্র সংখ্যা, ২২৫ পৃষ্ঠা)।

বহুদিন পরে অতর্কিতভাবে দেবেন্দ্রনাথের সহিত এই দীননাথ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। দীননাথ তখন কানপুরের ষ্টেশন মাষ্টার হইয়াছিলেন, ও দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিয়াছিলেন। (আত্মজীবনী, ২৮৫, ২৮৬ পৃঃ)।

[দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু ও তাঁহার ব্যবসায়ের পতনের পর ১৮৪৭ সালে বাঁশবেড়ের এই পাঠশালাটিও উঠিয়া যায়। তখন তাহার বাড়ী ও বাগান ডফের মিশন কিনিয়া লন।]

এই পাঠশালাই তত্ত্ববোধিনী সভা কর্তৃক অবলম্বিত প্রথম কার্য্য। কিন্তু অবৈতনিক হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতায় প্রথম দুই বৎসরে ইহাতে যে আশানুরূপ ছাত্র হইতেছিল না, ইহা দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভের কারণ হইয়াছিল।

যে-সময়ে কলিকাতার সকল লোকের এই আগ্রহ ছিল যে ছেলেরা যে-কোনওরূপেই হউক একটু আধটু ইংরেজী শিখুক, যে-সময়ে কলিকাতার গলিতে গলিতে, অতি যৎসামান্য ইংরেজী-জানা এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে একান্ত মূর্খ বহু বাঙ্গালী ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী, শুধু ইংরেজী শব্দের দীর্ঘ তালিকা মুখস্থ করাইবার নানা পাঠশালা ও স্কুল খুলিয়া বসিতেছে, ও তাহাতেই যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, যে-সময়ে ইংরেজী জানাই চাকরী পাইবার পক্ষে একমাত্র আবশ্যকীয় গুণ, সেই যুগে দেবেন্দ্রনাথ যে এরূপ দৃঢ়তার সহিত কেবল বাংলা ভাষায় শিক্ষা দান করিবার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত ও পরিচালিত করিয়াছিলেন, ইহাতে আমরা তাঁহার অপূর্ব্ব মনস্বিতার ও তেজস্বিতার পরিচয় পাই।

এদিকে, দ্বারকানাথের বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই (১৮৪২ সালের প্রথম ভাগে) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগদান করেন ও তত্ত্ববোধিনী সভার হাতে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনের ভার সমর্পণ করেন[১]। এইরূপে ক্রমশঃ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে লাগিল। ১৮৪৩ সালের আগষ্ট

---

(১) ২০ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

(ভাদ্র) মাসে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হইল। এই পত্রিকা যেন এক দিনেই দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়া লইল। এই পত্রিকার দ্বারা তত্ত্ববোধিনী সভার ও তাহার প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথের নাম চতুর্দ্দিকে আরও ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ইহার পর ঐ সালের ডিসেম্বর মাসে (৭ই পৌষ) দেবেন্দ্রনাথ ও আর কুড়ি জন ভদ্রলোক প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ করিলেন। তাহার পর হইতে প্রতিদিনই অনেক নূতন নূতন লোক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার নাম ও 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মের' নাম লোকের মুখে মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

আমরা দেখিতে পাই, ১৮৪৪ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা কলিকাতায় একটি বিখ্যাত সভা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে মৃতকল্প ও বিস্মৃত ব্রাহ্মসমাজকে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার আশ্রয় দান করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিলেন, তাহাকে লোকে এই সময় হইতে কিছুকাল পর্য্যন্ত 'তত্ত্ববোধিনী সভার দল' অথবা 'বেদান্তবাদীদিগের দল' বলিয়া চিনিতে লাগিল।

১৮

রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার বার।

রামমোহন রায় প্রথমতঃ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে প্রতি শনিবার সন্ধ্যার সময় ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনা হইবে। "প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী, তাঁহারদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।" (পঞ্চবিংশতি, ২০, ২১)। যে দিন (১৮২৮

সালের ২০ আগষ্ট, ৬ই ভাদ্র) ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, সে দিনটি বুধবার ছিল বলিয়াই হয়তো বুধবারটি নির্ব্বাচন করা হইল। ব্রাহ্মসমাজের নবগৃহ-প্রবেশের দিনটি (১৮৩০ সালের ২৩শে জানুয়ারী, ১১ই মাঘ) শনিবার ছিল।

১৯

ব্রাহ্মসমাজে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ।

রামমোহন রায়ের সময়ে ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সমাজঘরের পার্শ্বের আর একটি ঘরে, শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করা হইত। দেবেন্দ্রনাথ 'পঞ্চবিংশতি' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "যখন প্রথম ইহা [ব্রাহ্মসমাজ] সংস্থাপিত হইল, তখন সেখানে কি হইত? তখন সূর্য্য অস্ত হইবার কিছু পূর্ব্বে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ সমাজের পার্শ্ব-গৃহে উপনিষদ্ পাঠ করিতেন; সেখানে কেবল রামমোহন রায়, বিদ্যাবাগীশ, প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা উপবেশন করিয়া তাহা শ্রবণ করিতে পাইতেন; শূদ্রদিগের সেখানে যাইবার অধিকার ছিল না। সূর্য্য অস্ত হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ গোস্বামী সমাজের ঘরে আসিয়া বেদীতে বসিতেন। উৎসবানন্দ উপনিষদ্ ব্যাখ্যা করিতেন, বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের রচিত ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, এবং কখন কখন বেদান্তদর্শনেরও ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সেই সমাজ ভঙ্গ হইত। সেই সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, খ্রীষ্টান, মুসলমান, সকলেরই সমান অধিকার ছিল।...

ব্রাহ্মসমাজের সহিত যখন আমার প্রথম যোগ হয়, তখন দেখিলাম, সেই প্রকার নিভৃতরূপেই বেদপাঠ হইতেছে, বিদ্যাবাগীশ সেই প্রকারই প্রাচীন প্রণালীমত ব্যাখ্যান করিতেছেন; কিন্তু তাঁহার সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়া বর্ণন করিতেছেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদি হইতে পৌত্তলিকতার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইয়াছে। তিনি সেই অবধি উক্ত কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইলেন।" (১৪—১৯ পৃষ্ঠা)।

বেদপাঠকে এইরূপে যবনিকার অন্তরালে স্থাপন যে ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণের ইচ্ছাতে হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। রামমোহন রায় বা দেবেন্দ্রনাথ কেহই ব্রাহ্মসমাজে নিজে বেদপাঠ করিতেন না; অপরকে দিয়া পাঠ করাইতেন মাত্র। কিন্তু শূদ্রের সাক্ষাতে বেদপাঠ করিতে প্রস্তুত, এমন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম যুগে পাওয়া যাইত না। আত্মজীবনীর ৮১ পৃষ্ঠাতে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়াই অতিশয় কঠিন ছিল। সুতরাং শূদ্রের সাক্ষাতে যিনি বেদ পাঠ করিতে প্রস্তুত, এমন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যে আরও কঠিন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে ১৮৪১ সালেই একবার এ বাধা অতিক্রম করিয়াছিলেন। আত্মজীবনীর ৬৮ পৃষ্ঠায় তত্ত্ববোধিনী সভার সাংবৎসরিকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে অনেক অব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন ও বক্তৃতা দিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের সম্মুখেই বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৮৪২ সালে ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইলেন।

২০

তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ।

রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় কিছুকাল মাসিক ৬০৲ টাকা ও পরে মাসিক ৮০৲ টাকা হিসাবে নিয়মিত অর্থসাহায্য করিয়া, ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতেছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই অর্থসাহায্য, এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের বেদান্তজ্ঞান ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরাগ,—এই উভয়ের সমাবেশ না হইলে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর হইতে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান পর্য্যন্ত নয় বৎসর কাল (১৮৩৩—১৮৪২) ব্রাহ্মসমাজ জীবিত থাকিতে পারিত না।

দেবেন্দ্রনাথ যখন নিজ ব্যাকুলতার দ্বারা চালিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত মিলিত হইলেন, তখন ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ীর একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। এই কথা স্মরণ রাখিলে দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক অবাধে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার নিজহস্তে গ্রহণ করিতে পারা, এবং উহার কার্য্য পরিচালনের জন্য উহাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার অধীন করিয়া দিতে পারা, (আত্মজীবনীর ভাষায় 'ব্রাহ্মসমাজ অধিকার' করা) কিছুই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজকে 'অধিকার' করিলেন না; নিজেই বরং ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা অধিকৃত হইলেন। অল্প কালের মধ্যেই কিসে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার হয়, ইহাই তাঁহার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান হইয়া দাঁড়াইল।

দেবেন্দ্রনাথ 'পঞ্চবিংশতি' পুস্তকে লিখিতেছেন, "ব্রাহ্মসমাজের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগের অগ্রে ব্রাহ্মসমাজ যেন অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, স্পন্দহীন হইতেছিল; তাহার যত দূর পর্য্যন্ত দুর্গতি হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত তাহার পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ-সঞ্চার হইল। ১৭৬৩ শকে তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত যোগ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কি পরিণাম হইত, বলা যায় না। হয়তো আমরা ইহার কিছুই দেখিতে পাইতাম না। রামমোহন রায়ের এক ইংরাজি বিদ্যালয় ছিল, আমরা সেখানে অধ্যয়ন করিয়াছি; কিন্তু তাহা এখন কোথায়? হয়তো ব্রাহ্মসমাজের দশা সেই প্রকার হইত। তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত সংযোগের সময়ে এই আন্দোলন হইল যে, ব্রাহ্মসমাজ হইতে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকা আবশ্যক, কি, ইহা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া যাইবে? নির্দ্ধারিত হইল যে তত্ত্ববোধিনী সভার উপসনাকার্য্য ব্রাহ্মসমাজ গ্রহণ করিবে, এবং তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্বাবধারণ করিবে।" (২২, ২৩ পৃষ্ঠা)।

"ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে প্রচারকার্য্য হইতে পারে, ইহা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও ধারণাতে আসে নাই। রামমোহন রায়ের ট্রষ্ট ডীডে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সমাজে কেবল উপাসনাকার্য্যেরই কথা লিখিত আছে, সুতরাং সেখানে উপাসনাকার্য্য নিয়মিতরূপে করা হইবে। কিন্তু ট্রষ্ট ডীডে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের কোন কথাই লিখিত নাই বলিয়া, সমাজ হইতে সে কার্য্য হইতে পারে

বলিয়া কাহারও ধারণা ছিল না।…দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থির করিলেন যে, উভয় সভার মিলন সাধনের পর…তত্ত্ববোধিনী সভা প্রচারকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবে। কেবলমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রদত্ত চাঁদার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের পরিচালন কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছিল; এবং তত্ত্ববোধিনী সভারও ব্যয় বলিতে গেলে একা দেবেন্দ্রনাথই বহন করিতেন। কাজেই দেবেন্দ্রনাথ যখন উভয় সভার মিলনের প্রস্তাব করিলেন, তখন কোনই আপত্তি উঠে নাই। ১৭৬৩ শকের শেষভাগে (১৮৪২ খৃষ্টাব্দের প্রথমে) এই মিলনপ্রস্তাব গৃহীত হইল, এবং ১৭৬৪ শকের বৈশাখ মাসেই (১৮৪২ খৃষ্টাব্দে) উভয় সভার মিলন সাধিত হইল।”—(তত্ত্ববো., ১৮৩৭ শক, আশ্বিন, ১০৬ পৃষ্ঠা)।

দেশের লোক ব্রাহ্মসমাজের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকে তাহাকে ঐ সভার দল বলিয়া চিনিতে লাগিল, ইহা পূর্ব্বেই (৩৫৩ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হওয়া সত্ত্বেও, দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই সভা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের একটি যন্ত্রমাত্র ছিল। অপর দিকে অনেক সভ্য এই সভার নামেই আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বলিয়া অনুভব করিতেন; তাঁহাদের চক্ষে ব্রাহ্মসমাজ অপেক্ষা এই সভার মূল্যই অধিক ছিল। উভয়ের আপেক্ষিক মূল্য বিষয়ে এই মতভেদ হেতু তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত, এবং পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন প্রভৃতি লইয়া তদন্তর্গত ‘গ্রন্থাধ্যক্ষ সভার’ সহিত, সময়ে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ হইতে লাগিল।

এই মতভেদ অন্যান্যরূপেও প্রকাশ পাইতে লাগিল। খ্রীষ্টিয়দিগের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, সভার কয়েক জন বিশিষ্ট সভ্যের সহানুভূতি তাঁহার দিকে নাই। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ‘আত্মীয় সভাতে’ ভোট লইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন, এবং দেবেন্দ্রনাথ-কর্ত্তৃক সংস্কৃতভাষায় রচিত উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, (৪৫৮ পৃষ্ঠা)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্ম্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবাবিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন। এই

সকল দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে এই প্রশ্ন উঠিল যে, তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা যদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহায়তা না হয়, তবে অর্থব্যয় করিয়া তাঁহাকে জীবিত রাখিয়া ফল কি? ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা উঠাইয়া দেওয়াই শ্রেয়স্কর বোধ করিলেন। (তত্ত্ববো., ১৮৩৯ শকের পৌষ সংখ্যা, ২৩৭—২৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। *

২১

অক্ষয়কুমার দত্ত ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় অক্ষয়কুমার দত্ত প্রথম মাসে ৮৲, তৃতীয় মাসে ১০৲, ও তৎপরে ১৪৲ টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সংশ্রব তাঁহার সর্ব্ববিধ উন্নতির কারণ হয়। ইহার দ্বারা তাঁহার আয় বৃদ্ধি হইল, এবং জ্ঞান উপার্জ্জনের দ্বার উন্মুক্ত হইল। তিনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে গিয়া অতিরিক্ত ছাত্ররূপে উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৩ হইতে ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করাতে, যে মানুষ যে কার্য্যের উপযোগী, যেন তাঁহার হস্তে সেই কার্য্যই আসিল। তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র-সকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্যজগতে কি পরি-বর্ত্তন ঘটাইয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না।···ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও [তখন] এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ

প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন।" (রামতনু, ১৯৯, ২০০)।

২২

দেবেন্দ্রনাথের বিষয়-বিরাগ, ও দ্বারকানাথের অসন্তোষ।

১৮৩৯ ও ১৮৪০ সালে ক্রমাগত তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশন; ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন ও তাহা লইয়া অনুক্ষণ ব্যস্ততা; ১৮৪১ সালে বেলগাছিয়ার বাগানের প্রমোদ-সভার প্রতি অবহেলা; কয়েক মাস পরে জাঁকজমক করিয়া তত্ত্ববোধিনী সভার সাংবৎসরিক অধিবেশন,— দেবেন্দ্রনাথের এই সকল কার্য্য দেখিয়া দ্বারকানাথ ইংলণ্ড গমন করেন, (১৮৪২, জানুয়ারী)। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, (১৮৪৩, জানুয়ারী,) দেবেন্দ্রনাথ সেই সময়ে মুমূর্ষু পাঠশালাটিকে লইয়া মহাব্যস্ত। এপ্রিল মাসে তাহাকে বাঁশবেড়ে গ্রামে স্থানান্তরিত করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বার বার তথায় যাতায়াত করিতে লাগিলেন। ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল, এবং দেবেন্দ্রনাথের ব্যস্ততা আরও অনেক বাড়িয়া গেল।

১৮৪০ সালে যখন দ্বারকানাথ বিষয়সম্পত্তি নিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে একটি ট্রষ্টডীড্ সম্পাদন করেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা লইয়া মত্ত ছিলেন। ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাসে যখন দ্বারকানাথ উইল করিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ পাঠশালা ও পত্রিকা লইয়া মত্ত ছিলেন। পত্রিকা সেই মাসেই বাহির হইল। এই সময়েই দ্বারকানাথ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রতি বিরক্তিসূচক কথাগুলি ("তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন," ৭৮ পৃষ্ঠা,) বলিয়া থাকিবেন।

পিতার অসন্তোষ দর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজ পথ হইতে নিবৃত্ত হইলেন না; পৌষ মাসে তিনি বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্যাবাগীশকে পিতার বিরাগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য, বাড়ীতে না বসিয়া যন্ত্রালয়ে গিয়া তাঁহার কাছে পড়িতে লাগিলেন।

১৮৪৫ সালে দ্বারকানাথ স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে লইয়া দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৪৬ সালের ২২শে মে তারিখে তিনি ইংলণ্ড হইতে বিষয়ে অমনোযোগ হেতু দেবেন্দ্রনাথকে ভৎ র্সনা করিয়া এক পত্র লিখেন। (পত্রাবলী, ১৪৫)। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথকে বিষয়কর্ম্মে যতটুকু মন দিতে হইতেছিল, তাহাই তাঁহার অপ্রীতিকর বোধ হইতেছিল (১০৯ পৃষ্ঠা); তদুপরি পিতার এই ভৎর্সনা আসিল। তিনি কিছুকালের জন্য নির্জ্জনে নৌকায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। এই যাত্রাতেই ঝড় বৃষ্টির ভিতরে তিনি পিতার মৃত্যু-সংবাদ প্রাপ্ত হন। বাহির হইবার সময় তাঁহার পত্নী ব্যস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন (১১০ পৃষ্ঠা)। ইহাতে মনে হয়, সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের মন ভারাক্রান্ত ছিল, এবং তাহাতে পরিবারগণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

২৩

ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম, ও ব্রাহ্মধর্ম্ম, এই তিনটি নাম।

এই তিনটি নাম সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি একটু স্পষ্ট করা আবশ্যক। আত্মজীবনীতে 'ব্রাহ্মসমাজ' ব্যতীত 'ব্রহ্মসভা' এবং 'ব্রাহ্মসভা,' নামদ্বয়ও ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

ব্রাহ্মসমাজ কি-নামে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট (১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র) রামমোহন রায় চিৎপুর রোডস্থ কমললোচন বসুর বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই দিনে যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, তাহাতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় একটি ব্যাখ্যান পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং কি-নামে ব্রাহ্মসমাজ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য রামমোহন রায়ের পরেই রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উক্তি প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য।

রামমোহন রায়ের কোন গ্রন্থে কিংবা তাঁহার লিখিত কোন পত্রে ব্রাহ্ম-সমাজের নাম অথবা নাম বিষয়ে কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার তিন দিন পরে কলিকাতার *John Bull* নামক পত্রিকা ঐ অনুষ্ঠানের একটি বিবরণ প্রদান করেন। উহাতে, কি পদ্ধতিতে নবপ্রতিষ্ঠিত উপাসনালয়ে উপাসনা হইল, তাহার বর্ণনা আছে ; কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সমাজের নামটি কি হইল, তাহার উল্লেখ নাই। এই একটি সংবাদ-পত্রের একটি উল্লেখ ব্যতীত, সতীদাহ নিবারক আইন প্রচলনের (ডিসেম্বর ১৮২৯) পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, আর কোন সংবাদ পত্রে ব্রাহ্মসমাজের কোন নাম বা কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ; তাহার পর হইতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মসমাজের সেই প্রথম যুগে সংবাদপত্র প্রভৃতিতে ইহার এক প্রকার নাম নয়, **ছয়** প্রকার নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'ব্রহ্ম' শব্দ ও তাহা হইতে নিষ্পন্ন 'ব্রাহ্ম' ও 'ব্রাহ্ম্য' শব্দের সহিত (রামমোহন রায়ের সময়ে একার্থ-বাচক) 'সমাজ' ও 'সভা' শব্দদ্বয়ের সংযোগে যে ছয় প্রকার নাম রচিত হওয়া সম্ভব, তাহার সবগুলিই, (অর্থাৎ, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্ম্যসমাজ, ব্রহ্মসমাজ, ব্রাহ্মসভা, ব্রাহ্ম্যসভা, ও ব্রহ্মসভা) সেই যুগে ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে, সাধারণ লোকের নিকটে 'ব্রাহ্ম' অপেক্ষা 'ব্রহ্ম' শব্দটি অনেক অধিক পরিচিত ছিল বলিয়া, 'ব্রাহ্মসমাজ' অপেক্ষা 'ব্রহ্মসমাজ' নাম, এবং 'ব্রাহ্মসভা' অপেক্ষা 'ব্রহ্মসভা' নাম, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় অধিক বার দৃষ্টিগোচর হয়। এই সকল নামের তৎকালীন উল্লেখ ধারাবাহিক ভাবে বিবৃত করিতেছি।

(১) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের দিনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে ব্যাখ্যান পাঠ করেন, তাহা তৎকালেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৯৬ সালে ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় 'ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান, ও সঙ্গীত' নাম দিয়া বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ১৭টি ব্যাখ্যান পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাহাতে ঐ প্রথম ব্যাখ্যানটির বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন যে, উহার প্রথম মুদ্রাঙ্কনের আখ্যাপত্রে "শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্ম কর্ত্তৃক। ব্রাহ্মসমাজ। কলিকাতা। বুধবার ৬ ভাদ্র। শকাব্দা। ১৭৫০", এই কথাগুলি ছিল। সুতরাং দেখা যায় যে ঐ দিনে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় **নিজ উক্তিতে** 'ব্রাহ্মসমাজ' নামটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

(২) ১৮২৯ সালের ৬ই জুন তারিখে ব্রাহ্মসমাজের জমি ক্রয়ের কবালা-পত্র সম্পাদিত হয়। তাহাতে 'ব্রহ্মসমাজের নিমিত্তে' এই কথাগুলি

আছে। কবালা-পত্রের লিপিকর 'ব্রাহ্মসমাজ' না লিখিয়া 'ব্রহ্মসমাজ' লিখিয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। সাধারণ লোকে 'ব্রাহ্ম' শব্দটি তখন জানিত না।

(৩) ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারী, রবিবার, সতীদাহ নিবারক আইনের প্রতিবাদের জন্য 'ধর্ম্মসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০শে জানুয়ারী তারিখের *India Gazette* পত্রিকার ৪র্থ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভে তাহার প্রতিষ্ঠার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, "আমরা পূর্ব্বে 'ব্রাহ্ম্যসভা' ('Bramhya Shubhah') স্থাপনের কথা পত্রিকাস্থ করিয়াছিলাম। উহার বিরুদ্ধাচরণই গত রবিবারে প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম্মসভার' উদ্দেশ্য বলিয়া শুনিতে পাই।" দুঃখের বিষয়, 'ব্রাহ্ম্যসভা' স্থাপনের উল্লেখযুক্ত ঐ পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন সংখ্যা আমি বহু চেষ্টাতেও খুঁজিয়া পাইলাম না। **সংবাদপত্রে** ব্রাহ্মসমাজের নামের উল্লেখ (এ পর্য্যন্ত যতদূর সন্ধান করিতে পারিয়াছি) ইহাই প্রথম।

(৪) ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসের লণ্ডন হইতে প্রকাশিত *Asiatic Journal* নামক পত্রিকার ৮ম পৃষ্ঠায়, 'ধর্ম্মসভার' উৎসাহপূর্ণ কার্য্যকলাপের উল্লেখের পরে লিখিত হইয়াছে যে, "সংবাদ পাওয়া যায়, 'ধর্ম্মসভা'র বিরুদ্ধে 'ব্রহ্মসভা' ('Brumha Subha') নামে একটি সভা স্থাপিত হইতেছে।"

[এই পত্রিকা 'ব্রহ্মসভা'কেই নূতন মনে করিয়াছেন। বস্তুতঃ, ১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। ১৮৩০ সালে 'ধর্ম্মসভা' ও 'ব্রহ্মসভা' নামদ্বয় সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনে ব্যবহৃত নাম রূপেই সংবাদপত্রে উঠিয়াছে। প্রকাশ্যে 'ধর্ম্মসভা' স্থাপনের ৮।৯ মাস পূর্ব্বে ঐ আন্দোলন আরম্ভ হয়; খুব সম্ভবতঃ তখন হইতেই লোকের মুখে মুখে উভয় নাম সৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

তৎকালে দেশীয় শব্দ সকল ইংরেজী অক্ষরে লিখিবার সময় সাধারণতঃ u অক্ষরের দ্বারা অ-কার এবং a অক্ষরের দ্বারা আ-কার প্রকাশ করা হইত। তদ্ভিন্ন, ইংরেজের হস্তে দেশীয় শব্দ সকল বিকৃতও হইত।]

(৫) ইহার পর হইতে সংবাদপত্রসকলে মধ্যে মধ্যে 'ব্রহ্মসভা' নামের উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু তাহা অল্পকালের জন্য, ও প্রধানতঃ সতীদাহ নিবারক আইন ও তৎপ্রসূত দলাদলির সম্পর্কে।

(৬) ১৮৪৩ সালের আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়-কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত ব্যাখ্যানসকল মুদ্রিত করা এই পত্রিকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, (৭৫ পৃষ্ঠা)। তাঁহার ব্যাখ্যান ভাদ্র মাসের পত্রিকায় দুইটি, আশ্বিন মাসের পত্রিকায় একটি, ও কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় একটি মুদ্রিত হয়। এগুলি তাঁহার সেই বৎসরে প্রদত্ত ব্যাখ্যান। এগুলির শীর্ষদেশে "মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক [অমুক শকের অমুক দিবসে] 'ব্রহ্মসমাজে' ব্যাখ্যাত হয়," এইরূপ কথা আছে। এগুলির সহিত কাহারও স্বাক্ষর যুক্ত নাই; সুতরাং শীর্ষনামে 'ব্রহ্মসমাজ' শব্দটি সম্পাদক মহাশয়ের প্রদত্ত বলিয়া মনে হয়।

(৭) পৌষ মাসে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাঘ (১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী) মাসে দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে 'অভিষেক' করেন, (৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ মাসের পত্রিকায় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অধিকারপ্রাপ্ত আচার্য্যরূপে স্বীয় নামে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশ করেন:—"বিজ্ঞাপন॥ ব্রাহ্ম্যসমাজ। আগামী ১১ই মাঘ মঙ্গলবারে সূর্য্যাস্ত সময়ে সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম্যসমাজ হইবেক, যাঁহারা তৎকালে পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম্যসমাজে আগমন করিবেন॥ শ্রীরামচন্দ্র শর্ম্মা। আচার্য্যঃ"

(৮) ঐ মাঘের পত্রিকাতেই "ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যানের চূর্ণক" শীর্ষে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ১৭৫০ শকের ভাদ্র মাসের প্রথম দুই ব্যাখ্যানের সারাংশ মুদ্রিত হয়। এই 'ব্রাহ্মসমাজে' য-ফলা নাই।

(৯) ইহার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ঐ পত্রিকায় একমাত্র 'ব্রাহ্মসমাজ' নামই চলিয়া আসিতেছে।

(১০) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজ সংসৃষ্ট কাগজপত্রে সর্ব্বত্র 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে দেখা যায় যে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে 'ব্রহ্মসভা' নামটি বলিয়াছিলেন, (৬০ পৃষ্ঠা); এবং দেবেন্দ্রনাথ একবার দুই দলের কলহের উল্লেখ করিতে গিয়া 'ব্রাহ্মসভা' নামটি ব্যবহার করিয়াছিলেন (১০৫ পৃষ্ঠা)।

‘ব্রাহ্মসমাজ’ই প্রকৃত নাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত নাম সম্বন্ধে রামমোহন রায়ের পরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের উক্তি প্রামাণ্য ও গ্রাহ্য। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ‘ব্রাহ্মসমাজ’ ও ‘ব্রাহ্ম্যসমাজ’ এই দুইটি নাম ভিন্ন অন্য কোনও নাম ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই দুইটি শব্দ একই নামের দুই আকার মাত্র। তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যানের প্রথম মুদ্রাঙ্কনে ব্যবহৃত ‘ব্রাহ্মসমাজ’ শব্দটিই ব্রাহ্মসমাজের নামের **প্রাচীনতম প্রামাণ্য উল্লেখ**। সুতরাং ‘ব্রাহ্মসমাজ’ই প্রকৃত নাম।

ঐ প্রথম মুদ্রাঙ্কনের পুস্তক এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহাকে প্রমাণরূপে দণ্ডায়মান করা সম্বন্ধে যদি কেহ আপত্তি করেন, তবে বলিতে হয়, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের নাম সম্বন্ধে উহার প্রতিষ্ঠার সাড়ে নয় মাস পরে সম্পাদিত জমি ক্রয়ের কবালা-পত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য প্রত্যক্ষযোগ্য দলিল; তাহাতে লিখিত ‘ব্রহ্মসমাজ’ শব্দটি এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করে যে রামমোহন রায় ‘ব্রাহ্মসমাজ’ নাম দিয়াছিলেন, ‘ব্রহ্মসভা’ বা ‘ব্রাহ্মসভা’ নাম দেন নাই। ঐ কবালা-পত্রে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম তিন সংখ্যায় যে ‘ব্রহ্মসমাজ’ শব্দ আছে, তাহার কারণ এই যে, অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ‘ব্রাহ্ম’ শব্দটিকে অশুদ্ধ মনে করিয়া অনেকে ব্রাহ্ম-সমাজকে ‘ব্রহ্মসমাজ’ বলিতেন। কিন্তু যখন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অধিকারপ্রাপ্ত আচার্য্যরূপে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত বিজ্ঞাপন দিলেন, তখন হইতে ভুল নাম ‘ব্রহ্মসমাজ’ চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

ব্রাহ্মসমাজের নাম সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয় ইহা নহে যে সাধারণ লোকে ইহাকে কি নামে জানিত। তাহা এই যে, রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠার সময়ে ইহাকে কি নাম দিয়াছিলেন। ‘ব্রাহ্মসভা’ ও ‘ব্রহ্মসভা’ নামদ্বয় এক সময়ে বহুলরূপে প্রচলিত হইলেও রামমোহন রায়ের প্রদত্ত নহে; দলাদলি সূত্রে অনভিজ্ঞ লোকের মুখে মুখে রচিত মাত্র। কিংবদন্তীর উপরে নির্ভর করিয়া পূর্ব্বে কেহ কেহ লিখিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম নাম ‘ব্রহ্মসভা’ ছিল। কিন্তু তথ্য নির্দ্ধারণের পক্ষে বাংলাদেশে প্রচলিত কিংবদন্তী সকল অনেক স্থলেই নির্ভরের অযোগ্য। রামমোহন রায়ের ও দেবেন্দ্রনাথের জীবনচরিত

আলোচনা করিতে গিয়া আমরা পদে পদে তাহার পরিচয় পাইতেছি। দীর্ঘকালের ব্যবধানে রচিত, ক্রমশঃ মুখে-মুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, ও অনধিকারী লোকের দ্বারা প্রচারিত এই সকল জনশ্রুতি অপেক্ষা, সাড়ে নয় মাস পরের কবালা-পত্রের উল্লেখটি অনেক অধিক নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য। রামমোহন ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ' নামই দিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

'ব্রাহ্ম' নামটি কবে হইল?

'ব্রাহ্ম' শব্দটি রামমোহন রায়ের সৃষ্ট নহে। সংস্কৃতে এ শব্দটি অতি পুরাতন, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে বহুল ভাবে ব্যবহৃত। রামমোহন রায়ের সময়ে এ শব্দটি সাধারণ লোকে না জানিলেও শাস্ত্রজ্ঞ লোকেরা জানিতেন। শাস্ত্রসকলে ইহার অর্থ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়, বা (দেবতা) ব্রহ্মার সম্বন্ধীয়। কিন্তু সংস্কৃতে ইহা মানুষের ধর্ম্মমতের বা ধর্ম্মসাধনপ্রণালীর পরিচায়ক বিশেষণরূপে (অপেক্ষাকৃত আধুনিক তন্ত্রশাস্ত্রে ভিন্ন) কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই।

বাংলাভাষায় 'একমাত্র ব্রহ্মের উপাসক' অর্থে মানুষের বিশেষণরূপে এ শব্দটিকে রামমোহন রায়ই প্রথম ব্যবহার করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার উক্তিতে তিন স্থানে এই অর্থে 'ব্রাহ্ম' কথাটি আছে। যথা:— "প্রতিমাদিতে পরমেশ্বরের উপাসনা ব্রাহ্মেরা করিবেন না", (মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকা); "সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি তাবৎকালে ব্রাহ্মদের এইরূপ অনুষ্ঠান ছিল," (কবিতাকারের সহিত বিচার); "সর্ব্বকালে মৌন ও নির্জ্জনে থাকা, ইহা ব্রাহ্মের নিত্য ধর্ম্ম নহে", (ঐ)। 'ব্রাহ্ম' শব্দটির রামমোহন রায় কৃত এই নূতন ব্যবহার দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ যে ব্রহ্মোপাসক হইয়া এবং প্রতিমাদির পূজা হইতে বিরত হইয়া 'ব্রাহ্ম' এই বিশেষ নামে চিহ্নিত হইবেন, ইহা রামমোহন রায়ের কল্পনার অন্তর্গত ছিল।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের সময় পর্য্যন্ত ইহা কার্য্যতঃ ঘটিয়া উঠে নাই। তখন ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাতে আসিয়া যাঁহারা বসিতেন, তাঁহারা অন্যত্র প্রতিমা পূজা হইতে বিরত থাকিতেন না। তাঁহারা ঐ বিশেষ অর্থে 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হইবার যোগ্য ছিলেন না, এবং সম্ভবতঃ ঐ বিশেষ অর্থটি জানিতেন না। 'ব্রাহ্ম' নামে মানুষকে চিহ্নিত

করা হইবে, রামমোহন রায়ের এই কল্পনাকে দেবেন্দ্রনাথই (ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞা-পত্র রচনা ও ব্রত প্রবর্ত্তন করিয়া) কার্য্যে পরিণত করিলেন। তাই দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৮২ পৃষ্ঠা) বলিতেছেন, "যখন ব্রাহ্মসমাজ আছে, তখন তাহার প্রত্যেক সভ্যের ব্রাহ্ম হওয়া চাই। অনেকে হঠাৎ মনে করিতে পারেন যে ব্রাহ্মদল হইতে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছে ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে ব্রাহ্ম নাম স্থির হয়।" অর্থাৎ প্রকৃত ঘটনা এরূপ নয় যে, আগে কতকগুলি লোক 'ব্রাহ্ম' বলিয়া চিহ্নিত হওয়ার পরে তাঁহাদের দলের নামটি 'ব্রাহ্মসমাজ' হইল ; প্রকৃত ঘটনা এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্য হইতে কয়েক জন লোক প্রতিজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হইলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি রামমোহন রায়ের সময়ে সৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার সময়ে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইত। সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসমাজে যোগদানের পরে, যে সময়ে 'ব্রাহ্ম' কথাটি প্রবল হইয়া উঠিল, তখন হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই নামটিও ঐ ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত নামরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল। ইহাও অসম্ভব নহে যে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি দেবেন্দ্রনাথেরই সৃষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এই পরিচ্ছেদের সর্ব্বত্র, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' এই নামটির অর্থ, 'ব্রাহ্মের অবশ্য প্রতিপালনীয় ব্রতসমষ্টি' ; 'ব্রাহ্মের অবশ্য বিশ্বসনীয় মতসমষ্টি' নহে। দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' বলিতে বুঝিয়াছেন, সারা জীবনের জন্য আপনাকে কতকগুলি সঙ্কল্পের দ্বারা বাঁধা ; 'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ' বলিতে বুঝিয়াছেন, বিধিপূর্ব্বক আচার্য্যের নিকটে গিয়া ঐরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ।

দেবেন্দ্রনাথের রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র বহুবার সংশোধিত হইয়া তাহার বর্ত্তমান আকার (যাহা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায়) ধারণ করিয়াছে, (৩৭০ পৃঃ)। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাপত্রের সমুদয় আকার পরিবর্ত্তনের ভিতরে, দেবেন্দ্রনাথ চিরকাল মত-স্বীকার অপেক্ষা জীবনে পালনীয় সঙ্কল্প-স্বীকারকে অধিক প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছেন।

সারা জীবনের জন্য কতকগুলি বিধি ও নিষেধাত্মক সঙ্কল্পের দ্বারা আপনাকে বাঁধা,—এই অর্থে দেবেন্দ্রনাথ 'ধর্ম্ম' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই তিনি আত্মজীবনীতে (৮৬ পৃষ্ঠা) লিখিতেছেন, "পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না। ধর্ম্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ।" অর্থাৎ, যাঁহারা পূর্ব্বেই ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন বুঝিলেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম কি, এবং ঈশ্বরের জন্য তাঁহাদিগকে কিরূপ ধর্ম্মনিয়মে আপনাদিগকে বাঁধিতে হইবে। এবং ঈশ্বরকে লইয়াই ধর্ম্ম, ("ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম্ম থাকিতে পারে না") ইহা সত্য বটে, কিন্তু ধর্ম্ম দিয়া অর্থাৎ সঙ্কল্পের বাঁধন দিয়া আপনাকে না বাঁধিলে কেহ ঈশ্বরকে পায় না, ("ধর্ম্ম ব্যতীতও ব্রহ্মলাভ হয় না")।

দেবেন্দ্রনাথের সময়েও কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের কাগজপত্রে 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' এই দীর্ঘ নামটিই চলিয়া আসিতেছিল। ১৮৪৭ সালের ২৮শে মে (১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) তত্ত্ববোধিনী সভার অধিবেশনে, "অতঃপর ঐ নামের পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নাম অবলম্বন করা হইবে" এরূপ নির্দ্ধারিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার ও পত্রিকার প্রতিপত্তি হেতু সাধারণ লোকে তখন ব্রাহ্মদিগকে 'তত্ত্ববোধিনী সভার দল' অথবা 'Vedantists' বলিত, এবং তাঁহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্মকে 'Vedantism' বলিত। কিন্তু আত্মজীবনী পড়িয়া মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ ইহার পূর্ব্ব হইতেই (সম্ভবতঃ দীক্ষার সময় হইতেই) 'ব্রাহ্ম' নামটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের *Bengal Hurkaru* পত্রিকায় 'Bengalensis' এই ছদ্মনামধারী কোন লেখকের 'Historical Sketch of Vedantism' শীর্ষক এক পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পত্র দেবেন্দ্রনাথই লিখিয়াছিলেন কিংবা লিখাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার এক স্থানে আছে, "The Vedantists call themselves Brahmmas," (৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ইহাতেও মনে হয় ১৮৪৭ সালে 'ব্রাহ্ম' নামটি আর অপরিচিত ছিল না।

২৪

৭ই পৌষের বিশেষত্ব।

১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর) বৃহস্পতিবার, অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীগণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ইহা একটি যুগপরিবর্ত্তনকারী ঘটনা; তাঁহার সমগ্র পরবর্ত্তী জীবন যেন সেই দিনে গৃহীত সঙ্কল্পেরই বিকাশ মাত্র।

তিনি নিজে সারাজীবন এই দিনটিকে অতি পবিত্র চক্ষে দেখিতেন। এই দিনটিকেই আপনার প্রকৃত জন্মদিন বলিয়া মনে করিতেন। দুই বৎসর পরে তিনি এই দিনে গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদের যে মেলার আয়োজন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তাহাই প্রথম 'উৎসব'।

এই দিনটি শুধু যে দেবেন্দ্রনাথের জীবনেই নব যুগের দিন, তাহা নহে; ইহা এক অর্থে ব্রাহ্মসমাজেরও নবজীবনের দিন। এই দিনের পর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ, এক ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের দ্বারা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত মানুষের একটি দল হইয়া, প্রকৃত পক্ষে একটি 'সমাজ' হইল; ইহার পূর্ব্বে কেবল উপাসনার সময়ে কতকগুলি লোক একত্র আসিয়া বসিত মাত্র। ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কথা এই যে, এই দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজ প্রকৃত পক্ষে 'ধর্ম্মসমাজ' হইল। একরূপ ধর্ম্মমতে বিশ্বাসী ও একরূপ সমাজরীতিতে শাসিত মানুষেরা স্বভাবের টানে ও প্রয়োজনের চাপে ক্রমশঃ আপনা-আপনি পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া যেরূপ একটি দল গঠন করে, ব্রাহ্মসমাজ শুধু সেরূপ একটি দল নহে, শুধু সেই অর্থে একটি সমাজ নহে। কিন্তু প্রত্যেক ব্রাহ্ম, ব্রাহ্ম হইবার সময়ে, সারাজীবন ঈশ্বরের নিকটে বিশ্বস্ত থাকিবেন বলিয়া ও সকল আচরণে স্বীয় ধর্ম্মের মহান্ আদর্শটি রক্ষা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারূঢ় হন, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ লক্ষণ। দেবেন্দ্রনাথের প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মব্রত গ্রহণ হইতে ব্রাহ্মসমাজে এই লক্ষণটি সংক্রান্ত হইল। তাই দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (৮৬ পৃষ্ঠা) বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার।"

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রবর্ত্তনের ফলে ব্রাহ্মসমাজে ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত উৎসাহের এক মহা তরঙ্গ উঠিল; সেই তরঙ্গের আঘাতে বঙ্গের চতুর্দ্দিকে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে ব্রাহ্মসমাজসকল স্থাপিত হইতে লাগিল। ১৮৫০ সালে প্রতিজ্ঞাপত্র সংশোধিত হইয়া 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের' স্থলে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ বসিল। তখন হইতে এই উৎসাহতরঙ্গ আরও বর্দ্ধিত হইল; ১৮৫৬ সাল পর্য্যন্ত আরও সতেজে নব নব ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের কাজ চলিতে লাগিল। যাঁহারা মনে করেন, সংস্কারবিমুখ হইয়া দেশবাসীকে সন্তুষ্ট করিলেই লোকবৃদ্ধি হয়, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের এই সকল কথা ভাবিয়া দেখিবেন।

প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের নব জন্ম লাভ হইয়াছিল। প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণ প্রবর্ত্তনের দ্বারাই ব্রাহ্মসমাজেও নব জীবনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কোনও ধর্ম্মে প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে বাঁধিবার ভাবটি না থাকিলেও সে-ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচারিত হওয়া অসম্ভব নহে; এমন কি, সে-ধর্ম্ম একটি বিজয়ী ধর্ম্মরূপেও জগতে দণ্ডায়মান হইতে পারে। কিন্তু তাহা **ধর্ম্ম জীবনের** জন্ম দান করিতে পারে না।

এই দীক্ষার দিনে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান্ হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃত লাভ করিব।" বিশ্বাসীর এই আশা, এই ভবিষ্যদ্‌বাণী, সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের ভক্তগণের সাধকগণের ও বীর-হৃদয় সেবকগণের জীবন-ধারা, ব্রাহ্মসমাজের নানা বিভাগে প্রসারিত কর্ম্মক্ষেত্র, আজ তাঁহার ঐ কথার সাক্ষ্য দিতেছে।

এই ৭ই পৌষ দিনটিকে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ একটি স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য করিলেই ঠিক হয়। দেবেন্দ্রনাথের উত্তরকালের সাধনক্ষেত্র 'শান্তিনিকেতনে' তাঁহার ইচ্ছাক্রমে এই দিনে প্রতি বৎসর একটি উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে। তথায় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে এই দিনটি বিশেষ ভাবে সম্মানিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মহর্ষির এই দীক্ষার দিনটির বিষয়ে বলিয়াছেন, "শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি

উদ্ঘাটন ক'রে দেখি, তবে দেখ্‌তে পাব, এর মধ্যে সেই বীজ অমর হ'য়ে আছে, যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে; সে হচ্ছে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্য ফল্‌চে, এবং আমাদের আগামী কালের উত্তরবংশীয়দের জন্য ফল্‌তেই চল্‌বে।...

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃত পুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ ক'রে গিয়েছেন, তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত ক'রে কি রকম ক'রে প্রকাশ পেয়েছে, তা কারও অগোচর নেই। তার পরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয় নি। আজও সে বেঁচে আছে; শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হ'য়ে উঠ্‌চে।...

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল, তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান, তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনীগৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছে। এই সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি ক'রেছে, এবং এখনও প্রতিদিন একে সৃষ্টি ক'রে তুল্‌চে।" (অজিত, ৮৬—৮৮)।

২৫

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পদ্ধতির ও প্রতিজ্ঞার নানা পরিবর্ত্তন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন (আত্মচরিত, ৬৩ পৃঃ), "ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্র যে কত পরিবর্ত্তন ও সংশোধনের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন যে, ব্রাহ্মসমাজে ১৮৪৪ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বিধি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল, এবং দীক্ষাকালে ব্রাহ্মণ দীক্ষার্থীগণকে

শিখা ও সূত্র ত্যাগ করিতে হইত। দীক্ষার পর তাঁহারা তাহা পুনর্গ্রহণ করিতেন। মধ্যে কিছুকাল দীক্ষার সময় ধূপাধারে ধূপ জ্বালাইয়া তাহার আগুনে যজ্ঞোপবীত দগ্ধ করা হইত। দীক্ষার্থীকে একটি আংটি দেওয়া হইত; তাহাতে 'ওঁ তৎসৎ' মন্ত্র খোদিত থাকিত[১]। শোনা যায় যে মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসরণে দেবেন্দ্রনাথ দীক্ষার্থীদিগকে মন্ত্রদানও করিতেন। ইহার অন্ততঃ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতে পারা যায়। কাঁচড়াপাড়ার জগচ্চন্দ্র রায় এবং লোকনাথ রায়ের অন্তঃপুরের মহিলাদিগকে এইরূপ মন্ত্র দিবার জন্য কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পণ্ডিত শ্রীধর ন্যায়রত্ন প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৮৫০ সালের পর এই সকল রীতি উঠিয়া গিয়াছিল।—(H.B.S.I. 96, 97.)

দীক্ষার সময়ে উপবীত ত্যাগ বিষয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিজের উক্তি ৫৩ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

এই সময়ের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন, (তত্ত্ববো. ১৮৩৭ শকের পৌষ সংখ্যা, ১৬৩—১৬৬ পৃঃ),—"তিনি [দেবেন্দ্রনাথ] প্রথম যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করিয়াছিলেন, শুনিয়াছি যে তাহাতে প্রতিদিন গায়ত্রীমন্ত্র দ্বারা অভুক্ত অবস্থায় ব্রহ্মোপাসনা করিবার বিধি ছিল। আমরা কিন্তু যে মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অভুক্ত অবস্থায় উপাসনা করিবার কথা উল্লিখিত দেখি না[২]। সেই প্রতিজ্ঞা-পত্র নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

ওঁ তৎসৎ।

অদ্য সপ্তদশশত —শকে, —দিবসে, —বাসরে, ব্রাহ্মের সম্মুখে, ঈশ্বরকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ জানিয়া একান্তচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,

১। বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

২। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী আনন্দস্বরূপ পরমেশ্বররূপে প্রতি-মাদি কোন ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুর আরাধনা করিব না।

---

(১) ৩৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) এই মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্র, ও দেবেন্দ্রনাথের নিজের দীক্ষাকালে ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র, অভিন্ন নয় বলিয়া বোধ হয়। দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষায় ব্যবহৃত প্রতিজ্ঞাপত্র মুদ্রিত না হইয়াও থাকিতে পারে। (আত্মজীবনী সম্পাদক)।

৩। প্রণব-ব্যাহৃতি-গায়ত্রীর অবলম্বন দ্বারা, এবং তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা, পরব্রহ্মের উপাসনাতে নিযুক্ত থাকিব।

৪। রোগ বা বিপদের দিবস ভিন্ন, প্রতি দিবস সূর্য্যোদয় পরে, মধ্যাহ্ন কালের মধ্যে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া, পবিত্র মনে পরব্রহ্মের স্বরূপ ভাবনা পূর্ব্বক, ন্যূন সংখ্যা দশবার প্রণব-ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী জপ করিব।

৫। প্রতি বুধবারে, প্রতি মাসের প্রথম রবিবারে, এবং প্রতি বৎসরের ১১ মাঘ দিবসে, দৈনিক উপাসনান্তে সূর্য্যাস্ত পরে অর্দ্ধরাত্রি মধ্যে, রোগ বা বিপদগ্রস্ত না হইলে, কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিয়া, একাকী বা বহুজন সঙ্গে তত্ত্বজ্ঞানের আবৃত্তি দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।

৬। সত্য কথা কহিব, এবং সত্য ব্যবহার করিব।

৭। লোকের অপকার যাহাতে হয়, এমত সকল কর্ম্ম করিব না।

৮। কুকর্ম্মসকল হইতে নিরস্ত থাকিব।

৯। যদি মোহদ্বারা কোন কুকর্ম্ম দৈবাৎ করি, তবে একান্তে তাহা হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিয়া, পুনর্ব্বার সে কর্ম্ম করিব না।

১০। কোন ব্রাহ্ম বিপদগ্রস্ত হইলে যথাসাধ্য তাঁহাকে সাহায্য করিব।

১১। আমার বংশে এই সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ করিব।

১২। আমার সাংসারিক তাবৎ শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মসমাজে দান করিব।

হে পরমেশ্বর, এই সকল প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা আমার প্রতি অর্পণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সাক্ষী শ্রী—

ব্রাহ্ম শ্রী—

উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে আমরা তদানীন্তন ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য অবগত হইতে পারি। প্রথম প্রতিজ্ঞা হইতে বুঝিতেছি যে ১৭৬৫ শকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের নাম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' হয় নাই, 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' ছিল। ...

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রতিজ্ঞাতে দেখি যে, ... গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণ করা, এবং পারমার্থিক উন্নতিকল্পে তাহারই শ্রেষ্ঠতা ঘোষণা করা, ব্রাহ্মণ রামমোহন রায়, ব্রাহ্মণ দেবেন্দ্রনাথ, এবং সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য ব্রাহ্মণ সভ্যদিগের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক হইয়াছিল। ... কিন্তু আমরা দেখি যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই উপরোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের পরিবর্ত্তে এক সহজসাধ্য, সাম্প্রদায়িক ভাব বিরহিত, উদারতম ভাবাপন্ন এবং সাধারণের গ্রহণীয় এই একটী প্রতিজ্ঞা স্থাপিত হইয়াছিল যে, 'রোগ বা বিপদের দ্বারা অক্ষম না হইলে প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতি পূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিব।'

চতুর্থ ও পঞ্চম প্রতিজ্ঞা হইতে দেখা যায় যে ব্রাহ্মদিগের ভিতরে জাতি-ভেদ উঠাইবার সূত্রপাত স্বরূপে, অন্তত উপাসনার সময়ে 'কোন বর্ণের চিহ্ন বিধিপূর্ব্বক ধারণ না করিবার' বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ...

অনেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার পর, নূতন উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া মুদ্রিত প্রতিজ্ঞাপত্রের পার্শ্বে নিজ নিজ মনোমত অনেক অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা হস্তাক্ষরে লিখিয়া রাখিতেন। ... একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করিব। ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের পিতা নন্দকিশোর বসু তাঁহার ১৭৬৬ শকের ১২ই চৈত্র দিবসে স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্রে চতুর্থ প্রতিজ্ঞার শেষে লিখিয়া রাখিয়াছেন, 'কোন দিবস নিয়মিত সময় মধ্যে কোন ব্যাঘাত প্রযুক্ত যদি দশবার জপ না করিতে পারি, তদ্দিবসে অন্য সময়ে কিংবা তৎপর দিবসে চিত্ত একাগ্র হইলে, জপ যে বক্রী থাকিবেক, তাহা সম্পূর্ণ করিব।' আবার দশম প্রতিজ্ঞার পার্শ্বে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, 'এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগেরও যথাসাধ্য উপকার করিব।' "

আদি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের যে প্রতিজ্ঞাপত্র এখন প্রচলিত, (যাহা 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়), তাহা সম্ভবতঃ ১৮৫০ সালে রচিত হইয়াছিল। (৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

২৬

দেবেন্দ্রনাথের সহদীক্ষিতগণের মধ্যে কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(১) শ্রীধর ভট্টাচার্য্য পরে ন্যায়রত্ন উপাধিতে ভূষিত হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য হন। (২,৩) জগচ্চন্দ্র রায় ও লোকনাথ রায় কাঁচ্ড়া-পাড়া নিবাসী ছিলেন, (৩৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। (৪) শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র। ইঁহার কথা আত্মজীবনীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ পঞ্চম ও দশম পরিচ্ছেদে আছে।

(৫) ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাতপুত্র, এবং (৬) গিরীন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

(৭, ৮) আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও তারকনাথ ভট্টাচার্য্য পরে বেদাধ্যয়নের জন্য দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক কাশীতে প্রেরিত হন। ইঁহাদের কথা আত্ম-জীবনীর নানা স্থানে, বিশেষতঃ অষ্টম, চতুর্দ্দশ, সপ্তদশ, ও বিংশ পরিচ্ছেদে আছে।

(৯) বাঁশবেড়ে নিবাসী হরদেব চট্টোপাধ্যায় অতি মহদন্তঃকরণের লোক ছিলেন। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ও মহামারীর সময়ে আর্ত্তসেবার কার্য্যে মত্ত হইয়া উঠিতেন। দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, ও দেবেন্দ্রনাথের বাটীতে আহার করিয়া স্বগ্রামে গিয়া সে কথা সতেজে স্বীকার করেন। গ্রামবাসীদের উৎপীড়নে অবশেষে ইঁহাকে সাঁতরাগাছিতে গিয়া বাস করিতে হয়। ইনি ইংরেজী জানিতেন না; তথাপি বেথুন সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, ও ইঙ্গিতে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া স্বীয় কন্যাদ্বয়কে তাঁহার স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। পরে ইনি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় ও চতুর্থ পুত্র হেমেন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন, ও সেজন্য পরিবারে ও সমাজে ইঁহাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়।

(১০, ১১) একবিংশ পরিশিষ্টে স্বনামখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্তের, ও ৩৮ তম পরিশিষ্টে লালা হাজারী লালের বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(১২) শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় দেবেন্দ্রনাথের পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজে আসিতেন, (পঞ্চবিংশতি, ২৪)। ইনি পরে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত গ্রন্থসভার সভ্য হন। ডফ্ সাহেবের সঙ্গে যখন দেবেন্দ্রনাথের তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, সেই সময়ে ইনি "Rational Analysis of the Gospel" নামে এক বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব খণ্ডিত হয় দেখিয়া ডফ্ সাহেব রাগিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন, "The irrational paralysis of the Gospel." (অজিত, ১৪৫)।

(১৩) চন্দ্রনাথ রায় দেবেন্দ্রনাথের একজন পারিষদ ছিলেন। ইঁহার নিবাস বাঁশবেড়ে গ্রামে ছিল। আত্মজীবনীর ৬৯ পৃষ্ঠায় ও ৩৭ পরিশিষ্টে (৩৯৫ পৃষ্ঠা) ইঁহার বিষয়ে উল্লেখ আছে।

২৭

দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে বিধির অনুবর্ত্তিতা ও শৃঙ্খলাপ্রিয়তা।

জীবনের সকল গুরুতর কার্য্যে বিধির অনুবর্ত্তিতা দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম-ব্রত গ্রহণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে—

১। সারা জীবনে কি ভাবে এই ব্রত পালন করা হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ চিন্তাপূর্ব্বক দেবেন্দ্রনাথ এমন একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী নির্দ্ধারণ করিলেন, যাহাতে সেই ব্রত বিষয়ে কোনও রূপ অস্পষ্টতা না থাকে, কিংবা ব্রতপালন বিষয়ে শিথিলতা আসিবার কোনও সুযোগ না ঘটে।

"প্রতিদিন (ক) 'প্রাতে' (খ) 'অভুক্ত অবস্থায়' (গ) 'দশ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা' ব্রহ্মোপাসনা করিব,"—এই প্রতিজ্ঞাটির ভিতরে সকল কথাই অতি স্পষ্ট। ইহার পরে দেবেন্দ্রনাথ যে-সংশোধিত প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন, (যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হয়,) তাহাতে সারা জীবনে পালনীয় সঙ্কল্পগুলি অতিশয় স্পষ্ট। তাঁহার রচিত ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি চিন্তার সুশৃঙ্খলায় ও ভাবের স্পষ্টতায় একটি আদর্শ পদ্ধতি।

দেবেন্দ্রনাথ নিজ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের দিনে ঐ ভাবে গায়ত্রীর দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা

করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনাপদ্ধতি স্বয়ং রচনা করা সত্ত্বেও, আজীবন কখনও সেই প্রথম প্রতিজ্ঞার অন্যথাচরণ করেন নাই। প্রতিদিন "প্রাতে, অভুক্ত অবস্থায়, দশ বার গায়ত্রী মন্ত্র জপের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা" তিনি কখনও ত্যাগ করেন নাই। তিনি নিজ রচিত নূতন পদ্ধতি অনুসারে দ্বিতীয় বার উপাসনা করিতেন। এই দ্বিতীয় উপাসনা কখনও কখনও প্রাভাতিক অভ্যস্ত দুগ্ধপানের পরে করিতেন; কিন্তু গায়ত্রীদ্বারা উপাসনা অভুক্ত অবস্থাতেই চিরদিন করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার জীবনে যখন দিনের পর দিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত (কখনও কখনও পুনরায় সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত) একভাবে ব্রহ্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া কাটিয়াছে, সে অবস্থাতেও তিনি ঐ দুই বারের নিয়মিত ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করেন নাই,—বিধির অনুবর্ত্তিতা তাঁহার মধ্যে এমনই দৃঢ় ছিল।

ইহাতে কেহ যেন মনে না করেন যে, দেবেন্দ্রনাথ কেবল প্রণালীবদ্ধ উপাসনার পক্ষপাতী ছিলেন, অথবা উপাসনাকালে উপাসকের চিন্তা ও ভাবকে মুক্তভাবে উৎসারিত হইতে দিবার বিরোধী ছিলেন। সাধক ঐরূপ মুক্তভাবে ঈশ্বরের সঙ্গ সাধন করিলেও, তাঁহার উপাসনাতে এমন একটু অংশ থাকা আবশ্যক, যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত কিংবা পরিত্যক্ত হইবে না, যাহা সাধককে আজীবন বিধির দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে,—দেবেন্দ্রনাথের এই ভাব ছিল।

২। তৎপরে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিনে, যবনিকা, বেদী, আসন, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের উপযুক্ত পরিচ্ছদ, নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য, প্রভৃতির দিকে দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। যাহাতে অনুষ্ঠানাদির বাহ্য আকার তাহার গুরুত্বের অনুরূপ হয়, এবং সকলের চিত্তে সম্ভ্রমের ভাবের উদয় করে, এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি থাকিত।

৩। দেবেন্দ্রনাথ অনুভব করিতেন যে একজন গুরুস্থানীয় মান্য ব্যক্তির নিকটে স্বীয় সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়া, এবং তাঁহাকে সে সঙ্কল্পের সাক্ষী করিয়া, ব্রত গ্রহণ করিলে তাহা অধিক দৃঢ় হয়। তাই তিনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের কাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিলেন। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, প্রতিজ্ঞাপত্রটি দেবেন্দ্রনাথের নিজের রচিত, প্রতিজ্ঞাগ্রহণের

আগ্রহ দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়েই প্রথম সমুদিত, এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের অপেক্ষা দেবেন্দ্রনাথের চিত্তই ব্রাহ্মধর্ম্মপালনের দৃঢ়তায় ও সাহসে স্থিরতর; তথাপি তিনি বিধিরক্ষার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও বিনয় সহকারে বিদ্যাবাগীশের নিকটে ব্রতগ্রহণ ও উপদেশ যাচ্ঞা করিলেন।

জীবনের গুরুতর কার্য্যে এইরূপ বিধির অনুবর্ত্তিতার সহিত, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল কার্য্যে শৃঙ্খলাপ্রিয়তাও দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। যাহাতে সকল কাজ ভ্রমশূন্য, সম্পূর্ণ, সুশৃঙ্খল, ও সুন্দর হয়, সে বিষয়ে আজীবন তাঁহার জাগ্রত দৃষ্টি ছিল। পাঠ, মন্ত্র উচ্চারণ, গান প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি সর্ব্বদা এই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, এবং যথাশক্তি অপরকেও শিথিল হইতে দিতেন না। (৩৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ্ পাঠ করিবার সময়ে তিনি একজন দ্রাবিড়ী বৈদিক ব্রাহ্মণের নিকট হইতে তাহার উচ্চারণ শিখিতেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ শ্রবণে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন, (৬২ পৃষ্ঠা)। আত্মজীবনীর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণিত তত্ত্ববোধিনী সভার বার্ষিক অধিবেশন দিনে, সব দরোজাগুলিকে ঠিক আটটার সময়ে একসঙ্গে খোলা, লাল বনাতে আবৃত বিশ জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণকে দুই সারিতে সজ্জিত করা, সমস্বরে বেদ পাঠের আয়োজন, এই সকল ব্যবস্থাতেও দেবেন্দ্রনাথের শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

২৮

দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসর।

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৯ সাল পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মচিন্তার ও ধর্ম্মভাবের বিকাশ এবং ধর্ম্মজীবনের ঘটনাবলী তাঁহার আত্মজীবনীতে যে ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এখানে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক সূচী প্রদত্ত হইতেছে।

(১) যত দিন দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করেন নাই, তত দিন তিনি আপনাকে অতি দুর্ভাগ্য বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। 'পৃথিবীর সকলেরই উপাস্য দেবতা আছে, আমার নাই,' এই অনুভব তাঁহাকে কঠিন দুঃখ দিতে-ছিল। ক্রমে তিনি একাগ্র ও ব্যাকুল চিন্তাদ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, ঈশ্বর আছেন, তিনি জ্ঞানময়, ও তিনি জগতের নিয়ন্তা। তখন তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কখনও নির্জ্জনে একাকী, কখনও বা ব্রাহ্মসমাজে বন্ধুগণ সহ, সেই মহান্ পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহার অন্তরের ক্ষোভ ও দুঃখ দূর হইল। (১৮৩৮—১৮৪৩; আত্মজীবনীর ৯৬ পৃষ্ঠা)।

(২) দীক্ষার পর তিনি নিজে গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিয়া দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু গায়ত্রীর অর্থ সকলে বুঝিতে পারিবে না, ইহা অনুভব করিয়া, সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত, এই চিন্তায় অচিরে তাঁহাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল। ইহার ফল, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্রহ্মোপাসনার জন্য দুই প্রকার পদ্ধতি রচনা। (১৮৪৪ সাল ; আত্মজীবনীর ৮৮—৯৪ পৃষ্ঠা)।

(৩) গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা দৈনিক উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ তিনি এই নূতন উপলব্ধিতে প্রবেশ করিলেন যে, ঈশ্বর শুধু **জগতেরই** নিয়ন্তা নহেন, কিন্তু তিনি **আমার** অন্তরে থাকিয়া আমাকেও চালাইবেন। "তাঁহার আদেশ বলিয়া আমার ধর্ম্মবুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হইতে লাগিল, তাহাতে আপনাকে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।" (১৮৪৪, ১৮৪৫ ; আত্মজীবনীর ৯৭—১০০ পৃষ্ঠা)।

ঈশ্বর যে মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষকে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করেন, ব্রাহ্মসমাজ এই কথা বলিয়া ভারতবর্ষের ধর্ম্মে একটী নূতন ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। শাস্ত্র নয়, গুরুর উপদেশ নয়, কিন্তু অন্তরবাসী দেবতার আদেশই যে মানুষের চালক, তাঁহার আদেশ যে শাস্ত্র দেশাচার প্রভৃতির অপেক্ষা অধিক পালনীয়, এ কথা ভারতে নূতন। বলিতে গেলে, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মতত্ত্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথা। এই কথাটি রামমোহন রায় তাঁহার বেদান্ত গ্রন্থে বলিয়াছিলেন, (৫২ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। দেবেন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্রের সাধনের দ্বারা এই মহাসত্যের আভাস পাইলেন, এবং ক্রমশঃ ইহার মূল্য

উপলব্ধি করিয়া ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের একটি বীজমন্ত্র বলিয়া অনুভব করিলেন। তিনি এই সময়ের তিন বৎসর পরে যখন এই তত্ত্বটিকে "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" স্ব-রচিত এই মহাবাক্যের ভিতরে নিবদ্ধ করিলেন, তখন ইহা দেশবাসীর হৃদয়কে যেন এক মুহূর্ত্তেই জয় করিয়া লইল। পরবর্ত্তী যুগে কেশবচন্দ্র 'বিবেক-বাণী' নামে এই তত্ত্বটিকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন।

(৪) ঈশ্বরকে অন্তরের নিয়ন্তা (অর্থাৎ বিবেকের অধিপতি) রূপে জীবনে স্থাপন করিবার পর দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন আরও বিকশিত হইল। তাহার ফলে, ঈশ্বরের প্রেমরঞ্জিত নিত্য সহবাস লাভের জন্য তাঁহার অন্তরে প্রার্থনার উদয় হইল, এবং ক্রমশঃ সে প্রার্থনা পূর্ণ হইল। "তাঁহার প্রেমের আভা আমার হৃদয়ে আসিতে লাগিল। ... আমার সৌভাগ্যের দিন উদয় হইল। আমি এখন প্রেম পথের যাত্রী হইলাম।" (১৮৪৫ ; আত্মজীবনীর ১০২ পৃষ্ঠা)।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীর এই অংশ (একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদ) অতিশয় মূল্যবান্। ইহা গভীর প্রণিধানের সহিত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। ইহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের বিকাশের ক্রম এইরূপ :—প্রথম, ঈশ্বরের স্বরূপ জানা; তৎপরে, ঈশ্বরের আদেশের অধীন হওয়া; তৎপরে, ঈশ্বরের প্রেম অনুভব করা ও তাঁহার নিত্য সহবাস লাভ করা। **দেবেন্দ্রনাথ প্রেমানুভূতিতে পৌঁছিলেন, ভাবচর্চ্চার পথ দিয়া নয়, আজ্ঞাধীনতার পথ দিয়া,**—ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। সারবান্ সুদৃঢ় ও ঘাতসহ ধর্ম্মজীবন লাভের ইহাই চিরন্তন পদ্ধতি।

(৫) দৈনিক ধর্ম্মসাধনে নিষ্ঠার ফলে, যে-উপনিষদ্ হইতে তিনি স্বীয় ধর্ম্মজীবনে পূর্ব্বে এত সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তরে সেই উপনিষদের প্রতি নির্ভর অধিক বর্দ্ধিত হইল, ও তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের প্রধান সহায় হইবে, এই আশার উদয় হইল। (আত্মজীবনী, ১০৭ পৃষ্ঠা)।

(৬) ১৮৪৬ সাল হইতে দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনের সঙ্কল্প হইতে উত্থিত পরীক্ষাসকল আসিতে লাগিল। এই বৎসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। দেবেন্দ্রনাথ অপৌত্তলিক ভাবে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

সম্পন্ন করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। এই সঙ্কল্প রক্ষা করিতে গিয়া তাঁহাকে সকল আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইল।

ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ধর্ম্মকে ও সত্যকে রক্ষা করিবার জন্য সমাজের গঞ্জনা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরাগ অনেককেই সহ্য করিতে হইয়াছে, সহস্রের সম্মুখে একাকী অনেককেই দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছে। রামমোহন রায়ের পরে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের এই শ্রেণীর ধর্ম্মবীরগণের পথপ্রদর্শক হইয়াছিলেন। সেই যুগে এই সংগ্রামে তাঁহার সঙ্গী ও সহায় প্রায় কেহই ছিলেন না। তাঁহার সম্মুখে রামমোহনের বাল্যস্মৃতি মাত্র ছিল, আর কাহারও দৃষ্টান্ত ছিল না। তিনি স্বভাবতঃ নম্র ও ধীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন; সংস্কারকের উত্তেজনা তাঁহার ভিতরে ছিল না। কেবল ঐকান্তিক ধর্ম্মপ্রাণতাই তাঁহাকে এই সংগ্রামে এই অপূর্ব্ব বীর্য্য প্রদান করিয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে (১২৬ পৃষ্ঠা) এই সংগ্রামের বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিতেছেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।" এ বিষয়ে ৩৯ পরিশিষ্ট (৩৯৮—৪০৩ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

(৭) পিতার ব্যবসায়ের পতনের পরে যখন বিষম ঋণভার স্কন্ধে পড়িল, তখন দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালনের দ্বিতীয় পরীক্ষা উপস্থিত হইল। তিনি আত্মীয়গণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া প্রথমতঃ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, পিতৃকৃত ট্রষ্ট্ ডীডের সুবিধা গ্রহণ করিয়া নিরপরাধ উত্তমর্ণগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না, সমগ্র সম্পত্তিই উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিতে হইবে। আইনতঃ অসম্ভব বলিয়াই তাহা করা হইল না। তৎপরে প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়গণ সনির্ব্বন্ধে তাঁহাকে ইন্‌সল্‌ভেন্সি লইতে পরামর্শ দেন; তাহাও তিনি ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। (১৮৪৮ সালের প্রথম ভাগ; আত্মজীবনীর ১৪৭—১৪৯ পৃষ্ঠা, ও ৪১ পরিশিষ্টের ৪০৪—৪০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

(৮) সম্পত্তিনাশে দেবেন্দ্রনাথ দুঃখিত না হইয়া আনন্দিতই হইলেন। দ্রুতবেগে ব্যয়সঙ্কোচের ব্যবস্থাসকল করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম

জীবনের বৈরাগ্য আবার নূতন ভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি অনুভব করিলেন, ধর্ম্মজীবনের আর এক সোপানে আরোহণ করিলাম, (৮ পরিশিষ্ট)। রিক্ততার আনন্দে হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া, বিপুল ঋণশোধের উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের ভিতরেও তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে ধর্ম্মচিন্তায় শাস্ত্রাধ্যয়নে ও ধর্ম্ম-গ্রন্থপ্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন। (১৮৪৮ সালের দ্বিতীয়ার্দ্ধ; আত্মজীবনীর ১৫০, ১৫১ পৃষ্ঠা)।

(৯) ১৮৪৭ সালে দেবেন্দ্রনাথ কাশীতে গিয়া বেদ শ্রবণ করিয়া আসিয়া-ছিলেন (আত্মজীবনী, ১৩২ পৃষ্ঠা)। তদুপরি এই সময়ের গভীর অভিনিবেশ-পূর্ব্বক বেদ ও উপনিষদ্ আলোচনা হইতে দুইটি গুরুতর ফল উৎপন্ন হইল, (আত্মজীবনী, ১৮, ২০, ও ২২ পরিচ্ছেদ)। প্রথম, ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালীতে তৃতীয় বাক্য 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যোগ করা হইল। দ্বিতীয়, উপনিষদে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি হইতে পারিবে না, এবং জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি, দেবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

(১০) যখন কোনও প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি করা গেল না, তখন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায় হইবে, এই চিন্তা দেবেন্দ্র-নাথের চিত্তকে অধিকার করিল। এই চিন্তায় চালিত হইয়া তিনি ক্রমে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করিলেন। (১৮৪৮ সাল; আত্মজীবনী, ২৩ পরিচ্ছেদ)।

দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই বৎসরটির কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই ১৮৪৮ সালেই ব্যবসায় পতনের বজ্রাঘাত; উত্তমর্ণদের হাতে ট্রষ্ট্ সম্পত্তি সমর্পণের অপূর্ব্ব মহত্ত্বপূর্ণ সঙ্কল্প; সেজন্য আত্মীয়গণের বিরাগের তুমুল ঝটিকাবর্ত্তে পতিত হওয়া; ভোগবিলাসের সকল আয়োজন বিদায় করিয়া দিয়া অনভ্যস্ত দারিদ্র্যের জীবনে প্রবেশ; তদুপরি এই অবস্থার ভিতরে ধর্ম্মচিন্তায় ও শাস্ত্রাধ্যয়নে গভীরভাবে নিমগ্ন হইয়া ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতির সংস্কার, 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করা, এবং ঋগ্বেদের অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করা,—এই সকল গুরুতর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। এটি তাঁহার জীবনের একটি অতি আশ্চর্য্য ও অতি গৌরবময় বৎসর!

(১১) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা, খ্রীষ্টিয় প্রচারকগণের আক্রমণের বিরুদ্ধে বেদ বেদান্তের পক্ষ সমর্থন, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে একনিষ্ঠ অনুরাগ, ও নানা স্থানে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন,—এ সকলের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথের খ্যাতি ক্রমশঃ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছিল। তদুপরি পিতৃশ্রাদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা, এবং পিতার ব্যবসায়ের পতন ও ঋণ শোধের ব্যাপারে তাঁহার সাধুতা এবং সত্যনিষ্ঠা দর্শনে কতকগুলি লোক তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাহার ফল,—ক্রমে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের অনেকগুলি ধর্ম্মবন্ধু লাভ। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান-রাজ মহ্‌তাব্‌ চন্দ্‌ ও কৃষ্ণনগর-রাজ শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গে মিলনের কথা তিনি নিজেই আত্মজীবনীর একবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩৭ পরিশিষ্টে তাঁহার অন্যান্য ভক্ত বন্ধুদের কথা কিঞ্চিৎ বিবৃত হইল।

(১২) দেবেন্দ্রনাথের জীবনের এই সকল সংগ্রামের ফলে তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু-গণের সঙ্গে সম্বন্ধ গাঢ়তর হইল, ও ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাদিতে নূতন সরসতার আবির্ভাব হইল। ধর্ম্মরাজ্যের ইহাই চিরন্তন নিয়ম। ঈশ্বরের চরণে মানবের বিশ্বস্ততা যখন সমধিকভাবে উজ্জ্বল হয়, তখনই ধর্ম্মসমাজে সজীবতার দিন আসে। ১৮৪৯ সালের মাঘোৎসব নূতন সরসতার সহিত সম্পন্ন হইল। তাহাতে ফেনেলন রচিত নূতন একটি স্তোত্র পাঠ করা হইল; তাহা শ্রবণ করিয়া অনেক উপাসক ভাবে মগ্ন হইয়া অশ্রুপাত করিলেন। "ইহার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে এ প্রকার ভাব কখনই দেখা যায় নাই। পূর্ব্বে কেবল কঠোর জ্ঞানাগ্নিতেই ব্রহ্মের হোম হইত, এখন হৃদয়ের প্রেমপুষ্পে তাঁহার পূজা হইল।" (আত্মজীবনী, ২৪ পরিচ্ছেদ)।

[এই পরিশিষ্টের বর্ণনীয় কালের মধ্যেই অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তের অভ্রান্ততা বিষয়ে তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়, ও তাহার ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বেদান্তে নির্ভর পরিত্যাগ করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে এই বেদান্ত পরিত্যাগ একটি বৃহৎ ঘটনা, এবং ইতিবৃত্ত-লেখকগণ ইহার বর্ণনাসূত্রে দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারকে পরস্পরের প্রতিপক্ষরূপে দণ্ডায়মান করেন। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনে এই ব্যাপার একটি গুরুতর সংগ্রামের আকারে উপস্থিত হইয়াছিল।

কিন্তু আত্মজীবনীতে দেখিতে পাই, দেবেন্দ্রনাথ সে ভাবে ইহার বর্ণনা করেন নাই। "বেদান্ত অভ্রান্ত কি না" এই প্রশ্ন নয়, কিন্তু "বেদান্ত আমাদের ধর্ম্মের ভিত্তি হইবে কি না" এই প্রশ্ন দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকে আলোড়িত করিয়াছে। বেদান্তপরিত্যাগরূপ ব্যাপারকে তিনি এ গ্রন্থে তাদৃশ প্রাধান্য দান করেন নাই। ইহার কারণ কি? আমার মনে হয়, ইহার কারণ এই যে, আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল, প্রধানতঃ নিজ ধর্ম্মজীবনের গতি বর্ণনা করা। তিনি ক্রমশঃ কিরূপে ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের সঙ্গ ও ঈশ্বরের করুণা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার পাঠ চিন্তা ও ভ্রমণ কিরূপে তাঁহাকে এই পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, তাহাই এ গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। তাই এ গ্রন্থে বেদান্ত-বিষয়ক ঐ তর্কবিতর্কের কোন উল্লেখ নাই। সেই যুগের বৃত্তান্তের ভিতরে এ গ্রন্থে কোথাও তিনি আপনাকে বিবদমান দুই পক্ষের একতম পক্ষ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, বেদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই পরিশিষ্টে দেবেন্দ্রনাথের এই ভাবই অনুসরণ করা হইল। ৪৫ পরিশিষ্টে বেদান্ত পরিত্যাগ বিষয়ে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা হইবে।]

২৯

দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি রচনা ও তাহার ক্রমিক সংস্কারের সূচী।

১। ১৮৪৩ সালে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের সময় দেবেন্দ্রনাথ যে প্রতিজ্ঞাপত্র রচনা করেন, তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার প্রণালী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল,— "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক দশবার গায়ত্রী জপের দ্বারা পরব্রহ্মের উপাসনা করিব।" ইহা ব্যক্তিগত উপাসনা। (আত্মজীবনী, ৮৯ পৃষ্ঠা)।

২। ১৮৪৪ সালে ঐ প্রতিজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিয়া এইরূপ স্থির করা হইল যে, "প্রতিদিবস শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ব্বক পরব্রহ্মে আত্মা সমাধান" করিতে হইবে। তাহার প্রণালী, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ও 'আনন্দ-

রূপমমৃতং যদ্বিভাতি,' এই দুই বাক্য শ্রদ্ধাপূর্ব্বক উচ্চারণ ও চিন্তা। ইহাও ব্যক্তিগত উপাসনা। (আত্মজীবনী, ৮৯ পৃষ্ঠা)।

৩। ১৮৪৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার জন্যও একটি পদ্ধতি রচনা করেন, (আত্মজীবনীর ৯০—৯৪ পৃষ্ঠা)। তাহার অঙ্গসকল এই রূপ ছিল,—

(ক) সমাধান। সমাধানের দুই অংশ। প্রথম অংশে ঈশ্বর **আছেন,** এই কথা চিন্তা করিতে হইবে। এই চিন্তার অবলম্বন ঐ দুই উপনিষদ্-বাক্য। আত্মাতে তিনি 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' রূপে ও জগতে তিনি 'আনন্দরূপমমৃতং' রূপে প্রকাশিত আছেন, এই চিন্তা করিতে হইবে। এই দুই বাক্যের এই অর্থের কথা আত্মজীবনীর ১৫৬ পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে।

সমাধানের দ্বিতীয় অংশে ভাবিতে হইবে, ঈশ্বর **ক্রিয়াবান্** পুরুষ; তিনি বিশ্বের বিধাতা, স্রষ্টা, ও শাসনকর্ত্তা। এই অংশের অবলম্বন তিনটি উপনিষদ্-মন্ত্র। সে মন্ত্র তিনটি এই,—(১) 'স পর্য্যগাৎ শুক্রম্' ইত্যাদি, (ঈশ্বর বিধাতা); (২) 'এতস্মা জ্জায়তে' ইত্যাদি, (ঈশ্বর স্রষ্টা); (৩) 'ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি' ইত্যাদি, (ঈশ্বর শাসনকর্ত্তা)।

(খ) স্তোত্র। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্রহ্মস্তোত্র সংশোধন করিয়া 'নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়,' প্রভৃতি চারিটি শ্লোক প্রস্তত হইল। উপাসনাতে তাহা পাঠ করা হইত।

(গ) প্রার্থনা। 'হে পরমাত্মন্, মোহকৃত পাপ হইতে' ইত্যাদি বাংলা প্রার্থনাটি পাঠ করা হইত।

(ঘ) বেদপাঠ।
(ঙ) অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোকপাঠ।
} এ দুটি অঙ্গ রামমোহন রায়ের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল। (আত্মজীবনী, ৯৪ পৃষ্ঠা)।

['বক্তৃতা' (অর্থাৎ উপদেশ) পাঠ এ সকলের অতিরিক্ত; কিন্তু তাহা বোধ হয় সর্ব্বদা করা হইত না।]

৪। ১৮৪৮ সালে একটি গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল :—

(ক) সমাধানের প্রথম অংশে তৃতীয় বাক্য 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' যোগ করা হইল। (আত্মজীবনী, ১৫৬, ১৫৭ পৃষ্ঠা)।

[এখন হইতে সমাধানের প্রথম অংশে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, ও শান্তং শিবমদ্বৈতম্, এই তিনটি বাক্য হইল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ইহা ছিল না যে, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ, অমৃত, শান্ত, শিব, ও অদ্বৈত, এই আটটি স্বরূপকে লইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিন্তা বা আরাধনা করিতে হইবে। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, এই তিনটি বাক্যের দ্বারা সাধক ঈশ্বরকে (১) আত্মাতে, (২) জগতে ও (৩) আপনাতে আপনি স্থিত অবস্থায়,—এই তিন ভাবে বর্ত্তমান বলিয়া উপলব্ধি করিবেন। দেবেন্দ্রনাথের ইহাও অভিপ্রায় ছিল না যে, ব্রাহ্মগণ উপাসনাকালে 'স পর্য্যগাৎ' প্রভৃতি **ক্রিয়াবান্** ঈশ্বরের স্বরূপ-দ্যোতক মন্ত্রগুলিকে সমাধানের প্রথমাংশের **বর্ত্তমানতা**-দ্যোতক মন্ত্রগুলির অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থানে রাখিবেন, অথবা সেগুলিকে একেবারেই বর্জ্জন করিবেন। সমাধানের এই উভয় অংশ দেবেন্দ্রনাথ-প্রদর্শিত ঈশ্বরারাধনাতে সমান মূল্যবান্।

আবার, এই দুই অংশে যে-ঈশ্বরকে সাধক বর্ত্তমান ও ক্রিয়াবান্ বলিয়া অনুভব করিলেন, ধ্যানে (গায়ত্রী মন্ত্রের সাহায্যে) তাঁহাকে **নিজ জীবনের নিয়ন্তা ও চালক** রূপে দর্শন করিবেন। ঈশ্বর আছেন, ঈশ্বর ক্রিয়াবান্, ঈশ্বর আমার জীবনের চালক, এই তিন উপলব্ধি লইয়া দেবেন্দ্রনাথ-রচিত ব্রহ্মোপাসনা সম্পূর্ণ হয়।]

(৫) ১৮৪৮ সালের পরে, অর্থাৎ 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' প্রকাশের পরে, এই সকল পরিবর্ত্তন করা হইল :—

(খ) 'নমস্তে সতে তে', এই স্তোত্রের পরে তাহার বাংলা অনুবাদ যোগ করা হইল। (আত্মজীবনী, ৯৪ পৃষ্ঠা)।

(গ) প্রার্থনাতে 'অসতো মা সদ্গময়' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রার্থনাটি যোগ করা হইল। (আত্মজীবনী, ১৮৬ পৃষ্ঠা)।

(ঘ) বেদপাঠের পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসকল পাঠ করা হইবে, এরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। (আত্মজীবনী, ১৮৬ পৃষ্ঠা)। এই প্রথম অধ্যায়ের মন্ত্রসকল এই জন্য উদাত্ত অনুদাত্তাদি স্বরচিহ্ন-যুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের পুরোভাগে ব্রহ্মোপাসনাপ্রণালীর মধ্যে 'স্বাধ্যায়' নামে মুদ্রিত হইতেছে।

(ঙ) 'অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোক পাঠ'ও অতঃপর 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' হইতেই করা হইতে লাগিল। (আত্মজীবনী, ঐ পৃষ্ঠা)।

৬। ১৮৫৯ সাল। অর্চ্চনা ('ওঁ পিতা নোঽসি' প্রভৃতি তিনটি যজুর্ব্বেদের মন্ত্র), প্রণাম ('যো দেবোঽগ্নৌ' ইত্যাদি), ধ্যান (গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বনে), এবং উপসংহার ('য একোঽবর্ণঃ' ইত্যাদি),—এই অংশগুলি দেবেন্দ্রনাথ হিমালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে যোগ করেন। এজন্য আত্মজীবনীতে এসকলের উল্লেখ নাই। ১৮৫৯ সালে (১৭৮১ শকে) ও তাহার পরে এই সকল অংশ ক্রমে ক্রমে যুক্ত হয়। "১৭৮১ শকে উপাসনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইল", (ঈশান, ৭৭)।

৩০

গায়ত্রী, রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ।

'তৎসবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' এটি ঋগ্বেদের ৩।৬২।১০ সংখ্যক মন্ত্র। ইহার দেবতা সবিতৃদেব। ঋক্-মন্ত্র সকল রচিত হইবার পর যখন পুরোহিতগণ নানাবিধ যজ্ঞ ও তাহার সংস্পৃষ্ট নানা জটিল অনুষ্ঠান সকল উদ্ভাবন করেন, তখন এই মন্ত্রটির পুরোভাগে 'ওঁ', এবং 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিন ব্যাহৃতি (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত মন্ত্র), যোজনা করা হয়, এবং সমগ্র মন্ত্রটিকে ব্রাহ্মণদিগের দৈনিক সন্ধ্যাবন্দনার কেন্দ্রস্থানে স্থাপন করা হয়। এই গৌরবময় স্থান লাভ করিবার পর হইতে এই ঋক্ 'সাবিত্রী' নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাকে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় বেদের সার বলিয়া বর্ণনা করেন। কোনও কারণে তাঁহারা সমগ্র সন্ধ্যা পূজা সমাপন করিতে অশক্ত হইলে কেবল এই মন্ত্রটি জপ করিবেন, এই রূপ বিধি আছে।

এই মন্ত্রটির ছন্দ, গায়ত্রী। গায়ত্রীতে আট অক্ষরের তিন চরণ থাকে। এই মন্ত্রের প্রথম চরণের 'বরেণ্যং' শব্দটি 'বরেণিঅং' এই রূপ পড়িতে হইবে; তাহা হইলে আট অক্ষর ঠিক বুঝিতে পারা যাইবে। লৌকিক সংস্কৃতে গায়ত্রী ছন্দের ব্যবহার নাই। বহুযুগ হইতে একমাত্র এই মন্ত্রটি ব্রাহ্মণগণের নিকটে

গায়ত্রী ছন্দের পরিচয় দিতেছে; তাই এই মন্ত্রের প্রকৃত নাম 'সাবিত্রী ঋক্' প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়া, ইহা 'গায়ত্রী' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

গায়ত্রীর বৈদিক অর্থ এইরূপ ছিল,—"আমরা সেই সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ (অথবা তেজোময় রূপ) ধ্যান করি; যেন (তাহার ফলে) তিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন।"

ঋগ্বেদের ঋষিগণ যখন সূর্য্যকে জগতের তাবৎ জীবনীশক্তির ও জীবন-ক্রিয়ার প্রেরয়িতা রূপে অনুভব করিতেন, তখন 'সবিতৃদেব' এই নামে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। গায়ত্রী বা সাবিত্রী মন্ত্র আদিতে এই সবিতৃদেবের উদ্দেশেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মন্ত্র যে ইহার উপাসকগণকে অতি প্রাচীন কাল হইতেই সূর্য্যপূজার নিম্ন স্তর অতিক্রম করিয়া এক চৈতন্যময় পরম সত্তার অনুভূতিতে উঠিতে সহায়তা করিয়াছে, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষিদিগের মুখে বহু যুগ ধরিয়া এই মন্ত্রে সেই পুরাতন সবিতৃ-দেবের নামই উচ্চারিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই কালের মধ্যেই ক্রমে এই নাম হইতে জড়-সূর্য্যের দ্যোতনা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। বৈদিক যুগের পরে, উপনিষদের মধ্য দিয়া, জড় জীব ও মানবাত্মার একত্বের যে-অনুভূতিটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রথম আভাস যেন আমরা এই মন্ত্রে দেখিতে পাই। তরুলতা ও জীবগণের জীবনে যে-দেবতার জীবনীশক্তির প্রেরণা, মানবের অন্তর্জীবনেও যে সেই দেবতারই জীবনীশক্তির প্রেরণা, উভয় রাজ্যের প্রাণভূত যে একই তেজ ও একই দেবতা, এই মহাসত্যের অরুণ উন্মেষ এই মহিমময় মন্ত্রে সূচিত হইয়াছে। এই মহাসত্য ভারতের সকল তত্ত্ববিদ্যার শিরোভূষণ।

রামমোহন রায় তাঁহার যে পুস্তকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে বলিয়াছেন, তাহাতে 'ওঁ' অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, এবং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' অর্থাৎ ত্রিলোকপ্রকাশক, ব্রহ্মকে, সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মানবের বুদ্ধিবৃত্তি নিচয়ের প্রেরয়িতা, এই উভয় রূপে দেখিতে হইবে, এই উপদেশ আছে।

দেবেন্দ্রনাথ এই গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা আজীবন ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলেন। (৩৭৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গায়ত্রীর সাহায্যেই তিনি এই উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর কেবল জগতের নিয়ন্তা নহেন; ঈশ্বর

মানবের অন্তরে থাকিয়া তাহার বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে, বিশেষতঃ ধর্ম্মবুদ্ধিকে, অনুপ্রাণিত করেন; (আত্মজীবনী, একাদশ পরিচ্ছেদ)। এজন্য দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনে গায়ত্রীর স্থান অতি উচ্চে। (৩৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তিনি স্ব-রচিত ব্রহ্মোপাসনা প্রণালীতেও (ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের পুরোভাগে যাহা মুদ্রিত হয়), ইহাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রথমে 'ঈশ্বর **আছেন**', ও তৎপরে 'ঈশ্বর **ক্রিয়াবান্**', এই দুই উপলব্ধির পরে, উপাসক যখন 'ঈশ্বর **আমার নিয়ন্তা ও প্রভু**' এই অনুভূতিতে প্রবেশ কারবেন, তখন তিনি গায়ত্রী মন্ত্র অবলম্বন করিবেন, দেবেন্দ্রনাথ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। (৩৮৫ পৃষ্ঠা)।

৩১

ব্রহ্মোপাসনা ও শব্দের অবলম্বন।

রামমোহন রায় ১৮১৭ সালে মাণ্ডূক্যোপনিষদের ভূমিকাতে এরূপ লিখিয়াছিলেন যে, ব্রহ্মোপাসনা করিতে হইলে বেদান্তবাক্য পাঠ ও তাহার অর্থচিন্তনই শ্রেষ্ঠ উপায়। তিনি ব্রহ্মোপাসনাকে সম্পূর্ণরূপে মননের ব্যাপার বলিয়াছিলেন। বেদান্তবাক্যের অর্থচিন্তন ও পরমাত্মা ও জীবাত্মার অভেদ চিন্তনই উপাসনা। এই উপাসনা কোনও বিশেষ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক করিতেই হইবে, এমন নহে। এই উপাসনার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান, কাল, বা পদ্ধতিও নাই। যে স্থানে ও যে সময়ে চিত্ত একাগ্র হয়, তাহাই উপাসনার স্থান ও কাল। এই নীরব মননই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। কিন্তু দুর্ব্বলাধিকারীর পক্ষে, ওঙ্কার একটি অবলম্বন হইতে পারে; দুর্ব্বলাধিকারী যদি ব্রহ্মচিন্তা করিতে গিয়া দেখে যে, নীরব হইলে তাহার মন স্থির থাকিতেছে না, তবে সে ক্রমাগত 'ওঁ' মন্ত্র জপ করিতে পারে।

১৮২৭ সালে রচিত 'গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্' পুস্তকে রামমোহন রায় বেদান্তবাক্যের পরিবর্ত্তে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়া ও তাহার অর্থ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। এ পুস্তকেও তিনি মন্ত্র জপ অপেক্ষা (নীরব মননকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন।

অর্থ না বুঝিয়া অথবা মনন না করিয়া, কেবল শব্দ উচ্চারণ অথবা মন্ত্র জপের দ্বারা সাধারণতঃ লোকে পরিমিত দেবতার উপাসনা করিয়া থাকে। একমাত্র চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনাও এই প্রণালীতে করা অসম্ভব নহে; কিন্তু সেরূপ করিলে তাহা যে অশ্রেষ্ঠ উপাসনা হইবে, রামমোহন রায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন।

রামমোহন রায় বলিয়াছিলেন, শব্দের অবলম্বন দুর্ব্বলাধিকারীর জন্য। কিন্তু দেখিতে পাই, দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত উপাসনাতেও শব্দের অবলম্বন অন্বেষণ করিয়াছেন, ও তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার কারণ কি?

ইহার একটি কারণ এই যে, দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি শিথিলতার ও বিশৃঙ্খলতার অতিশয় বিরোধী ছিল। একদিন হয়তো সম্পূর্ণরূপে, একদিন হয়তো আংশিকরূপে উপাসনা করা গেল, এবং একদিন হয়তো একেবারেই করা হইল না, এরূপ শিথিলতা, অথবা একদিন একটি বিশেষ প্রণালী দিয়া উপাসকের চিন্তা প্রবাহিত হইল, অপর দিন একেবারে তদ্বিপরীত প্রণালী দিয়া চলিল, এরূপ বিশৃঙ্খলা, দেবেন্দ্রনাথ ভাল বাসিতেন না। (৩৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

সংস্কারক রামমোহন প্রথমে আসিয়া উপাসনাকে সকল বাহ্য অবলম্বন হইতে মুক্ত করিয়া আন্তরিক ও স্বাধীন করিয়া দিলেন। তৎপরে সাধক দেবেন্দ্রনাথ সেই চিন্তাগত আন্তরিক উপাসনাকে বিশৃঙ্খলা ও শিথিলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সুনির্ব্বাচিত বাক্যের সাহায্যে একটি নির্দ্দিষ্ট আকার দান করিলেন।

৩২

উমেশচন্দ্র সরকারের সস্ত্রীক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ।

"উমেশচন্দ্রের বয়স ছিল চৌদ্দ বছর মাত্র, এবং তার স্ত্রীর বয়স ছিল এগারো। সুতরাং নাবালক বলিয়া আইনতঃ তাহার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার অধিকার উমেশের ছিল না। ইহার পূর্ব্বে এই রকমের

আর একটা বিচার সুপ্রীম কোর্টের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। ব্রজমোহন ঘোষ নামে একটি নাবালক ছেলে খৃষ্টান হইতে গিয়াছিল,—আদালত সেই ছেলেটিকে পাদ্রীদের হাত হইতে তাহার পিতার হাতে সমর্পণ করেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আদালত বলিলেন যে, 'বাপকে তো ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ডফ্ সাহেব নিষেধ করেন নাই; অথচ ছেলের যখন বাপের কাছে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই, তখন আদালত কেন তাহার উপর জবরদস্তি করিবেন?'...

ব্যাপারটা যতটুকুখানিই হোক্, কলিকাতার সমাজে আন্দোলনটা নিতান্ত সামান্য হয় নাই। তাহার একটা কারণ, নাবালক ছেলে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে তাহার অভিভাবক আইনের সাহায্য পাইবেন না, এই একটা আতঙ্ক সুপ্রীম কোর্টের বিচারে লোকের মনকে দোলা দিতেছিল। কিন্তু প্রধান কারণ, 'অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত' খৃষ্টান হইতে চলিল, এজন্য একটা উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ। এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অমন উত্তেজিত হইয়াছিলেন।" —(অজিত, ১৩৮)।

এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ডফ্ সাহেবের একখানি পুস্তকের প্রতিবাদ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। (৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

৩৩

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়।

"হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মচারিদিগের তালিকায় এই সকল নাম পাওয়া যায়,—শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, সভাপতি। শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, সত্যচরণ বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু নামে প্রসিদ্ধ), প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু নামে প্রসিদ্ধ), ব্রজনাথ ধর, মতিলাল শীল, রমানাথ ঠাকুর, রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নীলরতন হালদার, বীর নৃসিংহ মল্লিক, রমাপ্রসাদ রায়, নন্দলাল সিংহ, দুর্গাচরণ দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, কাশীনাথ বসু, হরিমোহন সেন, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, ও রাজকৃষ্ণ মিত্র,—অধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হরিমোহন সেন,—সম্পাদক। শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব,—ধনাধ্যক্ষ।

এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মাসিক সহস্র টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

সকল ক্ষেত্রেই এদেশের ভাগ্যলক্ষ্মীর একরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। Joseph Barretto and Sons, এই নামধেয় কুঠি দেউলিয়া হইলে যেমন হিন্দুকলেজের মূলধন নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি আশুতোষ বাবু ও প্রমথ বাবু দেউলিয়া হওয়াতে হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়েরও মূলধন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং উঁহার অন্তর্দ্ধান হইল।”—(ঈশান, ৩৬)।

৩৪

নন্দকিশোর বসু।

নন্দকিশোর বসুর জন্ম ১৮০২ সালে হয়। স্বীয় আত্মচরিতে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—“আমার পিতা নন্দকিশোর বসু রামমোহন রায়ের স্কুলে ইংরাজি পড়িয়াছিলেন।...স্কুল ছাড়িয়া দিনকতক রামমোহন রায়ের সেক্রেটারীর কার্য্য করেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রাথমিক শিষ্য ছিলেন।...আমার মাতামহ অন্য কন্যাকে দেখাইয়া আমার মাতা ঠাকুরাণীর সহিত আমার পিতার বিবাহ দেন। তাহাতে বাবা চটিয়া পুনরায় একটি বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করাতে রামমোহন রায় তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন যে, ‘গাছের ফলের দ্বারা গাছের উৎকৃষ্টতা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যদি তোমার এই স্ত্রীতে উত্তম পুত্র জন্মে, তবে তোমার এই স্ত্রীকে সুন্দরী বলিয়া জানিবে।’

পিতাঠাকুর প্রথমে দিন-কতক হরকরা আফিসে কেরাণীগিরি করিয়াছিলেন।...হরকরা আফিস ছাড়িয়া অন্য দুই এক জায়গায় কেরাণীগিরি করিয়া একুশ বৎসর বয়সে গাজিপুর Opium Agency Officeএ নিযুক্ত হয়েন।...তৎপরে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া কোন কোন আফিসে কর্ম্ম করিয়া ট্রেজারীতে নিযুক্ত হয়েন। তৎপরে দেবোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত জন্য

স্থাপিত Special Commission Officeএর হেড্ কেরাণী পদে নিযুক্ত হয়েন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইংরাজী ১৮৪৫ সালে, ৭ই ডিসেম্বর, ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পিতাঠাকুর অতিশয় খাঁটি লোক ছিলেন।...Special Commission Officeএ যখন নিযুক্ত ছিলেন, তখন...উৎকোচ লইলে অনেক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন, কিন্তু পয়সা লইতেন না। যেরূপ আয় ছিল, সেইরূপ ব্যয় করিতেন; তাঁহাকে বড়মানুষী করিতে কেহ দেখে নাই।... সকলেই তাঁহাকে তাঁহার সৎপ্রকৃতি ও অমায়িক স্বভাব জন্য অতিশয় সম্মান করিত ও ভালবাসিত। ইনি বেদান্ত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন। যখন ইঁহার মৃত্যু হয়, তখন শঙ্করভাষ্য আনাইয়া পড়িতে বলেন, এবং ওঁকার জপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করেন। মৃত্যুর পর দেখা গেল, তাঁহার বুড়া আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের উপর রহিয়াছে।"—(রাজ. ৭—৯)।

৩৫

রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ।

"যে দিন প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া (ইং ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন আমি স্বগ্রামের দুই এক জন বয়স্ক ব্যক্তিদিগের সহিত তাহা করি। যে দিন আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি, সে দিন বিস্কুট ও সেরী আনাইয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়। জাতি বিভেদ আমরা মানি না, উহা দেখাইবার জন্য ঐরূপ করা হয়। খানা খাওয়া ও মদ্য পান করা রীতির জের রামমোহন রায়ের সময় হইতে আমাদিগের সময় পর্য্যন্ত টানিয়াছিল; কিন্তু সকলেই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের দিন ঐ রূপ করিতেন এমন নহে।"— (রাজ. ৪৬)।

৩৬

দেবেন্দ্রনাথের কার্য্যে রাজনারায়ণ বসুর সহযোগিতা।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার আত্মচরিতে লিখিতেছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই পরম শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্রবাবুকে এক পত্র লিখি। দেবেনবাবু এই পত্র পাইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতে, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ আমার সহিত পরামর্শ করিতে ও তদ্বিষয়ে আমার সাহায্য লইতে, প্রত্যহ গাড়ী পাঠাইতেন। আমি গিয়া দেখি, আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ব্যবস্থাদর্পণ প্রণেতা বিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তখন তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু ইংরাজীতে উপনিষদ্ তরজমা করেন এবং শ্যামাচরণ বাবু বক্তৃতা করেন।·· ব্রাহ্মসমাজে বিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার ক্রমে প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাহার কার্য্য হইতে অবসৃত হইলেন। ১৮৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস, এমনি সময়ে আমি তত্ত্ববোধিনী সভা দ্বারা উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদকের কর্ম্মে ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হই। ঐ কার্য্য ছয় মাস করিলে তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হই।...উপনিষদের অনুবাদকের কার্য্য করিবার সময় দেবেন্দ্রবাবু উপনিষদের শ্লোক আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেন, ও আমি তাহা ইংরাজীতে অনুবাদ করিতাম। সন্ধ্যায় উপনিষদ্ তরজমা করিতে করিতে শ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্রবাবু আমাকে জাগাইয়া খাওয়াইতেন। সে সকল বন্ধুত্বের কার্য্য কখনই ভুলিবার নহে।"—(রাজ. ৪৭—৫০)।

দশ বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ এই সকল কথা স্মরণ করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে এক পত্র লিখেন, (পত্রাবলী, ১৬)। তাহাতে আছে, "দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ফরাসডাঙ্গাতে তোমার সহিত বাস করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাহা জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তুমি উপনিষৎ ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদ করিয়া এক রাত্রি এমনি নিদ্রাগত অভিভূত হইয়াছিলে যে, রাত্রিকালে যে আহার করিলে তাহা প্রাতঃকালে আমরা বলিলেও তোমার তাহা স্মরণ হইল না।"

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় আরও বলিতেছেন,—"আমার কৃত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমি কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক, ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তরজমা করি।...দেবেন্দ্রবাবু আমাকে 'ইংরাজী খাঁ' বলিয়া জানিতেন; বাঙ্গলা ভাল জানি বলিয়া তিনি জানিতেন না। এক দিন আমার প্রথম বক্তৃতা...রচনা করিয়া দেবেন্দ্র-বাবুর তাকিয়ার নীচে রাখিয়া বাসায় চলিয়া আসি। তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রবাবু কি না মনে করিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার পর দিন স্পন্দায়মান হৃদয়ে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার নিকট ঐ বক্তৃতা সম্বন্ধে এরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে তাহা বর্ণনাতীত! সেই অবধি বক্তৃতার পর বক্তৃতা সমাজে আমা দ্বারা করা হইতে লাগিল। পূর্ব্বে সমাজে যেরূপ বক্তৃতা হইত (সে সকল বক্তৃতাকারীর মধ্যে অক্ষয় বাবু একজন), তাহা জ্ঞান-প্রধান ছিল। আমার উক্ত বক্তৃতা সকলের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রীতিভাব প্রথম সঞ্চারিত হয়, এই গৌরব বোধ হয় আমি দাওয়া করিতে পারি। আমি এরূপ প্রীতিভাবের বক্তৃতা যে লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, তাহার একটি কারণ আমার পারশি শিক্ষা।"—(রাজ. ৫১,৫২)।

৩৭

দেবেন্দ্রনাথের বন্ধুগণসঙ্গে ধর্ম্মচর্চ্চা ও বন্ধুপ্রীতি।

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে আপনার বন্ধুবৎসলতা ও বন্ধুসঙ্গচর্চ্চার বিষয়ে প্রায় কিছুই লিখেন নাই। তাঁহার সমান বন্ধুবৎসল মানুষ অতি অল্পই দেখা যায়। রাজনারায়ণ বাবুকে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। আজীবন রাজনারায়ণ বাবুর অসুস্থতায়, ব্যয়সাধ্য গার্হস্থ অনুষ্ঠানাদিতে, গৃহনির্ম্মাণে, প্রীতির সহিত অর্থসাহায্য করিয়াছেন। তিনি যাহাকে যাহাকে ভাল-বাসিতেন, সকলকেই এইরূপ প্রাণ খুলিয়া অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। মহর্ষির পত্রাবলী পড়িলে বুঝিতে পারা যায়, রাজনারায়ণ বাবুর প্রতি, বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি, শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে কি গভীর ভালবাসা ছিল।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজনারায়ণ বসুর সহিত তাঁহার যোগ হওয়ার পর প্রায়ই তিনি ইঁহাদিগকে ও অন্যান্য বন্ধুগণকে লইয়া তাঁহার বাড়ীতে ঘনিষ্ঠ ব্রহ্মপ্রসঙ্গ, সঙ্গীত, প্রভৃতিতে কালযাপন করিতেন। এই দিনগুলি তাঁহার পক্ষে বড়ই আনন্দের দিন হইত। আত্মজীবনীর ১৫১ পৃষ্ঠায় নিজ বাটীর ছাতের উপরে কম্বল পাতিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনার, এবং ৮৬, ২১৬, ও ২২২ পৃষ্ঠায় গোরিটিতে ও বরাহনগরে গঙ্গাতীরের বাগানে বন্ধুগণসহ ধর্ম্মপ্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। বাগানে বন্ধুদিগের সহিত এইরূপ মিলনে তিনি অতিশয় আনন্দলাভ করিতেন।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বীয় আত্মচরিতে লিখিয়াছেন,—"সমাজে হারমোনিয়ম ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে একর্ডিয়ন (accordion) দিনকতক ব্যবহার করা হইয়াছিল। কঠোপনিষদের যে শ্লোকের প্রথমে আছে, 'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য' সেই শ্লোক একর্ডিয়নে গাওয়া হইত। এক এক দিন দেবেন্দ্রবাবুর বাটীতে সন্ধ্যার পর এইরূপ গাওনাতে বড় আনন্দ হইত। কিরূপ আনন্দ হইত, তাহা এই নিম্নের লিখিত গল্প দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। চন্দ্রনাথ রায় নামে দেবেন্দ্রবাবুর একটি পারিষদ ছিলেন। ইঁহাকে দেবেন্দ্রবাবু পরে একটি নায়েবি কর্ম্ম দেন। ইঁহার বাটী বংশবাটী গ্রামে ছিল। ইনি এক রাত্রি বাসায় ফিরিয়া না যাইতে পারাতে দেবেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় শয়ন করিয়াছিলেন। পার্শ্বের ঘরে দেবেন্দ্রবাবু শুইয়াছিলেন। ঐ রাত্রিতে সন্ধ্যার পর বড় ব্রহ্মানন্দ হয়। দুই প্রহর রাত্রি বেলায় দেবেন্দ্রবাবু 'দুপ্ দুপ্' এইরূপ শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে আসিয়া দেখেন যে চন্দ্রনাথ রায় নৃত্য করিতেছেন। 'এ কি ?' জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, 'আমার নাচ পাইয়াছে, কি করি ?' লোকের যেমন ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, তেমনি নাচ পায়, ইহা অদ্ভুত কথা !

এই সময়ে পরস্পর পরস্পরকে আমরা শাস্ত্রোক্ত নামে ডাকিতাম। কাহারো নাম শৌনক ছিল, কাহারো নাম জরৎকারু, কাহারো নাম অষ্টাবক্র ছিল। অক্ষয়বাবু শীর্ণ কলেবর, তাঁহার নাম আমরা 'জরৎকারু' রাখিয়াছিলাম। কোন বন্ধুর স্ত্রীকে পত্রেতে দেবেন্দ্রবাবু 'মৈত্রেয়ী' বলিয়া ডাকিতেন।"—(রাজ. ৬৪, ৬৫)।

শৌনক একজন বৈদিক কুলপতি ঋষি ও বড় গৃহী ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ দেবেন্দ্রনাথকেই এই নাম দেওয়া হইয়াছিল। অষ্টাবক্র নামটি স্বয়ং রাজনারায়ণ বাবুর বলিয়াই বোধ হইতেছে; কারণ, অক্ষয়কুমার দত্ত রাজনারায়ণ বাবুকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আপনার প্রেমার্দ্র পত্র প্রাপ্ত হইয়া অমৃতাভিষিক্ত হইলাম, এবং অমনি আপনকার আনন্দোৎফুল্ল উৎসাহকর মুখশ্রী এবং ত্রিভঙ্গভঙ্গিম কোমল কলেবর আমার অন্তঃকরণে জাজ্বল্যমান হইয়া প্রকাশ পাইল।" ('প্রবাসী', ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ৫৭২ পৃষ্ঠা)। স্বয়ং রাজনারায়ণ বাবুর স্ত্রীকেই দেবেন্দ্রনাথ 'মৈত্রেয়ী' বলিতেন।

রাজনারায়ণ বাবু তৎপরে বলিতেছেন,—"উপনিষদের আলোচনায়, উপনিষদোক্ত শ্লোক গানে এবং তখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব আলোচনায় আমাদিগের দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইত। এখন যেমন ব্রাহ্মে ব্রাহ্মে দেখা হইলে কেবল পরস্পরে ব্রাহ্ম নায়কদিগের দোষ গুণ আলোচনায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হয়েন, সেরূপ ভাব তখন ছিল না। কোন ব্রাহ্মের সঙ্গে দেখা হইলে ঈশ্বর বিষয়ক কথোপকথনে এবং ব্রাহ্মদিগের সদ্‌গুণ আলোচনায় অতিবাহিত হইত। খাঁটি ঈশ্বরপ্রসঙ্গে অনেকটা সময় যাপিত হইত। তখন ভগবদ্গীতার এই শ্লোকানুসারে অনেকটা কার্য্য হইত,—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরং
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ।"—(রাজ. ৬৫)।

বৃদ্ধ বয়সে শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়ের সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রগাঢ় বন্ধুতা ও সে বন্ধুতার উচ্ছ্বাসের কথা পড়িয়া বিস্মিত হইতে হয়। একবার মাঘোৎসবের সময় যোড়াসাঁকোর বাড়ীর বৃহৎ প্রাঙ্গণের লোক-সমারোহের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় ভাবে মত্ত হইয়া এক ঘণ্টার অধিক কাল ধরিয়া দেবেন্দ্রনাথ-রচিত এই গানটি গাহিয়াছিলেন,—

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্।
পাপনাশহেতুরেষ নতু বিচারবাগ্‌বলম্।
দর্শনস্ত দর্শনেন নো মনো হি নির্ম্মলম্।
বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলম্।

শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ মহাশয় বর্ণনা করিয়াছেন, (অজিত, ৫৫০), দুইজনে "হাতধরাধরি করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া ঐ এক গান 'ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্‌' করিতে করিতে একবার উঠিতেছেন, আবার বসিতেছেন।... যেদিকে চাই, দেখি সকলেই ভাবাবেশে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।"

"পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে শুনিয়াছি যে, একবার এক ব্রাহ্মসম্মিলনের সভায় তিনি [অর্থাৎ শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়] ঈশ্বরের প্রেম বিষয়ে তাঁহার একটি রচনা পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ দেখেন, এক জায়গায় তাঁহার রচনা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া, দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয় হাত ধরাধরি করিয়া, 'পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ, তস্য তুচ্ছং সকলং' এই গান গাহিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সভা ভুলিয়া, সমস্ত ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঐ একই গান গাহিয়া দুজনে নৃত্য করিলেন। সভার শেষে যখন তিনি [শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়] বিদায় লইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গেলেন, তিনি তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—'তুমি আমায় আজ কি কথা শোনালে ! এমন কথা যে আমায় শোনায়, আমি যে তার গোলাম !"—(অজিত, ৫৫০,৫৫১)।

৩৮

লালা হাজারীলাল।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রচারক লালা হাজারীলাল ইন্দোরনিবাসী ছিলেন। প্রচারক নিযুক্ত হইবার পর "তিনি লোকের গৃহে গৃহে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যেই কাহাকেও ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিতে শুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তিনি প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহার নাম স্বাক্ষর করাইয়া লইতেন। স্বাক্ষর করিবার পর প্রত্যেক স্বাক্ষরকারীকে একটী করিয়া ওঁ-খোদিত স্বর্ণাঙ্গুরী দেওয়া হইত। হাজারীলাল যে কয়জনকে ব্রাহ্ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত করিয়া আনিতে পারিতেন, তাঁহাদিগের প্রতিজনের হিসাবে তিনি একটি করিয়া মোহর বা ষোল টাকা পুরস্কার

পাইতেন। ব্রাহ্মসমাজে মাসিক উপাসনার শেষে এই অঙ্গুরী ও পুরস্কার বিতরণ কার্য্য সমাধা হইত।...বলা বাহুল্য, এই প্রণালীতে ব্রাহ্মসম্প্রদায় বৃদ্ধির অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া দেবেন্দ্রনাথ উহা রহিত করিয়া দিয়াছিলেন।"—(তত্ত্ববো. ১৮৩৭ শকের পৌষ সংখ্যা, ১৬৭, ১৬৮ পৃঃ)।

লালা হাজারীলালের অঙ্গুরীতে "প্রণবের নীচে পারস্য ভাষায় 'ই হম্ নখাহদ্ মান্দ্' (এইরূপ রহিবে না) এই বাক্য অঙ্কিত ছিল[১]। এই বাক্য দেখিতে পাইলে বিপদের সময় সম্পদের অবস্থা মনে পড়িবে, এবং সম্পদের সময় বিপদের অবস্থা মনে পড়িবে, এইজন্য ঐ বাক্য অঙ্গুরীতে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।"—(রাজ. ৪৫)। হাজারীলাল ১৭৭৫ শকের ১২ই পৌষ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৫৩) ইন্দোর নগরে দেহত্যাগ করেন।

৩৯

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

আত্মীয়গণের বিরাগ ও ঠাকুর পরিবারে দলাদলি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ যে পৌত্তলিকতা পরিহার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাহার প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইল। আত্মীয়গণকে অসন্তুষ্ট করিয়াও তিনি স্বীয় ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াও সমাজকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' প্রণেতা লিখিতেছেন, "দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁহার শ্রাদ্ধ লইয়া এক গোলযোগ ঘটে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ দ্বারা নিজ বিশ্বাসমত কয়েকটিমাত্র বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া স্ব-রচিত ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানপদ্ধতিক্রমে[২] এক গৃহে শ্রাদ্ধ করিলেন। সে স্থলে গঙ্গাজল, তুলসী, কুশ, বা ৺নারায়ণ শিলা ছিল না। আর মধ্যম পুত্র গিরীন্দ্রনাথ সভায় বসিয়া

(১) আত্মজীবনী, ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) এই উক্তি নির্ভুল নহে। এই প্রবন্ধের শেষাংশ (৪০২, ৪০৩ পৃষ্ঠা) দ্রষ্টব্য।

সামাজিক রীতিনীতি অনুসারে জ্ঞাতিকুটুম্ব লইয়া দেবতা-ব্রাহ্মণের সমক্ষে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে শ্রাদ্ধ ও দানাদি উৎসর্গ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ নিজ খুল্লতাত রমানাথ ঠাকুর ও জ্ঞাতি পিতৃব্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর কাহারই অনুরোধে বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ স্পর্শ করিতে সম্মত হইলেন না। এই সূত্রে পিরালী সমাজে দলাদলির সৃষ্টি হইল।...

দ্বারকানাথের দেহ বিলাতে সমাহিত থাকায় গিরীন্দ্রনাথ এখানে কুশপুত্তলদাহ করিয়া শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। প্রসন্নকুমার ও রমানাথ-প্রমুখ সমস্ত পিরালী সমাজ এই ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিয়া লইলেন; কেবল পাথুরিয়াঘাটার হিন্দুশাস্ত্রদর্শী হরকুমার ঠাকুর [প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অগ্রজ] বলিলেন যে, যে-স্থলে দেহের অপ্রাপ্তি ঘটে সেই স্থলেই কুশপুত্তলদাহের বিধি শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু এ স্থলে দেহ বর্ত্তমান; এ ক্ষেত্রে বিলাত হইতে দেহ যখন আনাইয়া লওয়া যাইতে পারে, তখন কুশপুত্তলদাহ হইতে পারে না। অতএব, দেবেন্দ্রনাথের কৃত শ্রাদ্ধও যেমন অসামাজিক ও অশাস্ত্রীয়, গিরীন্দ্রনাথের কৃত শ্রাদ্ধও তদ্রূপ। অতএব, এই অশাস্ত্রীয় শ্রাদ্ধাচারী এবং এই শ্রাদ্ধে লিপ্ত কোন ব্যক্তির সহিত আত্মীয়তা রাখিব না।" (ব. জা. ই. ব্রা. ৬। ৩৫২, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, ও সংশোধনপত্র দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঠাকুরগোষ্ঠীতে সামাজিক দলাদলির সৃষ্টি হইল। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশের এক প্রসন্নকুমার ভিন্ন আর সকলে দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিলেন।

খ্রীষ্টধর্ম্মের পক্ষ হইতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের আক্রমণ।

এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের জন্য দেবেন্দ্রনাথকে একদিকে হিন্দু আত্মীয়গণের বিরাগভাজন হইতে হইল, অপর দিকে আবার তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সমালোচনাভাজন হইতে হইল। জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমার ঠাকুরেরই পুত্র; কিন্তু তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে অনুরক্ত ও হিন্দু সমাজের সহিত একান্ত বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন। উত্তরকালে তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই জ্ঞানেন্দ্রমোহন 'Justicia' এই ছদ্মনামে *Englishman* পত্রিকার ২২শে অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখের সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথকে "President of the Tuttobodhenee Sobha"

বলিয়া সম্বোধন করিয়া এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। তাহাতে তিনি বলেন, শ্রাদ্ধ একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান; এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া, ইহাতে লোক নিমন্ত্রণ করিয়া, 'idolatrous feast' হইতে দিয়া, গিরীন্দ্রনাথকে পৌত্তলিক মতে শ্রাদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া, ও ব্রাহ্মণদিগকে অর্থ দান করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ স্বতঃ এবং পরতঃ পৌত্তলিকতায় যোগ দিবার অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। রামমোহন রায় তো মাতার শ্রাদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই; দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন না কেন?

২৮শে অক্টোবরের *Englishman* পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের উত্তর প্রকাশিত হইল। সেই সংখ্যায় সম্পাদক মহাশয় স্বীয় মন্তব্যে জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের পক্ষ লইয়া এই কথাগুলি লিখিলেন,—"Our former correspondent [অর্থাৎ Justicia] considers the Shradh as one of those observances which cannot by any purification be disconnected from idolatrous rites and degrading notions of the Divine Being". Justicia আবার ৫ই নভেম্বর ১৮৪৬ তারিখের সংখ্যায় দেবেন্দ্রনাথের উত্তরের প্রত্যুত্তর দেন।

Justiciaর দীর্ঘ পত্রখানিতে সার কথা অত্যল্প। "রামমোহন রায় মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন", এই উক্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানাও এখন কঠিন। দেবেন্দ্রনাথকে এই সকল বাদানুবাদের ভিতরে (৪৫ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইল যে, ব্রাহ্মদের জন্য 'শ্রাদ্ধ' বলিয়া একটি অনুষ্ঠান থাকিবে কি না। পিণ্ডদান ও মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতি আপত্তিজনক অংশ বর্জ্জন করিয়া পিতৃপুরুষের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনাত্মক এই অনুষ্ঠানটিকে রক্ষা করাই দেবেন্দ্রনাথ শ্রেয়ঃ বলিয়া অনুভব করিলেন। ব্রাহ্মসমাজ যে হিন্দু জাতির এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই, ও ইহাকে স্বীয় সংস্কারাবলীর মধ্যে সসম্মানে স্থান দিয়াছেন, তাহার জন্য আমরা দেবেন্দ্রনাথের নিকটে ঋণী।

দ্বারকানাথের শ্রাদ্ধের তারিখ।

পিতার মৃত্যুসংবাদ যখন কলিকাতায় আসিল, দেবেন্দ্রনাথ তখন নৌকায় গঙ্গাবক্ষে ছিলেন। আত্মজীবনীতে এই নৌকাভ্রমণের, দ্বারকানাথের

কুশপুত্তলদাহের, ও দ্বারকানাথের পুত্রগণ কর্ত্তৃক অশৌচ ধারণের যে বিবরণ আছে, তাহাতে সময়ঘটিত অনেক ভুল রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনী লিখাইবার সময় কতক কতক ঘটনা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার শ্রাদ্ধসংক্রান্ত কোন কোন ঘটনা তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধের স্মৃতির সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। এই সকল ঘটনার তারিখ সম্বন্ধে আমরা তৎকালীন সংবাদপত্রে যেরূপ উল্লেখ পাইয়াছি, তাহা নিম্নে ক্রমশঃ প্রদত্ত হইতেছে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ১লা আগষ্ট ১৮৪৬ তারিখে লণ্ডন নগরে দেহত্যাগ করেন। যে বিলাতী ডাকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আসে, তাহা ১৮ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার বিকাল ৩টার সময় কলিকাতায় পৌঁছে। তখন সাগরপথের টেলিগ্রাফ ছিল না, এবং বিলাত হইতে দেড় মাসে ডাক আসিত। ঐ তারিখের *Calcutta Star Extra-ordinary* পত্রে দ্বারকানাথের মৃত্যুর সংবাদের মধ্যে এই কথাও ছিল,—"The heart was taken from the body to be conveyed to India."

আত্মজীবনীতে নৌকাভ্রমণের কালসম্বন্ধে প্রথমতঃ (১০৯, ১১১ পৃষ্ঠা) শ্রাবণ মাসের, ও পরে (১১৫ পৃষ্ঠা) ভাদ্র মাসের উল্লেখ আছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর বিকালে কলিকাতায় দ্বারকানাথের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাড়ীর স্বরূপ খানসামা দ্রুতগামী নৌকায় রওনা হইয়া পাটুলিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথকে এই সংবাদ দেয়। দেবেন্দ্রনাথের এই সংবাদ প্রাপ্তি ২০শে সেপ্টেম্বরের (৫ই আশ্বিনের) পূর্ব্বে হইতে পারে না। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের নৌকাভ্রমণ শ্রাবণ মাসে নয়, ভাদ্র মাসের শেষ ভাগে আরম্ভ হইয়াছিল।

আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে কুশপুত্তলদাহের এবং দশ দিন অশৌচ ধারণের বিবরণও ভ্রমাত্মক। আত্মজীবনীর ঐ সকল উক্তির মধ্যে নানা অসঙ্গতি দেখিয়া আমার মনে সংশয় হওয়ায়, আমি শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে, এরূপ স্থলে শাস্ত্রে কিরূপ বিধি আছে, এবং আত্মজীবনীর উল্লিখিত দিনগুলি ঠিক মনে হয় কি না। তিনি অনুগ্রহ করিয়া তদুত্তরে আমাকে লিখেন, "আপনার লিখিত দিনগুলিতে যে সমস্ত কার্য্য উল্লেখ আছে, তাহা ঠিক হিসাব মত হয় না।...কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী একাদশী বা অমাবস্যায় কুশপুত্তল দাহ করিতে হয়; [শাস্ত্রে] চতুর্দ্দশীর কোন

উল্লেখ নাই। কুশপুত্তলদাহের পর চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিতে হয়।" তৎপরে সমসাময়িক সংবাদপত্রে অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম, তাহা সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের উক্তিরই সমর্থন করে।

১৬ই অক্টোবর ১৮৪৬ তারিখের *Englishman* পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠায় এই সংবাদটি আছে:—"From the *Bhaskur*. CREMATION OF DWARKANATH'S EFFIGY.—On Sunday last, a straw effigy of the late lamented Dwarkanath was burned at the last place of Hindu cremation. His sons have put on mourning, and there is no longer any doubt of their performing his shrad." এই Sunday last = ১১ই অক্টোবর, ২৬শে আশ্বিন, কৃষ্ণাষ্টমী তিথি। কুশপুত্তলদাহ গঙ্গার পশ্চিম তীরে গিয়া করা হইয়াছিল, কারণ পশ্চিম তীর অধিক পবিত্র ও বারাণসী-সমতুল বলিয়া গণ্য। এই সংবাদের শেষাংশটি পড়িয়া মনে হয়, প্রথম প্রথম এরূপ একটি কথা রাষ্ট্র হইয়াছিল যে দেবেন্দ্রনাথ হয়তো শ্রাদ্ধই করিবেন না।

১৭ই অক্টোবরের *Englishman*এ "Local Items" শীর্ষে এই সংবাদ রহিয়াছে,—"SHRAD OF THE LATE BABOO DWARKANAUTH TAGORE.—On Thursday last at the Shrad of the late Baboo Dwarkanauth Tagore, several gold and silver articles, together with some valuable Cashmere shawls, were offered, which will be distributed to the Brahmins according to their ranks and talents, besides presents of money from fifty to a hundred rupees each."

এই Thursday last = ১৫ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন। "কুশপুত্তল-দাহের পর চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধ" করিবার নিয়মের সহিত ইহা মিলিতেছে।

দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধ ও স্ব-রচিত অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

উত্তরকালে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগের সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের জন্য নূতন পদ্ধতি রচনা করিয়া দিয়া ব্রাহ্মসমাজকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করেন। এই নূতন পদ্ধতি রচনা তখনই সম্ভব হইল, যখন কয়েকটি পরিবার পুরাতন পদ্ধতি

পরিত্যাগ করিয়া নূতন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সে-ভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন; সে সময় তখনও আসে নাই। পিতৃশ্রাদ্ধে দেবেন্দ্রনাথ কেবল অপৌত্তলিক মন্ত্রদ্বারা দানোৎসর্গ (দেবেন্দ্রনাথের ভাষায় "পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান") করিয়াছিলেন মাত্র। ইহার বহু বৎসর পরে (দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, ও সৌদামিনীর বিবাহের পরে), দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। এই তিনটি সন্তানের বিবাহ তাঁহাকে প্রচলিত হিন্দু পদ্ধতি অনুসারেই দিতে হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা সুকুমারী দেবীর বিবাহই (২৬শে জুলাই ১৮৬১) তাঁহার রচিত ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত পদ্ধতির প্রথম অনুষ্ঠান।

সুকুমারী দেবীর বিবাহের পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও রমানাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধের সময়ে অন্যান্য আত্মীয়গণ ত্যাগ করিলেও এই দুই জন দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু, শ্রাদ্ধের সময়ে যে-বৃষকাষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের স্কন্ধে লইবার কথা, তাহা একবার স্পর্শমাত্র করিতে প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে বার বার অনুরোধ করেন; তথাপি দেবেন্দ্রনাথ কিছুতেই তাহা করিলেন না। মাননীয় গুরুজনের অনুরোধ দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে অগ্রাহ্য করাতেই কুটুম্বগণ ক্ষুণ্ণ হইয়া জ্ঞাতি-ভোজনের দিনে আসিতে অসম্মত হন; এবং এই কারণেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "যদি দেবেন্দ্র পুনরায় এইরূপ না করেন, তবে আমরা সকলে তাঁহার নিমন্ত্রণে যাইব।" (আত্মজীবনী, ১২৬ পৃষ্ঠা)।

৪০

১৮৪০ সালে দ্বারকানাথের জমিদারী ও কারবার।

এই সময়ে দ্বারকানাথ কার ঠাকুর কোম্পানী ব্যতীত, শিলাইদহে ও অন্যান্য স্থানে নীলের কুঠি, কুমারখালিতে রেশমের কুঠি, রাণীগঞ্জে কয়লার খনি, ও রামনগরে চিনির কারখানা চালাইতেছিলেন; এবং রাজসাহীতে কালীগ্রাম, পাবনায় শাহাজাদপুর, রঙ্গপুরে স্বরূপপুর, হুগলীতে মণ্ডলঘাট

পরগণার তেরো আনা অংশ, দ্বারবাসিনী, ও জগদীশপুর, যশোহরে মহম্মদশাহী, এবং কটকে শরগড়া প্রভৃতি পরগণা ক্রয় করিয়া স্বীয় পৈতৃক জমিদারী সম্পত্তি বহু পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

"দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমনের পূর্ব্বে দ্বারকানাথ Mr I. Dean Campbell সাহেবের সহায়তায় Bengal Coal Company স্থাপন করেন। ইহা সে সময়ের সমস্ত কয়লার ব্যবসায়ের মধ্যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল। বার্ষিক ৬ কোটি মণের উপর কয়লা তোলা হইত। সে সময়কার 'বীরভূম', 'শিয়াড়শোল', এবং 'ইকুইটেবল্', এই তিনটি কোম্পানীর মোট কয়লা একত্র করিলেও ইহার সমান হইত না।" (Mem. 108.)

দ্বারকানাথের মেদিনীপুর ও ত্রিপুরা জেলার জমিদারীর এবং সোরা ও চায়ের কারবারের উল্লেখ কোনও পুস্তকে বা পত্রিকায় পাইলাম না ; এ জন্য তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে পারা গেল না। 'পরগণা বিরাহিমপুর' নদীয়া জেলার কুমারখালি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নাম।

৪১

ঋণ শোধের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের সাধুতা।

পিতার ব্যবসায়ের পতনের সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম লইয়া উন্মত্ত। বিষয় সম্পত্তি জঞ্জালরূপ, না থাকিলেই ভাল, যেন কতকটা এইরূপ ভাব তাঁহার মনে রাজত্ব করিতেছিল। পরিবারের আর সকলে যখন এই ভাবিয়া আকুল যে কিসে যতটুকু পারি রক্ষা করি, দেবেন্দ্রনাথের মনে ঠিক সেই সময়েই এই ভাব জাগিতেছে যে কিসে সব যায়। স্থতরাং দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের কার্য্যকলাপকে পরিবারস্থ অন্য লোকেরা বাতুলের কাজ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন।

ব্যবসায় পতনের পর কার ঠাকুর কোম্পানীর যে হিসাব সমসাময়িক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়[১], তাহাতে দেখা যায় যে অনাদায়ী টাকা আদায়

(১) ৩৩৮ পৃষ্ঠা, ও তত্ত্ববো. ১৮৪৮ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় আমার লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইলে, ও সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় করিলে, কোম্পানীর সব ঋণ শোধ হইয়া যাইতে পারিত। উহার উত্তমর্ণগণ সকলেই ধনবান্ লোক ছিলেন; তাঁহারা অপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ যে আত্মজীবনীতে (১৪৭পৃষ্ঠা) দেনা এক কোটি টাকা ও পাওনা ৭০ লক্ষ টাকা বলিয়া লিখিয়াছেন, তাহা যদি এই কোম্পানীরই দেনা ও পাওনার অঙ্ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়, তথাপি বলিতে হয়, উত্তমর্ণগণ ভালরূপেই জানিতেন যে কোনও ব্যবসায়ী হাউসের পতন হইলে, তাহার পাওনাদারদিগের প্রাপ্যের $\frac{৭}{১০}$ অংশও সচরাচর আদায় হয় না। সুতরাং তাঁহারা যে বিশেষ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাহা নহে। সমসাময়িক সংবাদপত্রেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়, (৩৩৯ পৃষ্ঠা)। কিন্তু স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথই অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে "মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্" এই মহামন্ত্র ধ্বনিত হইতেছিল। তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে, "সমুদয় ঋণ শোধ না করা পর্য্যন্ত আমাদের সম্পত্তি আইনতঃ আমাদের হইলেও, ধর্ম্মতঃ তাহা পরস্ব; কিরূপে আমরা তাহা ভোগ করিব?" তিনি এই জন্য "নিজে অগ্রসর হইয়া" ট্রষ্ট সম্পত্তি উত্তমর্ণদের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। (আত্মজীবনী, ঐ পৃষ্ঠা)।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব করিবামাত্র পরিবারের মধ্যে তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইবার আনন্দেই উচ্ছ্বসিত। কিন্তু পরিবারের অন্যান্য লোকেরা তো তাহা নহেন। তাঁহারা দৃঢ়তার সহিত দেবেন্দ্রনাথের এই সর্ব্বনাশকর কার্য্যে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন, এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইলেন।

এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে এইরূপ লিখিয়া দিয়াছেনঃ—"ট্রষ্ট্ডীড্ভুক্ত সম্পত্তিগুলি সমর্পণ বা হস্তান্তর করিবার অধিকার ট্রষ্ট্ডীডের বিধি অনুসারে দ্বারকানাথের পুত্রদের কাহারও ছিল না। দেবেন্দ্রনাথকৃত এই ট্রষ্ট্ সম্পত্তি সমর্পণের প্রস্তাব তাঁহার একান্ত সাধুতার পরিচায়ক হইলেও, ইহা কার্য্যে পরিণত করা কোনওরূপেই সম্ভবপর হইত না। শোনা যায়, 'দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বনাম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর' মোকদ্দমায় এ বিষয়ের পরিষ্কার উল্লেখ আছে; নাবালক দ্বিজেন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে ট্রষ্টী রমানাথ ঠাকুর এই মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। এই কারণেই ট্রষ্ট সম্পত্তি

ঋণ শোধার্থে বিক্রীত হইতে পারে নাই। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধরেরা এই সম্পত্তিই এখন ভোগ করিতেছেন। মহর্ষি যখন পরে উত্তমর্ণদের প্রতিনিধিস্বরূপে, তাঁহাদের দ্বারা অধিকৃত সম্পত্তিগুলির তত্ত্বাবধান ও পরিচালন করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন, তখনও তাঁহার হাতে ঐ ট্রষ্ট্ডীডভুক্ত সম্পত্তিগুলি প্রত্যক্ষভাবে আসে নাই। দ্বারকানাথের নিযুক্ত ট্রষ্টীরাই ঐ সম্পত্তিগুলির তত্ত্বাবধান করিয়া আসিয়াছেন।"

এই একান্ত সাধুতার ভাব হইতেই দেবেন্দ্রনাথ 'ইন্‌সল্‌বেণ্ট আইনে মস্তক দিতেও' অস্বীকৃত হইলেন। এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, এবং ইহার আশ্রয় গ্রহণের ঔচিত্য বা অনৌচিত্য, দেবেন্দ্রনাথ ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, এই আইনের আশ্রয় লইতে হইলে মানুষকে বলিতে হয় 'আমার আর কিছুই নাই', এবং যে ভাবে এ কথা বলিতে হয়, তাহাতে একটি চীর পর্য্যন্ত অঙ্গে থাকিলে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া উহা বলা যায় না, (১৪৯ পৃষ্ঠা)। তাই তিনি এরূপ ঘৃণার সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, "সম্পর্কে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুর কতবার তাঁহাকে অধিকাংশ বিষয় সম্বন্ধে Insolvent আদালতে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কতবার তিনি তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাদিগকে বলিতেন যে, 'খুড়া মহাশয় আমাকে বিষয় বেনামী করিয়া Insolvence লইতে বলিতেছেন, কিন্তু আমি তাহা কখন লইব না।'"—(রাজ. ৫৯)। বিষয় বেনামী করিয়া ইন্‌সল্‌ভেন্সী লওয়া দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে কল্পনাতেও অসহনীয় ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের এই সত্যনিষ্ঠা ও সাধুতার আর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। গর্ডন সাহেবের আহূত সভায় যাইবার সময় "দেবেন্দ্রনাথের অঙ্গুলীতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী ছিল। তাঁহার বিষয় সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে তিনি এই অঙ্গুরীটি সেই তালিকাভুক্ত করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। যখন গর্ডন সাহেব সভার মধ্যে তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তির তালিকা পাঠ করিতেছিলেন, তখন দেবেন্দ্রনাথ সভাতে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, 'আমার অঙ্গুলীতে একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী আছে; তালিকা প্রস্তুতের সময়ে আমি তাহার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। এই অঙ্গুরীও তালিকা-

ভুক্ত করুন।' এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তাঁহার এই কথা শুনিয়া সমস্ত সভা নিস্তব্ধ হইল; সকলের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন, এ যুবক মানুষ নয়, ইনি দেবতা! সাধুতার এ প্রকার দৃষ্টান্ত জগতে অতি বিরল। গর্ডন সাহেব প্রস্তাব করিলেন, 'আপনারা দেখিতেছেন, এই যুবক পিতৃঋণ শোধ করিবার জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পণ করিতেছেন। আপনার হস্তের অঙ্গুরী পর্য্যন্ত আপনার জন্য রাখিতে প্রস্তুত নহেন। অতএব আমি প্রস্তাব করি, ইঁহার সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ আপনারা ইঁহাকে এই অঙ্গুরী প্রদান করুন।' মহাজনেরা তৎক্ষণাৎ ইহাতে সম্মত হইলেন।"—(ভব. ১১৩)।

এই সময়ে শীঘ্র ঋণমুক্ত হইবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঋণভার লঘু করিবার জন্য যে সকল সম্পত্তি ও যে সকল সামগ্রী বিক্রয় করিবার অধিকার দেবেন্দ্রনাথের ছিল, সে সকলের উচিত মূল্য পাইবার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতে পারেন নাই। শোনা যায়, উচিত মূল্য পাইবার চেষ্টায় গিরীন্দ্রনাথ অনেক ঘোরাঘুরি ও পরিশ্রম করিতেন; কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের ব্যস্ততা হেতু অনেক সামগ্রী জলের দরে বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল।

এই সাধুতা, ধর্ম্মভীরুতা, ও ঋণ সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা বশতই দেবেন্দ্রনাথ উত্তরকালে নগেন্দ্রনাথের ঋণের খতে সহী দিতে এত আপত্তি করিয়াছিলেন, (আত্মজীবনী, ২১৮—২২০ পৃষ্ঠা)। পিতার সমুদয় ঋণ শোধ করিয়া, পিতার উইলের নির্দ্দেশ অনুসারে দরিদ্রদের জন্য প্রতিশ্রুত এক লক্ষ টাকাও দেবেন্দ্র-নাথ শোধ করেন। এই দাতব্য টাকাকেও তিনি ঋণ বলিয়াই অনুভব করিতেন। এই জন্য, পিতার মৃত্যুর পর হইতে যতদিন এই লক্ষ টাকা দিতে বিলম্ব হইয়াছিল, সেই বিলম্বের সময়ের সুদ সহিত তিনি এই টাকা District Charitable Societyকে দান করেন।

'পিতৃস্মৃতিতে' শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবী বলিতেছেন, ('প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ২৩৩ পৃষ্ঠা)—"তিনি সামান্য পরিমাণ দেনাকেও অত্যন্ত ভয় করিতেন। তাঁহার ছেলেরা কেহ ঋণ করিয়া তাঁহাকে সাহায্যের জন্য ধরিলে তিনি বলিতেন, 'আমি কি চিরজীবন কেবল ঋণশোধই করিব?'

সীতানাথ ঘোষ মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া যখন তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষা চাহিতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি এককালে সাত হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজ তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। ঋণের দুঃখ কত বড়, তাহা তিনি জানিতেন বলিয়াই ঋণীর প্রতি তাঁহার সমবেদনা এত প্রবল ছিল।"

৪২

দেবেন্দ্রনাথের ব্যয়সঙ্কোচ।

"এই সময়ে তাঁহাকে [দেবেন্দ্রনাথকে] অনেক ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। এই প্রকার শ্রুত হওয়া যায়, তিনি একবারে চারি আনা মূল্যের অধিক সামগ্রী আহার করিতেন না। যাঁহার পিতার ডিনার তিন শত টাকার কমে হইত না, তিনি চারি আনা মূল্যের ডিনার খাইয়া তৃপ্ত হইতেন।...সমস্ত গাড়ী ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, কেবল বাটীর মহিলাদিগের যাতায়াতের জন্য একটিমাত্র পাল্কী রাখিলেন। কখন কখন বাড়ীর মহিলাদিগের নির্ম্মিত দাঁড়াসেলাই দেওয়া জামা পরিয়া ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতেন, এবং উপদেশ প্রদান করিতেন।"—(ভব. ১১৮,১২২)।

শ্রীযুক্তা সৌদামিনী দেবী তাঁহার 'পিতৃস্মৃতিতে' ('প্রবাসী,' জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ২৩৩ পৃষ্ঠা) বেলগাছিয়ার বাগানে দ্বারকানাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সাহেবদিগকে সমারোহপূর্ব্বক ভোজ দেওয়ার বর্ণনা করিয়া তৎপরে লিখিতেছেন, "পিতামহ [দ্বারকানাথ] দ্বিতীয়বার বিলাতে যাওয়ার পর বেলগেছের বাগানে সাহেবের ভোজ বন্ধ হইয়া গেল। তখন সহরের অনেক খানালোলুপ সম্ভ্রান্ত লোক পিতার [দেবেন্দ্রনাথের] ডিনার-টেবিল আশ্রয় করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন, এবং জাতি বজায় রাখিয়া চলিতেন। যখন য়ুনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়াতে অকস্মাৎ ঋণসমুদ্রের মধ্যে পড়িতে হইল, তখন এক রাত্রেই পিতা ডিনারের সমারোহ বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজনারায়ণ বাবু প্রায় তাঁহার সঙ্গে খাইতেন। সেদিন তিনি আসিয়া দেখিলেন, টেবিলে ডাল রুটি ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলিলেন, 'এই খাইয়া আপনার

চলিবে কি করিয়া ?' পিতা কহিলেন, 'ঈশ্বর যখন যে অবস্থার মধ্যে ফেলেন, তখন সেই অবস্থার মত চলিতে পারিলে তবেই সব ঠিক চলে।' এখন হইতে পিতা সংসারের সকল প্রকার খরচ সম্বন্ধেই অত্যন্ত টানাটানি করিয়া চলিতে লাগিলেন। পুরাতন চাল বজায় রাখিয়া লোকসমাজে অভিমান বাঁচাইবার জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না।"

৪৩

দেবেন্দ্রনাথের বর্দ্ধমান ভ্রমণ, ও বর্দ্ধমান রাজবাটীর ব্রাহ্মসমাজ।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিতে (৫৪, ৫৫ পৃষ্ঠা) বর্দ্ধমান যাত্রা এইরূপে বর্ণিত আছে ঃ—"এই ভ্রমণের সময় আমাদিগের সর্ব্বদা ধর্ম্মচর্চ্চা হইত।...আমরা যখন বর্দ্ধমানে গিয়া পৌঁছি, তখন দেখি, মহারাজা মহাতাব চন্দ্ বাহাদুর তাঁহার বডিগার্ডের নায়ক কর্ণেল গোলানি [গোমানী] সিংহকে আমাদিগের আহ্বানার্থে পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইনি আমাদিগের সঙ্গে করিয়া বর্দ্ধমানে লইয়া যান। তারাচাঁদ বাবুর বাটীতে আমাদিগের বাস হয়। রাজা প্রত্যহ গরুর গাড়ী করিয়া আমাদিগের জন্য অতি বৃহৎ সিধা পাঠাইতেন।"

সাত বৎসর পরে দেবেন্দ্রনাথ আবার বর্দ্ধমানে গিয়া ঐ প্রথম বর্দ্ধমান যাত্রার কথা স্মরণ করিয়া রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, (পত্রাবলী, ৪৫)—"এখানে আইলেই, তোমার সহিত সদালাপ করত দামোদর নদী দিয়া যে প্রথম বার অত্র স্থলে সুখে আগমন হইয়াছিল, তাহা এত দিন বিলম্বেও স্মরণের পথে জাজ্বল্যমান প্রকাশ পায়। সেই সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান প্রাপ্তির উদ্দেশে নৌকা হইতে অবতরণ, বহুদূর পর্য্যটন, পরে বাজারে আগমন, সেই দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারি-কর্ত্তৃক নিবারণ, মনোহর চন্দ্রমার কিরণ দ্বারা বর্দ্ধমান পুরী দর্শন, দামোদর নদী তীরে দ্বিপ্রহর রজনীতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার সেই

নৌকাতে শয়ন, ও পরদিবস গোমানীর আগমন এবং রাজার আতিথ্য গ্রহণ, এ সকল যেন সে দিনের কথা মত বোধ হইতেছে।" 'দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারি-কর্ত্তৃক নিবারণ' কথাটি পড়িয়া মনে হয়, বিনা সংবাদে অপরিচিতের মত বর্দ্ধমান নগরে নৈশ ভ্রমণ করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ কিছু কিছু কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটাইয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন, "ইনি [মহারাজা মহ্‌তাব চন্দ্‌] ইহার কিছুদিন পরে বর্দ্ধমানে এক ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। ঐ সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম 'বৈদান্তিক ধর্ম্ম' ছিল। যে প্রণালীতে তখনকার কলিকাতা সমাজের কার্য্য সম্পাদিত হইত, ঠিক সেই প্রণালীতে উহার কার্য্য সম্পাদিত হইত।...বর্দ্ধমানের এই সমাজ এখনও আছে কি না, বলিতে পারি না। সেই দিন অবধি মহাতাব চাঁদের পুত্র আফতাব চাঁদের সময় পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।"

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার এই বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল,—"গত ৩০শে আষাঢ়, (১৭৭৩ শক) রবিবারে বর্দ্ধমানাধিপতি শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর নিজ বাটীতে এক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।...যাহাতে তাহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়,... তদর্থে তিন জন উপাচার্য্য নিযুক্ত হইয়াছেন,—শ্রীযুক্ত শ্রীধর বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ, এবং শ্রীযুক্ত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন। যদিও মহারাজ স্বয়ং পরিষদ্‌বর্গের সহিত একত্র হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা করণার্থে এই সমাজ সংস্থাপন করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের তথায় গমন করিবার নিতান্ত নিষেধ নাই; কেবল, প্রথম বারে তাঁহাদিগকে উপাচার্য্যের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবেক। মহারাজের এক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবারও মানস আছে। তাহা হইলে বর্দ্ধমানের সর্ব্বসাধারণ লোকে সমাজস্থ হইয়া পরব্রহ্মের শ্রবণ মনন করিতে পারিবেন।" (ভব. ১২৮, ১২৯ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)।

তত্ত্ববোধিনীর উক্ত উদ্ধৃতাংশে লক্ষ্য করিবার দুইটি বিষয় আছে। প্রথম, এই ব্রাহ্মসমাজ বর্দ্ধমানাধিপতির রাজসভার ব্রাহ্মসমাজ হইল। দ্বিতীয়, 'সাধারণের জন্য ব্রাহ্মসমাজ' এই অর্থে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' কথাটি

এই উদ্ধৃতাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' ইহার বহু বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার প্রতিষ্ঠাতাগণ নূতন সমাজের নামকরণ করিবার সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন।

৪৪

কৃষ্ণনগর ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা শ্রীশচন্দ্র।

আত্মজীবনীর ১৬২ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে, রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ কলিকাতায় হয়। ইহার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত দেবেন্দ্রনাথের পত্রব্যবহার হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। "ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে আছে যে, রাজা শ্রীশচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রদেশের তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের নিয়মপত্রে স্বাক্ষর করান, এবং দেবেন্দ্রনাথকে একজন বেদজ্ঞ উপদষ্টা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া চিঠি লেখেন। দেবেন্দ্রনাথ লালা হাজারীলালকে পাঠাইলেন। হাজারীলাল শূদ্র এবং বেদবিৎ নয়, সেইজন্য রাজা অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। যাহাই হোক্, হাজারীলালকে তিনি বিদায় করিলেন না। ইহার পরে তিনি কোন প্রয়োজনে মুরশীদাবাদে চলিয়া গেলেন। সেখানে এক মাসের বেশি কাটাইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন যে, কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবক ব্রাহ্ম হইয়াছেন এবং হাজারীলাল উপাচার্য্যের কাজ করিতেছেন। তিনি ইহাতে বিরক্ত হইয়া রাজবাড়ীতে ব্রাহ্মদিগকে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মরা আর একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে সমাজ করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জন ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য পাঠাইলেন।

কৃষ্ণনগরে অনেকেই ব্রাহ্মদলের বিরোধী হইল, কিন্তু রাজা শ্রীশচন্দ্রের সহানুভূতি থাকাতে তাহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারিল না। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে (১৭৬৯ শকে) কৃষ্ণনগরের সমাজমন্দির তৈরি হইল। দেবেন্দ্র-

নাথ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করেন।"—. অজিত, ২২৩, ২২৪)।

৪৫

দেবেন্দ্রনাথ, বেদান্ত, ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ।

২৮ পরিশিষ্টে (৩৮৩ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে যে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার আত্ম-জীবনীতে বেদান্ত পরিত্যাগের ব্যাপারটিকে তাদৃশ প্রাধান্য দান করেন নাই। অথচ দেবেন্দ্রনাথকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে ঐ বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক হয়। তাই এই কিঞ্চিৎ দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইতেছে।

আত্মজীবনীর দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন যে, কোনও প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থে ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি হইতে পারিবে না, ইহা যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন, তখন ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল কোথায় হইবে, এই চিন্তা তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিল; এবং এই চিন্তার দ্বারা চালিত হইয়াই তিনি প্রথমে 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ' ও তৎপরে 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' রচনা করিলেন। 'প্রামাণ্য গ্রন্থ', 'পত্তনভূমি', প্রভৃতি শব্দের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন, প্রথম যুগে বেদান্তকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন, এবং তৎপরে 'ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থল' বলিতে তিনি কিরূপ গ্রন্থের অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সকল প্রশ্নেরই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে বেদান্ত-পরিত্যাগরূপ কার্য্যটি প্রশংসনীয় কি নিন্দনীয় হইয়াছিল, এবং প্রশংসনীয় হইয়া থাকিলে তাহার প্রশংসা দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য কি অক্ষয়কুমার দত্তের প্রাপ্য, এই সকল বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। এ আলোচনাতে কেবল দেবেন্দ্রনাথের মনের গতি বুঝিতে চেষ্টা করা হইবে।

'পত্তনভূমি' ও 'ঐক্যস্থল'।

আমার বিশ্বাস, দেবেন্দ্রনাথ 'পত্তনভূমি' ও 'ঐক্যস্থল' এই শব্দদ্বয়ের দ্বারা এমন কোনও 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' বা বাক্যাবলী অন্বেষণ করিতেছিলেন, (১) যাহা সকল ব্রাহ্মই আপনাদের ধর্ম্মের মূল সত্য বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার

করিবেন, এবং যে মূল সত্যের সহিত মিলাইয়া ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় অবান্তর প্রশ্নের মীমাংসা করিবেন, (২) যাহা প্রতিবাদীর তর্কের আঘাতের সম্মুখীন হইবার সময়ে ব্রাহ্মদিগের হস্তে পরীক্ষিত সত্যাস্ত্রসকলের কোষস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে সে আঘাত হইতে রক্ষা করিবে, এবং নাস্তিকতা ও ভ্রান্তি হইতে দূরে রাখিবে ; এবং (৩) সর্ব্বোপরি, যাহা নিয়মিতরূপে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ ও মনন করিয়া ব্রাহ্মদিগের চিত্তে বিমল জ্ঞান, ঈশ্বরভক্তি, ও সাধুভাব সকল উজ্জ্বল থাকিবে।

এক সময়ে দেবেন্দ্রনাথের এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে উপনিষদই ব্রাহ্মদিগের এইরূপ 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' হইবে। পরে যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা হইবে না, তখন তিনি মনে বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি অতিশয় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল। মানুষকেই হউক, গ্রন্থকেই হউক, শ্রদ্ধা দিতে ও হৃদয়ে রাখিতে পারিলেই তাঁহার তৃপ্তি হইত। উপনিষদ্ এ দেশের মানুষের হৃদয় হইতে উত্থিত ধর্ম্মজিজ্ঞাসার ও ধর্ম্মমীমাংসার প্রাচীনতম শাস্ত্র। উপনিষদ্ রামমোহন রায়ের গভীর শ্রদ্ধার বস্তু ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যের প্রধান সহায় হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং যখন সংশয়ের অন্ধকারের ভিতরে পথ খুঁজিতেছিলেন, তখন উপনিষদ্ হইতেই তিনি নিজ চিন্তার সায় পাইয়া অপূর্ব্ব বল ও সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। এই উপনিষদের সাহায্যে ভারতের সকল বিভিন্নতা দূর করিয়া, ভারতকে ঐক্যবন্ধনে বাঁধিয়া, তাহার স্বাধীনতার পথ মুক্ত করা যাইবে, দেবেন্দ্রনাথের মনে এক সময়ে এতদূর পর্য্যন্ত আশার উদয় হইয়াছিল। (আত্মজীবনী, ১০৭ পৃষ্ঠা)। এই উপনিষদ্ যে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে পারিল না, ইহাতে তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হওয়া অনিবার্য্য ছিল।

বেদান্ত কি এক সময়ে ব্রাহ্মদিগের 'বাইবেল' স্বরূপ ছিল ?

দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্ ত্যাগ (অথবা সেই সময়ের ভাষায় বলিতে গেলে 'বেদান্ত ত্যাগ', discarding the Vedanta) সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। যখন উপনিষদে তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল, তখন কি তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে উপনিষদকে সেই স্থান

দিতে চাহিয়াছিলেন, খ্রীষ্টানগণ স্বীয় ধর্ম্মে বাইবেলকে যে স্থান দেন? তাঁহার উপনিষদ্ 'পরিত্যাগের' অর্থ কি বাইবেলের অনুরূপ একটি স্থান হইতে উপনিষদকে অধঃকৃত করা? আমার তাহা মনে হয় না।

পত্তনভূমি ও ঐক্যস্থলের যে অর্থ উপরে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থ বাইবেল সম্বন্ধে তাহার অতিরিক্ত আরও অনেক কথা বিশ্বাস করেন। যথা, (১) বাইবেল অলৌকিক প্রণালীতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত, (২) বাইবেলের প্রতি-কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, (৩) পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল জাতির মানুষের পরিত্রাণের জন্য বাইবেলই একমাত্র শাস্ত্র, (৪) অতএব, সকল মানুষকে বাইবেলে (এবং বাইবেলের অলৌকিকতা অভ্রান্ততা প্রভৃতিতে) বিশ্বাসী করিতে হইবে, (৫) মানবের ধর্ম্মজীবন পোষণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, এক বাইবেলেই তাহার সব আছে; ইত্যাদি।

প্রামাণ্য গ্রন্থ ও অভ্রান্ত গ্রন্থ।

এই ভাবে অদ্বিতীয়, অলৌকিক, ও অলৌকিকতা হেতু অভ্রান্ত কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজনীয়তা দেবেন্দ্রনাথের মনে কখনও উদয় হয় নাই, ইহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু তিনি 'প্রামাণ্য গ্রন্থের' প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেন, ইহা নিশ্চিত। 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' ও 'অভ্রান্ত গ্রন্থ', এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। মানবমনের ইহা স্বাভাবিক বৃত্তি যে, যে-গ্রন্থ অথবা যে-শিক্ষক হইতে সে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বের অন্বেষণে বা সর্ব্বোচ্চ প্রশ্নসকলের মীমাংসায় আলোক প্রাপ্ত হয়, সে-গ্রন্থকে বা সে-শিক্ষককে সে বিশেষ ভক্তির চক্ষে দেখে; এবং নিজ চিন্তা হইতে অথবা অপরের সহিত তর্কবিতর্ক হইতে উত্থিত সংশয়ের ভিতরে সে এরূপ আশা করে যে, সেই-গ্রন্থের অথবা সেই-মানুষের নিকটে গেলেই তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে, তাহার চিত্তের অশান্তি ও আন্দোলন নিরস্ত হইবে। এইরূপ গ্রন্থ বা মানুষকেই 'আপ্ত' অথবা 'প্রামাণ্য' (authoritative) আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাতে সে-মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ অথবা সে-গ্রন্থকে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করা আবশ্যক হয় না; সংশয় নিরসন করিতে সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করাই যথেষ্ট।

দেবেন্দ্রনাথ কি অভিপ্রায়ে 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দেবেন্দ্রনাথ একবার তর্কবিতর্কের মধ্যে পড়িয়া কিছু কালের জন্য উপনিষদকে শুধু 'প্রামাণ্য গ্রন্থ' না বলিয়া 'অভ্রান্ত গ্রন্থ'ও বলিয়াছিলেন বটে। সে তর্কবিতর্কের ইতিহাস নিম্নে লিখিত হইতেছে। কিন্তু উপনিষদের প্রতি এই অভ্রান্ততা আরোপ দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ ছিল; ইহা সাময়িক কারণে ও তর্কবিতর্কের তাড়নায় ঘটিয়াছিল; ইহা দেবেন্দ্রনাথের সুচিন্তিত ও স্থায়ী বিশ্বাসের অন্তর্গত ছিল না।

বেদান্তবিষয়ক বাদানুবাদের ইতিহাস।

রামমোহন রায় বেদান্তকে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারের সাহায্যের জন্য ব্যবহার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বেদান্তের নামে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত সমুদয় মতকে সমগ্রভাবে কখনই গ্রহণ করেন নাই। যে একান্ত অদ্বৈতবাদে উপাসনা অসম্ভব হয়, যে মায়াবাদে জগৎকে মিথ্যা ও অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করা হয়, যে সন্ন্যাসবাদ গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্ভব বলিয়া প্রচার করে এবং মানুষকে সংসারের ভালমন্দ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া তোলে, তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে রামমোহন রায় কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রচলিত বেদান্তবাদের মতে ব্যক্তিগত উপাসনাই অসম্ভব, রামমোহন রায়-প্রবর্ত্তিত সামাজিক উপাসনা তো আরও অসম্ভব। এই সকল কারণে বেদান্তের দোহাই দেওয়া সত্ত্বেও রামমোহন রায় সমসাময়িক লোকের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন। সে সময়ে সাধারণ লোকেরা রামমোহন রায়ের বেদান্তকে প্রকৃত বেদান্ত বলিয়া স্বীকার করিত না, বেদান্তের বিকৃত রূপ (caricature) বলিয়াই মনে করিত। (H. B. S. I., 73.)

রামমোহন রায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশকে বেদান্ত শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের অতি বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত সেবক ছিলেন বটে; কিন্তু রামমোহন রায়ের ন্যায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও নানা ধর্ম্মের আলোচনাজনিত চিন্তার উদারতা তাঁহার মধ্যে ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি বেদান্তের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিত। তাঁহার হাতে পড়িয়া

রামমোহন রায়ের 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম' আর সার্ব্বভৌমিক বা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম রহিল না; ক্রমশঃ তাহা স্বীয় নামের দ্বারা সূচিত সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া একান্তভাবে 'বেদান্তধর্ম্মেই' পরিণত হইল। (৪১০ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উক্তি দ্রষ্টব্য)। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বিশ্বাস করিতে ও প্রচার করিতে লাগিলেন যে (১) বেদ অপৌরুষেয়, অতএব নিত্য, এবং অভ্রান্ত; এবং (২) বেদান্ত অনুসরণ করিয়া পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অভেদচিন্তনই মুখ্য উপাসনা।

এস্থলে ইহা বলা উচিত যে বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় রামমোহন রায়ের অন্যান্য শিষ্যগণও বেদান্তকে অভ্রান্ত বলিতেন। যথা, রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীতের ৭৯ সংখ্যক (কৃষ্ণমোহন মজুমদার রচিত) সঙ্গীতে আছে, "অভ্রান্ত বেদান্ত শান্ত, কহে না পাইয়া অন্ত, 'এ নহে, এ নহে', হয় এই নিরূপণ"; ৯৬ সংখ্যক (কালীনাথ রায় রচিত) সঙ্গীতে আছে, "ন্যায় সাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পায় স্থল, অভ্রান্ত বেদান্ত অন্ত না জানে তাঁহার; মীমাংসা সংশয়াপন্ন হ'য়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্যমনোতীত তিনি সকল-কারণ।"

১৮৩৫ কিংবা ১৮৩৬ সালে দেবেন্দ্রনাথের জীবনপরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। ১৮৩৮ সালে তিনি বিদ্যাবাগীশের কাছে উপনিষদ্ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী সভা, ১৮৪০ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ও ১৮৪৩ সালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্ত্তিত হয়। পাঠশালায় উপনিষদ্ পড়ান হইতে লাগিল, এবং পত্রিকায় উপনিষদের বৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই দুই কার্য্য প্রধানতঃ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের সহায়তায় সম্পন্ন হইত।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৮৪৫ সালের ২রা মার্চ্চ পরলোকগমন করেন। তাঁহার জীবিতকালে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বহুল পরিমাণে তাঁহার দ্বারাই প্রভাবিত হইয়া চলিতেছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরও এ প্রভাব বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যাহা লিখিতেন, তাহার মধ্যে তাঁহার ঐ দুই মতও প্রকাশ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; তথাপি তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রবন্ধের

অদ্বৈতবাদ প্রতিপাদক উক্তি সকলের প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না ; দেবেন্দ্রনাথ প্রথম হইতেই অদ্বৈতবাদের বিরোধী ছিলেন। (আত্মজীবনী ৭৭, ২১৩ পৃষ্ঠা)।

এইরূপে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিদ্যাবাগীশের অদ্বৈতবাদ হইতে মুক্ত রহিল বটে, কিন্তু এ উভয়ে তাঁহার প্রচারিত বেদান্তের অভ্রান্ততার মত তাঁহার মৃত্যুর পরও চলিতে লাগিল।

ক্রমে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেশের গণ্য মান্য লোক প্রায় সকলেই ইহার সভ্য হইলেন। ব্রাহ্মগণ এতদিন দেশের কাছে অপরিচিত ছিলেন, এখন তাঁহারা এই সভার নামে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই সময়েও বিদ্যাবাগীশ হইতে আগত বেদান্তের অভ্রান্ততার মতটি সভায় ও পত্রিকায় নীরবে অবিচারে স্বীকৃত হইয়া চলিল।

এদিকে ১৮৪৪ সালে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাতে উপনিষদ্ পড়াইতে পড়াইতে দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ অনুভব করিতে লাগিলেন যে বেদ না জানিলে উপনিষদ্ ভাল করিয়া বোঝা যায় না। তাই বেদ জানিবার জন্য ১৮৪৪ অথবা ১৮৪৫ সালে আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে কাশীতে প্রেরণ করা হইল।

আত্মজীবনী (ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিচ্ছেদ) হইতে জানিতে পারা যায় যে এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদ্ কিছু কিছু পড়িয়াছিলেন, এবং শঙ্করভাষ্যের সাহায্যে বেদান্তসূত্রও পড়িয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের অসমগ্র অধ্যয়নের ফলে তাঁহার মনে এই প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে বেদান্তসূত্রের ন্যায় উপনিষদও আদ্যন্ত একভাবাপন্ন (homogeneous) ও সুসম্বদ্ধ (systematic) রচনাবলীর সমাবেশ। তাই তিনি মনে করিলেন, বেদান্তসূত্র অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দেয়, অতএব তাহা ত্যাজ্য ; এবং উপনিষদ কেবল বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিক্ষা দেয়, অতএব তাহা আদরণীয়। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদকেই বেদান্ত বলিতেন। এই বেদান্ত 'অভ্রান্ত' কি না, এ বিষয়ে এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

কিন্তু এই সময়েই (১৮৪৪) খ্রীষ্টিয়দিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল। তখনও বিদ্যাবাগীশ মহাশয় জীবিত ; বিদ্যাবাগীশ প্রচারিত

বেদান্তের অভ্রান্ততার মতকে তত্ত্ববোধিনী সভার (সুতরাং ব্রাহ্মসমাজেরও) মত বলিয়া তখনও লোকে জানে। সুতরাং দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টীয় প্রতিপক্ষগণ ব্রাহ্মসমাজকে আক্রমণ করিতে গিয়া এই মতটির উপরেই বিশেষ ভাবে আক্রমণ করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ এই সকল আক্রমণের উত্তর দিতে গিয়া বিদ্যাবাগীশের ভূমিকেই অবলম্বন করিলেন; বেদান্তের অভ্রান্ততা মানিয়া লইলেন। তাঁহার তখনও ধারণা ছিল যে বেদান্তে (অর্থাৎ উপনিষদে) বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ বই আর কিছু নাই।

ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল যাহা, তাহাই হইল। বেদান্তের অভ্রান্ততা রক্ষা করিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ সুযুক্তির অভাবে বিব্রত হইয়া পড়িতে লাগিলেন; দাঁড়াইবার ভূমিতে দাঁড়াইয়া থাকা কঠিন হইতে লাগিল। আবার তাঁহারই স্বদলভুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি এই তর্কে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকৃত হইলেন।

পাঠ ও চিন্তা করিবার উপযুক্ত অবসর পাইলে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তের অভ্রান্ততা একদিনের তরেও স্বীকার কিংবা সমর্থন করিতেন কি না, সন্দেহ। উপনিষদ ভাল করিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই, এবং অতি অপ্রস্তুত অবস্থায়, তিনি এই তর্কজালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবশ্য, ইহার সহিত এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, স্বভাবতঃ ধীরগতিপ্রিয় দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে, চিন্তার কোনও পুরাতন ভিত্তিকে হঠাৎ পরিত্যাগ করা কঠিন ছিল।

ইহার পর হইতে কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যেমন একদিকে খ্রীষ্টীয়দিগের সহিত বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, তেমনি বেদান্তের অভ্রান্ততা বিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ লেখকগণের প্রেরিত পত্রে দেবেন্দ্রনাথের উক্তির প্রতিবাদও চলিতে লাগিল। তৎকালীন 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভায়' (অর্থাৎ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীতে) অক্ষয়কুমার দত্তের পক্ষীয় লোকের সংখ্যাই অধিক ছিল।

নিজ দলের ভিতরে এইরূপ মতভেদ দেখিয়া দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র বেদ ভালরূপে জানিবার জন্য আরও তিন জন ছাত্রকে কাশীতে প্রেরণ করিলেন; এবং পিতার মৃত্যুর পরে পিতার শ্রাদ্ধ ও সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে একটু মুক্ত

হইবামাত্র স্বয়ং কাশীতে গিয়া বেদ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আত্মজীবনীর সপ্তদশ পরিচ্ছেদে কাশীধামে দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হয় নাই ; উহাতে কেবল বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদপাঠ ও বেদ গানের বর্ণনা আছে। কিন্তু কাশীতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ যে কার্য্যটি প্রধান ভাবে করিয়াছিলেন, তাহা এই বেদ পাঠ ও বেদ গান শ্রবণ নহে। তিনি নিজের প্রেরিত চারিজন ছাত্রের সহিত গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়া আসিয়াছিলেন যে বেদে কি আছে ও কি নাই।

দেবেন্দ্রনাথের কয়েকজন প্রতিপক্ষ।

যাহা হউক, এখন বেদান্তবিষয়ক বাদানুবাদে দেবেন্দ্রনাথের তিন জন প্রতিপক্ষের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম প্রতিপক্ষ, খ্রীষ্টিয় মিশনরী আলেগ্‌জাণ্ডার ডফ্ সাহেব। রামমোহন রায়ের অনুরোধপত্র পাইয়া, এবং তাঁহারই উৎসাহে, স্কটলণ্ডস্থ জেনারেল্ এসেম্‌ব্লিজ্ মিশন্ ১৮৩০ সালে ডফ্ সাহেবকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। রামমোহন রায় ডফ্‌কে বিধিমত সাহায্য করেন। তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষাদানের জন্য স্কুল খুলিতে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কেহ বাড়ী ভাড়া দিতেছিল না ; রামমোহন রায় চেষ্টা করিয়া চিৎপুর রোডের ব্রাহ্মসমাজের পরিত্যক্ত বাড়ীখানি তাঁহাকে ভাড়া করিয়া দেন। ছাত্র জুটিতেছিল না ; রামমোহন রায় নিজের স্কুলের কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছাত্রকে বুঝাইয়া ডফের স্কুলে প্রেরণ করেন। বাইবেল পড়ান হয় বলিয়া ছাত্রগণ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল ; রামমোহন রায় বহুদিন পর্য্যন্ত স্বয়ং প্রতিদিন স্কুলে আসিয়া ছাত্রদিগকে অভয়দান করেন। এই প্রকারে রামমোহন রায় যাঁহাকে বলিতে গেলে হাতে ধরিয়া কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া গেলেন, সেই ডফ্ সাহেবই, মিশনরী সাহেবগণের চিরাচরিত রীতি অনুসারে, য়ুরোপ ও আমেরিকায় গিয়া ভারতবর্ষকে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া, তত্তৎদেশবাসীদিগকে তাঁহার মিশনে অর্থদান করিতে উৎসাহিত করেন। স্ব-রচিত India and India's Missions নামক পুস্তকে ডফ্ সাহেব হিন্দুধর্ম্মের ও বেদান্তের প্রভূত নিন্দাবাদ করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইহাতে অতিশয় ক্ষুব্ধ হইলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ১৭৬৬ শকের আশ্বিন (১৮৪৪ সালের সেপ্টেম্বর) এবং তৎপরবর্ত্তী মাঘ, শ্রাবণ ও আশ্বিন (১৮৪৫ সালের জানুয়ারী, জুলাই ও সেপ্টেম্বর) মাসে, ঐ পুস্তকের, এবং এই বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ কলিকাতার তৎকালীন খ্রীষ্টিয় পত্রিকা সকলের আক্রমণের, চারিটি প্রতিবাদ মুদ্রিত হইল; এবং ১৮৪৫ সালেই ঐ চারিটি প্রতিবাদ হইতে সঙ্কলিত Vedantic Doctrines Vindicated নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইল।

এই সকল বাদ প্রতিবাদের মধ্যেই আর এক ঘটনা ঘটিল। ১৮৪৫ সালের এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে ডফ্ সাহেব, অভিভাবকগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, তাঁহার বিদ্যালয়ের ১৪ বৎসর বয়স্ক ছাত্র উমেশচন্দ্র সরকারকে ও তাহার ১১ বৎসর বয়স্কা বালিকা পত্নীকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও উত্তেজনা অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ, দেবেন্দ্রনাথের খ্রীষ্টধর্ম্মানুরাগী জ্ঞাতি-ভ্রাতা (প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের পুত্র) জ্ঞানেন্দ্রমোহন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৬ সালে সমুদয় হিন্দু আত্মীয়গণকে অসন্তুষ্ট করিয়া অপৌত্তলিক বৈদিক মতে নিজ পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এই শ্রাদ্ধের বিরুদ্ধে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ১৮৪৬ সালের অক্টোবর মাসে *Englishman* পত্রিকায় লেখনী চালনা করেন। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও তাঁহার সমর্থনকারী *Englishman* সম্পাদক বলেন, শ্রাদ্ধ একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। তাহার সহিত পৌত্তলিকতা অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। যুক্তিবাদী ধর্ম্মে 'শ্রাদ্ধ' বলিয়া একটি অনুষ্ঠানের স্থান থাকিতে পারে না; দেবেন্দ্রনাথ তাহা অনুষ্ঠিত হইতে দিয়া কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিয়াছেন, (৪০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এ সকল উক্তির উত্তর দিতে গিয়া দেবেন্দ্রনাথ এই ভাবের কথা বলেন যে, "আমরা বেদকে আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের মানদণ্ড মনে করি। আমরা ব্রাহ্ম হইয়া বেদের জ্ঞানকাণ্ড মাত্র গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডকে (শ্রাদ্ধাদি যাহার অন্তর্গত) আমরা নিরর্থক মনে করিলেও দূষণীয় মনে করি না।"—এই জ্ঞানেন্দ্রমোহন পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

তৃতীয় প্রতিপক্ষ, জগদ্বন্ধু নামক পত্রিকা। এই পত্রিকার সহিত দেবেন্দ্রনাথের তর্কযুদ্ধও ১৮৪৬ সালেই উপস্থিত হয়। এই পত্রিকা বলেন, বেদ অভ্রান্ত

ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারে না। দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে তত্ত্বোধিনী পত্রিকায় সম্পাদকরূপে এই কথার প্রতিবাদ লিখিতে বলেন; অক্ষয়কুমার তাহা করিতে অসম্মত হন। তখন দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ বাবু নিজ নিজ নামে প্রতিবাদ লিখিয়া তাহা তত্ত্বোধিনীতে প্রকাশ করেন।

বাংলা ভাষায় যে সকল বাদ প্রতিবাদ চলিতেছিল, তাহার ভিতরে দেখা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ বেদকে 'নিত্য' বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না; কিন্তু বেদবাক্যমাত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বেদবাক্যের মধ্যে যাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, কেবল তাহাই যে মান্য তাহা নহে; সমগ্র বেদই মান্য ও প্রামাণ্য। কারণ, "পক্ষপাত ও মোহশূন্য হইয়া সেই বেদভাবকে আমরা আলোচনা করিলে যখন তন্মধ্যে যুক্তিসাধ্য সমুদয় বিষয় আমাদিগের বুদ্ধি নিষ্পন্ন সিদ্ধান্তের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হয়, তখন বেদমধ্যে আমাদিগের বুদ্ধি-সীমার অতীত সমুদয় ধর্ম্মও যে অখণ্ডরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রতি সংশয় কি ?" (তত্ত্ববো. ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৪—২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত)। এই যুক্তি এত দুর্ব্বল যে আজকাল বালকেরাও ইহার সদুত্তর দিতে পারে।

ইংরেজী বাদানুবাদের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তকে 'Revelation' অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ বলিয়াছিলেন। 'Revelation' বলিতে দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায়টি ঠিক কি ছিল, তাহা এই বাদানুবাদে তাঁহার সহযোগী রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

Revelation শব্দে দেবেন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন ?

রাজনারায়ণ বসু মহাশয় স্বীয় আত্মচরিতে লিখিতেছেন :—

"ইংরাজী ১৮৪৮—৫০[১] এই তিন বৎসর, বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট কি না ইহা সর্ব্বদা আমাদিগের মধ্যে বিচারিত হইত। আমরা তখন ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস করিতাম বটে, কিন্তু, বেদ কেবল যুক্তিযুক্ত বাক্যপূর্ণ বলিয়া, তাহা

(১) এই অঙ্ক নির্দ্দেশ পর পৃষ্ঠায় বসু মহাশয়ের নিজের উক্তির সহিত মিলিতেছে না। কাশী হইতে ছাত্রগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে এই বিচার হইত, এবং কাশীর ছাত্রগণ ১৮৪৮ সালে ফিরিয়া আসেন। সুতরাং এই স্থানে ১৮৪৫—৪৭ বলিলে কতকটা ঠিক হয়। —(আত্মজীবনী সম্পাদক)।

ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিতাম। আমরা যে এইরূপে বিশ্বাস করিতাম, তাহা আমার *Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj* নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যদ্বারা প্রমাণিত হইবে। 'After the death of Ram Mohan Ray, the catholic character of the Samaj was not destroyed. Even while its leaders admitted the Vedas to be a revelation, they did so solely on account of the "reasonableness and cogency of these doctrines," (see *Vedantic Doctrines Vindicated,*) as compared with the other Shastras of the Hindus and the religious scriptures of other nations. They rejected the idea of a revelation supported by external evidence. ... The Revd. Mr. Mullens in his *Essay on Vedantism, Brahmoism, and Christianity* says: "Though the Brahmos claim the Vedas as a revelation of divine truth, they look primarily upon the works of Nature as their religious teacher. From Nature they learned first, and because the Vedas, (as they assert,) agree with Nature, therefore they regard them as inspired." ... It is, therefore, evident that the leaders of the Samaj at this time considered the Vedas to be revealed solely on account of the reasonableness and cogency of these doctrines. Their error lay in believing that whatever they contained was reasonable and cogent. As soon as they perceived their mistake after a wider study of the Vedas, they shook it off at once. Now, why did they do so easily ? The reason is, that a higher standard of belief had always predominated in their minds ... over that of written revelation, *viz.,* the standard of Reason ; and, as conscientious men, they could not continue professing that to be a revelation, which was found to contain errors.'

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহাতে প্রমাণিত হইবে যে, দেবেন্দ্র বাবুর প্রথম সময়ের ব্রাহ্মেরা প্রকৃত প্রস্তাবে বেদকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া কখন বিশ্বাস করিতেন না।

যে চারি জন যুবক পণ্ডিত দেবেন্দ্র বাবু দ্বারা কাশীতে প্রেরিত হয়েন, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ফিরিয়া আইলে পর বেদকে উপরে উল্লিখিত

তুর্ব্বলাকারেও ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইবে কি না, এই লইয়া আমাদিগের মধ্যে মহা তর্ক উপস্থিত হইল। দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি, অথচ সংস্কারক; অক্ষয় বাবু যুক্তির অত্যন্ত অনুরাগী ও সংস্কার বিষয়ে অগ্রসর। দুই জনে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উহাতে ভ্রম ও অযুক্তিযুক্ত বাক্য দৃষ্ট হইতেছে। 'বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত,' এই মত অক্ষয় বাবু দ্বারা ১৭৭২ শকের ১১ই মাঘ দিবসের সাম্বৎসরিক উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষিত হয়।"—(রাজ. ৬৫—৬৮)।

['বেদ' ও 'বেদান্ত' উভয় শব্দে এখানে উপনিষদই বুঝিতে হইবে।]

'তুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদেশে বিশ্বাস' ত্যাগ।

রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের ইংরেজী উক্তিতে এই কথা আছে যে, "ব্রাহ্মগণ অধিক বিস্তৃতভাবে বেদ পাঠ করিয়া যখন বুঝিলেন যে তাহাতে ভ্রম আছে, তৎক্ষণাৎ তাঁহারা তাহার ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্টতায় বিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।" ঐ স্থলে 'ব্রাহ্মগণ' অর্থে প্রধানতঃ দেবেন্দ্রনাথকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নের কাজটি বিশেষভাবে দেবেন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন।

পিতার ব্যবসায়ের পতনের ফলে যে বৎসর তাঁহার বিষয় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, সেই বৎসরই (১৮৪৮) দেবেন্দ্রনাথ এই "অধিক বিস্তৃতভাবে বেদ (ও উপনিষদ্) অধ্যয়নে" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সারাদিন অধ্যয়নের পর সন্ধ্যাকালে ছাতের উপরে কম্বল পাতিয়া বসিতেন, ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিতেন, এবং ধর্ম্মপ্রসঙ্গে প্রায়ই রাত্রি দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়া যাইত,—এই সকল কথা আত্মজীবনীর ১৫১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে।

বসু মহাশয়ের উক্তি হইতে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ অথবা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় যে-ভাবে অভ্রান্ত পুস্তকে বিশ্বাস করিতেন, দেবেন্দ্রনাথ যে কয় দিন বেদান্তের পক্ষাবলম্বন করিয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন, সে কয় দিনও সে-ভাবে তাহার অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিতেন না। খ্রীষ্টানগণের

এবং বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের চিন্তার ক্রম এইরূপ,—"এই পুস্তক ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট, অতএব ইহা অভ্রান্ত, ও অক্ষরে অক্ষরে সত্য।" দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার ক্রম ছিল অন্যরূপ। তাহা এই,—"এই পুস্তকে কোনও ভুল পাওয়া যাইতেছে না, সব কথা যুক্তির সঙ্গে মিলিতেছে, অতএব ইহাকে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট বলা যায়।" এই দুই প্রকার চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই কারণেই, দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে কোথাও এমন স্পষ্ট কথা পাওয়া যায় না যে তিনি কোনও দিন বেদান্তের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, খ্রীষ্টানগণের সহিত এই সকল তর্কের ভিতরে দেবেন্দ্রনাথ বেদান্তকে যেরূপ 'দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতেই অক্ষয়কুমার দত্ত অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, এবং রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিও-শিষ্যগণ অতিশয় বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ এই বেদান্তসমর্থনের ভিতরে সুযুক্তির একান্ত অসদ্ভাব দেখিয়া ইহাকে কপটতা বলিয়া বিদ্রূপ করিতেন। কঠোর সত্যনিষ্ঠ রামতনু লাহিড়ী মহাশয় বিরক্ত হইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা গ্রহণ করাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। (রামতনু, ১৭৩,১৮০,১৮১ পৃঃ)।

এই 'দুর্ব্বলাকারে ঈশ্বরপ্রত্যাদেশ' স্বীকার বোধ হয় ১৮৪৬ সাল পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। যে গভীরতর ও বিস্তৃততর অধ্যয়নের ফলে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে বেদে ও উপনিষদে অনেক অযৌক্তিক কথা আছে এবং তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে পারিবে না, সে অধ্যয়ন এই বৎসরে আরব্ধ হইয়া ১৮৪৮ সালে সম্পূর্ণ হয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন, (তত্ত্ববো. ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৫, ২৬ পৃষ্ঠা),—"অবশেষে 'জগদ্বন্ধু' পত্রিকার সহিত বাদানুবাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং কাশীধামে যাইয়া বেদবেদান্ত আলোচনা করিয়া ১৭৬৯ শকে [১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে] আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

এই আলোচনার ফলে এই বৎসরের প্রথমেই ব্রাহ্মসমাজ বেদের অভ্রান্ততা ও নিত্যতায় বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইলেন। তাই ১৭৬৯ শকের বৈশাখ [১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল] মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শিরোদেশে

সেই সুপ্রসিদ্ধ উপনিষৎ মন্ত্র শোভিত দেখিতে পাই,—'অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।'

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কি দুর্দ্ধর্ষ মানসিক বলের পরিচয়, তাহা আমরা এখন কল্পনাতেও আনিতে পারি না। শত সহস্র যুগ যুগান্তরের অর্জ্জিত মানসিক শৃঙ্খল নির্ব্বিবাদে ও সহজে খসিয়া গেল; বিনা রক্তপাতে একটা মহান্ আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধিত হইল।…এই স্বাধীনতা-ভাগীরথী আনয়ন বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে অক্ষয়কুমারের নিকটে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি কখনও অস্বীকার করিতেন না।"

১৮৪৭ সালের ২৮শে মে (১৭৬৯ শকের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ) তত্ত্ববোধিনী সভার এক অধিবেশনে স্থির হইল যে অতঃপর 'বেদান্তপ্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্মের' পরিবর্ত্তে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' নামটি ব্যবহৃত হইবে। (৩৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

দেবেন্দ্রনাথের ১৮৪৭ সালের মত ও বিশ্বাস।

দেবেন্দ্রনাথের এই সময়ের মত ও বিশ্বাস *Bengal Hurkaru* পত্রিকার ১৮৪৭ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় 'Bengalensis' ছদ্মনামধারী লেখকের 'Historical Sketch of Vedantism' শীর্ষক একটি পত্র হইতে জানিতে পারা যায়। এই পত্রে লেখক বলিতেছেন, "The Vedantists call themselves Brahmmas";তৎপরে বলিতেছেন, "Vedantism consists only in (1) a belief in the existence and infinite attributes of God. (2) In His worship through contemplation, truth, and love. (3) In the observance of His laws. (4) In a belief in the doctrine of transmigration of souls through bodies in this or any other orb of the universe. (5) In a belief in the final liberation of the soul of the pious from all corporeal connections and particular worlds of transmigratory existence, and its enjoyment of all spiritual bliss arising from a complete knowledge and love of God". মৃত্যুর পরে আত্মার লোকলোকান্তরে বিচরণ ও নব নব দেহধারণ বিষয়ক মতটি দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এই পত্র দেবেন্দ্রনাথেরই রচিত, অথবা তাঁহার

প্রেরণায় তাঁহার পক্ষীয় কোন লেখকের রচিত। আত্মজীবনীর ১৭১, ১৭২ পৃষ্ঠায় দেবেন্দ্রনাথের এই মত ব্যক্ত রহিয়াছে। (Transmigration শব্দটি থাকিলেও, ইহা পূর্ব্বজন্মবিস্মরণমূলক জন্মান্তরবাদ নহে)। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি এই মতে বিশ্বাস করিতেন বলিয়া মনে হয় না।

এই পত্রে 'Vedantism' নামটিই ব্যবহৃত হইয়াছে। বোধ হয় চারি মাস পূর্ব্বে অবলম্বিত নূতন নাম 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' তখনও তাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। এই পত্রে বিবৃত প্রথম তিনটি মত হইতে ইহাও বোঝা যায় যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত প্রকাশক সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলী ('ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ') রচনা করিবার সঙ্কল্প এই সময় হইতেই দেবেন্দ্রনাথের মনে উদিত হইয়াছিল। ১৮৪৮ সালে যখন তিনি 'বীজ' রচনা করেন, তখন মৃত্যুর পরে আত্মার অবস্থা বিষয়ক ৪র্থ ও ৫ম মত তাহাতে নিবিষ্ট করেন নাই।

১৮৪৮ সালেই 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সঙ্কলিত হইল। ১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে তাহা আশ্চর্য্যরূপে সমগ্র বঙ্গদেশে সমাদৃত ও প্রচারিত হইল। দেশের সমুদয় শিক্ষিত লোক যেন এই গ্রন্থের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ১৮৫১ সালের মাঘোৎসবে প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে ঘোষণা করা হইল যে বেদবেদান্ত ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে ও ব্রাহ্মসমাজের শাস্ত্র নহে।

এই ঘোষণা অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতার মধ্য দিয়া করা হয় বটে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের অনুমতিক্রমেই ইহা করা হইয়াছিল। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির ইচ্ছা ছিল যে এই ঘোষণা আরও বহু পূর্ব্বে করা হয়, এবং তাঁহারা এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের এই ধীর গতিতে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে বিলম্বের দুই কারণ।

দেবেন্দ্রনাথের বেদান্তত্যাগে এই বিলম্বের কারণ বিষয়ে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের উদ্ধৃত উক্তির ভিতরে যে ইঙ্গিত রহিয়াছে ("দেবেন্দ্র বাবু চিরকাল ভক্তিপ্রধান ও রক্ষণশীল ব্যক্তি, অথচ সংস্কারক,") তাহা আমার কাছে একমাত্র কারণ অথবা মুখ্য কারণ বলিয়া মনে হয় না।

মুখ্য কারণ দুইটি। প্রথম কারণ, উপনিষদের ঋষিদিগের সহিত দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ও হৃদয়ের গভীর যোগ। দেবেন্দ্রনাথের

প্রকৃতি তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের প্রকৃতি অপেক্ষা অনেক অধিক গভীর ছিল। তাঁহারা অনেকেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মাত্র ছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মপিপাসু ছিলেন। তাঁহাদের একমাত্র অন্বেষণের বস্তু ছিল 'যুক্তি', দেবেন্দ্রনাথের অন্বেষণের বস্তু ছিল প্রথমে 'ব্যক্তি,' ও তৎপরে 'যুক্তি'। দেখিতে পাওয়া যায় যে এই ব্যক্তি-অন্বেষণ দ্বিবিধ আকারে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিতে প্রথম হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম জীবনের অন্ধকারের অবস্থার ভিতরেও তিনি কেবল জ্ঞানালোকই অন্বেষণ করেন নাই; কিন্তু (১) ভক্তিভরে, নম্র হৃদয়ে, "আমার পূজা কে লইবে" বলিয়া একজন বন্দনীয় পরম **পুরুষকে** অন্বেষণ করিতেছিলেন (৯৬ পৃষ্ঠা) ; এবং (২) জ্ঞানালোকের দুই একটি কিরণ লাভ করিবামাত্র, তাহাতে যাঁহার 'সায়' আছে এমন **মানুষের** সঙ্গ পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। উপনিষদ্ দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিনিহিত এই দ্বিবিধ ব্যক্তি-অন্বেষণ চরিতার্থ করিল। উপনিষদুক্ত পরব্রহ্ম দিনে দিনে তাঁহার 'চিরজীবনসখা' হইলেন, উপনিষদের ঋষিগণ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের গুরু ও বন্ধু হইলেন।

ধর্ম্মসাধকের পক্ষে এই 'সায় পাওয়া' যে কত আবশ্যক, তাহা দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীর চতুর্থ, পঞ্চম, ও সপ্তম পরিচ্ছেদে জ্বলন্ত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। আত্মজীবনীর এই অংশ পাঠ করিবার সময়, এই 'সায়ের' প্রকৃতিটি কি, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। একজন তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি নিজ চিন্তা ও যুক্তির দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন, অপর একজনকে স্বতন্ত্র-ভাবে সেই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে দেখিলে তাঁহার মনে যে আশ্বাস লাভ হয়, দেবেন্দ্রনাথ 'সায়' বলিতে কি সেই আশ্বাস বুঝিয়াছিলেন? তাহা নহে। জিজ্ঞাসুর পক্ষে, কেবল যুক্তিপথের যাত্রীর পক্ষে, সহযাত্রীর এই সাক্ষ্যটুকু যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরসঙ্গপিপাসুর পক্ষে ব্যক্তিগত সম্বন্ধবিহীন এই সাক্ষ্যটুকু যথেষ্ট হয় না। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি ধর্ম্মজীবনের আরম্ভকাল হইতেই এইরূপ সঙ্গপিপাসু ছিলেন; তিনি কোনও দিনই কেবল জিজ্ঞাসুমাত্র ছিলেন না। যে সময়ে তিনি সংশয়ের আন্দোলনে আন্দোলিত, সেই সময়েও তিনি, শুধু তত্ত্বজ্ঞানের জন্য নয়, কিন্তু সকল জ্ঞানের উৎস যে পরম পুরুষ, তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধির জন্য

লালায়িত ছিলেন। তাই সেই সময়ে তাঁহার চিত্ত, এই পরম পুরুষের মুখ সাক্ষাৎভাবে যিনি দর্শন করিয়াছেন, এমন কোনও আপ্তকাম সাধকের সহিত পরিচিত হইবার জন্য, ও এমন আপ্তকাম সাধকের সায় পাইবার জন্য, তৃষিত ছিল। যে পদ্মার মাঝীর দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি নিজ আকাঙ্ক্ষিত সায়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন (আত্মজীবনী, ৫৫পৃষ্ঠা), সে মাঝী যুক্তিপথের সহযাত্রীর উপমাস্থল নহে, পারগামী সাধকেরই উপমাস্থল।

তৎপরে, উপনিষদের ঋষিদিগের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের ভাবটি বুঝিতে হইলে আরও একটি বিষয়ে প্রণিধান করা আবশ্যক। দেবেন্দ্রনাথ চিন্তা ও যুক্তিকে (Reason) তাহার প্রাপ্য মূল্য সর্ব্বদাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু চিন্তা ও যুক্তিকেই সত্যলাভের **একমাত্র** উপায় বলিয়া তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই। উপনিষদের (মুণ্ড. ৩।১।৮) অনুসরণে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, যে-সাধক জ্ঞানোজ্জ্বলিত পবিত্র হৃদয়ে ধ্যায়মান হন, তাঁহার সেই চিত্তে ঈশ্বর সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হন, এবং সাক্ষাৎভাবে (অর্থাৎ যুক্তির পথ দিয়া না গেলেও) পবিত্র সত্যসকল প্রকাশিত করেন। তিনি বলিতেছেন, (আত্মজীবনী, ১৪৩ পৃষ্ঠা),—"ঋষিরা ... শুদ্ধ হইয়া একাগ্র মনে জ্ঞানময় তপঃসাধনে রত হইলেন। তখন দেব-দেব পরমদেবতা সেই একাগ্রমনা স্থিরবুদ্ধি ঋষিদিগের নির্ম্মল হৃদয়ে আপনি আবির্ভূত হইয়া, মন ও বুদ্ধির অতীত সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন।" দেবেন্দ্রনাথের মতে শ্রবণ (অধ্যয়ন) এবং মনন (যুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত-মালা গ্রন্থন) জ্ঞানের একটি পথ; ধ্যানলব্ধ 'অপরোক্ষানুভূতি' জ্ঞানের দ্বিতীয় পথ। উচ্চ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পক্ষে দেবেন্দ্রনাথ এই দ্বিতীয় পথকে যুক্তির পথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন; এবং এই অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ জ্ঞানের সহিত যখন যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তের মিল হইত, তখন সেই 'সায়' পাইয়া তিনি তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত হইতেন।

প্রথম জীবনে যখন তিনি কেবল যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছিলেন, যখন তিনি অপরোক্ষানুভূতির অধিকারী হন নাই, তখন নিজের সেই যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তসকলের সহিত উপনিষদের জ্ঞানোজ্জ্বলিত পবিত্র হৃদয়-সম্পন্ন ঋষিদিগের অপরোক্ষানুভূতির মিল দেখিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। এই জন্যই

আত্মজীবনীতে ঐ সময়ের বর্ণনায় তিনি এইরূপ আশ্চর্য্য ভাষা ব্যবহার করিতেছেন,—"আমি মানুষের নিকট হইতে সায় পাইতে ব্যস্ত ছিলাম, এখন স্বর্গ হইতে দৈববাণী আসিয়া আমার মর্ম্মের মধ্যে সায় দিল,—আমার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইল!" (৬০ পৃষ্ঠা)। "এ আমার নিজের দুর্ব্বল বুদ্ধির কথা নহে, এ সেই ঈশ্বরের উপদেশ। সে ঋষি কি ধন্য, যাঁহার হৃদয়ে এই সত্য প্রথমে স্থান পাইয়াছিল!" (৬১ পৃষ্ঠা)। উপনিষদের বিশুদ্ধ-হৃদয় ঋষিদিগের ধ্যায়মান চিত্তে ঈশ্বর সাক্ষাৎ ভাবে আপনার জ্ঞান প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস ছিল; তাই তিনি উপনিষদের সায়কে 'দৈববাণী' ও 'ঈশ্বরের উপদেশ' বলিয়াছেন।

পরবর্ত্তী জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম খণ্ড রচনা ব্যাপারের বর্ণনাসূত্রে তিনি বলিতেছেন, "কে আমার হৃদয়ে এই সত্যসকল প্রেরণ করিলেন? 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ,' যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, সেই জাগ্রৎ জীবন্ত দেবতাই আমার হৃদয়ে এই সকল সত্য প্রেরণ করিলেন। ইহা আমার দুর্ব্বল বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, ইহা মোহবাক্যও নহে, প্রলাপবাক্যও নহে। ইহা আমার হৃদয়ে উচ্ছ্বসিত তাঁহারই প্রেরিত সত্য। যিনি সত্যের প্রাণ, যিনি সত্যের আলোক, তাঁহা হইতেই এই জীবন্ত সত্যসকল আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়াছে।" (আত্মজীবনী, ১৭৯ পৃষ্ঠা)। এ সময়ে দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতিতে পহুঁছিয়াছেন।

দেবেন্দ্রনাথের তৎকালীন অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে অধিকাংশ মানুষ যুক্তি তর্কের রাজ্যেই বাস করিতেন। ধর্ম্ম যে জীবনের অভিজ্ঞতার দ্বারা উপলব্ধি করিবার বস্তু, ইহা তাঁহারা জানিতেন না। উপনিষদের পশ্চাতে কোনও **মানুষকে** তাঁহারা অনুভব করিতেন না। "যুক্তিসিদ্ধতার দিক হইতে যাহা অপূর্ণ, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাজ্য," ইহার অধিক কোনও অনুভূতি তাঁহাদের চিত্তে উদিত হইত না। গভীর ঈশ্বরপিপাসার দ্বারা নিরন্তর চালিত, গভীর ঈশ্বরপিপাসার দ্বারা লব্ধদৃষ্টি, প্রাচীন ঋষিদিগের জীবনের অভিজ্ঞতা ইহাতে নিবদ্ধ আছে, এই বলিয়া দেবেন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদের যে একটি অপূর্ব্ব মূল্য ছিল, তাঁহাদের কাছে তাহা ছিল না।

ঋষিদিগের সহিত এইরূপ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ ভিন্ন, দেবেন্দ্রনাথের উপনিষদ্-ত্যাগে বিলম্বের আরও একটি কারণ ছিল। ব্রাহ্মসমাজ যে একটি ধর্ম্মমণ্ডলীর আকার ধারণ করিল, ইহা দেবেন্দ্রনাথের বহু প্রার্থনা ও সংগ্রামের ফল। এই ধর্ম্মমণ্ডলীভুক্ত আত্মাগুলির আধ্যাত্মিক কল্যাণ কিসে হয়, তাহাদের আধ্যাত্মিক ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তির সম্যক্ ব্যবস্থা কিরূপে হয়, সে বিষয়ে দেবেন্দ্র-নাথের চিত্তে গভীর ব্যাকুলতা ছিল। প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রতিদিন যাহা পাঠ করিয়া নিজ হৃদয়কে বিমল ভক্তির ভাবে পূর্ণ ও ঈশ্বরপূজার জন্য উন্মুখ করিয়া লইবেন, এমন কোনও গ্রন্থ ব্রাহ্মদের হাতে দেওয়া দেবেন্দ্রনাথ একান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। উপনিষদ্ কাড়িয়া লইলে তাহার পরিবর্ত্তে এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য ব্রহ্মোপাসককে কি দেওয়া হইবে, এই প্রশ্নের সুমীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। তর্কবিতর্কের সময়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গিগণ মনে করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতেও, শুধু যুক্তিযুক্ত বাক্যের ও সুপরীক্ষিত সত্যের আধার বলিয়াই বেদান্ত মূল্যবান্ হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। দেবেন্দ্রনাথ, দৈনিক পবিত্র পাঠের বিষয় বলিয়া, মানবহৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার ও উজ্জ্বল রাখিবার উপায়স্বরূপ বলিয়া, উপনিষদ্‌কে মূল্যবান্ মনে করিতেছিলেন।

১৮৪৯ ও ১৮৫০ সালে ক্রমে তাঁহার রচিত 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থখানি ব্রাহ্ম-দিগের অন্তরের শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। এই গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের দৈনিক ধর্ম্মসাধনে ধর্ম্মগ্রন্থপাঠের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতেছে, এবং ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মপ্রসঙ্গের ও ধর্ম্ম-সাহিত্যের প্রধান উৎসের স্থান অধিকার করিতেছে, ইহা দেখিয়া ক্রমে দেবেন্দ্রনাথের মন নিশ্চিন্ত হইল। ১৮৫০ সালে তিনি পূর্ব্বেকার 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম' গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্রের পরিবর্ত্তে (৩৭৩ পৃষ্ঠা) 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রহণের নূতন প্রতিজ্ঞাপত্র প্রণয়ন করিলেন। (এই প্রতিজ্ঞাপত্র এখন 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' গ্রন্থের পুরোভাগে দেখিতে পাওয়া যায়)। এইরূপে যখন তাঁহার পরিচালিত মণ্ডলীটির ধর্ম্মজীবন রক্ষার ও ধর্ম্মসাধনের সম্যক্ ব্যবস্থা হইল, তখন (১৮৫১ সালে), তিনি প্রকাশ্যভাবে 'বেদান্ত পরিত্যাগ' ঘোষণা করিতে অনুমতি করিলেন।

উপনিষৎকার ঋষিদিগের সহিত যোগ ও তাঁহাদিগের ধ্যানলব্ধ অপরোক্ষানুভূতিতে আস্থা, এবং নিত্যপাঠের জন্য পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থের প্রয়োজনবোধ,—এই দুই ভাব দেবেন্দ্রনাথের অন্তরের অতি গভীর স্থানে বর্ত্তমান ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার অনুবর্ত্তীদিগের ন্যায় সহজে ও অল্প সময়ে বেদান্তকে (অর্থাৎ উপনিষদ্‌কে) ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

'ব্রাহ্মধর্ম্ম' অভ্রান্ত অথবা একমাত্র অথবা শেষ ধর্ম্মগ্রন্থ নহে। আত্মপ্রত্যয় ইহার সত্যসকলের ভিত্তি।

খ্রীষ্টানগণ বাইবেলকে একমাত্র ও অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য যেরূপ ব্যাকুল হন, তাহার সহিত ভারতীয় প্রকৃতির মিল নাই। এই প্রকৃতি সম্পন্ন কোনও মানুষের পক্ষে কোনও গ্রন্থকে ঐরূপ একমাত্র বা অক্ষরে-অক্ষরে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ব্যাকুল হওয়া স্বাভাবিক নহে। খ্রীষ্টানদিগের সঙ্গে সংঘাতের ফলে এ দেশের কোনও কোনও নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে যুক্তি তর্কের অদ্ভুত ব্যায়ামের সাহায্যে বেদের অক্ষরে-অক্ষরে অভ্রান্ততা ও সর্ব্ব-মানবের পরিত্রাণের দ্বার হইবার যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে বটে। কিন্তু এই ব্যস্ততা ও এই প্রয়াস অতি আধুনিক কালের বস্তু, ও ইহা ভারতীয় চিরাগত প্রকৃতির একান্ত বিরুদ্ধ।

দেবেন্দ্রনাথের মন এ বিষয়ে ভারতীয় ছাঁচে গঠিত ছিল। খ্রীষ্টিয়দিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না হইলে, তিনি যেরূপ শান্তভাবে উপনিষদ্ অধ্যয়ন ও প্রচার করিতেছিলেন, তাহাই করিয়া চলিয়া যাইতেন। উপনিষদের সহিত বাইবেলের তুলনা, উভয়ের উৎকর্ষ অপকর্ষের বিচার, এবং উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের গৌরব পাইবার যোগ্য, অথবা যোগ্য নয়, এই সকল প্রশ্ন, তাঁহার মনে হয়তো উত্থিতই হইত না। তিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ রচনা করিলেন, তখন তাহাকে অভ্রান্ত-গ্রন্থ অথবা একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া রচনা করেন নাই।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলেন (তত্ত্ববো. ১৮৩৯ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৬৩ পৃঃ),—"আমরা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়ে অনেকবার আলাপ করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি কখনও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকে আত্মপ্রত্যয়-

পোষক একমাত্র অদ্বিতীয় এবং শেষ গ্রন্থ বলিয়া মনে করিতেন না; তিনিও ইহাকে একখানি আত্মপ্রত্যয়-পোষক অন্যতর আদর্শ গ্রন্থ বলিয়াই মনে করিতেন।"

দেবেন্দ্রনাথের ১৮৬৪ সালের রচনা ("ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত") হইতে এ বিষয়ে কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

"রামমোহন রায়ের মনের ভাব, কিসে সকল প্রকার পৌত্তলিকতা গিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়। এই জন্য এক দিক হইতে যেমন ভারতবর্ষের লোকদিগের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য একমেবাদ্বিতীয়ং পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, তেমনি আবার পৃথিবীর সমুদয় লোককে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত করিবার জন্য আর দিক হইতে তিনি কি করিলেন? না, বাইবল্‌কে নিয়ামক বলিয়া, তাহাতে যে পৌত্তলিক ভাগ আছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বাইবেল দ্বারাই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা সিদ্ধান্ত করিলেন। সেই প্রকার, কোরাণকে নিয়ন্তা করিয়া, মহম্মদকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কোরাণদ্বারাই এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রতিপন্ন করিলেন। ইহাতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলের সহিত তাঁহার বিবাদ হইল। ... এক মাত্র সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া ঈশ্বরকে লোকের নিকটে প্রতিপন্ন করিবার তাঁহার ভরসা ছিল না।

যদিও তিনি জানিতেন, ধর্ম্ম প্রচার ও রক্ষার জন্য এক এক আপ্ত পুস্তকের অবলম্বন চাই, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসের ভূমি সহজ জ্ঞান ছিল; তাহা না হইলে সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে তিনি সার সত্য কেমন করিয়া সংকলন করিলেন? যদিও তিনি ভরসা করিয়া আত্মপ্রত্যয়ের উপর লোকদিগকে নির্ভর করিতে বলিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি নিজে আত্মপ্রত্যয় দ্বারা চালিত হইতেন।...

রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন, যাহারা বেদ মানে, তাহারদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা। কিন্তু, যাহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহারদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই। ক্রমে সেই কাল

উপস্থিত হইল ; ক্রমে বেদের দোষ সকল পরিস্ফুটিত হইয়া পড়িল। তখন আমরা মনে করিলাম যে, বেদের মধ্যে যে-সত্য আছে, তাহাই সংকলন করা। এই জন্য তুই বৎসর লইয়া শ্রুতি স্মৃতি হইতে টীকার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তাহাতে অন্তর্নিবেশিত করা হইল।... যে-ধর্ম্ম সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, সে-ধর্ম্ম হইতে যে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি নিবদ্ধ হওয়া, ও কার্য্যেতে তাহা পরিণত হওয়া, ইহা পৃথিবীর কোন পুরাবৃত্তে নাই। ভারতবর্ষেই কেবল এই নূতন সৃষ্টি। ভারতবর্ষ ব্যতীত এমন দৃষ্টান্ত আর পৃথিবীতে নাই।" (পঞ্চবিংশতি, ২৭—৩৩ পৃষ্ঠা)।

৪৬

'ব্রাহ্মধর্ম্ম'গ্রন্থ রচনা।

প্রথম খণ্ড,—নূতন ব্রাহ্মী উপনিষদ্।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা বিষয়ে মহর্ষি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "তাঁহার প্রসাদে আধ্যাত্মিক সত্যসকল আমার হৃদয়ে যাহা উদ্ভাসিত হইতে লাগিল, আমি তাহা উপনিষদের মুখে নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে বলিতে লাগিলাম, এবং অক্ষয়কুমার তাহা তখনি লিখিয়া যাইতে লাগিলেন," (১৭৬ পৃষ্ঠা); "এই প্রকারে আমার হৃদয়ে যেমন যেমন উপনিষৎ-সত্যের আবির্ভাব হইতে লাগিল, তেমনি পর পর বলিতে লাগিলাম।...তিন ঘণ্টার মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইয়া গেল," (১৭৮ পৃষ্ঠা)। মহর্ষির এই উক্তিগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

অধ্যাত্মতত্ত্বের জন্য প্রথম জীবনে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কি প্রবল ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল, আত্মজীবনীর তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে আমরা তাহার পরিচয় লাভ করি। ইহার দশ এগারো বৎসর পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনা করেন। এই দশ এগারো বৎসর তিনি একাগ্র চিন্তায় এবং য়ুরোপীয় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থসকলের অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বোপরি, এই সময়ে তিনি উপনিষদের বাছা বাছা প্রিয় মন্ত্রগুলিকে

নিরন্তর পাঠ ও আলোচনা করিতেন, এবং নানা দিক হইতে সে সকলের মর্ম্মে প্রবেশ করিবার জন্য যত্ন করিতেন। এই বৎসরগুলিকে দেবেন্দ্রনাথের জীবনের 'প্রথম তপস্যার যুগ' বলা যাইতে পারে।

এই ব্যাকুল ও একাগ্র তপস্যার ফলে, প্রথমতঃ তাঁহার চিত্তে তাঁহার চিন্তালব্ধ অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল একটি বিশেষ শৃঙ্খলা ধরিয়া সজ্জিত হইয়া গেল। তৎপরে, উপনিষদ্ হইতে প্রাপ্ত তাঁহার প্রিয় মন্ত্রগুলিও, ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তালব্ধ তত্ত্বের পর্য্যায়ের মধ্যে সজ্জিত হইতে লাগিল।

উপনিষদ্‌কে তিনি এমনই প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন যে, নিজ চিন্তালব্ধ কোনও সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদে প্রতিবিম্বিত দেখিতে না পাইতেন, এবং সেই সত্যকে যতক্ষণ তিনি উপনিষদের ভাষায় স্মরণ ও প্রকাশ করিতে না পারিতেন, ততক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে তৃপ্তি হইত না। এই জন্য এই সময় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার চিন্তা ও ভাষা যেন উপনিষদের ছাঁচে ঢালাই হইয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি উপনিষদের রসে অভিষিক্ত হইয়া যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় তাঁহার অন্তরে স্বভাবতই তাঁহার ভাবের অনুকূল উপনিষদের ছিন্ন বচনাংশ সকলও ক্রমশঃ সজ্জিত ও গ্রথিত হইতে লাগিল। আত্মজীবনীর ৯৭ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই যে বৃহদারণ্যকোপনিষদের একটি সুদীর্ঘ পরিচ্ছেদের একটি ক্ষুদ্র ছিন্ন বাক্যাংশ ('অয়ম্ অস্মিন্ আকাশে তেজোময়ো হমৃতময়ঃ পুরুষঃ') ও একটি ছিন্ন শব্দ ('সর্ব্বানুভূঃ') একত্র গ্রথিত করিয়া তিনি ১৮৪৪ সালে (অর্থাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার চারি বৎসর পূর্ব্বে) আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে, উপনিষদের নানা স্থান হইতে গৃহীত বহু সমগ্র বচন, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ছিন্ন ও আপন চিন্তায় গ্রথিত বহু বচনাংশ, দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে এই যুগে সঞ্চিত ও সজ্জিত হইয়া বর্ত্তমান ছিল।

তাঁহার চিত্তে উপনিষদ্-বচন সকলের এই ভাবে সঞ্চিত গ্রথিত ও সজ্জিত হওয়ার ব্যাপারটি অতি ধীরে ধীরে সংঘটিত হইয়াছে। অতি ধীরে ধীরে, মণিকারের ন্যায় যত্নের ও নিপুণতার সহিত, দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের উজ্জ্বলতম রত্নসকল চিনিয়াছেন ও বাছিয়াছেন, এবং ততোধিক নিপুণতার সহিত সে সকল গ্রথিত ও সজ্জিত করিয়াছেন।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা ঽমৃতং গময়, আবিরাবীর্ম এধি, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্" এই প্রার্থনাটি; "যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়ো ঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ, তমেব বিদিত্বা ঽতি মৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়" এই বচনটি; "ওঁ পিতা নো ঽসি" প্রভৃতি ত্রিমন্ত্রাত্মক অর্চ্চনাটি,—ইহার প্রত্যেকটি এইরূপে নানা স্থান হইতে ছিন্ন বাক্য ও শ্লোকের দ্বারা দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গ্রথিত। কিন্তু এখন ইহার প্রত্যেকটি, আমাদের মনের তারে একটি অখণ্ড বচনের মত, এক ভাবে ও এক সুরে স্পর্শ করে।

এই নব-গ্রথিত পবিত্র বচনগুলি ব্যবহার করিবার সময়ে আমাদের মনে হয়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পক্ষে মণিকারের তুলনাটিও তুচ্ছ! এই বচনগুলি কিরূপে প্রস্তুত হইয়াছে? একজন ব্যাকুল সাধকের অন্তরে উপনিষদের বিচ্ছিন্ন বাক্যগুলি পতিত হইয়া, তাঁহার সাধনার অনলে দ্রব হইয়া, তাঁহার চিন্তা-রসে প্রেম-রসে রসিয়া, গলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

যে ভূতত্ত্ববিদ্যা (geology) দেবেন্দ্রনাথের পরম প্রিয় ছিল, তাহা হইতে একটি তুলনা সংগ্রহ করিয়া ইহা বুঝাইতে ইচ্ছা হয়। এক খণ্ড গ্রাণাইট প্রস্তর পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীকৃত প্রস্তরকণায় রচিত। ভূগর্ভের উত্তাপ ও প্রবাহিত জলধারার বেগ, দীর্ঘ যুগে, পৃথিবীর আদিম শৈলমালা হইতে শিলাখণ্ড সকলকে খসাইয়াছে, আলোড়িত ও চূর্ণীকৃত করিয়াছে, আবার তাহাকে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়াছে, ও জলমিশ্রিত নানা মসলার সংযোগে একত্র বাঁধিয়াছে। এইরূপে নূতন প্রস্তর রচিত হইয়াছে। এই নব-রচিত প্রস্তর কেমন সুদৃঢ় ও কেমন সুমসৃণ! তেমনই, উপনিষদের আদিম তত্ত্বশৈলের খণ্ডসকল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার অনলে ও তাঁহার সাধনার ধারায় পতিত হইয়া, দীর্ঘকাল তদ্দ্বারা আলোড়িত, চূর্ণীকৃত ও সজ্জিত হইয়া, তাঁহার চিন্তার ও ভাবের মসলায় একত্র গ্রথিত হইয়া, প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় ও সুমসৃণ নব নব বচনের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আর সে সকল বচনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করে, কাহার সাধ্য!

দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে উপনিষদ্-বাক্য সকল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপে সজ্জিত ও

গ্রথিত হইয়া বিদ্যমান ছিল বলিয়াই, তাঁহার রসনা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ রচনার দিনে "তিন ঘণ্টার মধ্যে" ও "নদীর স্রোতের ন্যায় সহজে সতেজে" ঐ বচন সকল নিঃসৃত হইতে পারিয়াছিল।

এই জন্য, তিনি উপনিষদের বচনসকলকে স্বস্থান হইতে ছিন্ন করিয়া আপনার মনোমতভাবে পুনর্গ্রথিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে সাহিত্যিক বিচার-পদ্ধতির দ্বারা বিচার করা সম্ভব নহে। এস্থলে দেবেন্দ্রনাথ গ্রন্থরচয়িতা নহেন; তিনি সাধক, তিনি ঋষি। তিনি অগ্রে এইরূপ এক একটি বিমিশ্র বচনকে আপনার চিন্তাধারার মধ্যে এক ও অখণ্ড বচনরূপে দীর্ঘকাল ধারণ করিয়াছেন; এবং সেই দীর্ঘকালের অন্তে তাহাকে **আপনার** উক্তি বলিয়া (উপনিষৎকার ঋষির উক্তি বলিয়া নয়) ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানিকে দেবেন্দ্রনাথ সাহিত্য বলিয়া নয়, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া, ধর্ম্মসাধকের দৈনিক পবিত্র পাঠের বস্তু বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। (৪৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই কারণেই দেবেন্দ্রনাথ এ গ্রন্থের কুত্রাপি কোনও শ্লোকের মূল নির্দ্দেশ করেন নাই। বচনগুলি এই গ্রন্থে ধৃত হইবার পর আর প্রাচীন উপনিষদের মন্ত্ররূপে পাঠকগণের নিকটে উপস্থিত হইবে না, তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত নূতন 'ব্রাহ্মী উপনিষদের' বচনরূপেই উপস্থিত হইবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। এবং এই কারণে, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বাক্যগুলি উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত হইলেও, এই গ্রন্থকে শুধু একখানি সংগ্রহগ্রন্থ ও দেবেন্দ্রনাথকে শুধু ইহার সঙ্কলয়িতা বলিয়া বিচার করিলে ভুল হইবে। ইহার ভাষা উপনিষদের হইলেও, বক্তব্য বিষয়টি ও তাহার শৃঙ্খলা সম্পূর্ণরূপে দেবেন্দ্রনাথেরই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের অন্যান্য অংশ।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮৪৮ সালে, ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৪৯ সালে রচিত হয়। ১৮৫৪ সালের মার্চ্চ (১৭৭৫ শকের চৈত্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় শ্লোকের সহিত বঙ্গানুবাদ[১] মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৬১ সালের মে

(১) অজিতকুমার (২১৫ পৃঃ) লিখিতেছেন, পত্রিকার ঐ সংখ্যা হইতে 'তাৎপর্য্য' প্রকাশ আরম্ভ হয়; ইহা ভুল। তাৎপর্য্য নয়, বঙ্গানুবাদ প্রকাশ ঐ সংখ্যায় আরব্ধ হয়।

(১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ) মাসে ঐ পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে 'তাৎপর্য্য' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়।

'তাৎপর্য্য' সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন, "দেবেন্দ্রনাথের এই একটী গুণ ছিল যে, তাঁহার হস্ত দিয়া যে সকল লেখা যাইত, বা তাঁহাকে যাহা কিছু শোনানো হইত, তাহা তিনি সংশোধনের পর সংশোধনের দ্বারা নিখুঁত না করিয়া ছাড়িতেন না। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাতে এই গুণ ছিল ; আমরা অনেক বার তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্যগুলি যে তাঁহার হস্তে কি প্রকার আমূল সংশোধন লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা প্রথম সংস্করণের একখণ্ড ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম তিনটি মন্ত্রের মূল তাৎপর্য্য অক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। অবশিষ্ট অংশের তাৎপর্য্য রাজনারায়ণ বসু, অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং দেবেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। যখন দেখি যে তেরো বৎসর বাদে ১৭৮৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের তাৎপর্য্য তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তখনই কতকটা বুঝিতে পারি যে, কত সাবধানতার সহিত তাৎপর্য্যগুলি লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছিল।...

দ্বিতীয় খণ্ডের তাৎপর্য্য প্রধানত পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী কর্ত্তৃক লিখিত। অনুশাসন খণ্ডের সংকলনেও অযোধ্যানাথ দেবেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। রাজনারায়ণ বসুও এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন।"—(তত্ত্ববো., ১৮৩৯ শকের কার্ত্তিক সংখ্যা, ১৬৩—১৬৫ পৃষ্ঠা)।

৪৭

ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্কোচ।

আত্মজীবনীতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ কখনও ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে উপবেশন করেন নাই। ১৮৪৯ সালের ১১ই মাঘের উৎসবের দিনে তিনি "বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রহৃষ্ট মনে ভক্তিভরে" (১৮৭ পৃঃ) ফেনেলন-

রচিত স্তোত্রটি পাঠ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় দেবেন্দ্রনাথও মনে করিতেন যে, আমরা সংসারী মানুষ, আমাদের পক্ষে ধর্ম্মযাজন (আচার্য্যের কাজ করা) এবং ধর্ম্মোপদেশ দান (গুরুর কাজ করা) বিধেয় নয়। উভয়েই ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু স্ব-রচিত সেই পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার কার্য্যটি উভয়েই অন্যের দ্বারা নির্ব্বাহ করাইয়াছেন। উভয়েই যজন-যাজন-নিরত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগকে আচার্য্যের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং নিজেরা ব্যয়ভার বহনাদির দ্বারা তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে উভয়েই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কোনও দিনই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কাজ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি কখনও কখনও ব্যাখ্যান (অর্থাৎ উপদেশ) লিখিয়া দিতেন, কিন্তু তাহাও অন্যে পাঠ করিত। দেবেন্দ্রনাথ নিজে বক্তৃতা পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রথম প্রথম বেদীতে বসিতে চাহিতেন না।

এ বিষয়ে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এইরূপ বলিতেছেন,—"প্রথম প্রথম মহর্ষি উপাসনার দিনে বেদীর সম্মুখে নীচে দাঁড়াইয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি,—'আমি মনে করিতাম যে, আমি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিবার অধিকারী নহি। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগেরই ইহাতে উপযুক্ত অধিকার। আমি ধনবানের পুত্র, বিষয়ীর পুত্র; অতএব বিষয়ীর ন্যায়, যজমানের ন্যায়, আচার্য্য-পুরোহিতগণের অধস্তন সোপানে দাঁড়াইয়া কার্য্য করাই আমার পক্ষে যোগ্য।' তাঁহার নিজের জন্য তাঁহার মনের ভাব এইরূপ। কিন্তু এই কঠোর হিন্দুসংস্কার-বিপ্লাবিত দেশে, কেশব বাবু বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও, মহর্ষি যখন তাঁহাতে ধর্ম্মাচার্য্যের যোগ্যতা অনুভব করিলেন, তখন সকলকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাকেই আচার্য্য পদে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কেশব বাবুরও পূর্ব্বে ইহা ভাল লাগিত না যে, মহর্ষি নীচে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করেন। তিনি সর্ব্বদা মহর্ষিকে বেদী গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতেন। তিনি শেষে একদিন জোর করিয়া মহর্ষিকে বেদীতে বসাইয়া দিলেন। মহর্ষি যখন বেদীতে বসিলেন, তখন

তাঁহার মনের বিশ্বাস ফিরিল। তিনি আপনার অধিকার আপনি বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন যে, 'এই তো আমার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপযুক্ত আসন; এতদিন কেন আমি ইহাতে উপবেশন করি নাই?' এখন হইতে মহর্ষি প্রত্যেক বুধবারে বেদীতে বসিয়া ব্যাখ্যান দিতে লাগিলেন।"—(প্রিয়. পরি. ২। ৭, ৮)।

১৮৬০ সালের ২৫শে জুলাই (১৭৮২ শকের ১১ই শ্রাবণ) বুধবার দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে প্রথম উপবেশন করেন, ও তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যান দান করেন।

৪৮

আসাম যাত্রার প্রথমাংশ, ও রাজনারায়ণ বসু।

দেবেন্দ্রনাথ দেশভ্রমণের সময়ে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে সঙ্গে লইতে বড় ভালবাসিতেন। আসাম যাত্রাতেও তাহাকে সঙ্গী করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন তাঁহার সঙ্গ-সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। বসু মহাশয় স্বীয় আত্মচরিতের ৬৭—৭১ পৃষ্ঠায় এই কয়েক দিনের একত্র ভ্রমণের (ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনার) অতি কৌতুকাবহ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাহা সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এখানে তাঁহার বিবরণের অত্যল্প অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইল।

"ইংরাজী ১৮৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেন্দ্রবাবু ও আমি আসামপ্রদেশ দেখিবার জন্য Captain Hickley সাহেবের নেতৃত্বের অধীন 'যমুনা' নামক ষ্টীমারে আরোহণ করি। তখন আমার বয়ঃক্রম তেইশ বৎসর। আমরা গঙ্গাসাগর, তৎপর বড়-সুন্দরবন দিয়া, আসামাভিমুখে গমন করি। বড়-সুন্দরবন দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম যে, এই একটি ক্ষুদ্র প্রণালী, এত ক্ষুদ্র যে ষ্টীমার তাহাতে ফিরিতে পারে না; তাহার অব্যবহিত পরেই, এমন একটি বিস্তীর্ণ নদী যে সমুদ্র বিশেষ।···

আমাদিগের প্রত্যেকের নিকট হইতে খাই-খরচ দরুণ কাপ্তেন সাহেব ৪৲ টাকা করিয়া লইতেন, কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে দিতেন না। এরূপ

কাপ্তেন আমরা কখন দেখি নাই; ঐবার আমাদিগের ভাগ্যক্রমে ঐরূপ কাপ্তেন জুটিয়াছিল। কাপ্তেন সাহেব বোধ হয় আর জীবিত নাই। তিনি যে লোকে এখন থাকুন না কেন, অবশ্য ঐ অল্প আহার দেওয়ার জন্য তিনি এক্ষণে অনুতপ্ত হইতেছেন, সন্দেহ নাই।...

'আমার ধাতু বরাবর গাঢ় বাঙ্গালী-তর'। আমার কলেজে শিক্ষা উহার উপর পাশ্চাত্য সভ্যতা জোর করিয়া আরোপ করিয়াছিল মাত্র। কলমের ন্যায় উহা আমার প্রকৃতির উপর গাঢ়রূপে বসে নাই। আমি মধ্যে মধ্যে খানা ও মদ খাইতাম বটে, কিন্তু সচরাচর প্রত্যহ দুই বেলা মাছের ঝোল ভাত না খাইলে চলিত না। ক্রমাগত মদ ও খানা খাইলে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিত। ষ্টীমারে কিরূপ জীবন যাপন করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে জানিলে সেইরূপ উপায় করা যাইত; অর্থাৎ ফুলেল তৈল ইত্যাদি সঙ্গে লইতাম। ষ্টীমারে রুক্ষ স্নান ও দিনের মধ্যে তিন বার (অর্থাৎ হাজরি, টিফিন, ও ডিনরে) মাংস খাওয়াতে, ঢাকায় না পৌছিতে পৌছিতে তিন চারি দিবসের মধ্যে বিজাতীয় গরম হইয়া উঠিল; রাত্রিতে ঘুম হয় না। ঢাকায় যখন ষ্টীমার পৌছিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া দিতে দেবেন্দ্রবাবুকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিলাম। তিনি আমাকে ঢাকায় নামাইয়া দিলেন। আমি মাছের ঝোল খাইবার অভিলাষে আমার কলেজের সমাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত ঈ. চ. মি-র বাসায় আশ্রয় লইতে তদভিমুখে গমন করিলাম।"

রাজনারায়ণ বাবু মাছের ঝোল ভাত খাইতে ও সরিষার তেল মাখিয়া স্নান করিতে পাইবার আশায় জল ছাড়িয়া স্থলে উঠিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানা যায় যে, সেই ইংরেজী অনুকরণের যুগে ডাঙ্গাতে উঠিয়াও তাঁহার অভিলাষ সহজে পূর্ণ হয় নাই।

৪৯

১৮৫১ হইতে ১৮৫৩ সালের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচী।

মহর্ষির আত্মজীবনীতে সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদের পরে কয়েক বৎসরের কোনও বৃত্তান্ত নাই, এবং স্থানে স্থানে কালক্রম ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। এই জন্য

দুইটি পরিশিষ্টে ঐ পরিচ্ছেদের পরবর্ত্তী ঘটনাসকলের সংক্ষিপ্ত সূচী প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৫০ অথবা ১৮৫১ সালে দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মতত্ত্ববিদ্যা' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। এই পুস্তিকায় তাঁহার সেই সময়ের দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে বৈদান্তিক মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের দোষ প্রদর্শন করা হইয়াছে। মায়াবাদ ও অদ্বৈতবাদের প্রতি বিরাগ বশতঃ এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ, এক দিকে ঈশ্বর, এবং অন্য দিকে জগৎ ও জীবাত্মা, এই উভয়ের পার্থক্যের উপরে, ও এই উভয়ের সত্তার স্বাতন্ত্র্যের উপরে, অত্যধিক মাত্রায় ঝোঁক দিতেছিলেন।

পূর্ব্বে যেরূপ বেদ ও উপনিষদ্ অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি দিয়া ছাত্র রাখা হইত, ১৮৫১ সালের মে মাসে সেইরূপ দুইজন ছাত্রকে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি দেওয়া হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল; (অজিত, ২৩৪)।

১৮৫১ সালের ১৩ই জুলাই বর্দ্ধমানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল, (১৬০ ও ৪১০ পৃষ্ঠা)।

এই সময়ে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, (পত্রাবলী, ৩১)। দেবেন্দ্রনাথের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় জ্ঞানেন্দ্র-মোহন তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া সংবাদপত্রে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ক্রমশঃ রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতাসূত্রে আবদ্ধ হন, এবং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াই তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে এক প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন উত্থিত হয়। কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপনাবধি মফঃসলবাসী ইংরেজগণকে মফঃসলস্থ ফৌজদারী আদালত সকলের অধীন না করিয়া একেবারে কলিকাতাস্থ সুপ্রীম কোর্টের অধীন করা হইয়াছিল। ইহাতে তাহাদের নানাবিধ অত্যাচার করিবার সুবিধা হইত; কারণ দরিদ্র প্রজাগণ কলিকাতায় আসিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারিত না। এই কারণে নীলকর প্রভৃতি কুঠিওয়ালা ইংরেজগণের অত্যাচার ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া চলিয়াছিল। স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট

মফঃসলবাসী ইংরেজগণের এই সকল অত্যাচার দূর করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক বোধ করিলেন। ব্যবস্থাসচিব ভারতবন্ধু বীটন সাহেব এই ভাবের চারিটি আইনের ড্রাফ্‌ট্‌ প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে ভারতবাসী ইংরেজেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ প্রস্তাবিত আইনগুলিকে 'কালা আইন' (Black Acts) নাম দিয়া উহাদের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন তুলিয়া দিলেন। তৎকালে এদেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রই ইংরেজদের হাতে ছিল, এবং তখনও ভারতবর্ষের লোকেরা একতাবদ্ধ হইয়া আন্দোলন করিতে শিখেন নাই। কেবল এক রামগোপাল ঘোষ দেশীয়দিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া অনেক সুযুক্তিপূর্ণ ও বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজদের যেমন ঐক্য, তেমনি ধনবল ছিল। তাঁহারা ঐ আইনের বিরুদ্ধে পালিয়ামেণ্টে পর্য্যন্ত আন্দোলন চালাইলেন। তাঁহাদেরই জয় হইল। 'কালা আইন' আর ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইতে পারিল না।

এই বৎসরই বীটন সাহেব এই আন্দোলনের পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় অকালে পরলোকগত হইলেন।

এই কঠোর পরাজয়ে বাঙ্গালী সমাজের চক্ষু ফুটিল। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, এবং স্থায়ী ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন জাগাইয়া রাখিবার কোনও আয়োজন করা, কত যে আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন। ১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর 'Bengal Landholders' Association,' ও ১৮৪৩ সালে তাঁহার বন্ধু George Thompson, 'Bengal British Indian Society' স্থাপন করিয়াছিলেন। এই দুই সভাকে যুক্ত করিয়া ১৮৫১ সালের ৩১শে অক্টোবর 'British Indian Association' নামে একটি নূতন সভা স্থাপন করা হইল। তাহার প্রথম সভাপতি হইলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, আশুতোষ দেব, রামগোপাল ঘোষ, প্যারিচাঁদ মিত্র, প্রভৃতি কমিটির সভ্য হইলেন; দেবেন্দ্রনাথ তাহার সম্পাদক হইলেন। দেবেন্দ্রনাথ এতদিন ধর্ম্ম লইয়াই মত্ত ছিলেন, কিন্তু এ সময়ে স্বদেশবাসীগণের এই আন্দোলনে যোগ না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

১৮৫১ সালে, ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিশ্বাসীর পক্ষে উপবীত রাখা অসঙ্গত, ইহা

অনুভব করিয়া রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করেন। (রামতনু, ১৯৪)। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজে ও তাহার বাহিরে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তকেও এই প্রশ্ন আলোড়িত করিয়াছিল। তিনিও ব্রাহ্মদিগের পক্ষে উপবীত পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অনুভব করেন। (কিন্তু রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার বিরোধী হন ; ৪৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮৫১ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বোধোদয়" প্রকাশিত হয়।

১৮৫২ সালের জানুয়ারী মাসে ১২।১৩ জন ছাত্র দেবেন্দ্রনাথের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন, (পত্রাবলী, ২)। তন্মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত দুই জন ছাত্রও নিশ্চয়ই ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের এক পত্র হইতে ('প্রবাসী', ১৩১১ বঙ্গাব্দ, ৫৭৮ পৃষ্ঠা) জানা যায় যে, এই বৎসরের জুন মাসে "ব্রাহ্মধর্ম্মের বাঙ্গালা ভাষ্য প্রস্তুত" হইতেছিল। এই 'ভাষ্য' সম্ভবতঃ 'তাৎপর্য্য'।

এই জুন মাসের ২১শে তারিখে ভবানীপুরের হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কাশীশ্বর মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্র লোক মিলিত হইয়া 'জ্ঞানপ্রকাশিকা' নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ইহার উদ্দেশ্য তত্ত্ববোধিনী সভার অনুরূপ ছিল। কার্ত্তিক মাসে দেবেন্দ্রনাথ এই সভা পরিদর্শন করেন। ক্রমে ইহা 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে' পরিণত হয়। 'ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ' পদ্মপুকুর রোডে অবস্থিত। ইহা পরবর্ত্তী কালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র হইয়া ধন্য হইয়াছিল। এই সমাজ জ্ঞান-প্রকাশিকা সভার স্থাপনের দিনটিকেই (১৭৭৪ শক, ৯ই আষাঢ় = ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে জুন) স্বীয় প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া গণনা করেন।

১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত, রাখালদাস হালদার ও অনঙ্গমোহন মিত্র দেবেন্দ্রনাথেরই ভবনে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভা সম্বন্ধে আত্মজীবনীর ২২০ পৃষ্ঠা এবং ৫৫ পরিশিষ্টের ৪৫৮ ও ৪৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এ দিকে 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ' প্রচারের পর হইতে ব্রাহ্মসমাজের জীবন অনেক অধিক সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময় হইতে উৎসবাদি অনেক সরস হইতে

থাকে, (আত্মজীবনী, ১৮৭, ১৯০ পৃষ্ঠা,) এবং অনেক স্থানে নূতন নূতন ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৮৫২ সালের ২রা জুলাই দেবেন্দ্রনাথ জগদ্দল গ্রামে তাঁহার ভক্ত রাখালদাস হালদার মহাশয়দের বাটীতে গিয়া তথায় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া আসেন, (৪৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাখালদাস হালদার ও তাঁহার বন্ধু অনঙ্গমোহন মিত্র খিদিরপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগের বহুদিনের পোষিত আকাঙ্ক্ষা অনুসরণে তথায় সংস্কৃত মন্ত্রের পরিবর্ত্তে কেবল বাংলা ভাষায় উপাসনা হইতে লাগিল। অক্ষয়কুমার দত্তেরও বাংলা ভাষায় উপাসনা করা বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল; তিনি বার বার ঐ সমাজ দর্শন করিতে যাইতেন। এ বিষয়ে ৪৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। (এই অনঙ্গমোহন মিত্র পরে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন)।

১৮৫৩ সালের মে মাসে ডুমুরদহ ব্রাহ্মসমাজ, এবং ১৮৫৪ সালের জুলাই মাসে ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৩ সালে ভবানীপুরে 'সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী' ও বেহালায় 'নিত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী', এই দুই নামে দুইটি সভা স্থাপিত হইয়া উৎসাহের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকেন; প্রথমোক্ত সভা দ্বারা ৫৩ জন লোক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

দেবেন্দ্রনাথের পত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে ১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি শিলাইদহে গিয়াছিলেন। ২৮শে মে তিনি লিখিতেছেন যে সংসারের গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার উপরে পড়িয়া তাঁহার অত্যন্ত অনবকাশ ঘটাইয়াছে; ঋণ অনেক শোধ হইয়া আসিয়াছে। আগষ্ট মাসে দেবেন্দ্রনাথ পল্‌তার বাগানে ছিলেন। ১লা অক্টোবর তিনি তাঁহার অভ্যস্ত শারদীয় ভ্রমণে বাহির হন; কিন্তু কোন্ দিকে গেলেন, পত্রে তাহার উল্লেখ নাই। (পত্রাবলী, ৫—৯, এবং ৩৬)।

১৮৫৩ সালের মে মাসে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। এতদিন রমানাথ ঠাকুরের পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন।

১৮৫৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোর নগরে লালা হাজারীলালের মৃত্যু হয়। (৩৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

১৮৫৪ হইতে ১৮৫৮ সালের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত সূচী।

১৮৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে তাঁহার গোরিটির বাগানে ব্রাহ্মদিগের একটি সম্মিলন হয়। তথায় দেবেন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মদিগের এক দল বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদানের" প্রস্তাব করেন। ব্রাহ্মদিগের উপবীত পরিত্যাগ করা উচিত, এই প্রস্তাবও সেখানে আলোচিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ উপবীত পরিত্যাগ সমর্থন করেন; রাখালদাস হালদার উপবীত ত্যাগ করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক অনুষ্ঠান সকলের পদ্ধতির সংস্কার করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতেছিলেন। ক্রমশঃ উপনয়ন প্রথা পরিত্যাগ ও জাতিভেদ প্রথা ভগ্ন করা অনিবার্য্য হইবে, এই মতও তিনি তাঁহার পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত আপত্তি করিয়া বলেন যে, জাতিভেদ ভগ্ন করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। (পত্রাবলী, ৩৭, ৩৮, ৩৯, এবং ২৫, ২৯ দ্রষ্টব্য)।

এদিকে, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ যে কয় জন অত্যধিক যুক্তিবাদী লোক 'আত্মীয় সভা' স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, যাঁহারা কখনও কখনও হাত তুলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতেন, (আত্মজীবনী, ২২০ পৃষ্ঠা,) তত্ত্ববোধিনী সভার অন্তর্গত 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' সভায় বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ তাঁহাদিগের প্রতিপত্তি অধিক হইয়া উঠিতেছিল। 'গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা' তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রেরিত প্রবন্ধসকল মনোনীত করিতেন। তাঁহাদের কার্য্যে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমশঃ অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন; ১৮৫৪ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে লিখিত এক পত্রে (পত্রাবলী, ১০) তিনি তাঁহাদিগকে 'নাস্তিক' বলেন, (৪৫৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই মার্চ্চ (চৈত্র) মাস হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। (৪৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

এই বৎসরে পূজার সময় দেবেন্দ্রনাথ চম্পারণ, দিল্লী ও এলাহাবাদে ভ্রমণ করেন, (পত্রাবলী, ১১, ১২, ১৩)। ১৯শে ডিসেম্বর তারিখে গিরীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

১৮৫৫ সাল হইতে গিরীন্দ্রনাথের অভাবে দেবেন্দ্রনাথ বিষয় পরিচালন কার্য্যে সহায়হীন হইয়া পড়েন ও বিব্রত হইতে থাকেন। এই সময়ে একজন উত্তমর্ণ নালিশ করাতে দেবেন্দ্রনাথ ১৪ হাজার টাকার ওয়ারাণ্টে ধৃত হন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথের ঋণ উপস্থিত-মত শোধ করিয়া দিবার ভার লন। (আত্মজীবনী, অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ)।

এই বৎসর পূজার সময় দেবেন্দ্রনাথ ঢাকা গমন করেন, (পত্রাবলী, ৪৩, ৪৫,) কিন্তু তথা হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্রই অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাখালদাস হালদার প্রভৃতির সহিত তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ও সংস্কৃত মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা ইত্যাদি বিষয় লইয়া অপ্রীতিকর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। (৪৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

আবার ১৮৫৬ সালে, দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নূতন নূতন ঋণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মনে অশান্তি উৎপন্ন করেন।

এই সকল অশান্তির ফলে দেখা যায় যে, এই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ সংসারে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি বর্ষাকালে বরাহনগরে গোপাললাল ঠাকুরের বাগানে গিয়া কিছুকাল যাপন করেন। তথায় উপনিষদ্ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে, আত্মচিন্তায়, ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। সেখানেই তাঁহার মনে দীর্ঘকালের জন্য দেশ ত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে হিমালয়ে বাস করিবার সঙ্কল্পের উদয় হয়।

এইবার দেশ ত্যাগ করিয়া শীঘ্র আর বাড়ী ফিরিবেন না, তাই তিনি সেপ্টেম্বর মাসে চারি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কিছুকাল পদ্মা নদীতে ছিলেন। "সেখান হইতে সিমলায় যাইবার সময় ছেলেদের বিদায় দিবার বেলায় তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় ত এই তাহাদের সঙ্গে শেষ বিদায়।" (অজিত, ৪২৯)।

এক শত টাকায় কাশী পর্য্যন্ত একটি বোট ভাড়া করিয়া ৩রা অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ তাহাতে আরোহণ করেন; এবং মুঙ্গের, পাটনা, কাশী, প্রয়াগ,

আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, অম্বালা, লাহোর দর্শন করিয়া ১৮৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী অমৃতসরে উপস্থিত হন। তথায় দুই মাস যাপন করিয়া ২৮শে এপ্রিল সিমলা পাহাড়ে গমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ যখন দিল্লীতে, তখন নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে খুঁজিয়া পান নাই, (২৩০ পৃষ্ঠা)। ইহলোকে আর দেবেন্দ্রনাথের সহিত নগেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হইল না।

দেবেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিকালে, ১৮৫৭ সালের ১১ই জানুয়ারী, রমাপ্রসাদ রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী নিযুক্ত হন।

সিমলায় দেবেন্দ্রনাথ এক বৎসর ৮ মাস কাল অবস্থিতি করেন। তথায় একাকী নির্জ্জনে ধ্যান, চিন্তা, পাঠ, ও প্রকৃতির শোভাদর্শন, তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্ম ছিল। এই সময়ে তিনি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়ের চিঠি-পত্রে প্রসঙ্গতঃ Sir William Hamilton ও Scottish Intuitionist দার্শনিকদিগের গ্রন্থের, এবং Kant, Fichte, Victor Cousin, ও Francis Newman এর পুস্তকাবলীর উল্লেখ আছে। (পত্রাবলী, ১৮ ও ৪৭ দ্রষ্টব্য)। এসকল ব্যতীত উপনিষদ্ ও হাফিজ তাঁহার নিত্য পাঠ্য ছিল।

এই সময়ের মধ্যে তিনি তিন বার সিমলা ত্যাগ করিয়া তিন স্থানে গিয়াছিলেন। গুর্খা বিদ্রোহের সময় ডগ্‌শাহী (১৮৫৭, ১৭—২৯ মে), নির্জ্জন ও সঙ্কটময় পর্ব্বতে ভ্রমণ করিয়া ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিবার উদ্দেশ্যে সুংগ্রী (১৮৫৭, ৭—২৬ জুন), ও ভজ্জীর রাণার নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া সোহিনী (১৮৫৮, ফেব্রুয়ারী) গমন করেন।

১৮৫৮ সালের অক্টোবর মাসে নিম্নগামিনী নদীর স্রোত দর্শন করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ঈশ্বরের আদেশ অন্তরে অনুভব করেন; ১৬ই অক্টোবর সিমলা ত্যাগ করেন, ও ১৫ই নভেম্বর কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। এলাহাবাদ হইতে কলিকাতা আসিবার পথে, ষ্টীমারে তিনি নগেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হন। ২৪শে অক্টোবর নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়।

আত্মজীবনীতে উল্লিখিত কয়েক জন ইংরেজের স্বল্প পরিচয়।

বোটানিকেল গার্ডেনে কিড সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ, (৪৬ পৃষ্ঠা)।

বোটানিকেল উদ্যানে যে-স্তম্ভের নীচে দেবেন্দ্রনাথ বসিতেন, ও যাহাকে তিনি সমাধিস্তম্ভ মনে করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃ Robert Kyd সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ। Lt.-Col. Robert Kyd, Military Secretary to the Government of Bengal পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ, ও বোটানিকেল গার্ডেন প্রতিষ্ঠার (১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। মৃত্যুকাল (১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত তিনি ঐ গার্ডেনের অবৈতনিক তত্ত্বাবধায়কের কার্য্য করেন। কলিকাতার Kyd Street তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। —(Cotton's *Calcutta Old and New.*)

জজ্ কল্‌বিল্, (২১০ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই নাম 'কলবিন্' মুদ্রিত হইয়াছিল; তাহা ভুল। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম, Sir James William Colville.

কল্‌বিল্ সাহেব ইংলণ্ডে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত পরিচিত ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন; তৎপরে ১৮৪৫ সালে কলিকাতায় আসেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুর পরে আহূত শোকসভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সে সময়ে (১৮৪৬) তিনি Advocate General ছিলেন। এই পদে ১৮৪৮ সাল পর্য্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৫ পর্য্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের Puisne Judge, এবং ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত Chief Justiceএর কার্য্য করেন। তৎপরে সুপ্রীম কোর্টের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া Privy Councilএর Judicial Committeeর মেম্বর হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমর্থিত বিধবা বিবাহ আইন ইনিই প্রণয়ন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ইংরেজী 'V' অক্ষরের স্থানে সর্ব্বদা 'ব' লিখিতেন। পত্রাবলীর ৮৬ সংখ্যক পত্রে তিনি লিখিতেছেন,—"গবর্ণমেণ্টের স্থানে গভর্ণমেণ্ট লেখা

বিস্তারত্বের লেখনীর উপযুক্ত নহে। V অক্ষরের স্থানে ভ এবং ভ অক্ষরের স্থানে v, বাঙ্গালা লেখার রোগ হইয়াছে।”

জেনারেল আন্সন, (২৪৫ পৃষ্ঠা)।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই নাম ‘আর্সন’ মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহা ভুল। “কমাণ্ডার-ইন্-চীফ্ জেনারেল আন্সন্ সিপাহী বিদ্রোহের এক বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসেন। ভারতবর্ষের লোকদিগের জীবন সম্বন্ধে মাত্র এক বৎসর-লব্ধ অভিজ্ঞতা লইয়া ইঁহাকে এই গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইল। আট বৎসর পূর্ব্বে নেপিয়ারের ন্যায় একজন প্রতিভাশালী সেনাপতিকে যে সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল, তাহাও ইহার গুরুত্বের তুলনায় কিছুই নহে। ইনি এবং ইঁহার সহকর্ম্মীগণ সকলেই, সিপাহীদিগের অসন্তোষের বহু চিহ্ন প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও, তৎপ্রতি অন্ধ ছিলেন। ইনি আসন্ন বিপদের জন্য পূর্ব্ব হইতে কিছুমাত্র প্রস্তুত হইতে পারেন নাই। বিদ্রোহের প্রথম অবস্থায় নিজ ডিপার্টমেণ্টের নিকট হইতে ইনি যথাযোগ্য আনুগত্য এবং সাহায্যও লাভ করেন নাই। দিল্লী অভিযানের পথে কর্ণালের (Karnal) নিকটবর্ত্তী এক স্থানে কলেরায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি বিশেষ সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন না।” (T. Rice Holmes প্রণীত *History of the Indian Mutiny,* London, 1898, হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

লর্ড হে, (২৪৬, ২৮৯ পৃষ্ঠা)।

মহর্ষি লর্ড হে-কে সিম্‌লার ‘কমিশনার’ বলিয়া লিখিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সিম্‌লার ‘ডেপুটি কমিশনার’ অর্থাৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। (১৯২ পৃষ্ঠায় গৌহাটীর ‘কমিশনার’ শব্দেও এই অর্থ বুঝিতে হইবে)।

“১৮৫৭ সালে লর্ড উইলিয়ম্ হে সিম্‌লায় ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। মে মাসের ১৬ই তারিখে Nasiri Gurkhas নামক সৈন্যদল সিমলার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিদ্রোহী হয়। তাহাদের অসন্তোষের কারণ এই হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে বহু দূরে লইয়া আসা হইয়াছে, অথচ তাহাদিগকে ঠিক সময়ে বেতন দেওয়া হয় না, এবং তাহাদিগের পরিবারবর্গ নিরাপদে রহিল

কি না তদ্বিষয়ে কেহই দৃষ্টি রাখেন না। বিদ্রোহ আরম্ভ হইলে ডেপুটি কমিশনার লর্ড হে এবং সৈন্যদলের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র সিম্‌লাতেই রহিলেন, কিন্তু সিম্‌লার অন্যান্য ইংরেজ অধিবাসীগণ পলায়ন করিলেন।" (T. Rice Holmes প্রণীত *History of the Indian Mutiny,* London, 1898, হইতে সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)।

৫২

"ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ"।

১৮৪৭ সাল হইতেই দেবেন্দ্রনাথের অন্তরে ব্রাহ্মদিগের মত ও বিশ্বাস সংক্ষিপ্ত বাক্যাবলীর দ্বারা প্রকাশ করিবার আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছিল। (৪২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-বীজ' রচনা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, (তত্ত্ববো., ১৮৩৯ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ২৬—২৮ পৃঃ)—"রামমোহন রায়ের ... বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যায় এক স্থলে* উক্ত হইয়াছে যে, পরমেশ্বরে এবং তাঁহার সৃষ্ট মানবের প্রতি প্রীতি এবং তৎপ্রিয়কার্য্য সাধন, এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা[১]। দেবেন্দ্রনাথ ইহাকেই কেন্দ্রে রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সৃষ্টি করিয়াছিলেন।...

দেশ যখন সমাজের কঠোর দাসত্ব-শৃঙ্খলে, মানসিক পরাধীনতার কঠিন পাশে, আবদ্ধ ছিল, সে সময়ে যে দেবেন্দ্রনাথ সেই কঠোর শৃঙ্খল কাটিয়া, এই উদারতম অসাম্প্রদায়িকতার মূল ভিত্তি বীজচতুষ্টয় সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার আত্মার আশ্চর্য্য বলের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। একমাত্র এই বীজচতুষ্টয় সৃষ্টি করাই তাঁহাকে 'মহর্ষির' আসনে অবিচলিত রাখিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।...

---

* ৩ অঃ, ৩ পাঃ, ৫৩ সূঃ।

(১) রামমোহন রায়ের বাক্যগুলি এই :—"পরমেশ্বর এবং তাঁহার জনের সহিত অনুবন্ধ অর্থাৎ প্রীতি, আর তাদ্বিধ্য অর্থাৎ প্রীত্যনুকূল ব্যাপার, এই দুই পরম মুখ্য উপাসনা হয়।"—(আত্মজীবনী-সম্পাদক)।

পরলোকগত ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজে সকল বাক্যের মধ্যে নিম্নলিখিত বাক্যটী সকল অপেক্ষা সুন্দর এবং মহান্,—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব, ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। এই উচ্চ ও মহান্ বাক্যটী মহর্ষির নিজের রচিত। ... পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং লক্ষ্ণৌয়ের বিখ্যাত রাজা দক্ষিণারঞ্জন প্রথমে এই বাক্যটী অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং বেদোক্তি মনে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাই যে, উহা বেদোক্তি নহে, মহর্ষির রচনা।'

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীতে এই ভাবের কথা থাকিলেও, এই ভাবটীকে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি করা এবং বীজমন্ত্রের আকারে তাহাকে একটা বিশুদ্ধ গঠন দিয়া সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করাতেই ভারতের ধর্ম্মজগতে দেবেন্দ্রনাথের আসন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।"

ব্রাহ্মধর্ম্মবীজকে 'সারগর্ভ' বলাতে দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় কি ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। "ব্রাহ্মদিগের মতের ঐক্যতার জন্যে চারিটি ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ নির্ণীত হইল, এবং সেই সকল বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ মহাবৃক্ষরূপে ঈশ্বরের দিকে সমুত্থিত হইল, তাহা হইতেই নানা প্রকার জ্ঞানময় ভাবপূর্ণ পুস্তক সকল প্রসূত হইয়া পুষ্পের ন্যায় সুসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল; এবং তাহাই ফলবন্ত হইয়া এখন সংসারের দিকে অবনত হইতেছে। যে সকল শুভানুষ্ঠান দেখিতেছি, তাহাতেই তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে।" (পঞ্চবিংশতি, ৯)। বীজ প্রকাশের পর ক্রমশঃ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এমন উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল প্রচারিত হইতে লাগিল, যাহা ঐ বীজেরই বৃক্ষ শাখা ফল প্রভৃতি নামে বর্ণিত হইতে পারে। বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তকের ভিত্তি ছিল, হয় 'ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ,' নতুবা 'ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ'।

৫৩

‘পল্‌তা’র বাগানে ব্রাহ্মদের মেলা ও উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব।

ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ এই বিষয়টির ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়াছিলেন। সে সকল বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে দেশ কাল পাত্র ঘটিত কিছু কিছু অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৪৯ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৬—১০ পৃষ্ঠায় একটি প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করিয়াছি। এখানে কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের ৩৮ পৃষ্ঠায়, ১৭৬৭ শকের ৭ই পৌষ (১৮৪৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর) তারিখের গোরিটির বাগানের মহোৎসবের বৃত্তান্তের অব্যবহিত পরেই এই অংশ ছিল,—“উপাসনা ভঙ্গ হইলে...উন্মত হইয়াছিলেন।” (বর্ত্তমান সংস্করণে এই কথাগুলি ২১৬ পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হইয়াছে)। অর্থাৎ প্রথম সংস্করণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছিল যে গোরিটির বাগানে ১৮৪৫ সালের উৎসবে রাখালদাস হালদার “উপবীত পরিত্যাগ করা হউক” এইরূপ প্রস্তাব করেন, এবং স্বীয় মতের সমর্থনের জন্য শিখ সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন।

(২) প্রিয়নাথ শাস্ত্রী রচিত মহর্ষির আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পরিশিষ্টের ১৮, ১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে মহর্ষির মুখে তিনি এইরূপ শুনিয়াছিলেনঃ—

“৭ই পৌষ আমার দীক্ষার দিন। আমার দীক্ষার পর বৎসরে ৭ই পৌষ দিবসে এই দিনের স্মরণার্থ গোরিটীর বাগানে এক মেলা হয়। এই মেলার দিনে আমরা সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া মধ্যাহ্নকালে বৃক্ষতলে ছায়ায় বসিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলাম। উপাসনার পর কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম একত্রে বসিয়া উপবীত রাখা বা না রাখা সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে আমরা যখন জাতিনির্ব্বিশেষে সকলে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসক হইয়াছি, তখন কেহ বা উপবীতধারী, কেহ বা

উপবীতহীন থাকিবেন, এ পার্থক্য ভাল নহে। অতএব অধিকাংশের মতে উপবীত না রাখাই স্থির হইল। আমি এই প্রস্তাবের পোষকতা করিয়া বলিলাম যে, দেখ, পঞ্জাবের শিখসম্প্রদায় এক ঈশ্বরের উপাসক হইয়া সকল জাতি মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইল, এবং তাহাতে তাহাদের এত বল হইল যে, তাহারা দিল্লীর বাদসাকেও রণে পরাজয় করিয়া আপনারা স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিল। আমার এই কথাতে সকলের মনে আরও উৎসাহ জন্মিল। জগদ্দল নিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র [রাখাল দাস] হালদার প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর উপবীত রাখিবেন না। সত্য সত্যই তিনি বাড়ীতে যাইয়া উপবীত ফেলিয়া দিলেন।...

এই উপবীত বর্জ্জনের বিষয় ভালরূপ স্থির করিবার জন্য আমি ইহার পরে কলিকাতার সমাজগৃহে ব্রাহ্মদিগকে আহ্বান করিলাম। সমাজ মন্দিরের দোতলায় তাঁহাদের অধিবেশন হইল। ... ব্রাহ্মদের মতে স্থির হইল যে, ব্রাহ্মদের উপবীত ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। তাহার পর হইতে যিনি যখন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আসিতেন, তখন তাঁহাকে উপবীত পরিত্যাগ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরে আমি সিমলা পর্ব্বতে ভ্রমণের নিমিত্ত বাহির হই।"

এই বর্ণনানুসারে, (ক) শিখসম্প্রদায়ের দৃষ্টান্তটি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথেরই উক্তি, রাখালদাস হালদারের নহে ; এবং (খ) এই মেলা দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষার পর বৎসর, অর্থাৎ ১৭৬৬ শকে হইয়াছিল, ১৭৬৭ শকে নহে। এই দুইটি কথা আত্মজীবনীর প্রথম সংস্করণের সহিত মিলিতেছে না।

উক্ত উভয় বিবরণই ঘটনার বহু বৎসর পরে স্মৃতি হইতে মুখে বর্ণিত হইয়াছিল। এরূপ স্থলে এই সকল বিষয়ে অনৈক্য ও ভুল হওয়া বিচিত্র নহে।

সৌভাগ্যক্রমে, বহুকাল পরে বর্ণিত ঐ দুই বিবরণ ব্যতীত, সেই সময়ে লিখিত দুইটি প্রামাণ্য বর্ণনাও পাওয়া যাইতেছে, এবং এই দুইটি বর্ণনার পরস্পরের মধ্যে অসামঞ্জস্য নাই। তন্মধ্যে একটি স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে ২৭শে পৌষ (১৭৭৫ শক) তারিখে পত্রে লিখিয়াছিলেন। "পত্রাবলী" পুস্তকের ৩৭ সংখ্যক পত্রে তাহা মুদ্রিত আছে।

মহর্ষিদেবের পত্রের এই বর্ণনাটি আত্মজীবনীর বর্ত্তমান সংস্করণের ২১৬

পৃষ্ঠায়, স্থানান্তরিত অংশের বোধসৌকর্য্যার্থে, তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বে, স্মল পাইকা অক্ষরে মুদ্রিত হইল।

দ্বিতীয়টি, স্বর্গীয় রাখালদাস হালদার মহাশয়ের দৈনন্দিন লিপি অনুসরণে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় "A Mid-Victorian Hindu, a Sketch of the Life and Times of Rakhal Das Haldar" নামক পুস্তকের ২৭—২৯ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সুকুমার হালদার মহাশয় তাঁহার পিতার ডায়েরীর যে অংশ অবলম্বন করিয়া ঐ বর্ণনা লিখিয়াছিলেন, তাহার একটি নকল তিনি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন। ঐ অংশ বাংলায় লিখিত ছিল ; আমার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধে উহা মুদ্রিত হইয়াছে ; উহা বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক।

এই দুই সমসাময়িক বিবরণ হইতে দেখা যায় যে,—

(১) যে-মেলাতে রাখালদাস হালদার উপস্থিত ছিলেন, তাহা ১৭৬৬ অথবা ১৭৬৭ শকে না হইয়া ১৭৭৫ শকের ১৮ই পৌষ (অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) তারিখে হইয়াছিল। M.V.H. পুস্তক হইতে দেখা যায় যে ১৭৬৭ শকে রাখালদাস হালদারের বয়স ১৩ বৎসর মাত্র ছিল। সুতরাং সে সময়ে তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মদের মেলায় উপস্থিত হইয়া উপবীত পরিত্যাগ বিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশ করা নিতান্ত অসম্ভব ছিল।

(২) আত্মজীবনীতে এই মেলার স্থানটি 'গোরিটি' বলিয়া উক্ত হইয়াছে; 'পত্রাবলীতে' এবং রাখালদাস হালদারের দৈনন্দিন লিপিতে 'পল্‌তা' বলিয়া লিখিত আছে। গোরিটি ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে ও পল্‌তা পূর্ব্ব উপকূলে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহার পিতার নোটবুকে তৎকর্ত্তৃক অঙ্কিত ভাগীরথী নদীর একটি নক্সাও আছে; তাহাতে 'গোরিটি' ও 'চাঁপদানি'র মাঝখানে 'পল্‌তা' লেখা রহিয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, কোনও কারণে মহর্ষি (এবং তাঁহার অনুসরণে তাঁহার বন্ধুগণ) পল্‌তার পরপারস্থ গোরিটির বাগানকে 'পল্‌তার বাগান'ও বলিতেন। এই সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে আমি পত্র লিখি। তিনি তদুত্তরে লিখেন, "গোরিটির বাগান' ও 'পল্‌তার বাগান' দুইটি নহে। 'গোরিটির বাগান' যাহাকে বলে, 'পল্‌তার

বাগান'ও তাহাকেই বলে।" এই গোরিটির বাগানকে আগে লোকে চাঁপদানির 'বিবির বাগান' বলিত। এখন ঐ স্থানে 'Dalhousie and Angus Jute Mill, Champdany' নামক চটের কল অবস্থিত।

(৩) শিখসম্প্রদায়ের সহিত তুলনাটি, দেবেন্দ্রনাথ এবং রাখালদাস, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উক্তি, তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। মহর্ষির উক্তি হইবারই অধিক সম্ভাবনা।

৫৪

জগদ্দলের রাখালদাস হালদার, ও তাঁহার পিতা।

জগদ্দল নামে একাধিক গ্রাম আছে। এই জগদ্দল ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলে (চন্দননগরের পরপারে) অবস্থিত। কলিকাতার উত্তরে ভাগীরথীতীরবর্ত্তী যে সকল গ্রামের আদিম মূর্ত্তি কলকারখানার বিস্তারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জগদ্দল তাহারই মধ্যে একটি।

রাখালদাস হালদারের পিতা বেচারাম হালদার (খ্রীষ্টাব্দ ১৭৮৫—১৮৬৯) ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পূর্ত্ত বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। ইনি সাধু-প্রকৃতি, পরোপকারী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ঠাকুর পরিবারের ন্যায় ইনিও পীরালী শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন; শেষ বয়সে পীরালী দোষ খণ্ডনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ইঁহারই বাটীতে ২রা জুলাই ১৮৫২ তারিখে 'জগদ্দল ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী না হইয়াও নিজ উদারতাগুণে বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন।

রাখালদাস হালদার (১৮৩২—১৮৮৭) ইহার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হন। তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানানুরাগী মানুষ ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের ও অনঙ্গমোহন মিত্রের সহিত মিলিত হইয়া তৎকর্ত্তৃক ১৮৫২ সালে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন এবং তৎপরে সংস্কৃত উপাসনা প্রণালী সম্বন্ধে ও ব্রাহ্মসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে অসন্তোষ প্রকাশ,—এ সকল বৃত্তান্ত ৪৫৮, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইল। সে সময়ে দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্ত্তিগণের মধ্যে রাখালদাস অনেক বিষয়ে অত্যগ্রসর ছিলেন।

রাখালদাস পরে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অনেক উদার-প্রকৃতি ও শিক্ষিত ইংরেজের সহিত তাঁহার হৃদ্যতা হয়। সাবধানতার সহিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তথ্য অনুসন্ধান করা ও লিপিবদ্ধ করা তাঁহার একটি বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার পত্র ডায়েরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকের পক্ষে অতিশয় মূল্যবান্। তিনি লণ্ডনের 'University College'এ সংস্কৃত ও বাংলা পড়াইতেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করিয়া সেই কর্ম্মে যশস্বী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার পিতা "উপবীত পরিত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়াই আপনার বক্ষে ছুরি মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন", মহর্ষির এই উক্তিতে ভুল আছে। রাখালদাস হালদার মহাশয়ের ডায়েরী হইতে জানা যায়, তিনি শুধু যে উপবীত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহাই নহে, কিন্তু সত্য সত্যই উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদারহৃদয় পিতা তজ্জন্য কেবল অজস্র অশ্রুপাত করেন; তদ্ব্যতীত আর কিছুই করেন নাই; এবং, সেই অশ্রু দর্শনেই রাখালদাস পুনরায় উপবীত গ্রহণ করেন। ঐ ডায়েরীর এই অংশের নকলও আমি সুকুমার হালদার মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; তাহাও আমার পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে (৪৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) মুদ্রিত আছে।

৫৫

১৮৫৩—১৮৫৫ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির সহিত দেবেন্দ্রনাথের মতের ও ভাবের পার্থক্য।

"বাংলা গদ্যসাহিত্যে যে দুইজন প্রতিভাবান্ পুরুষ এক নবযুগ আনিতেছিলেন,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত,—তাঁহারা দুজনেই আধ্যাত্মিকতার চেয়ে নৈতিকতাকেই বড় বলিয়া জানিতেন। ... অক্ষয়কুমার দত্ত ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার আবশ্যকতাই স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন, 'কৃষিজীবী লোক পরিশ্রম করিয়া শস্য লাভ করে; কিন্তু জগদীশ্বরের সমীপে প্রার্থনার দ্বারা কোন কৃষাণের কস্মিন্‌কালেও শস্যলাভ হয় নাই।'

তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে প্রার্থনার শক্তি যে কিছু নয় তাহা নিম্নলিখিতরূপ দেখাইয়াছিলেন :—'পরিশ্রম = শস্য। পরিশ্রম ও প্রার্থনা = শস্য। অতএব, প্রার্থনা = ০।' ...

একবার রাজনারায়ণ বাবু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটা বক্তৃতা পড়েন। সেই বক্তৃতা দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ভাল লাগিয়াছিল; কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা তাহা পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার পত্রে লিখিতেছেন, (২৬ ফাল্গুন, ১৭৭৫)—'এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'[১]

অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের উপরেও সন্তুষ্ট ছিলেন না; কারণ, ঐ গ্রন্থের প্রচারে বেদ উপনিষদের প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের উপর সমানই রহিয়া গেল। তিনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে এক বক্তৃতায় বলেন যে 'ভাস্কর ও আর্য্যভট্ট এবং নিউটন ও লাপ্লাস যে কিছু যথার্থ বিষয় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র; গৌতম ও কণাদ এবং বেকন ও কোন্ত [Comte] যে কোন প্রকৃত তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের শাস্ত্র।' মূল প্রবন্ধে লাপ্লাস ও কঁতের নাম ছিল; এই দুইটি নাম নাস্তিকের নাম বলিয়া পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার সময় ব্রাহ্মসমাজের কোন কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা উঠাইয়া দেন; তাহাতে অক্ষয় বাবুর বিশেষ বিরক্তির কারণ হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বমূলক 'ডীজম্' করিবার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা করিয়াছিলেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের' দ্বিতীয় ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিতেছেন, 'বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয়কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।'

(১) ৪৪৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—(আত্মজীবনী-সম্পাদক)।

ব্রাহ্মসমাজের নূতন ধর্ম্মগ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' যেমন অক্ষয়কুমারের ভাল লাগিত না, তেমনি ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতিরও তিনি বিরোধী ছিলেন। সংস্কৃত মন্ত্র বাদ দিয়া নিছক বাংলা ভাষায় উপাসনা হয়, ইহাই তিনি ইচ্ছা করিতেন। এটা যে শুধু তাঁহার একলার ইচ্ছা ছিল, তাহা নয়। এ ইচ্ছা তখন অনেকগুলি ব্রাহ্মের মনে উদয় হইয়াছিল। ... অগ্রহায়ণ[১] মাসে রাখালদাস হালদার 'ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক অবস্থা বিষয়ক পর্য্যালোচনা' নাম দিয়া এক আবেদন লিখিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পাঠাইয়া দেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'তাহা (ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ) যে প্রকার ভাষায় লিখিত, তাহা এইক্ষণকার পক্ষে সুশ্রাব্য নহে। প্রাচীন কালের মুনিঋষিরা যে প্রকার অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন, আমরা সে প্রকারে অবস্থিত নহি। সুতরাং পরমেশ্বর বিষয়ে মনের ভাব প্রকাশের যে প্রকার রীতি তাঁহাদের ছিল, আমাদের সেরূপ নহে।'...উপাসনা-পদ্ধতি সম্বন্ধে তিনি লেখেন, 'এক পদ্ধতিই চিরকালের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ঈদৃশ নিয়মের এক দোষ এই যে, দুর্ব্বল উপাসকেরা অমনোযোগী হইয়া পড়ে। উপাসনাকালীন সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।... যদি কেহ বলেন যে, যে-সকল সংস্কৃত বচন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অর্থ জানিলেও তো হইতে পারে, তদ্বিরুদ্ধে আমাদের উত্তর এবং জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহার প্রয়োজন কি ?' ... আবেদনের উপসংহারে লিখিতেছেন, 'আমাদের প্রস্তাব এই যে, ব্রাহ্মেরা...সংস্কৃতে শ্রুতিপাঠ ও ব্রাহ্মধর্ম্মপাঠের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষায় পরমেশ্বরের সংক্ষেপ উপাসনা করিবেন। পরে দেড় বা দুই ঘণ্টা কাল পরমেশ্বরের প্রসঙ্গ ও আপনারদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিষয়ে কথোপকথন করিবেন।" (অজিত, ২৪০—২৪৩)।

বাংলায় উপাসনা করিবার অভিলাষ রাখালদাস হালদার মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুগণ খিদিরপুর ব্রাহ্মসমাজে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন, (৪৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রাখালদাস হালদার, অক্ষয়কুমার দত্ত, এবং অনঙ্গমোহন মিত্র,—প্রধানতঃ এই তিন জনের উৎসাহে দেবেন্দ্রনাথের ভবনে ১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে 'আত্মীয় সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন রায়ের 'আত্মীয় সভার' অনুকরণে ইহার নামকরণ হয়। প্রতি বুধবার সায়ংকালে ইহার অধিবেশন হইত,

(১) ডিসেম্বর, ১৮৫৫ ; M. V. H., ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—(আত্মজীবনী-সম্পাদক)।

(M. V. H., 23); দেবেন্দ্রনাথকে ইহার সভাপতি ও অক্ষয়কুমার দত্তকে ইহার সম্পাদক করা হইয়াছিল। প্রথমতঃ ইহার উদ্দেশ্য ছিল, সামাজিক প্রশ্নসকলের আলোচনা করা ; কিন্তু ক্রমশঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলতত্ত্বসকলও ইহার আলোচনার অন্তর্গত হইয়া পড়িল। (H. B. S. I., 110).

এই আত্মীয় সভা সম্বন্ধে ১৮৬৪ সালে দেবেন্দ্রনাথ লিখিতেছেন,—"শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদলের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, 'ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন ? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না ?' কি হাস্যাস্পদ ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল, এবং সহজজ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।...হিমালয়ে কখনো কখনো মনে হইত, এমন কি হইবে যে বঙ্গদেশে গূঢ় সত্য ভাব সকল প্রতিষ্ঠিত হইবে ?" (পঞ্চবিংশতি, ৩২,৩৩)।

"এই গোলযোগের তদানীন্তন অন্যতর নেতা কানাইলাল পাইন বলেন যে, ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া কোন গোলযোগ হয় নাই, তবে কতকগুলি কথা এবং সংস্কৃত ভাষায় উপাসনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে এবং ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বর 'সর্ব্বব্যাপী' বলিয়া উক্ত হয়েন। অক্ষয় বাবু এবং কানাই বাবু প্রমুখ ব্রাহ্মেরা বলিলেন যে 'সর্ব্বব্যাপী' কথার পরিবর্ত্তে 'সর্ব্বত্র বিদ্যমান' শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। আমরা শুনিয়াছি যে তাঁহারা 'সর্ব্বশক্তিমান্' শব্দের পরিবর্ত্তে 'বিচিত্রশক্তিমান্' শব্দ ব্যবহার করিবার জন্য জেদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কিরূপ ছোটখাটো বিষয় লইয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রথম বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল। দেবেন্দ্রনাথ এই সকল গোলযোগের নাম দিয়াছিলেন 'ব্রহ্মগোল'। তিনি ট্রষ্টীদিগের দোহাই দিয়া তবে এই ব্রহ্মগোল নিরস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।"—তত্ত্ববো., ১৮৩৯ শকের অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৯৬, ১৯৭ পৃষ্ঠা, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিত প্রবন্ধ)।

৫৬

কাশীর রাজেন্দ্র মিত্র ও তৎপুত্র গুরুদাস মিত্র।

প্রাচীন সুতানুটি, কলিকাতা, ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের ভূমির উপরে বর্ত্তমান কলিকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত। যে গোবিন্দরাম মিত্রের নামে গোবিন্দপুরের নামকরণ হইয়াছিল, তাঁহার পৌত্র আনন্দময় মিত্র কাশীবাসী হন। আনন্দময়ের পুত্র রাজেন্দ্রলাল (মৃত্যু ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ) বদান্যতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে 'রাজা রাজেন্দ্রলাল' বলিত। তৎপুত্র গুরুদাস মিত্র সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে ইংরেজদের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা বরদাদাস মিত্র বদান্যতায় পিতার অনুরূপ ছিলেন।—(শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস রচিত "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী", ২৭, ২৮ পৃষ্ঠা)।

৫৭

"জো অমৃতরস চাখা নহীঁ, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া ?"

এই হিন্দী উক্তিটি ও ইহার দেবেন্দ্রনাথপ্রদত্ত উত্তরটি আত্মজীবনীতে যেভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে, বোধ হয় তাহাতে কিছু ভুল আছে। হিন্দী উক্তিটি একটি 'ভজনের' অর্থাৎ পরমার্থসঙ্গীতের প্রথম ও শেষ পংক্তি হইতে গৃহীত।

(প্রথম পংক্তি) জিন্ প্রেমরস চাখা নহীঁ, অমৃতরস পিয়া তো ক্যা হুয়া ?

(শেষ পংক্তি) মৎলুব হাসিল ন হুয়া, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া ?

অর্থাৎ "যে প্রেমরস আস্বাদন করে নাই, সে অমৃত পান করিলেই বা কি হয় ?...তার তো লক্ষ্য সিদ্ধ হইল না, সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিলেই বা কি হয় ?"

স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত দেবেন্দ্রনাথের একটি পত্রে (পত্রাবলী, ১০৫) এই বচনটির আলোচনা আছে। তাহা এখানে

উদ্ধৃত হইতেছে :—"হিন্দীতে আর একটি কথা বলি, শুন। 'জো প্রেমরস চাখা নহি, রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া', যে ব্যক্তি প্রেমরস আস্বাদন করে নাই, সে যদি কেন্দে কেন্দে মরিয়া যায়, তো কি হয় ? ঈশ্বরের প্রেমরস না পাইয়া, পর্য্যটক হইয়া, কেবল ভিক্ষাদ্বারা জীবন পোষণ করিলে, দুঃখে চক্ষুর অশ্রু দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইলে, হাহারব করিয়া মরিয়া গেলে, কি ফল ? যাহার জন্য পর্য্যটন করা, যাহার জন্য দুঃখ পাওয়া, যাহার জন্য অশ্রুজল বিসর্জ্জন দেওয়া, যাহার জন্য মরিয়া যাওয়া, তাহার প্রতি তো তার লক্ষ্য হইল না। এ লক্ষ্য হইলে কি হইবে যে, 'কেবল ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, অতএব কেবল ভিক্ষা করিয়াই বেড়াই !' এ কি নিষ্ফল প্রতিজ্ঞা যে, 'না বুনিয়া না কাটিয়া' আহার করিতে হইবে ! যাহার হৃদয়-ভাণ্ডারে প্রেমরস সঞ্চিত হয় নাই, সে আবার অন্যকে তাহা কি প্রকারে কোথা হইতে বিতরণ করিবে ? যে আপনি প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছে, সেই অন্যকে আকর্ষণ করিতে পারে।"

পাঠক দেখিতে পাইতেছেন যে হিন্দী বচনটির আত্মজীবনীর পাঠ অপেক্ষা পত্রে লিখিত পাঠ অধিক শুদ্ধ। আত্মজীবনীর "রোনা পিটনা বেফায়্দা নহী", এ কথার অর্থ করা কঠিন। যদি (দেবেন্দ্রনাথের পত্রের অনুসরণে) বলিতে চাই, "এমন লোক হায় হায় করিয়া মরিয়া গেলেই বা কি ফল", তবে 'রোনে পিট্নেসে ফায়দা নহী', অথবা 'রোনা পিটনা বেফায়্দা হ্যায়', অর্থাৎ 'কাঁদা-কাটা নিষ্ফল' এরূপ হওয়া উচিত। আর যদি বলিতে চাই, "এমন লোকের জীবনের লক্ষ্য তো অসিদ্ধ রহিল, অতএব তার পক্ষে কাঁদাকাটাই স্বাভাবিক", তবে 'রোনা পিটনা বে-মৌকা (অসঙ্গত) নহী', বা এরূপ কিছু বলা উচিত।

৫৮

সুজ্মী পর্ব্বত ভ্রমণ কোন্ সালে হয় ?

আত্মজীবনীর পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রনাথ সুজ্মী পর্ব্বত ভ্রমণের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এই গ্রন্থের একটি অতি পবিত্র ও অতি মধুর অংশ। এই ভ্রমণের সময়ে নির্জ্জন অরণ্যে বনফুল দেখিতে দেখিতে তিনি যে একদিন ঈশ্বরের করুণার অনুভবে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিলেন, ও পথে পথে

হাফিজের একটি কবিতা গান করিয়াছিলেন, এই বর্ণনাটি (২৫৯ পৃষ্ঠা) বড়ই প্রাণস্পর্শী। হাফিজের সেই কয় পংক্তির সহিত ঐ দিনের স্মৃতি জড়িত হওয়াতে, উহাই তাঁহার নিকটে তাঁহার প্রিয় হাফিজের বচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া গিয়াছিল। মহর্ষির সমগ্র জীবনের ভাবটি ঐ কয় পংক্তি যেমন সম্যক-রূপে প্রকাশ করে, বোধ হয় আর কোন ভাষার কোন উক্তিই তেমন করে না। একবার কয়েক জন ভক্তের সহিত বসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতে করিতে মহর্ষি এরূপ ভাবগদ্গদকণ্ঠে ও বাষ্পাকুলনয়নে ঐ কয় পংক্তি আবৃত্তি করিয়াছিলেন যে তথায় উপস্থিত সকলেরই মনে যেন একটি স্বর্গীয় ভাবের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়াছিল। ঐ বনফুল দর্শনের দিনটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি চিহ্নিত দিন হইয়াছিল। এইজন্য তাঁহার এই সুংগ্রী ভ্রমণের সময়টি যতদূর সম্ভব যথাযথ ভাবে নিরূপণ করিতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা হয়।

সিমলা হইতে দেবেন্দ্রনাথ একবার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে) সুজ্মী পর্ব্বত ভ্রমণ করিতে ও একবার (মাঘ মাসে) ভজ্জী ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন। আত্মজীবনীর মতে উভয় ভ্রমণ ১৭৭৯ শকে হয়। কিন্তু দেখা যায় যে এই দুই ভ্রমণের বিবরণ দেবেন্দ্রনাথ সিমলা হইতে এক পত্রে (পত্রাবলী, ৫০) রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। সেই পত্রের তারিখ ১লা শ্রাবণ, ১৭৮০ শক। আত্মজীবনীর বিবরণে দেবেন্দ্রনাথ ঐ পত্রের ভাষাই বহুল পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। আত্মজীবনী ও পত্র, উভয়ের বর্ণনাতেই কেবল তারিখ আছে, অব্দের উল্লেখ নাই। কিন্তু পত্রখানি এমন ভাবে লিখিত যে, তাহা পড়িয়া মনে হয় যেন পত্র লিখিবার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে (অর্থাৎ ১৭৮০ শকের জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে) সুজ্মী ভ্রমণ করা হইয়াছিল।

নানা কারণে আমি সুজ্মী ভ্রমণের আত্মজীবনী হইতে অনুমিত অব্দই (১৭৭৯ শক = ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) গ্রহণ করিলাম। এই সকল কারণ ১৮৪৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪০, ৪১ পৃষ্ঠায় আমার লিখিত একটি প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

৫৯

এলাহাবাদের নীলকমল মিত্র ও লালকুঠি।

নীলকমল মিত্র উত্তরকালের এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ জননায়ক ও রাজনৈতিক কর্ম্মী অনারেবল্ চারুচন্দ্র মিত্রের পিতা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃগণের প্রতি ইনি অতিশয় শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন :—"এলাহাবাদে আমার হেয়ার স্কুলের সমাধ্যায়ী পুরাতন বন্ধু বাবু নীলকমল মিত্রের বাটীতে অবস্থিতি করি। তথায় তাঁহার পুত্র সপ্তদশ বর্ষীয় যুবক চারুচন্দ্র মিত্র আমার যথেষ্ট শুশ্রূষা করেন। ইনি নামেও চারু, কর্ত্তব্যেও চারু। কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য জন্য ঐ নামের উপযুক্ত, এমত নহে। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, সরলতা, সৌজন্য, ও অতিথিসেবা জন্য ঐ নামের উপযুক্ত ছিলেন।...নীলকমল বাবুর বাটীর নাম লালকুটী ছিল।...এলাহাবাদে এই সময়ে দুইটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, একটি কেশব বাবুদিগের, আর একটি বাবু নীলকমল মিত্রের। দেবেন্দ্রবাবু নীলকমল বাবুর সমাজ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, 'উহা উভয় আকৃতি প্রকৃতিতে কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়।' আমি ঐ সমাজে প্রতি সপ্তাহে উপাসনা করিতাম ও উপদেশ প্রদান করিতাম।"—(রাজ., ১১৫, ১৩৭)।

৬০

শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কয়েকটি মন্তব্য।

এই পরিশিষ্টগুলিতে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইল, তাহার অনেক অংশ আমি স্বয়ং তাঁহার সময়ের সংবাদপত্রাদি হইতে অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছি। কোন কোন স্থলে অন্যের লিখিত বা মৌখিক উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া কিছু কিছু লিখিতে হইয়াছে। আমি সর্ব্বত্র আমার কথার মূল নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

এ সম্পর্কে মৌখিক আলোচনা প্রধানতঃ এই তিন জনের সঙ্গে করিতে

হইয়াছিল :—(১) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও (৩) শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়। পরিশিষ্টগুলি শেষ বার লিখিত হইবার পর, ও মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে, চিন্তামণি বাবুর সঙ্গে আর একবার আলোচনা করিবার সুযোগ আমার হইয়া উঠে নাই। মুদ্রিত হইবার পরে পরিশিষ্টগুলি দেখিয়া তিনি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য মনে হইতেছে।

(১) "৩০৩ পৃষ্ঠা, ১৭—২১ পংক্তি। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উক্তি হইতে কোনও অনভিজ্ঞ পাঠক এরূপ কল্পনা করিতে পারেন যে দ্বারকানাথ তখন পর্ণকুটীরবাসী ছিলেন। বস্তুতঃ দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য্য তখন 'অতুল' না হইলেও যথেষ্ট ছিল। প্রাচীনকালের গ্রামসুলভ জীবনযাত্রার কোন কোন রীতি তখন পর্য্যন্ত সহরে প্রচলিত ছিল; তাই দ্বারকানাথের বৃহৎ অট্টালিকার পার্শ্বে গোলপাতা নির্ম্মিত সূতিকাগৃহ ছিল।"

[এই মন্তব্য আমি অঙ্গীকার করিয়া লইলাম।—আত্মজীবনী-সম্পাদক।]

(২) "৩১০—৩১২ পৃষ্ঠা। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' পুস্তক হইতে উদ্ধৃত অংশে দুইটি আপত্তিযোগ্য কথা আছে। (১) উহাতে বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণের যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, (ইংরেজগণের সঙ্গে আহার করাতে জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কা,) তাহা ঠিক নহে। দ্বারকানাথ ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি সম্ভ্রান্ত ইংরেজগণের উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া, ও একটি গাড়ী-বারান্দার অভাব ছিল বলিয়া গাড়ী-বারান্দাসহ বৈঠকখানা বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাহা ভদ্রাসন বাটীর 'পার্শ্বে' নয়, সম্মুখে নির্ম্মিত হয়। (২) উক্ত উদ্ধৃতাংশে ইংরেজগণের 'প্ররোচনায়', ও 'ভ্রষ্টাচারে লিপ্ত হইলেন,' এই উক্তিদ্বয়ের দ্বারা দ্বারকানাথের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। তিনি স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। কাহারও প্ররোচনায় নয়, কিন্তু নিজে ভাল মনে করিতেন বলিয়াই ইংরেজদের সঙ্গে সখ্য ব্যবহার করিতেন; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের সঙ্গে আহার করিলেও, স্বীয় আহারে ও পরিচ্ছদে তিনি চিরকাল দেশীয় রীতি রক্ষা করিয়াই চলিতেন।"

[এই মন্তব্য আমি অঙ্গীকার করিয়া লইলাম।—আত্মজীবনী-সম্পাদক।]

(৩) "২৯৮ পৃষ্ঠার ৬—১০ পংক্তিতে (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃতাংশে) এবং ৩১১ পৃষ্ঠার ১৪—১৬ পংক্তিতে ('বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' হইতে উদ্ধৃতাংশে) বলা হইয়াছে যে, দ্বারকানাথ ইংরেজগণের সংশ্রবে আসিতেন বলিয়া তাঁহার পত্নী শেষ জীবনে পতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সম্পর্ক ত্যাগের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে।"

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উক্তিটি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত। তিনি বলেন, সম্পর্ক ত্যাগের কথা নিঃসংশয় সত্য। তিনি বয়োবৃদ্ধা আত্মীয়াগণের নিকট হইতে ইহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। —আত্মজীবনী-সম্পাদক।]

(৪) "৩১৯ পৃষ্ঠা, ৩—৬ পংক্তি। দ্বারকানাথ দেবেন্দ্রনাথকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার সময়, দেবেন্দ্রনাথের 'মতিগতির পরিবর্ত্তন'ও দ্বারকানাথের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত ছিল, এই উক্তির প্রমাণ কি ?"

[এই পুস্তকের ৩১৮ ও ৩১৯ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মূল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৮৩৮ শকের আষাঢ় সংখ্যার ৫৫—৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধ। ক্ষিতীন্দ্রবাবু বলেন, ঐ কথাটি তিনি স্বয়ং মহর্ষির মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন।—আত্মজীবনী-সম্পাদক।]

নাম-সূচী

এই নাম-সূচীতে (পত্রশীর্ষের ও পরিচ্ছেদশীর্ষের নাম এবং ৩১৭ পৃষ্ঠার পাঠ্যতালিকার নাম ভিন্ন) মূলগ্রন্থের ও পরিশিষ্টের সমুদয় নামের পত্রাঙ্ক দেওয়া হইল। সময়-সূচীতে যে-যে নামের সম্পর্কে গ্রন্থের ও পরিশিষ্টের অতিরিক্ত কোন কথা আছে, তাহারও পত্রাঙ্ক দেওয়া হইল। ইংরেজী বর্ণমালায় মুদ্রিত নাম, সমান উচ্চারণবিশিষ্ট বাংলা অক্ষরের নামসকলের শেষভাগে দেওয়া হইয়াছে। পাঠক বিদেশীয় নাম এই সূচীতে বাংলা ও ইংরেজী উভয় অক্ষরেই অন্বেষণ করিবেন। ইংরেজী B এবং V দুই প্রকার অক্ষরের জন্য এই সূচীতে বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব পৃথক্ করিতে হইল; কিন্তু বর্গীয় বয়ের ঠিক পরেই অন্তঃস্থ ব দেওয়া হইয়াছে।

অ

অক্ষয়কুমার দত্ত, ৬৬, ৬৯, ৭৫, ৭৬, ৮৫, ১০৪, ১০৫, ১১৬, ২২০, ৩৪৭—৩৫১, ৩৫৭—৩৫৯, ৩৭৪, ৩৮২, ৩৯৩—৩৯৬, ৪১২, ৪১৮, ৪২১—৪২৬, ৪৩৭, ৪৪৩—৪৪৬, ৪৫৫—৪৫৯

অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৪২, ৩০০, ৩৭০, ৩৭৫, ৩৯০, ৩৯৭, ৪৩৬, ৪৪১

অথর্ব্ব বেদ, ১৩১—১৩৪

অদ্বৈতবাদ, ৭৭, ৯৩, ১৮৫, ২১৩, ২৭৫, ৪১৭, ৪৪১

অনঙ্গমোহন মিত্র, ৪৪৩, ৪৫৫, ৪৫৮

অমৃতসর, ২৩১—২৩৮, ৪৪৭

অম্বালা, ২৩১, ২৮৪, ৪৪৭

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, ৪৩৭

অলকাসুন্দরী (পিতামহী), ৩৭—৪২, ২৯৭, ৩০১—৩০৪, ৩১৮, ৩১৯

অবতারবাদ, ৮১, ১৮৫, ৩৫৪

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩১২

আ

আগ্রা, ২২৮, ২৩০, ৪৪৭

আত্মতত্ত্ববিদ্যা, ৪৪১

আত্মীয় সভা (অক্ষয়কুমার), ২২০, ৩৫৭, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৫৫, ৪৫৮, ৪৫৯

আত্মীয় সভা (রামমোহন), ৬৫, ৩৪২

আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (পরে বেদান্তবাগীশ), ৮১, ৮৫, ১০৯, ১৩২—১৩৯, ১৪৩, ১৫৪, ৩৭৪, ৩৯৮, ৪১৭, ৪২৪, ৪৩৮

আনন্দময় মিত্র, ৪৬০

আন্‌সন (Anson), ২৪৫, ৪৪৯

আফ্‌তাব্ চন্দ, ১৬২, ৪১০

আল্লোপনিষদ, ১৬৬

আশুতোষ দেব, ১০৬, ৩৯০, ৪৪২

আসাম, ১৯২—১৯৪, ৪৩৯, ৪৪০

আহ্নিক তত্ত্ব, ২১২
Academic Assn., ৩১৫
Adam, Rev. W., ১৩, ৩১৪

ই

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ৫৯, ৩১৯, ৩৩০—৩৪০, ৪০৮
ইডেন (মিস্), ৭৯, ৩০৮, ৩০৯
ইন্দোর, ৪৪৪
ইরাবতী, ২৩২
Englishman, ৩৩৭, ৩৯৯, ৪০০, ৪০২, ৪২০
'India & India's Missions', ৪১৯
India Gazette, ৩৬২

ঈ

ঈ. চ. মি., ৪৪০
ঈশানচন্দ্র বসু, ৩৪৩, ৩৬১, ৩৮৬
ঈশোপনিষদ্, ৬০, ৬২, ৯০, ১৫৩, ২৭৩, ৩৯৪
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ৬৬
ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, ৭০, ৭১, ৮১, ৩৫৪
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৬৯, ৩৪৭, ৩৫৭, ৪৪৩, ৪৫১, ৪৫৬

উ

উত্তরমীমাংসা, ৭১, ১৬৭
উৎসবানন্দ গোস্বামী, ৩৫৪
উপনিষদ্, ৬০—৭৭, ৮০, ৮৯—৯১, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১২৫, ১৩১, ১৪২—১৪৫, ১৫১—১৫৭, ১৬৫—১৮৬, ২২২, ২২৩, ২৭০—২৭৩, ৩২২, ৩২৩, ৩৪২, ৩৪৫—৩৪৯, ৩৫৪, ৩৭৭—৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৭, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪১৩—৪৩৬, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৫৭
উপমন্যু, ৪৮
উমেশচন্দ্র দত্ত, ২৯৯
উমেশচন্দ্র রায়, ৬৯
উমেশচন্দ্র সরকার, ১০৩, ৩৮৯, ৩৯০, ৪২০

ঋ

ঋগ্বেদ, ১৩১—১৩৪, ১৪০—১৪৭, ১৫১, ১৫৩—১৫৫, ১৭৯, ৩৮১

এ

এলাহাবাদ, ৩৯, ১৯৫, ২২৭, ২২৮, ২৮৬—২৯০, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৬৩
এসিয়াটিক সোসাইটী, ১৫৪
Asiatic Journal, ৩৬২

ঐ

ঐতরেয়োপনিষদ্, ৬২, ১৮৬

ঔ

ঔরঙ্গজেব, ২১৭

ক

কটক, ১২৭, ১২৮, ২০৩,—২০৭, ৪০৪
কঠোপনিষদ্, ৬২, ৬৩, ৯১, ৯৬, ৯৯, ১২৫, ১৪৯, ১৫৩, ১৭০, ১৭৭, ১৮৯, ২২৬, ২৭১, ২৭২, ২৭৬, ৩৯৪

কমললোচন বসু, ৭২, ৩৬০
কমলাকান্ত চূড়ামণি, ৪৭, ৯১, ৩৭৪
কলেজ পাঠশালা, ৩৪৩, ৩৪৮
কল্‌বিল্‌, ২১০, ৪৪৮
কাত্যায়নী দেবী, ৩০৪
কাত্যায়নী (রাণী), ৩৪০
কানপুর, ২৮৫, ২৮৬, ৩৫২
কানাইলাল ঠাকুর, ৩১১
কানাইলাল পাইন, ৪৫৯
কাবুল, ২৫১
কামাখ্যার মন্দির, ১৯২—১৯৭
কার্, উইলিয়ম্‌, ৩৩২
কার ঠাকুর কোম্পানী, ২০, ১২৮—১৩০, ১৪৬, ১৫১, ২০৮, ৩১৮, ৩৩০—৩৪০, ৪০৪, ৪০৫
কালা আইন, ৪৪২
কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, ৬৫
কালীগ্রাম, ৫৩, ১২৮, ৪০৩
কালীঘাট, ৩৭, ৫২, ১৩৮, ২৭৬
কালীনাথ রায়, ৮৪, ৪১৬
কালীমোহন ঘোষ, ৩৯৭
কাল্‌কা, ২৩৯, ২৮৪
কাল্‌না, ১১১, ১১৫
কাশী, ১০৮, ১০৯, ১৩২—১৩৮, ১৪৬, ১৫৩, ১৫৫, ১৯৯, ২২৪—২২৭, ২৯০, ৩৪৬, ৩৮১, ৪১৭—৪১৯, ৪২২, ৪২৪, ৪৪৬, ৪৬০
কাশীশ্বর মিত্র, ৪৪৩
কিশোরীচাঁদ মিত্র, ৩০৭
কিশোরীনাথ চট্টো., ২২৭, ২৩১, ২৪১, ২৪৪, ২৪৯—২৫৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৭৬, ২৮৩—২৮৬, ২৯৩
কান্তি চাটুয্যে, ১৬০
কুতব মিনার, ২৩১
কুমারখালি, ১৩৮, ৪০৩, ৪০৪
কুমার সিংহ, ২৮৮
কৃষ্ণনগর, ১৬২—১৬৪, ২২৭, ২৭৭, ৪১১, ৪১২
কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, ৭১, ৩৪৪
কৃষ্ণমোহন মজুমদার, ১৫৭, ৪১৬
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১৪, ৩১৫, ৩২৯, ৪৭১
কেনোপনিষদ্‌, ৬২, ১৫৩, ১৮০, ৩৯৪
কেলু গাছ, ২৫৫, ২৫৮, ২৬০, ২৬১
কেশবচন্দ্র সেন, ৩৭৯, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৬৩
কৈবল্যোপনিষদ্‌, ২২৩
কৌলোপনিষদ্‌, ১৬৬
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩০১, ৩১৪, ৩২৮, ৩৭১, ৪২৪, ৪৩১, ৪৩৭, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৯, ৪৬৭, ৪৬৫
‘ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত’, ৪১১
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ৩১৪
Calcutta Bank, ৩৩০
Calcutta Courier, ৩০৯, ৩৪৮, ৩৪৯
Calcutta Gazette, ৩৩৮

Calcutta Star, ৪০১
Calder, James, ৩৩০
Campbell, I. Dean, ১৬, ৪০৪
Colville, Sir W. J., ২১০, ৪৪৮
Commercial Bank, ৩৩০—৩৩৩
Cousin, Victor, ২৭০, ৪৪৭
Kant, ২৭০, ৪৪৭
Kyd, Robert, ৪৪৮

খ

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩০৪, ৩০৫, ৪০৫, ৪৬৪
খাএকৃষ্ণ, ১৯৬
খিদিরপুর, ৪৪৪, ৪৫৮

গ

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩১২, ৪৫৪
গায়ত্রী, ৮৩—৮৯, ৯৭—১০০, ৩২৮, ৩৭২—৩৭৯, ৩৮৩, ৩৮৯
গালিমপুর, ২১৯
গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০, ৮৫, ১১৭—১১৯, ১২৫—১৩০, ১৪৭, ১৪৯, ১৫২, ২০৮, ২১৮, ৩১২, ৩৩২—৩৪০, ৩৭৪, ৩৯৮—৪০০, ৪০৭, ৪৪৬
গীতা, ৮৮, ১৫৩, ১৫৪, ১৮১, ২১২
গুরুদাস মিত্র, ২২৬, ৪৬০
গুরুদ্বারা, ২৩২—২৩৬
গোপাল তাপনী উপনিষদ, ১৬৫
গোপাললাল ঠাকুর, ২২২, ৩৩৪, ৪৪৬
গোপীকান্ত বিগ্রহ, ৩০৫, ৩০৬
গোপীচন্দনোপনিষদ্, ১৬৬
গোপীনাথ বিগ্রহ, ৩৮, ৩০৫, ৩০৬
গোপীমোহন ঠাকুর, ৪৭, ১০৫, ৩০৬
গোমানী সিংহ, ৪০৯, ৪১০
গোরিটি, ৮৬, ২১৬, ৩৬৮, ৩৯৫, ৪৪৪, ৪৬৫, ৪৫২—৪৫৫
গোবিন্দরাম মিত্র, ৪৬০
গোবিন্দ বাঁড়ুয্যে, ১৬০
গোবিন্দ সিংহ (শিখ গুরু), ২৩৫
গৌহাটী, ১৯২—১৯৪, ৪৪৯
গ্রন্থ সাহিব, ২৩৪
গ্রন্থাধ্যক্ষ সভা, ৩৫৭, ৩৭২, ৬১৮, ৪৪৫, ৪৫৭
Gassendi, ৫২৩
Gordon, D.M., ১৪৬, ১৪৭, ৩৩২, ৩৩৯, ৪০৬
Gordon, J. G., ৩৩০

ঘ

ঘোষজা মশায়, ২৫১

চ

চট্টগ্রাম, ১৯৬
চন্দননগর, ২৪
চন্দ্রনাথ রায়, ৬৯, ৮৫, ৩৭৫, ৩৯৫
চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২১০, ৩১১
চারুচন্দ্র মিত্র, ৪৬৩

চাপদানি, ৪৫৪, ৪৫৫
চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, ৪৬৩—৪৬৫

ছ

ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৩৬, ৬২, ১৫৩, ১৬৭—১৭০, ১৭৩, ১৭৭, ২২২

জ

জগচ্চন্দ্র রায়, ৮৫, ৩৭১, ৩৭৪
জগদীশপুর, ৪০৪
জগদ্দল গ্রাম, ২১৬, ৭৭৪, ৪৫৩—৪৫৬,
জগদ্ধাত্রী পূজা, ১৯১, ১৯২, ৫২৭
জগদ্বন্ধু পত্রিকা, ৪২০, ৪২১, ৪২৪
জগন্নাথ ক্ষেত্র, ৩৭, ২০৩—২০৬
জজ্জী সাহেব, ১৫৭, ২৩৫, ২৬২, ২৮৩
জয়রাম ঠাকুর, ৩০৫
জয়রাম মিত্র, ৩৪০
জব্জ সাহেব, ২০৯
জলঙ্গী নদী, ২৭৭
জলন্ধর, ২৫১
জাহ্নবী দেবী, ১২৫
জৈমিনি, ৭১
জ্ঞানপ্রকাশিকা সভা, ৪৪৩
জ্ঞানরত্নাকর, ১২৪
জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ২২, ৩১৬, ৩৯৯, ৪০০, ৪২০, ৪৪১
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, ৪৬০
Jenkins, R. C., ২০
John Bull, ৩৬১
Joseph Barretto & Sons, ১০, ৩৯১
'Justicia', ৩৯৯, ৪০০

ট

টম্‌সন্ (জর্জ), ১৪, ১৫, ৪৪২
টেলার (কাপ্তান), ৩৩২

ড

ডগশাহী, ২৪৯—২৫২, ৪৪৭
ডফ্ সাহেব, ১০৩, ৩৫২, ৩৭৫, ৩৯০, ৪১৯, ৪২০
ডি. গুপ্ত, ৩৩৪
ডিরোজিও, ১০, ১১, ১০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৩৫৯, ৪২৪
ডিষ্ট্রিক্ট চ্যারিটেব্‌ল্ সোসাইটী, ১২৮, ৩৩৫, ৪০৭
ডুমুরদহ, ৪৪৪
'Defence of Brahmoism and the Brahmo Samaj', ৪২২
Duchess of Sutherland, ৩০১, ৩২৮

ঢ

ঢাকা, ১৯২, ৪৪০, ৪৪৬

ত

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৬২, ৭৫—৭৭, ১০৪, ১১১, ১৩১, ১৫১, ১৫৪, ১৫৫, ১৭৮, ২১১, ২১৫, ৩১৪, ৩২৮, ৩৩০, ৩৪০, ৩৪৫, ৩৫৩, ৩৫৭—৩৬৭, ৩৮২, ৩৯৪, ৩৯৮

৪১০, ৪১৬—৪২১, ৪২৪, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪৫, ৪৫০—৪৫৪, ৪৫৭, ৪৫৯, ৪৬২
তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, ২৮৬, ৩৪৬—৩৫২, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৮২, ৪১৬, ৪১৭
ঐ যন্ত্রালয়, ৭৫, ৭৮—৮০, ৮২, ৩৫৯
ঐ সভা, ৬২—৭১, ৭৫, ৭৮—৮১, ৮৫, ১৫৫, ১৯১, ২০৮, ২০৯, ৩০৬, ৩০৯, ৩৪৫—৩৫৯, ৩৬৭, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৯৩, ৩৯৯, ৪১৬—৪১৮, ৪২৫, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫৭
তত্ত্বরঞ্জিনী সভা, ৬৪, ৩০৭
তমসা নদী, ২৭৭
তলবকার উপনিষদ, ১৫৩
তাজমহল, ২২৮
তারকনাথ ভট্টাচার্য্য (পরে তত্ত্বরত্ন), ৮১, ৮৫, ১০৯, ১৩২—১৩৯, ১৫৪, ১৬০, ৩৭৪, ৪১০
তারাচাঁদ চক্র., ৩১৪, ৩১৫, ৩৯০, ৪০৯
তিলকচন্দ্র (মহারাজা), ৩৪০
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১৩৫
তৈত্তিরীয়োপনিষদ, ৬২, ৮৯, ১৪৫, ১৫১, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৪, ১৮৯
ত্রিপুরা, ১২৭, ৪০৪, ৪৪৪

দ

দক্ষিণডিহি, ২৯৭
দক্ষিণারঞ্জন মুখো., ৩১৪, ৩১৫, ৪৫১
দর্পনারায়ণ ঠাকুর, ৩০৫, ৩১১, ৩৯৯
দানাপুর, ২৮৮
দামোদর নদ, ১৫৮, ১৫৯, ৪০৯
দারুণ ঘাট, ২৬৫
দিগম্বরী দেবী (দেবেন্দ্রনাথের মাতা), ১২৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩১১, ৪০১
দিদীমা, ('অলকাসুন্দরী' দ্রষ্টব্য)।
দিল্লী, ২১৭, ২২৮—২৩১, ২৪৫, ২৮৫, ৪৪৬, ৪৪৭
দীননাথ রায়, ২৮৫, ২৮৬, ৩৫২
দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৯৩
দুর্গাচরণ সাংখ্যতীর্থ, ৪০১, ৪০২
দুর্গানারায়ণ বসু, ২৬
দুর্গামণি দেবী, ২৯৭
দুর্গাপূজা, ৫৭, ৫৮, ৬৩, ১২১, ১২২, ১২৬, ৩১৩, ৩১৬, ৩২৭
দেবী উপনিষদ, ১৬৬
দ্রবময়ী দেবী, ১২৫
দ্বারকানাথ গুপ্ত, ৩৩৪
দ্বারকানাথ ঠাকুর, ৩৯, ৬০, ৭৮—৮০, ১০৯, ১১৪—১৩০, ২০৬, ২১০, ২৯৭—৩২১, ৩২৭—৩৪১, ৩৪৭, ৩৪৭—৩৫০, ৩৫৫—৩৬০, ৩৭৪, ৩৮০, ৩৯৮—৪০৮, ৪১৮, ৪৪২, ৪৪৮, ৪৬৩—৪৬৫
দ্বারবাসিনী, ৪০৪
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১০, ৪০৩, ৪০৫

ধ

ধর্ম্মসভা, ১০৫, ৩৬২

ধৌম্য ঋষি, ৪৮

ন

নগরী নদী, ২৬২—২৬৪

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৩২৪—৩২৯

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১০৯, ১১৭, ১২৮—১৩০, ১৯১, ১৯২, ২১০, ২১৮—২২০, ২৩০, ২৯১, ৩৩৪—৩৪০, ৩৬০, ৪০৭, ৪৪৬, ৪৪৭

নচিকেতা, ১৭০

নন্দকিশোর বসু, ১১০, ৩৭৩, ৩৯১, ৩৯২

নন্দকুমার চক্রবর্ত্তী, ৩৪১

নবদ্বীপ, ১৬৩, ২২৪

নব বাঁড়ুয্যা, ২১১

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ১১৭

নানক, ৯৭, ১৫৭, ২৩৪, ২৩৫

নারকাণ্ডা, ২৫৭, ২৬০

নারদ, ৪৩, ৪৪

নিত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা, ৪৪৪

নীলকমল মিত্র, ২৯০, ৪৬৩

নীলমণি ঠাকুর, ২৯৭, ৩০৪, ৩০৫

নীলরতন হালদার, ১২৪, ৩৯০

নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫, ৩১৪, ৪৪৭

নৃসিংহ পূর্ব্ব তাপনী উপনিষদ্, ১৭৯

Nasiri Gurkhas, ৪৪৯

Newman, Francis, ২৭০, ৪৪৭

প

পঞ্জৌর, ২৩৯, ২৮৪

পত্রাবলী, ১৩২, ২১৬, ২৩৭, ২৪০, ২৭৫, ৩৬০, ৩৯৩, ৪৪১—৪৪৮, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৬০—৪৬২

পদ্মা, ৫৩—৫৫, ৪২৮, ৪৪৬

'পরলোক ও মুক্তি' (পুস্তিকা), ১৭২

পলতা, ('গোরিটি' দ্রষ্টব্য)।

পাটনা, ২২৬, ৪৪৬

পার্টলি, ১১১, ৪০১

পাঠানকোট, ২৩২

পাণ্ডুয়া, ২০৩

পাবনা, ১২৭, ৪০৩

পুরাতন বাড়ী, ৬৮, ৩০৫, ৩০৬

পুরী, ৩৭, ২০৩—২০৬

পূর্ণ মিত্রের স্কুল, ৫৬

পূর্ব্ব মীমাংসা, ৭১

প্যারীচাঁদ মিত্র, ৩১৫, ৪৪২

প্যারীমোহন বন্দ্যো., ২৪১—২৪৩

প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, ৩০৫

প্রমথনাথ দেব, ১০৬, ৩৯০, ৩৯১

প্রয়াগ, ('এলাহাবাদ' দ্রষ্টব্য)।

'প্রবাসী', ৩১০, ৩৯৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪৪৩

প্রশ্নোপনিষদ্, ৬২, ১৫৩, ১৭১

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৪৭, ১২৬, ২১০—২১২; ২১৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩২১, ৩৩২, ৩৪৩, ৩৪৮, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৬, ৪৪২, ৪৪৬

প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, ৬৯
প্রিন্সেপ, উইলিয়ম, ৩৩২
প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, ৩৫, ৪৩৮, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৬৪
Plowden, ৩৩০, ৩৩২

ফ

ফতুয়া, ২২৫
ফরাসডাঙ্গা, ১১৫
ফুঙ্গী, ১৯৯
ফেনেলন, ১৯০, ৩৮২, ৪৩৭
Farm Cave, ১৯৮— ২০০
Fichte, ২৭০, ৪৪৭

ব (বর্গীয়)

বর্ম্মা, ১৯৫—২০২
বাদরায়ণ, ১৬৭
বাঁশবেড়ে, ৪৭, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৯, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৯৫
বিরাহিমপুর, ১২৭, ১২৮, ৪০৪
বীটন, ২২, ৪৪২
বীটন (বেথুন) স্কুল, ২১
বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৬২, ৯৭, ১৪২, ১৫১, ১৫৩—১৫৫, ১৬৭, ১৭০, ১৭২, ১৭৭, ১৭৮, ১৮৬, ১৮৮, ২৮১, ৪৩৪
বেচারাম চট্টো., ১০০, ৩৯৪, ৪৬০
বেচারাম হালদার, ২১৭, ৪৫৫, ৪৫৬
বেলগাছিয়ার বাগান, ৭৯, ৩০৭—৩১০, ৩৩৫, ৩৫০, ৩৫৯, ৪০৮
বেহালা, ৪৪৪
বৈঠকখানা বাড়ী, ৪৫, ৫৯, ১১৬, ১২৮, ৩১০—৩১২, ৪৬৪
বোটানিকেল গার্ডেন, ৪৬, ৩১৯, ৪৪৮
'বোধোদয়', ৬৯, ৪৪৩
বোয়ালি, ২৬২, ২৬৩
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম (বোলপুর), ৩৬৯, ৩৭০
'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' ১৪২
ব্রহ্ম মীমাংসা, ১৬৭
ব্রহ্ম সভা, ৬০, ৩৬০—৩৬৪
ব্রহ্মসমাজ, ৩৬১—৩৬১
ব্রহ্মসূত্র, ১৬৭
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি, ৬২, ৮৮—৯৪, ১৫৫—১৫৭, ১৮৬, ৩৯৬, ৩৫৭, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৮১—৩৮৯, ৪৬৬, ৪৫৮, ৪৫৯
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ, ৬২, ১৭৫—১৮৬, ২৭৬, ৩৬৬, ৩৬৬, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮১—৩৮৮, ৪১২, ৪২৬, ৪২৯—৪৩৭, ৪৪১—৪৪৬, ৪৫১, ৪৫৭, ৪৫৮
ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিজ্ঞাপত্র, ৬২, ৮৩—৮৯, ৯৮, ২৩৬, ৩৬৫, ৩৫৩, ৩৬৬, ৩৬৯—৩৭৫, ৪৩০
ব্রাহ্মধর্ম্মবীজ, ৬২, ৮৪, ১৭৫, ২১৪—২১৬, ৩৮১, ৪১২, ৪২৬, ৪৫০, ৪৫১
ব্রাহ্মসভা, ১০৫, ৩৬০—৩৬৪
ব্রাহ্মসমাজ, ৬২, ৭০—৭২, ৮০—৯৬, ১৩০, ১৫৪—১৫৭, ১৬০—১৬৩,

১৮৬—১৯০, ২০৬, ২১৪—২১৭, ২৩৪, ৩০১, ৩৪৩—৩৭৩, ৩৮২, ৩৯৩, ৩৯৭, ৪০০, ৪২৬, ৪৩৭—৪৩৯, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৫৩, ৪৬৩
'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত', ৭০, ৩২৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৭৫, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৫১, ৪৫৯
'ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনাপদ্ধতি, ব্যাখ্যান, ও সঙ্গীত', ৩৬১
ব্রাহ্মী উপনিষদ্, ১৮০, ৪৩৬
ব্রাহ্মসভা, ৩৬১, ৩৬২
ব্রাহ্মসমাজ, ৩৬১—৩৬৮
ব্রিষ্টল, ৭০
Bengal Almanac, ৩৩৫
Bengal Bank, ৩৩০
Bengal British Ind. Soc., ৪৪২
Bengal Coal Company, ১৬, ৪০৪
'Bengalensis', ৩৬৭, ৪২৫
Bengal Herald, ১২৪
Bengal Hurkaru, ৩০৯, ৩১০, ৩৩৭—৩৩৯, ৩৬৭, ৪২৫
Bengal Landholders' Association, ১৩, ৪৪২
'Black Acts', ৪৪২
Boyle, ৩২৩
British Indian Association, ৪৪২
British India Society, ১৩

ব (অন্তঃস্থ)

[আদিতে অন্তঃস্থ ব-যুক্ত যে সকল নাম সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলা ভাষায় আসিয়া রূপান্তরিত হয় নাই, কেবল তাহাই অন্তঃস্থ ব শীর্ষে প্রদত্ত হইল।]

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', ৩০৭, ৩১০—৩১২, ৩১৫, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪৬৪
'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', ৪৬০
বরদাদাস মিত্র, ৪৬০
বর্দ্ধমান, ১৫৮—১৬২, ৪০৯—৪১১, ৪৪১
বরাহনগর, ২২২, ৩৯৫, ৪৪৬
বসুজা মশায়, ২৫১
বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্, ১৫৩
বাণেশ্বর ভট্টাচার্য (পরে বিদ্যালঙ্কার), ১০৯, ১৩২—১৩৯, ১৫৩
বাল্মীকি, ২৭৭
'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', ৪৪৩, ৪৫৭
বিনোদিনী দেবী, ১২৫
বিন্ধ্যাচল, ১৩৮
বিমলা দেবীর মন্দির, ২০৫, ২০৬
বিলাসপুর, ২৬৩
বিশ্বভারতী, ৩৬৯
বিশ্বেশ্বরের মন্দির, ৯৬, ১৩৩
বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ৭১ ১৮৭, ৩৪৪, ৩৪৫
বীরনৃসিংহ মল্লিক, ৩৪০, ৩৯০
বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩৭৪

বৃন্দাবন, ৩৭, ১২০, ২৬০, ৪৪৭
'বেতালপঞ্চবিংশতি', ১৯
বেদব্যাস, ৪৩, ৬৬
বেদাঙ্গ, ১৩১, ১৫৩
বেদান্ত, ৬৫, ৬৯, ৭১, ৭৭—৮০, ১০৭, ১০৮, ১৫১—১৫৪, ১৬৭, ১৭৫, ৩৪২, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৮, ৩৯২, ৪১২—৪৩৩
বেদান্ত কলেজ, ৩৪৮, ৩৫০
বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম্ম, ৩৫৩, ৩৮৬—৩৭৩, ৪১০, ৪১৬, ৪২৫, ৪৩০
বেদান্তসূত্র, ১৬৭, ৪১৭
ব্রজনাথ ধর, ১০৬, ৩৯০
ব্রজমোহন ঘোষ, ৩৯০
ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪৫, ৮৫, ১১৬, ১২৫, ৩৭৪
'Vedantic Doctrines Vindicated', ৪২০, ৪২২
'Vedantism, Brahmoism, and Christianity', ৪২২

ভ

ভক্তী, ২৬৩, ২৭৪—২৭৮, ৪৪৭, ৪৬২
ভবসিন্ধু দত্ত, ৩১৩, ৩২২, ৪০৬—৪১০
ভবানীচরণ সেন, ৮৫
ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ, ৪৪৩, ৪৫৭
ভারতবর্ষীয় ঐ ৫২, ৩১৩, ৩২২
ভাস্কর (সংবাদপত্র), ৪০২
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১০৬, ৩১৬

ম

মণ্ডলঘাট, ৪০৩
মতিলাল শীল, ১৭
মথুরা, ১৬৬, ২২৯, ২৩০, ৪৪৭
মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১২৪
মদনমোহন বসু, ২৬
মনুসংহিতা, ১৪২, ১৬১, ১৮১—১৮৩
মসূরী পর্ব্বত, ১৭৯
মহম্মদশাহী, ৪০৪
মহানারায়ণোপনিষদ, ২২৩
মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৯১—৯৭, ১৮২, ২২৯, ২৭৫, ৩৭০, ৩৭১, ৩৮৪
মহাভারত, ৪৮, ১১১, ১৮১, ১৮২
মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩১৬, ৪০৪
মহ্তাব্ চন্দ, ১৫৯—১৬২, ৩৩৭, ৩৮২, ৪০৯, ৪১০
মা-গোসাঁই, ৩৮, ৩০৪
মাণিকতলার বাগান (রামমোহন রায়ের), ৫৬, ২৭৫, ৩৪২
মাণ্ডূক্যোপনিষদ, ৬২, ১৫৫—১৫৭, ২২৯, ৩৬৭, ৩৮৮
মাতা ('দিগম্বরী দেবী' দ্রষ্টব্য)।
মাধবপুর, ২৩২
মায়াবাদ, ৬৫, ১৮৫, ৪৪১
মিরাট, ২৪৫
মির্জ্জাপুর, ১:৮
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ৪৭
মুঙ্গের, ২২৫, ২৭৭, ৪৪৬

মুণ্ডকোপনিষদ্, ৬২, ৮৯, ৯০, ১৩১, ১৪৫, ১৫৩, ১৫৬, ১৬৮, ১৭২, ১৭৪, ১৭৭, ৩৯৪, ৪২৮
মুদেলিয়ার, ১৯৬
মুসমীন্, ১৯৬—২০২
মেঘদূত, ২০৫, ২৬৫
মেঘনা, ১৯২
মেদিনীপুর, ১২৭, ৪০৪, ৪৫৭
মেনকা দেবী, ২৯৭
মেমারি, ১৩২
মোতি ঝিল, ৩০৭, ৩০৮
মোহমুদ্গর, ২২১
ম্যাক্‌ফার্সন, ডাঃ, ৩৩২
Mackintosh & Co., ৩৩০, ৩৩১
'Memoir of Dwarkanath Tagore,' ৩০৭—৩০৯, ৩১৫, ৩৩২
'Mid-Victorian Hindu, A', ৪৫৪, ৪৫৮, ৪৫৯
Mullens, Rev. Mr., ৪২২

য

যজুর্ব্বেদ, ১৩১—১৩৫, ১৪০—১৪৫, ১৫৩, ১৫৪, ২৭৩, ৩৮৬
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা), ৩০৫
যমুনা নদী, ২২৮—২৩০, ২৮৫

র

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য, ২১২
রঙ্গপুর, ১২৭, ৪০৩
রমানাথ ঠাকুর, ২০, ৫৯, ১১৮, ১২৪, ১২৫, ২১৪, ২১৯, ২২০, ২৯৭, ৩২১, ৩৩১, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৯০, ৩৯৯, ৪০৩, ৪০৫, ৪৪২
রমানাথ ভট্টা., ১০৯,১৩২—১৩৯,১৫৩
রমাপ্রসাদ রায়, ৫৬, ৬৯, ২১৪, ৩১৪, ৩২৪, ৩৯০, ৪৪৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩৫, ১৭৩, ২৮০, ৩০৬, ৩৬৯, ৩৭০
রসিককৃষ্ণ মল্লিক, ৩১৪, ৩১৬
রাখালদাস হালদার, ২৩, ২১৬, ২১৭, ৪৪৩—৪৪৬, ৪৫২—৪৫৮
রাজচন্দ্র দাস, ৩৪০
রাজনারায়ণ বসু, ২৬, ১১০—১১৫, ১৩২, ১৫৮, ১৯০, ২১৬, ২৩৭, ৩১৬, ৩১৭, ৩৭০, ৩৯১—৩৯৮, ৪০৬—৪১০, ৪১৬, ৪২১—৪২৬, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৫৭, ৪৬২, ৪৬৩
রাজসাহী, ৫৪, ১২৭, ২১৯, ৪০৩
রাজা সুখময়, ৩৪০
রাজা হরনাথ, ৩৪০
রাজেন্দ্রনাথ সরকার, ১০৩
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (কলিকাতার), ৩৪৭
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (কাশীর), ২২৬, ৪৬০
রাণীগঞ্জ, ১২৭, ৪০৩
রাধাকান্ত দেব, ১০৫, ১০৬, ১১৮, ৩৯০, ৪৪২

রাধাকান্ত বিগ্রহ, ৩০৫, ৩০৬
রাধানাথ ঠাকুর, ৪৫, ২৯৭
রাধাপ্রসাদ রায়, ৫৭, ২০৬, ৩২৭, ৩৪৮
রামগোপাল ঘোষ, ১০৫, ৩১৪, ৩১৫, ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫৮, ৪২৪, ৪৪২
রামচন্দ্র গাঙ্গুলী, ২০৬
রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, ৬০, ৬৬, ৬৮—৭১, ৭৫, ৭৮—৮৫, ৯৪, ২৩০, ৩৪০—৩৪৮, ৩৫৪, ৩৫৯—৩৬৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪১৫—৪১৮, ৪২৩, ৪২৪, ৪৩৮
রামতনু লাহিড়ী, ৩১৪, ৩১৫, ৩৫৯, ৪২৪, ৪৪৩
রামদাস (গুরু), ২৩৩
রামদুলাল সরকার, ৩৪০
রামনগর (চিনির কারখানা), ৪০৩
রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ৮৫
রামপুর, ২৬২, ২৬৫
রামপুর বোয়ালিয়া, ২৯২, ২৯৩
রামমণি ঠাকুর, ৫৭, ১২০, ২৯৭, ৩২৬, ৩২৭
রামমোহন রায়, ৩৯, ৫৬—৬০, ৬৬, ৭০, ৭২, ৭৫, ৮৩—৮৫, ৮৮, ৯৭, ১০৮—১১০, ১২৪, ১৪২, ১৫৭, ২০৬, ২১১, ২২৯—২৩১, ২৭৫, ৩১২, ৩১৫, ৩২৪—৩২৯, ৩৪১—৩৪৪, ৩৪৭—৩৫০, ৩৫৩—৩৫৬, ৩৬০—৩৬৬, ৩৭৩, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৬—৩৯২, ৪০০, ৪১৩—৪১৬, ৪১৯, ৪২২, ৪৩২, ৪৩৮, ৪৫০, ৪৫১
রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসঙ্গীত, ৮৪, ১০৯, ১১৯, ১৫৭
ঐ স্কুল, ১০, ৫৬, ৭৮, ৩১৩, ৩১৪
রামলোচন ঠাকুর, ২৯৭, ৩০৪, ৩২৭
রামবল্লভ ঠাকুর, ৩০৬
রামায়ণ, ২৭৭
রাবী নদী, ২৩২
রাসবিলাসী দেবী, ১২৪, ১২৫
'Rational Analysis of the Gospel', ৩৭৫
Reid, ৩২৩

ল

লক্ষ্মীজনার্দ্দন শিলা, ৩০৫, ৩১০, ৩২৭
লক্ষ্মীনারায়ণ তর্কভূষণ, ৩৪১
লণ্ডন, ১১৭
লর্ড অকলণ্ড, ৭৯, ৩০৯
লর্ড লীটন্, ২৩৩
লর্ড হে, ২৪৬, ২৪৭, ২৮৯, ৪৪৯, ৪৫০
লালকুঠি, ২৮৬, ৪৬৩
লালদীঘি, ২৩২
লালা বাবু, ২৩০
লাহোর, ২৩১, ৪৪৭
লোকনাথ রায়, ৮৫, ৩৭১, ৩৭৪
La Mettric, ৩২৩
Locke, ৩২৩

অন্তঃস্থ ব

(বর্গীয় ব'য়ের ঠিক পরে)

শ

শঙ্করাচার্য্য, ৬৫, ৭৭, ১৬৫, ১৬৭, ২১৩, ২২১, ২২৩, ২৭৬, ৩৯২, ৪১৭

শতদ্রু নদী, ২৬২, ২৭৪—২৭৭

শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৫৪, ২৩৮

শম্ভুনাথ পণ্ডিত, ৩৪৭, ৪৪৩

শরগড়া, ৪০৪

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৮৫

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, ৩৬৯, ৩৭০

শারীরক মীমাংসা, ১৬৭

শালিমার বাগ (পঞ্জোর), ২৩৯, ২৮৪

শাহাজাদপুর, ১২৮, ৪০৩

শিখ সম্প্রদায়, ২৩৩—২৩৬, ৪৫৩, ৪৫৫

শিলাইদহ, ৪০৩, ৪৪৪

শিবচন্দ্র দেব, ৩১৪

শিবনাথ শাস্ত্রী, ৪২, ৩৭০, ৩৯৭

শিবপ্রসাদ মিশ্র, ৩৪২

শ্যামাচরণ দে, ৩১৪

শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য (পরে তত্ত্ববাগীশ), ৪৭, ৪৮, ৫৯, ৬৯, ৮৫, ৯২, ৯৪, ১২৪, ১২৫, ১৬০, ৩৫১, ৩৬৩, ৩৭৪, ৪১০

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ৮৫, ৩৭৫

শ্যামাচরণ সরকার, ৩৯৩

শ্রীকণ্ঠ সিংহ, ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭

শ্রীধর ভট্টাচার্য্য (পরে ন্যায়রত্ন), ৮৫, ৩৭১, ৩৭৪

শ্রীধর বিদ্যারত্ন, ৪১০

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪৩, ৪৪, ২২২, ২২৫, ২৫৪, ৪৪৬

শ্রীশচন্দ্র রায় (কৃষ্ণনগররাজ), ১৬২—১৬৪, ৩৪৭, ৩৮২, ৪১১, ৪১২

শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ২৫

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৬২, ৯৫, ১৪৫, ১৫৩, ১৫৬, ১৬৩, ১৬৮, ১৭৬, ১৭৮, ১৮৬, ২২৩, ২৭১, ২৭৩, ৩৯৪

স

সতীশচন্দ্র (কৃষ্ণনগর-রাজকুমার), ১৬৪

সত্যচরণ ঘোষাল, ১০৫, ১০৬

সত্যজ্ঞানসঞ্চারিণী সভা, ৪৪৪

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩৫, ১১০, ২৯৩, ৪০৩

সরদা নদী, ৫৪

সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা, ৫৫, ৩১৫, ৩১৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ৪১০, ৪১১

সামবেদ, ১৩১—১৩৪, ১৪০, ১৫৪, ১৭৯

সারদা দেবী (পত্নী), ১১০, ৩৬০

সাবিত্রী মন্ত্র ('গায়ত্রী' দ্রষ্টব্য)।

সাহাজাদপুর, ১২৮, ৪০৩

সিক্রোল, ২২৬

সিমলা, ২৩৮—২৮৫, ২৮৯, ৪৪৭, ৪৪৯, ৪৬২

সিরাহন পর্ব্বত, ২৬৫

সীতাকুণ্ড, ২২৫, ২৭৭

সীতানাথ ঘোষ, ৪০৮

সুকুমার হালদার, ৪৫৪, ৪৫৬

সুকুমারী দেবী, ৪০৩

সুখময় (রাজা), ৩৪০

সুখসাগর, ১১৫

সুখানন্দ স্বামী, ২৩০, ২৩১, ২৭৫—২৭৮

সুজ্মী পর্ব্বত, ২৬০—২৬৩, ৪৪৭, ৪৬১—৪৬৩

সুন্দরীতাপনী উপনিষদ্, ১৬৬

সোহিনী, ২৬৩, ২৭৪—২৭৭, ৪৪৭

সৌদামিনী দেবী, ২১, ৩১০, ৪০১, ৪০৭, ৪০৮

স্কন্দোপনিষদ্, ১৬৬

স্বরূপ খানসামা, ১১৪, ৪০১

স্বরূপপুর, ৪০৩

Scottish Intuitionists, ৩২৩, ৪৪৭

হ

হরকুমার ঠাকুর, ৩১১, ৩৯৯

হরদেব চট্টোপাধ্যায়, ৮৫, ৩৭৪

হরিনাথ (রাজা), ৩৪০

হরিপুর, ২৪১

হরিমন্দির, ২৩২—২৩৬

হরিমোহন গোস্বামী, ৩৭৪

হরিমোহন সেন, ১০৬, ৩৯০, ৩৯১

হরিশ্চন্দ্র নন্দী, ৮৫

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪৪৩

হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, ২৩০, ২৩১, ২৭৫, ৩৪১, ৩৪২

হাজারীলাল, ৮৫, ৮৬, ১১৯—১২১, ১২৫, ১৩২, ১৩৯, ৩৭৪, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪১১, ৪৪৪

হাফিজ, ১৫০, ১৭৯, ২২১, ২২৩, ২২৪, ২৫৯, ২৬৯, ২৭০, ২৭৩, ২৯২, ৩২১, ৪৪৭, ৪৬২

হিন্দু কলেজ, ১০, ৫৬, ৩১৩—৩১৭, ৩২২—৩২৪, ৩৪৩, ৩৪৮

হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়, ১০৬, ৩১৬, ৩৯০, ৩৯১

হুগলী, ১১১, ১২৭, ৪০৩

হেণ্ডারসন (মেজর), ৩৩২

হেদুয়া, ৫৬, ৭৮—৮০, ৩৪২, ৩৪৩

হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১১০, ৩৭৪

Hamilton (Sir W.), ২৩৭, ৪৪৭

Hampton, F. R., ২০

History of the Brahmo Samaj (Sastri), ৩৭১, ৪১৫, ৪৫৯

Holbach, ৩২৩

Holmes's *History of the Indian Mutiny*, ৪৪৯, ৪৫০

Hume, ৩২৩